গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

মানকুমারী বসু : ব্যক্তি ও স্রষ্টা জীবনের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-অনুষদের অন্তর্গত বাংলা বিভাগের অধীনে পি-এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

(bearing registration no 10018401114000009 of 2018)

গবেষক

পীযুষ নন্দী



বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

২০২০

Certificate from the Supervisor

This is certify that the thesis entitled **"মানকুমারী বসু: ব্যক্তি ও স্রষ্টা জীবনের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা"**submitted by Pijush Nandi, who got his name registered on June 2018, for the award of Ph.D. (Arts)Degreeof West Bengal State University is absolutely based his own work under the supervision of professor Mohini Mohan Sardar, Professor & Head, Department of Bengali, West Bengal State University, Barasat, Kolkata-700126 and that neither his thesis nor any part of the thesis has been submitted for any degree or any other academic award anywhere before.

Signature of the Supervisor
(Mohini Mohan Sardar)
Professor & Head,
Department of Bengali
West Bengal State University
Barasat, Kolkata-700126

Declaration

I Pijush Nandi, bearing Ph.D. registration no.**10018401114000009** dated-**22.06.2018**,hereby declared that the work described in this thesis entitled **"মানকুমারী বসু: ব্যক্তি ও স্রষ্টা জীবনের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা"** is entirely my own work. No portion of the work referred to in this thesis has been submitted in support of an application for another degree or qualification of this or any other University or Institute. Any help or source information, with has been availed in the thesis, has been duly acknowledged.

(Pijush Nandi)
Ph.D. Scholar
Dept. of Bengali,
West Bengal State University
Barasat, Kolkata-700126

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই গবেষণা কর্মটিদীর্ঘদিনের নিরলস শ্রমের ফসল। একইসঙ্গে মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। একাধিক ব্যক্তি বিভিন্নভাবে আমার সেই পরিশ্রমকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই এই গবেষণা কর্মকে সার্থক রূপ দিতে গিয়ে আমি বিভিন্নভাবে একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী হয়ে রয়েছি।

প্রথমেই আমি বলবো আমার শিক্ষক মহাশয় ড. মোহিনীমোহন সরদারের কথা। আমার গবেষণার বিষয়টি উনিই আমাকে ভাবতে সাহায্য করেছিলেন। বিষয়টির সজ্জাতেও ওনার সাহায্য পেয়েছি। এই অবসরে স্যারের সেই ঋণ স্বীকার করছি এবং স্যারের প্রতি আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ওপ্রণাম জানাচ্ছি।

চৈতন্য লাইব্রেরির একনিষ্ঠ সেবক গুইন দার প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মানকুমারী বসুর বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন গ্রন্থ গুইনদাই আমাকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকার ফটোকপি পেতে সাহায্য করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গবেষণার প্রতি আমার নিষ্ঠা অনুভব করে গুইনদা শুধু আমার কারণেই সময় অতিক্রম করে গেলেও আমার পড়াশোনা শেষ না হওয়া অবধি বহুদিন লাইব্রেরি খোলা রেখেছিলেন। ওনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই অবসরে ওনাকেও আমি আমার প্রণাম জানাই।

পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন লাইব্রেরি যথা ন্যাশান্যাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, চন্দননগর লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, বাঁশবেরিয়া লাইব্রেরি, বেলঘরিয়া প্যারীমোহন লাইব্রেরি, রামমোহন লাইব্রেরি প্রভৃতি গ্রন্থাগারের সকল গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বারবার তাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা দেখার ও পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এছাড়াও কিছু

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত লাইব্রেরি আমি ব্যবহার করেছি। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিশ্বভারতীরকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেরনাম উল্লেখ করতেই হয়। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকএবং সকল কর্মীদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা আমার একাধিক প্রয়োজন মিটিয়ে আমার গবেষণা কর্মের শ্রমকেলাঘব করেছেন। আর স্টেট সেন্ট্রাল গ্রন্থাগারে সশরীরে না গেলেও তাদের ওয়েবসাইট থেকে আমি একাধিক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেছি। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রতিষ্ঠান ও উক্ত বিভাগের আধিকারিক এবং তার কর্মীদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুমিতা চক্রবর্তী আমাকে আমার গবেষণার বিষয়ে কিছুক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিকোণের সন্ধান দিয়েছেন। এই অবসরে ওনাকেও আমিপ্রণাম জানাই। আমার অভিভাবকতুল্য ব্যক্তি কমল বসু মহাশয়ের কাছেও আমি যথেষ্ট ঋণী। তিনি আমার গবেষণার বিষয়ে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন এবং গবেষণা বিষয়ে কোনো তথ্য পেলেই তিনি তক্ষুনিতা আমাকে দিয়ে সাহায্য করতেন। এছাড়াও তিনি আমার গবেষণার আলোচনা সম্পর্কেও বারবার গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমি প্রণাম জানাই।

‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকার ‘কবি মানকুমারী বসু’ সংখ্যা আমাকে প্রচুর তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক অতনু মিত্র গবেষণা সংক্রান্ত কিছু চিত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার সহধর্মিণী দেবলীনা যশ এই গবেষণা কর্মে নিরন্তর অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বাক্য গঠন ও বানানের ক্ষেত্রে প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে সে আমার শ্রমের বোঝাকে লাঘব করেছে। তাকেওআমি আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই।

পীযুষ নন্দী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

প্রাককথন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। সামাজিক সংস্কার, ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁরা অবদান রেখেছেন। কিন্তু এসবের মধ্যে কোনো মহিলা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব লক্ষ করা যায় না। তৎকালে আবির্ভূত ব্যক্তিদের দ্বারা সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংস্কার সাধন হয়েছে, তার ফলস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যক্ষেত্রে কয়েকজন মহিলা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। এই ঘটনা বাংলার সমাজ ও ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। এই পর্বে যে কয়েকজন মহিলা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) ছিলেন অন্যতম। নবাগত এই মহিলা সাহিত্যিক, সাহিত্য ক্ষেত্রে একাধিক প্রকরণেসাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি কবিতা, মহাকাব্য, প্রবন্ধ, ছোটোগল্প, উপন্যাস, আত্মজীবনী প্রভৃতি প্রকরণে সাহিত্য সৃষ্টি করে নিজেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন গুরুত্বপূর্ণ মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তবুও একালের সারস্বত চর্চায় তিনি এবং তাঁর সাহিত্য অবহেলিত হয়ে রয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, সংস্কৃতির বর্ণনা যেমন রয়েছে তেমনই তাঁর সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর আত্মকথা ও তাঁদের জীবন-ভাবনার প্রকাশও মূর্ত হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি উল্লেখ্য, তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর জীবন সম্পর্কে একজন নারীর দৃষ্টিভঙ্গিরয়েছে। এই সব বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা মানকুমারী বসু এবং তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছি।

এযাবৎ মানকুমারী বসুকে নিয়ে কোনো অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি তা নয়, তবে মানকুমারী বসুর সৃষ্টসাহিত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে বলা যায় যেতা যথেষ্ট নয়। মানকুমারী বসুকে নিয়ে হাতেগোনা যে কয়টি গবেষণা কর্ম হয়েছে সেগুলিতে সাহিত্যিক মানকুমারী বসুর সামগ্রিক সত্তার প্রকাশ নেই, আছে শুধু তাঁর কবিসত্তার আলোচনা। তাই আমরা মানকুমারী বসুর ব্যক্তি জীবন ও তাঁর সমগ্র সাহিত্য সত্তা নিয়ে গবেষণা

করতে চেয়েছি। তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে আজও আমরা প্রেরণা লাভ করি। দীর্ঘ পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠা আজও আধুনিক সমাজের নারীর কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁর সাহিত্য থেকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবনা, মূল্যবোধ যেমন জানতে পারি, তেমনি একজনমহিলা সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত সাহিত্য বিচার করে, সেই সময়কারনারীর ভালো-মন্দ লাগার যৌক্তিকতা এবং তাঁদের জীবন-যাপনের গতিপথকে নির্মাণ করতে পারি। এই কারণেই মানকুমারী বসু আজওআমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। সেই প্রাসঙ্গিকতাকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াসে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

মানকুমারী বসু : ব্যক্তি ও স্রষ্টা জীবনের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:

প্রথম অধ্যায়: মানকুমারী বসু: ব্যক্তি ও স্রষ্টা জীবনের স্বরূপ সন্ধান।

ক. ব্যক্তিপরিচয় উদ্ধার।

খ. শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্যের পরিচয় উদ্ধার।

গ. স্রষ্টা জীবনের পরিচয় উদ্ধার।

ঘ. আবির্ভাবের পটভূমি বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কবি মানকুমারী বসুর কাব্য প্রতিভার স্বরূপ সন্ধান।

১. লিরিকধর্মী কবিতার বিশ্লেষণ।

ক.ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কবিতা।

খ.স্নেহ ও শোক কবিতা।

গ.প্রকৃতি ও স্বদেশপ্রেমের কবিতা।

ঘ.প্রশস্তি ও স্মরণমূলক কবিতা।

ঙ.আত্মভাবনামূলক কবিতা।

২.বিষয়ভিত্তিক কবিতার বিশ্লেষণ।

৩.পুনর্নির্মাণমূলক কবিতার বিশ্লেষণ।

৪.শিশু-কিশোর পাঠ্য কবিতার বিশ্লেষণ।

তৃতীয় অধ্যায়: মহাকাব্য রচয়িতা মানকুমারী বসু: প্রথম মহিলা মহাকবির কবিত্ব প্রতিভার অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা ।

ক. কাহিনি গ্রন্থণে কৃতিত্ব সন্ধান।

খ. চরিত্র সৃজনে নৈপুণ্যের পরিচয় উদ্ধার।

গ. ভাষা-ছন্দ-অলংকার প্রয়োগে নৈপুণ্য সন্ধান এবং কাব্যের রস বিচার।

চতুর্থ অধ্যায়: মানকুমারী বসুর প্রাবন্ধিক সত্তার স্বরূপ সন্ধান ।

পঞ্চম অধ্যায়: মানকুমারী বসুর কথাসাহিত্য: অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা ।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সমকালীনতা ও মানকুমারী বসু: প্রতিভার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ ।

সপ্তম অধ্যায়: আধুনিক সমালোচনার ধারায় মানকুমারী বসু ও তাঁর সাহিত্য: একটি সমীক্ষা।

অষ্টম অধ্যায়: ফলকথা: একালে মানকুমারী বসুর সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার ।

পরিশিষ্ট:

গ্রন্থপঞ্জী:

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়কাল জুড়ে সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন যেমন সংঘঠিত হয়েছে, তেমনই এই সময়কালে একাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব ও তাঁদের শিক্ষা-ভাবনার বাস্তবায়নে বাঙালি সমাজ যে আলোড়িত হয়েছে, সেকথা সত্য।এতদিন ধরে অবদমিত হয়ে থাকা নারীর জীবনেওসেই আলোড়নের প্রভাব পড়তে দেখা গেছে।বিধবা বিবাহ আইন সম্মত হওয়া, বাল্যবিবাহ বন্ধ হওয়া, কৌলীন্য প্রথার বিলোপ ঘটানো, নারী শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই বাঙালি সমাজেদ্বন্দ্ব ও মতভেদ দেখা যায়। যদিও বলা যায়,ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে নারীর জীবন নিয়েপ্রগতিশীল কোনো তত্ত্ব তখনো দানা বাঁধেনি এবংনারী শিক্ষা নিয়ে তখনও সমাজের বাধা কাটেনি;তবুও বহু প্রতিকূলতার মধ্যেমননশীল এবং সহৃদয় কোনো কোনো ব্যক্তিনারীশিক্ষা ও নারী মুক্তির প্রগতিশীল চিন্তাচেতনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন।ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র সময়পর্ব জুড়ে এইভাবে সংরক্ষণশীল মনোভাববনামপ্রগতিবাদী ভাবধারা ক্রমাগত সামাজিক দ্বন্দ্ব তৈরী করেএই সময়টাকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে। লক্ষ করার বিষয় হল, নারী সমাজের এই দীর্ঘকালীন অবদমন থেকে নারীর বেরিয়ে আসার জন্য যে আন্দোলন তাতে পুরুষের ভূমিকাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।আসলে তখনও নারী তাঁর নিজের কথা ভাবতে শেখেনি এবং বলাইবাহুল্য পুরুষরাই নারী মুক্তির দিশায় নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই লড়াই এ নেমেছেন।

নারী সমাজের অন্যান্য সমস্যা বাদ দিয়ে শুধু তাঁর শিক্ষার আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করলেই তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। নারীর শিক্ষা নিয়ে তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ধারণা হল,নারী পড়াশোনা শিখলে তাঁর অকালবৈধব্য দশা হবে। শুধু তাই নয়,বাল্যবিবাহকেওনারী শিক্ষারএকটা বড় বাধা বলা যায়। আর তৃতীয় কারণটি হল, সেকালের সমাজে এই বিশ্বাস ছিল যে, নারী শিক্ষিত

হলে পুরুষতান্ত্রিকতাকে সে অস্বীকার করার সাহস দেখাতে পারে। এই সব ভাবনাকে কাটিয়ে ওঠা খুব সহজ ছিল না।আর তাই নারী শিক্ষার প্রথমপর্বেরইতিহাস একপ্রকার ব্যর্থতার ইতিহাস বলা যায়। আরও উল্লেখ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা ভর্তি হননি।এর অবশ্য একাধিক কারণ থাকতে পারে। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির পৃষ্ঠপোষক হলেন মিশনারি সোসাইটি, তাই মেমদের কাছে পাঠ নিলে জাত নষ্ট হবে বলে অনেকে মনে করতেন। স্বপন বসু সম্পাদিত 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা' গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক একটি পত্রাংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে -

"..... দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কয়েকজন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করেন কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের ঐ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।"[১]

বলাইবাহুল্য পারিতোষিকের লোভে নিম্নবর্ণের মেয়েরা শিক্ষাঙ্গনেগেলেও তখনও উচ্চবর্ণের সমাজে নারীশিক্ষা নিয়ে তেমন কোনো সামাজিক সচেতনতা দানা বাঁধেনি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও একদল মানুষের নিরন্তর আন্দোলন ও সমাজ-পরিবর্তনের প্রবল ইচ্ছার জন্যনারীর শিক্ষা নিয়ে সমাজিক ভাবনার কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে।এব্যাপারে মিশনারিদের উৎসাহও লক্ষ করার মতো। ১৮১৯ সালে পিয়ার্স সাহেবের সভাপতিত্বে কলিকাতায় 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' স্থাপিতহয়।[২]এছাড়াও এব্যাপারে মিস কুকের ভূমিকা প্রশংসনীয়।[৩]১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম কেরি, জন ওয়ার্ড ও জোশুয়ামার্শম্যানের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে 'দ্য সেরামপোর ফিমেল এডুকেশন সোসাইটি' স্থাপিত হয়।[৪] যদিও এইসব উদ্যোগ এবংনারীশিক্ষা প্রসারের পেছনেমিশনারীরা খ্রিস্ট ধর্ম ও তাঁদের দর্শন প্রচার করতে চেয়েছিলেন।তবুও মিশনারীদের এই জাতীয় উদ্যোগের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সমাজের মধ্যে নারী শিক্ষার ভাবনাকে প্রসারিত করতে দেশীয় প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশনারিদের এই উদ্যোগ যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়েই বেথুন সাহেবের উদ্যোগে এবং দেশীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'ক্যালকাটা

ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, একাধিক সুধী ব্যক্তি এই স্কুলে তাঁদের পরিবারের মেয়েদের ভর্তি করেছিলেন। আমরা আগেই স্বীকার করেছি যে, এই উদ্যোগের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে মূলত নিম্নশ্রেণির মেয়েরাই ভর্তি হত, তাও আবার শিক্ষা অপেক্ষা পারিতোষিক লাভই ছিল তাদের মূল উদ্দ্যেশ্য।অথচ এই প্রথম মিশনারিদের উদ্যোগে এবং প্রগতিশীল সংগ্রামী বাঙালি পুরুষের ঐকান্তিক ইচ্ছায় উচ্চসমাজের মেয়েরাও ধীরে ধীরে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে প্রথাগত শিক্ষার পাঠ নিতে শুরু করল। বলা বাহুল্য যে, এই প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে রক্ষণশীলরা স্কুলের মেয়েদের উদ্দেশ্যে তীব্র গালিগালাজ করা, বেথুন সাহেবের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, স্কুলে পাঠরত মেয়েদের পরিবারকে সমাজচ্যুত করা প্রভৃতি একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সেই প্রতিকূলতার মধ্যেও নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে বলা যায়। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর(১৮৫১) পর থেকে এই অবস্থারপরিবর্তন হয়েছে। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ নারী শিক্ষার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছে এবং এর কিছুটা সময় পরে সরকার থেকে বেথুন স্কুলের দায়িত্ব নিলে এই আন্দোলনও স্বীকৃতি লাভ করে।[৬] ঊনবিংশ শতকের ছয়ের দশকের পর থেকে নারী শিক্ষার পক্ষে ধীরে ধীরে একটা জনমত তৈরি হয়ে উঠেছে।এই সময়ের পর থেকেই কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক মহিলা স্কুল স্থাপিত হয়েছে। গ্রামের দিকেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৮৬৪ সালে যশোরের এগারোটি গ্রামে মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়েছে।[৭]এতকিছুর পরেও সমাজের সর্বস্তরে নারীরপ্রথাগত শিক্ষার সার্বিক বিকাশ ঘটেনি। প্রথাগত শিক্ষার ব্যাপারে তখনও বাংলার উচ্চসমাজেদ্বিধা রয়েই গেছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক স্বপন বসু বলেছেন-

"সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এই স্কুলে মেয়ে পাঠাতে দ্বিধার কথা বিদ্যাসাগর ১৮৬২ সালের বেথুন স্কুল রিপোর্টে উল্লেখ করেন। অবশ্য এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে বাড়ির মেয়েদের ঘরে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন— একথা উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেননি।"[৮]

যদিও এব্যাপারে বেথুন সাহেব যথেষ্ট উদ্যোগনিয়েছেন এবং এব্যাপারে একাধিক দেশীয় ব্যক্তির সাহায্যও তিনি পেয়েছেন। তবু বেথুন সাহেবের মৃত্যুর(১৮৫১

সালে ১২ই আগস্ট) এগারো বছর পরে ১৮৬২ সালে বেথুন স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা হয়েছে ৯৩ জন।[৯] সংখ্যাটা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে বাঙালি উচ্চসমাজে মেয়েদের পারিবারিক শিক্ষাদানের রীতি চালু হতে দেখা যায়। এছাড়াও কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিরা তাঁদের মেয়েদের প্রথাগত শিক্ষাদান করাতে এগিয়ে এসেছেন। এই সময় থেকে উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারে একটা শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল বলা যায়। তখন ঘরে ঘরে মহিলাদের পারিবারিক শিক্ষাদানের মানসিকতা বোধহয় এই সংস্কৃতিরই ফল। ছয়ের দশকে এই মানসিকতা পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কারণগুলি হল এক. দীর্ঘদিন ধরে সমাজে নারীর শিক্ষার জন্য আন্দোলন, দুই. ব্রাহ্মধর্মে নারীশিক্ষাকে স্বীকৃতি জানানো, তিন. হিন্দু ধর্মে সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল মানুষের আবির্ভাব, চার. উচ্চবিত্ত পুরুষদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার। এই স্বল্প অবকাশেই উনিশ শতকের ছয়ের দশকে প্রচলিত পারিবারিক শিক্ষা ও প্রথাগত স্কুল শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে একাধিক মহিলা সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) এঁদেরই একজন। বাংলা সাহিত্যে মানকুমারী বসুর পরিচিতি একজন মহিলা কবি হিসেবে। আমরা একটু শুধরে নিয়ে তাঁকে মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে পরিচয় দিতে আগ্রহী। এবিষয়ে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কিছু মতামত যথাস্থানে প্রকাশ করবো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই মহিলা কবিদের বাইরেওসামাজিকক্ষেত্রে এবং নারী শিক্ষার প্রসারে কয়েকজন মহিলার অবদানের কথা জানা যায়। ছয়ের দশকে রাধিকাসুন্দরী দেবী, রঙ্গদেবী, করুণাময়ী দেবী, কৃষ্ণকামিনী দেবী, বামাসুন্দরী দেবী প্রমুখ মহিলাগণ নারী শিক্ষা প্রসারে তাঁদের যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।[১০]ঊনবিংশ শতাব্দীর জটিল ও দ্বান্দ্বিক সমাজব্যবস্থায় নারীর নিজেরআত্মকথা এবং তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে নারীর দৃষ্টিমানকুমারী বসুর ব্যক্তি জীবন ও তাঁর সাহিত্য থেকে জানা যায়। মানকুমারী বসু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘ ‘বিবাহ’ রূপে হিন্দু-সমাজে বালিকাদিগকে এক অন্ধকার পূর্ণ ভবিষ্যৎ রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়া থাকে।’[১১]নারীর এই আত্মকথা যেন ঐতিহাসিক দলিল। ১৮৫৪ সালে ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ পত্রিকায় মহিলাদের মনের কথা জানিয়ে লেখা হয়- ‘নিত্য সুখ প্রদায়িনী, বিদ্যার অভাবে।/আপন জীবন তারা, মরুভূমি ভাবে।।’[১২]এই বক্তব্য থেকেসমাজে নারীর অবস্থানসম্পর্কে আমাদের

ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে অনেকে গ্রন্থ রচনা করলেও কৈলাসবাসিনী দেবীর 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি'(১৮৬৫) গ্রন্থটি আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটি যেন বঞ্চিতদের মুখে বঞ্চনার গল্প হিসেবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর গ্রন্থে উনিশ শতকের স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। কৈলাসবাসিনী দেবী নিজে বলছেন-'যেকাল পর্যন্ত্য বালীকাগণের পাঠোপযোগী হিন্দু অন্তঃপুর তুল্য বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাবৎকাল আর তাহাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা কখনই বিধেয় নহে।'[১৩]নারীর স্কুলশিক্ষা নিয়ে একজন নারীর বক্তব্যকে সংরক্ষণশীল মনে হলেও একথা বেশ বোঝা যায়, সেকালে শিক্ষা, বিদ্যাঙ্গননারীর কাছে খুব একটা সুখের ছিল না।এই একই অনুভূতির কথা পাই মানকুমারী বসুর সাহিত্যেও।

মানকুমারী বসুর পরিচয় মুলত কবি হিসেবে হলেও তিনি মহাকাব্য, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, আত্মজীবনী প্রভৃতি সাহিত্যের প্রণেতা। এই বিস্তৃত লেখনীর মধ্য দিয়ে একদিকে নারীসমাজ ও তার শিক্ষা, অন্যদিকে সামাজিক সংস্কার ও নারীর মূল্যবোধ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত আমরা পাই, যা থেকে উনিশ শতকের সমাজ-বাস্তবতায় মানকুমারী বসুর সাহিত্য প্রতিভাকে মূল্যায়ন করা যায়। আমরা তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে পৃথক পৃথক অধ্যায় বিভাজন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এই কথা বলা যায় যে, তাঁর লেখনি উনিশ শতকের নারীর কথায় নারীর সংলাপ।

একথা স্বীকার করতেই হয় যে, মানকুমারী বসু প্রথাগত শিক্ষায় যৎসামান্য অগ্রসর হলেও তিনি মূলত ছিলেন স্বশিক্ষিত। তাঁর সেই শিক্ষা উনিশ শতকের প্রগতিশীল নারীর শিক্ষা হিসাবে ধরাই যায়। মূলত তিনি ছিলেন নারীর প্রতিনিধি স্থানীয়। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়, নিজের চেষ্টায় তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন এবং বিধবা হওয়ার পরও শিক্ষাকে ত্যাগ করেননি। এমন সাহিত্যিক আমাদের আগ্রহকে আকর্ষণ করবেন এটিই স্বাভাবিক। সেই আগ্রহের কারণেই আমরা মূলত মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন নিয়ে, তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যসত্তাসহ তাঁর স্রষ্টা-জীবন নিয়ে, তাঁকে অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হয়েছি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য-

১. দ্রষ্টব্য: স্বপন বসু (সম্পা.), 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা', ভূমিকা অংশ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৩।

২. পিয়ার্স সাহেবের পুরো নাম ডাবলিউ এইচ পিয়ার্স। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের পুরো নাম 'The Female Juvenile society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools'-এই কাজে তিনি সহৃদয় ইংরেজ মহিলাদেরও সাহায্য পেয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১০।

৩. বিলাতের 'ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি' থেকে মিস কুককে স্ত্রীশিক্ষার জন্য এদেশে পাঠিয়েছিলেন। তিনি চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে আটটি মহিলা স্কুল স্থাপন করেন। সেই স্কুলগুলি হল ঠনঠনিয়া স্কুল, মির্জাপুর স্কুল, প্রতিবেশী স্কুল, শোভাবাজার স্কুল, কৃষ্ণবাজার স্কুল, শ্যামবাজার স্কুল, মল্লিকবাজার স্কুল ও কুমারটুলি স্কুল। বিস্তারিত বিবরণেরজন্যদ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১১।

৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১২।

৫. রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি দেশীয় ব্যক্তির সহায়তায় বেথুন সাহেব স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৫।

৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৮।

৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-২১।

৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৮।

৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৭।

১০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-২০।

১১. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথগুপ্ত, 'বঙ্গেরমহিলাকবি', 'মানকুমারীবসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল২০১৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১০৩।

১২. দ্রষ্টব্য: স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', 'স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', পুস্তক বিপণি, অগাস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১৫৪।

১৩. দ্রষ্টব্য: কৈলাসবাসিনী দেবী, 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি', 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা', স্বপন বসু(সম্পা.), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৬৩।

প্রথম অধ্যায়

মানকুমারী বসু: ব্যক্তি ও স্রষ্টা জীবনের স্বরূপ সন্ধান

প্রথম অধ্যায়

মানকুমারী বসু: ব্যক্তি ও স্রষ্টা জীবনের স্বরূপ সন্ধান

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশিয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে বাঙালির চিন্তা-চেতনার ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণ করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন পাশ্চাত্যপন্থীরা। তাঁদের সেই নিরলস প্রচেষ্টা যে শিক্ষিত বাঙালির চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল সেকথা সত্য, কিন্তু বাঙালিরা যে তাঁর আত্মগরিমাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত একাধিক ব্যক্তির রচিত সাহিত্য ও তাঁদের জীবন-সংগ্রাম থেকেই সেকথা বুঝে নেওয়া যায়। নবজাগরণের সামাজিক আন্দোলনের ফলে অনেকক্ষেত্রে বাঙালির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিবাদের প্রকাশ ঘটেছে; যদিও এরই পাশাপাশি রয়েছে বাঙালির আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দর্শন চিন্তা, তথাকথিত উন্নাসিক সংস্কৃতি ও বাবু কালচারের প্রতি তাঁদের বিতৃষ্ণা এবং একটি রক্ষণশীল সামাজিক অবস্থান। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ইতিহাস ও তত্ত্ব জানতে বা বুঝতে তৎকালীন সময়ে সৃষ্ট সাহিত্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ অপরদিকে তেমনি সাহিত্যিকদের ব্যক্তিজীবনও সমান প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। আসলে সমসাময়িক সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে সাহিত্যিকদের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য পর্যালোচনা করলে তৎকালীন সমাজের ভাবনা বুঝে নেওয়া যায় ।সময়ের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সেইসব উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন ও তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য বাস্তবে যেন কালের দর্পন স্বরূপ।

সাহিত্য ও তাঁর ভাবনা রূপায়নের পিছনে স্রষ্টার ব্যক্তিজীবনের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্রষ্টা কখনো কখনো সাহিত্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার ছাপ রেখে যান। তাই আমাদের অনুসন্ধানের মধ্যে আমরা সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য দুটিকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। এই প্রসঙ্গেই আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহিলা কবি[১] মানকুমারী বসুর (১৮৬৩-১৯৪১) ব্যক্তিজীবনের অনুসন্ধান এবং তাঁর সাহিত্যের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। কবিদের জীবন

অনুসন্ধান করার জন্য অনেক সময় পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না। কবি মানকুমারী বসু সম্পর্কেও এই কথা সমানভাবে সত্য। কবির ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা, জীবনী জাতীয় রচনা থেকে তাঁর সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য উদ্ধার করা যায়। 'আমার অতীত জীবন'(কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ন সংখ্যা, ১৩৩৩,উত্তরা পত্রিকা), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কবির জীবনী 'মানকুমারী বসু' (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৫৯) এবং মানকুমারী বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'মানকুমারী জয়ন্তী'(১৩৪৭)[২] শিরোনামের পুস্তিকাটি থেকে কবির জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়; যদিও 'আমার অতীত জীবন' শিরোনামে প্রকাশিত কবির এই লেখাটি আসাধারণ সাহিত্য হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত। লেখাটি কবির অখণ্ডিত একটি জীবনগাথা। পরবর্তীকালে প্রত্যেকে এই লেখাটির উপর ভিত্তি করেই একাধিক নিবন্ধ তৈরি করেছেন। আমরাও মূলত এই লেখাটিকে আদর্শ হিসাবে ধরে কবির ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি। কবির সম্পূর্ণ ব্যক্তি জীবনকে আমরা একাধিক উপঅধ্যায়ে বিভাজন করে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধরার চেষ্টা করেছি। সেগুলিকে নিম্নলিখিত শিরোনামে নামাঙ্কিত করে আমরা মানকুমারী বসুর ব্যক্তি ও স্রষ্টা জীবনের স্বরূপ সন্ধানে অগ্রসর হয়েছি।

ক. ব্যক্তিপরিচয় উদ্ধার
খ. শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্যের পরিচয় উদ্ধার
গ. স্রষ্টা জীবনের পরিচয় উদ্ধার
ঘ. আবির্ভাবের পটভূমি বিশ্লেষণ

ক. ব্যক্তিপরিচয় উদ্ধার

বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের বিখ্যাত দত্ত বংশে মানকুমারী বসুর জন্ম। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বর্গীয় রাধামোহন দত্তচৌধুরী, ইনিই কবির পিতামহদেব। তাঁর প্রথম পত্নী অল্প বয়সে গত হলে পুনরায় তিনি বিবাহ করেন, তাঁর সেই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে কবির পিতা স্বর্গীয় আনন্দমোহন দত্তচৌধুরীর জন্ম। কবির মাতামহ হলেন যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামের জমিদার স্বর্গীয় বনমালী বসু।

তাঁর আটটি সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা হলেন কবির মাতা শান্তমণি দেবী। অতি অল্প বয়সেই কবির পিতামাতা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিবাহের সময় তাঁদের বয়স ছিল যথাক্রমে এগার ও পাঁচ বছর। কবিরা ছিলেন চার ভাই-বোন। প্রথম মন্মথমোহন দত্তচৌধুরী, দ্বিতীয় প্রমথমোহন দত্তচৌধুরী, তৃতীয় মনমোহিনী দেবী ও সর্বকনিষ্ঠ কবি মানকুমারী বসু। কবির জন্মের চার বৎসর পূর্বেই তাঁর অগ্রজা মনমোহিনী দেবী বসন্ত রোগে মারা যান। কন্যার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া, পরিবারের সকলেই খুবই বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা সকলেই পুনরায় কন্যা সন্তানের আশায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকেন। কবি নিজে এ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন-

> "আমার মাতামহী ঠাকুরাণী এবং দুই বিধবা মাতৃস্বসা, আমার মায়ের পুনরায় একটি কন্যা হইবার জন্য ঠাকুর দেবতাকে অনেক মানসিক করেন।"[৩]

তাঁদেরই একান্ত প্রার্থনার ফলস্বরূপ শান্তমণির কোল আলো করে জন্ম নেন মানকুমারী বসু। মানকুমারী বসুর জন্মের সাল-তারিখ নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। কবি নিজে জানিয়েছেন-'১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ রাত্রিকালে মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ অভাগিনীর জন্ম হয়।'[৪] কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বারিদবরণ ঘোষ সকলেই ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দকেই মানকুমারী বসুর জন্ম সাল হিসেবে মেনে নিয়েছেন।[৫] গৌতম সান্যাল জানিয়েছেন, 'মানকুমারীর আত্মকথাটি কবির প্রায় ৬২ বছর বয়সের রচনা। স্মৃতিদুর্বলতাজনিত কারণে তথ্যাদি ত্রুটিপূর্ণ হতেই পারে।'[৬] মানকুমারীর জন্ম সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' গ্রন্থে জানিয়েছেন-

> "স্মৃতিকথায় সাল তারিখের এক-আধটু গণ্ডগোল থাকা স্বাভাবিক। মানকুমারীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা-খুলনার উকীল শ্রী চারুচন্দ্র নাগ দেখাইয়া দিয়াছেন যে

তাঁহার জন্মতারিখ প্রকৃতপক্ষে ১৩ মাঘ ১২৬৯ (২৫ জানুয়ারি ১৮৬৩) ১৩ই মাঘ ১২৭১ নহে।”[৭]

অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য কবির সাক্ষ্য অনুসারে ১২৭১ সালকেই প্রতিষ্ঠা দিতে বেশি আগ্রহী। যদিও গৌতম সান্যালের সাক্ষ অনুসারে আমরাও মনে করি অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের যুক্তিগুলি একেবারে নিশ্ছিদ্র নয়। গৌতম সান্যাল আরও বলেছেন, ওকালতি ব্যবসায় যুক্ত জামাতা যে তথ্য দিয়েছেন, তাঁকে নিশ্চয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বিচারে গ্রহণ করেননি, উপযুক্ত প্রমাণসহই তিনি নিশ্চয় জন্মসালটি যাচিয়ে নিয়েছেন।[৮] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর ‘মানকুমারী বসু’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন-

“কবি মানকুমারী বসুর নিকট তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়া আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলে, তিনি তাঁহার আত্মচরিত আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাই আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।”[৯]

এই একই প্রবন্ধে মানকুমারী বসুর দেওয়া আত্মচরিতে ইংরাজি ১৮৬৩ সালের উল্লেখ আছে। উত্তরা পত্রিকায় প্রকাশিত ‘আমার অতীত জীবন’ এ ইংরাজি সালের কোনো উল্লেখ না থাকলেও অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীতে ইংরাজি ১৮৬৩ সালের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০] কবির জামাতা ১২৬৯ সালে মানকুমারী বসুর জন্মসালের কথা কবির মৃত্যুর পর জানিয়েছেন। অথচ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর ছাপা গ্রন্থে কবির জন্মসাল হিসাবে ১২৬১ বঙ্গাব্দের যে উল্লেখ করেছেন তা মূলত ছাপার প্রমাদ। কারণ এই গ্রন্থেই ইংরাজি ১৮৬৩ সালকেই মানকুমারী বসুর জন্মসাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ ১২৬৯ বঙ্গাব্দে যে মানকুমারী বসুর জন্ম, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো কোনো সমালোচক ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ বাংলায় ১২৭১ বঙ্গাব্দকে কবির জন্মসাল ধরে আট বছর বয়সে কবির বিবাহের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর আত্মচরিতে ১২৭৯ সালে ৭ই মাঘ দশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হওয়ার প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।[১১] তাহলে ১২৬৯ সালকে তাঁর জন্মকাল হিসাবে মান্যতা দেওয়া যায় এবং ১২৬৯ সালে জন্ম ধরে কবির আত্মচরিতে উল্লিখিত বিভিন্ন বয়সের ঘটনার সঙ্গে তাঁর জন্মসালের হিসাবও মিলে যায়। আরও বলা যায়, আট বছর বয়সে

কবির বিবাহ ধরে যাঁরা ১৮৬৫ সালকে কবির জন্ম সাল হিসাবে মেনে নিয়েছেন, তাঁরা ‘আমার আতীত জীবন’ এ কবির দেওয়া তথ্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেননি। কবি তাঁর আত্মচরিতে আট বছর বয়সের উল্লেখ করে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, আবার দশ বছর বয়সে তিনি তাঁর বিবাহের উল্লেখও আত্মচরিতে করেছেন।[১২] তৎকালীন সময়ে তথ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকায় অনেক্ষেত্রেই জন্মসালের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে বাংলায় ১৩ই মাঘ নিয়ে কোন সমস্যা তৈরি না হলেও ইংরাজি তারিখ নিয়ে একটু মতভেদ রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা’ গ্রন্থে মানকুমারী বসুর জামাতার দেওয়া তথ্য থেকে জানিয়েছেন, কবির জন্ম তারিখ ইংরাজি ২৫ জানুয়ারি, আবার যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর ‘বঙ্গের মহিলা কবি’ গ্রন্থে ২৩ জানুয়ারির উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে কোনো প্রামাণিক তথ্য না পাওয়া গেলেও মানকুমারী বসুর আত্মজীবনী এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তথ্যের উপর নির্ভর করে, আমরা বলতে পারি মানকুমারী বসুর জন্ম ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৩ মাঘ অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৬৩ সালের ২৩ জানুয়ারি। ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের ‘সাতক্ষীরায়’ কবিতায় কবি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর তেরো বছর পরে সেখানে যাবার কথা জানিয়েছেন।[১৩] কবিতাটির রচনাকাল ১৩০৩ এর ১৪ আশ্বিন।[১৪] সেই হিসাবে স্বামীর মৃত্যু সাল দাঁড়ায় ১২৯০ বঙ্গাব্দ। তখন কবির বয়স সাড়ে আঠারো বছর।[১৫] এই হিসেবে ১২৭১ বঙ্গাব্দ কবির জন্মসাল হতে পারে। স্বামীর মৃত্যু সাল হিসেবে ১২৯০ সালের কথা কবির স্মরণে থাকলে ‘আমার অতীত জীবন’ গ্রন্থে তিনি তা উল্লেখ করতেন। সেখানে তিনি শুধুমাত্র ২৯ শ্রাবণের[১৬] কথা জানিয়েছেন, কিন্তু কোনো সালের উল্লেখ করেন নি। বিভিন্ন জায়গায় কবির নিজের দেওয়া সাল তারিখের মধ্যেই বেশ কিছু ব্যবধান রয়ে গেছে। তাই আমরা উক্ত ১২৬৯ অর্থাৎ ১৮৬৩ সালকেই কবির জন্মসাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে আগ্রহী। এছাড়াও কবির জন্মের সার্ধশতবর্ষে তাঁকে নিয়ে একাধিক লেখায় মানকুমারী বসুর জন্মসাল হিসেবে ১৮৬৩ সালের কথাই পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য হিসেবে উল্লেখ্য বিমানকান্তি নাগের ‘সার্ধশতবর্ষে কবি মানকুমারী বসু’, প্রবীণ কণ্ঠঃ নির্বাচিত সংকলন, জুন ২০১৫।)

জন্মকাল সংক্রান্ত কিছু সমস্যা তৈরি হলেও মানকুমারী বসুর বাকী জীবনের তথ্য নিয়ে আর কোনো সংশয় দেখা যায় না। জন্মের পরেই শিশু কন্যাকে ঘিরে দত্ত পরিবারে আনন্দের জোয়ার বয়েছিল বলে জানা যায়। কবির আত্মকথায় এই অনুভূতির কথাও পাওয়া যায়।

> "দেবতার কৃপায় সেই মৃতা কন্যা আবার আসিয়াছে, এই বিবেচনায় আত্মীয়গণ যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং 'যথোচিতের উপরে'ও আমার আদর-যত্ন হইতে লাগিল। বাঙ্গালী মেয়ের অদৃষ্টে ইহা কচিৎ ঘটিয়া থাকে।"[১৭]

মানকুমারী বসুর পারিবারিক ঈশ্বর বিশ্বাসের ধারণাটি এখান থেকেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। পরিবারের সকলেই বিশ্বাস করতেন, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করার জন্যই তাঁদের মৃত কন্যা পুনরায় ফিরে এসেছে। তবে উদ্ধৃতিটির শেষ বাক্যটি খুবই ধারালো। এই একটি বক্তব্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক চিত্রটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশুকালে অভিমানী হওয়ার দরুণ, কন্যার নাম রাখা হয়েছে 'মানকুমারী'। মানকুমারী বসু সবথেকে বেশি তাঁর বাবার স্নেহ-সান্নিধ্য পেয়েছেন। আনন্দমোহন বাবু সম্পর্কে জানা যায়, তিনি হলেন একজন সংসারবৈরাগী উদাসীন মানুষ । মানকুমারী বসু তাঁর পিতা সম্পর্কে জানিয়েছেন-

> "যখন আমার জ্ঞানের উদ্রেক হইল তখনই আমি দেখিলাম, আমার বাবা- আমার ঋষিপ্রতিম বাবা- ধর্ম্মাচরণ ও জ্ঞানানুশীলন লইয়াই দিন যাপন করেন। বৈষয়িক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে ন্যায়-ধর্ম্মের সীমা পাছে অতিক্রম করিতে হয়, এই আশঙ্কায় তরুণ বয়সেই বাবা বিষয়-কর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন।"[১৮]

আনন্দমোহন বাবুর আরও অনেক প্রতিভা ছিল, পাড়ার সমস্ত শিশুদের কাছে তাঁর বহুল জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। নিজ কন্যা মানকুমারী বসুর তো কথাই নেই। আনন্দমোহন বাবু গান গেয়ে, খেলা দেখিয়ে, গল্প বলে ছেলেদের বশ করতেন। কবি

তাই মায়ের থেকে বাবার কাছে বেশি থাকতেন। অপরদিকে কবির মা শান্তমণি দেবী হলেন সংসারী ও অভিজ্ঞ মানুষ। সমস্ত সংসারের দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর। মানকুমারী বসু লিখেছেন-

> "মা কার্যকারকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, পুত্রের উন্নতি চেষ্টা, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন, গৃহকর্ম্ম অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত পরিচালন, এইসব করিতেন।"[১৯]

মানকুমারী বসু কিন্তু বাবা-মা উভয়ের কাছেই অপত্য স্নেহ লাভ করেছিলেন। বাবা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরী ছিলেন সদাশয় সৎ ব্যক্তি। তিনি পুরমহিলাদের নিকট পুরাণ পাঠ করতেন, সকল সময় বালিকাদের উদ্দেশ্যে সদুপদেশ দিতেন। এই উদার ও মুক্ত আঙিনায় ছোট থেকে কবি বেড়ে উঠেছেন। পিতামাতার অত্যধিক সান্নিধ্যে থাকার কারণে ছোটো থেকেই মানকুমারী বসুর হৃদয়ও ছিল কোমল প্রকৃতির। কবির আত্মকথাতেই এ প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়-

> "তখন আমার মন বড় নরম ছিল; কাহার কোন বিপদ শুনিলে আমার হৃদয়ে ভয়ানক যন্ত্রণা হইত। বাড়ির কাহার কোন অসুখ হইলে আমি আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া যথাশক্তি তাহার শুশ্রূষা করিতাম; বাবার পুরাতন ভৃত্য আমার মধুদাদা মরিয়া গেলে আমি তাঁহার জন্য অনেকদিন পর্যন্ত লুকাইয়া কাঁদিতাম।"[২০]

মানকুমারী বসুর এই অন্তরাত্মার ব্যাকুলতা ও অকৃত্রিম স্নেহ প্রভৃতি সকল কিছু তাঁর মায়ের থেকে পাওয়া। শান্তমণি দেবী সংসারী মানুষ হলেও তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন, আর আনন্দমোহন বাবু তো স্বভাববৈরাগী ছিলেন, তাই পিতার বৈরাগ্য স্বভাবটিও কবি পেয়েছেন। পরবর্তীকালে মানকুমারী বসুও দীন-দুঃখী, অনাথ, ভিখারি এবং অসহায় মানুষকে মুক্ত হস্তে দান করেছেন। শৈশব থেকেই তাঁর পড়াশুনার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহই তাঁর কবিজীবনে সাফল্য এনে দিয়েছে। শৈশব থেকে পড়াশুনায় ভালো হওয়ার পাশাপাশি কবি মানকুমারী বসু অত্যন্ত জেদি ও একগুঁয়ে

প্রকৃতির ছিলেন। পরিবারের প্রত্যেকের অপত্য স্নেহ ও আদরে বড় হয়েছেন বলে মানকুমারী বসুর ব্যক্তি সত্তায় এমন দোষ জন্মেছে বলে অনেকে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে আত্মকথায় কবির দীর্ঘ স্বীকারোক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে--

> "আত্মীয়দিগের অত্যধিক যত্ন আদর পাইয়া আমার স্বভাবে কতকগুলি দোষ জন্মিয়াছিল। আমি যখন যে বাহানা করিতাম, প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ হইত, সেজন্য আমি বড় 'একগুঁয়ে' হইয়াছিলাম। .....সেইজন্য কেহ আমাকে একটু কটূক্তি বা কুব্যবহার করিলে আমার বড়ই অভিমান হইত। "[২১]

নিজের মুখে এই সরল স্বীকারোক্তি কজন মানুষই বা করতে পারেন?, বৃদ্ধ বয়সে লেখা আত্মকথাতেও কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলিকে অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জেদ ও একগুঁয়েমি কবির জীবনে শুধু নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এমনটাই নয়, কিছু ইতিবাচক ভূমিকাও রেখেছে। এর সপক্ষে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'আমার অতীত জীবন' গ্রন্থে পাদটীকা অংশে পাওয়া যায়-

> "আমার সেই অভিমান ও একগুঁয়েমী হইতে একটি বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমার হস্তাক্ষর অতি জঘন্য ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদের স্কুলে একজন নূতন শিক্ষক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমরা সকল ছাত্রী হস্তলিপি দেখাইতেছিলাম; শিক্ষক আমার হস্তাক্ষর সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখিয়া অবজ্ঞাভরে ফেলিয়া দিলেন। আমার বড় অভিমান হইল। আমি একগুঁয়ে ছিলাম কি না, তাই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ঘরে বসিয়া কেবলই লিখিতে লাগিলাম। এক সপ্তাহ পরে আবার যেদিন সকলে লেখা দেখাইলাম সেদিন শিক্ষক মহাশয় আমার হস্তাক্ষর সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।"[২২]

কোনপ্রকার আত্মম্ভরিতা কবির মনে ছিল না, তবে আবার নিজের আত্মাদরকেও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি তিনি। তবে মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবনে আরও কিছু দোষ ছিল বলে তিনি মনে করতেন। সংসারের ব্যাপারে মানকুমারী বসু অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং এই ব্যাপারে তাঁর অনীহাও ছিল। এগুলিকে তিনি দোষ বলেই মনে করতেন, আর তা স্বীকার করতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তিনি নিজেই জানিয়েছেন-

> "আরও দোষ ছিল আমি 'স্নেহনীড়ে' পালিতা বলিয়া লোক-ব্যবহার বুঝিতাম না- আমার সামাজিক বুদ্ধির অভাব ছিল। .....আরও এক দোষ ছিল, আমি গৃহকর্ম্ম কিছুই করিতাম না-শিখিতাম না; আমার মা, ভ্রাতৃজায়াদ্বয়, পিসিমা, ঝি, চাকর প্রভৃতি কোনদিন ঘড়া হইতে এক গেলাস জল ঢালিতে দেন নাই কি একটি সলিতা পাকাইতে দেন নাই। আমিও সে-সব কিছু করিতে ইচ্ছা করি নাই।"[২৩]

মানকুমারী বসু যেমন ভালোবাসা পেয়েছেন, তেমনি তাঁর দাদার থেকে শাসনও পেয়েছেন। যদিও বেশিরভাগ সময় তিনি প্রবাসে কাটাতেন, কিন্তু সবসময়ই মানকুমার বসু তাঁর দাদার শাসনের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন ,বিশেষকরে যখন তিনি বাড়ি ফিরতেন।

> "দাদা বাড়ি আসিলে আমি 'চোরের' মত হইয়া থাকিতাম। সকলের চেয়ে তাঁহাকে বেশি ভয় করিতাম।"[২৪]

কোন কিছু বোঝাবার আগেই, শৈশবেই কবিকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে হয়। কবির বিবাহ হয়, পিত্রালয় সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঁচ-ছয় মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্যানন্দকাটী গ্রামে। বিবাহটি সম্পন্ন হয়েছে মূলত মানকুমারী বসুর মায়ের ইচ্ছা ও পচ্ছন্দ অনুসারে। কবির বিবাহের কথাও তাঁর 'আমার অতীত জীবন' রচনা থেকে জানতে পারা যায়। বিবাহ প্রসঙ্গে কবি জানিয়েছেন-

> "আমার পিত্রালয় সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঁচ-ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিদ্যানন্দ কাটী গ্রাম।...দিদিদিগের কয়টি দেবর কার্যপলক্ষে একদিন আমার

> সেই পিতৃব্যের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজনকে দেখিয়া আমার মাতৃদেবী, তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া এবং সচ্চরিত্রের কথা শুনিয়া, নিজ জামাতা করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন।”[২৫]

নিকট পরিবারের মধ্যে গুণবান পাত্রের সঙ্গে কবির বিবাহটা বোধহয় মানকুমারী বসুর আত্মীয়-জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি।অল্পবিস্তর সমস্যা তৈরি হলেও মহাসমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল বলে জানা যায়।

> “আমার মাতা-পিতা, সহোদর, মাতুল প্রভৃতি আত্মীয়দিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, বাবা তাঁহার স্নেহের কন্যাকে মহাসমারোহপূর্ব্বক, ১২৭৯ সালে ৭ই মাঘ তারিখে(ইংরাজী ১৮৭৩ সালে) সেই মনোনীত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। পাত্রের নাম বিবুধশঙ্কর বসু।”[২৬]

পাত্র বিবুধশঙ্কর বসু মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তেন বলে জানা যায়। বিবাহের সময় বিবুধশঙ্কর বাবুর বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে কোনো তথ্য যায় না। তবে মানকুমারী বসুর যে অল্প বয়সে বিবাহ হয়েছে এব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কবির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি--‘তখন আমার বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর’, এই অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াটা সেকালের একটি রীতি ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকেও এই সামাজিক সংস্কার থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারেনি, কবির বিবাহ যেন সেকথাই প্রমাণ করে। শিক্ষিত বাঙালি পরিবার তখনও অবধি রক্ষণশীল ভাবনাকেই পোষণ করতেন । বাল্যবিবাহ নারীর ব্যক্তিজীবনে কয়েদখানা স্বরূপ, তা নারীর জীবনে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার প্রধান বাধা বলা যায়। বাঙালি নারী তাই তখনও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেননি। মানকুমারী বসুও তার ব্যতিক্রম নন। যদিও তিনি শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের প্রচলিত কাঠামো ও মতাদর্শের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছেন। যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের আত্মপ্রকাশের ধরন

সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটি বিশেষ মত প্রকাশ করেছেন, যা মূলত তাঁর রক্ষণশীল ভাবনা সঞ্জাত। সমালোচক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় কবির সেই বক্তব্যের সরলীকরণ করেছেন এইভাবে--

> "বাংলার 'রসের প্রবাহ' লুপ্ত হয়ে যাওয়ার দরুন মানুষ কেবল ছিন্নমূলই হয়ে যাচ্ছে না, সেই সঙ্গে তাদের 'মন কঠিন, স্বার্থপর এবং বিকৃত' হয়ে পড়ছে; সমাজের সেই অধোগতি রুখতে, সমাজকে নতুনভাবে উজ্জীবিত, প্রাণস্পন্দময় করে তুলতে বাংলার মেয়েদের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে।"[২৭]

উপনিবেশবাদের প্রেক্ষাপটে বাঙালির আপন ঘরানা বাঁচাতে, পুরুষের সংসার অভিমুখী করতে নারীর, নারীসুলভ কোমলতা ও তাঁর দায়িত্বশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও বিবাহের যৌক্তিকতাকে আন্তরিকভাবে সমাজমঙ্গলের কারণ বলে মেনে নিতে পারেননি মানকুমারী বসু। আত্মকথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যের বিরোধিতা করে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন তিনি। বিবাহ সম্পর্কে তাঁর সরল স্বীকারোক্তি-

> " 'বিবাহ' রূপে হিন্দু-সমাজে বালিকাদিগকে এক অন্ধকার পূর্ণ ভবিষ্যৎ রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সেখানে হয় তাহার ভাগ্যে সুখের চন্দ্রমা না হয় দুঃখের অমানিশা উপস্থিত হইয়া থাকে।"[২৮]

বিবাহের সময়ে মানকুমারী বসুর সংসার জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু সৎ চরিত্রবান পাত্রের কারণে কবি বিবাহিত জীবনে 'দুঃখের অমানিশা' থেকে রেহাই পেয়েছেন। যদিও সংসার সম্পর্কে তাঁর বরাবরই একটি ভীতি ছিল। স্মৃতিচারণে সেই ভীতির কথা তিনি স্বীকার করেছেন এভাবে--

> "বাবা আমাকে সেই বালিকা বয়সে যাঁহার হাতে দিয়েছিলেন তিনি ধার্ম্মিক, কৃতবিদ্যা, সংযত, সুশীল, ও চরিত্রবাণ। .....তার পরে আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি যে রকম অদ্ভুত রকমের ছিল তাহাতে যদি কোন

> অধর্ম্মাচারী, অসহিষ্ণু, নির্ম্মম স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়িতাম, তাহা হইলে আমার দুঃখের পরিসীমা থাকিত না।"[২৯]

সাংসারিক বোধহীনতার কারণে বিবাহের ফলে নারীজীবনের অসহায়তার দিকটি কবির কথায় স্পষ্ট হয়। যদিও, কবির বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছে। 'আমার অতীত জীবন' এ কবি মানকুমারী বসু স্বামী বিবুধশঙ্কর বাবুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন-

> "বাল্য-বিবাহের ফলে আমি তাঁহার গুণের মর্ম্ম বুঝিবার অবকাশ পাই নাই; জল, বায়ু, আলোকাদির মত তাঁহার স্নেহ, দয়া ও শুভাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সহজপ্রাপ্য বলিয়া আমি তাঁহার বিশেষত্ব কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"[৩০]

কবির কথায় স্পষ্ট বোঝা যায়, বাল্যবিবাহের ফলে চরিত্রের ইতিবাচক গুণগুলিকে বোঝার ক্ষেত্রেও অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। তবে বিবুধশঙ্কর বাবুর, একাধিক গুণের কথা জানা যায়। সেই কারণেই, তিনি মানকুমারী বসুর পরিবারেও যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনে কবি যে অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ও নম্র স্বভাবের ছিলেন, তাঁর একাধিক উদ্ধৃতি থেকে সেকথা প্রমাণিত হয়। বিবাহের অল্পদিন পরেই কবি সাগরদাঁড়িতে ফিরে এসেছিলেন, মূলত তাঁর অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে। তেরো বৎসর বয়স সম্পূর্ণ হলে, কবি পুনরায় শ্বশুর বাড়ি বিদ্যানন্দকাটী গ্রামে ফিরে যান।[৩১] এরপর থেকে তিনি আমৃত্যু বিদ্যানন্দকাটী গ্রামেই থেকেছেন। শ্বশুর বাড়িতে ফিরে, কবি সচেতনভাবে তাঁর ছোটবেলার জেদ ও একগুঁয়েমি ভাবকে কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়েছেন। মানকুমারী বসুর শ্বশুর বাড়িতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপারে সুষ্ঠ পরিবেশের কথা তিনি নিজেই আমাদের জানিয়েছেন। কবির শ্বশুর মহাশয়দের মধ্যে একজন হলেন রাসবিহারী বসু, যিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট[৩২] ছিলেন। তাঁর ইচ্ছায় উক্ত গ্রামে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যানন্দকাটীর সেই স্কুলে মিশনারী মহিলারা এসে মেয়েদের সেলাই শেখাতেন। এছাড়াও, মানকুমারী বসুর শ্বশুর বাড়ির পরিবারে নিত্য রামায়ণ,

মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করা হতো। বাবা-মার অপত্য স্নেহ ছেড়ে, শ্বশুর বাড়িতে প্রথমে মন বসাতে, কবিকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। অবশ্য খারাপ লাগা কাটতে বেশি সময় লাগেনি। এই বিষয়ে কবির স্বীকারোক্তি- 'কেবল আমি বলিয়া নহি, বঙ্গ-গৃহের অনেক বালিকা বধূকেই এইরূপে মানুষ হইতে হয়।'[৩৩] কবিরও তাঁর শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা কতকটা এইরকম ছিল, তিনি তা নিজেই আমাদের জানিয়েছেন-

> "আমাকে 'অদ্ভুত জীব' দেখিয়া অর্থাৎ আত্ম-গোপন করিতে অক্ষম, ছলনা-চাতুরীতে অনভ্যস্ত এবং গৃহ-কর্ম্মে অশক্ত, এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়া অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং নিষ্ঠুর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।"[৩৪]

খুব উচ্চপরিবারে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও এই নিষ্ঠুর আচরণ কবিকেও সহ্য করতে হয়েছিল। তবে চারিত্রিক গুণের (বিনয়ী-নম্র, লাজুক, কবিতা রচনা ইত্যাদি) কারণে অল্প দিনেই মানকুমারী বসু উক্ত পরিবারে নিজের স্থান পাকা করে নিতে পেরেছিলেন । কবিতা রচনা গুণের জন্য, কবি তাঁর স্বামী বিবুধশঙ্কর বাবুর কাছেও বিশেষ ভালোবাসার পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। বিবুধশঙ্কর বাবু মানকুমারী বসুর কবিত্ব প্রতিভার জন্য তাঁকে প্রশংসার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত উৎসাহিতও করতেন। কবি হিসেবে অবশ্য মানকুমারী বসুর কোনো অহঙ্কার ছিল না, বরং পাছে কেউ জানতে পারেন তার জন্য কবির সঙ্কোচ ছিল বরাবরই।[৩৫] বিবুধশঙ্কর বাবুও খেয়াল রেখেছিলেন তাঁর স্ত্রী যেন কোনোভাবেই বিরূপ সমালোচনার দ্বারা দিকভ্রষ্ট হয়ে না পড়েন। কবি নিজেই জানিয়েছেন, 'ইহা দেখিয়া পতিদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "লোকে প্রশংসা করিতেছে বলিয়া তুমি যেন গর্ব্বিতা হইও না।"'[৩৬] মানকুমারী বসুর কবি সত্তার বিকাশে পতি হিসেবে বিবুধশঙ্কর বসুর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল।

আনুমানিক ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মানকুমারী বসুর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছে তাঁর একমাত্র কন্যা প্রিয়বালা। কবির বয়স তখন সতেরো বৎসর। একই বছরে এই

ঘটনার পাশাপাশি কবির জীবনে একটি বিপর্যয়ও ঘটেছে। কবির লেখনীতেই সে কথার উল্লেখ আছে-

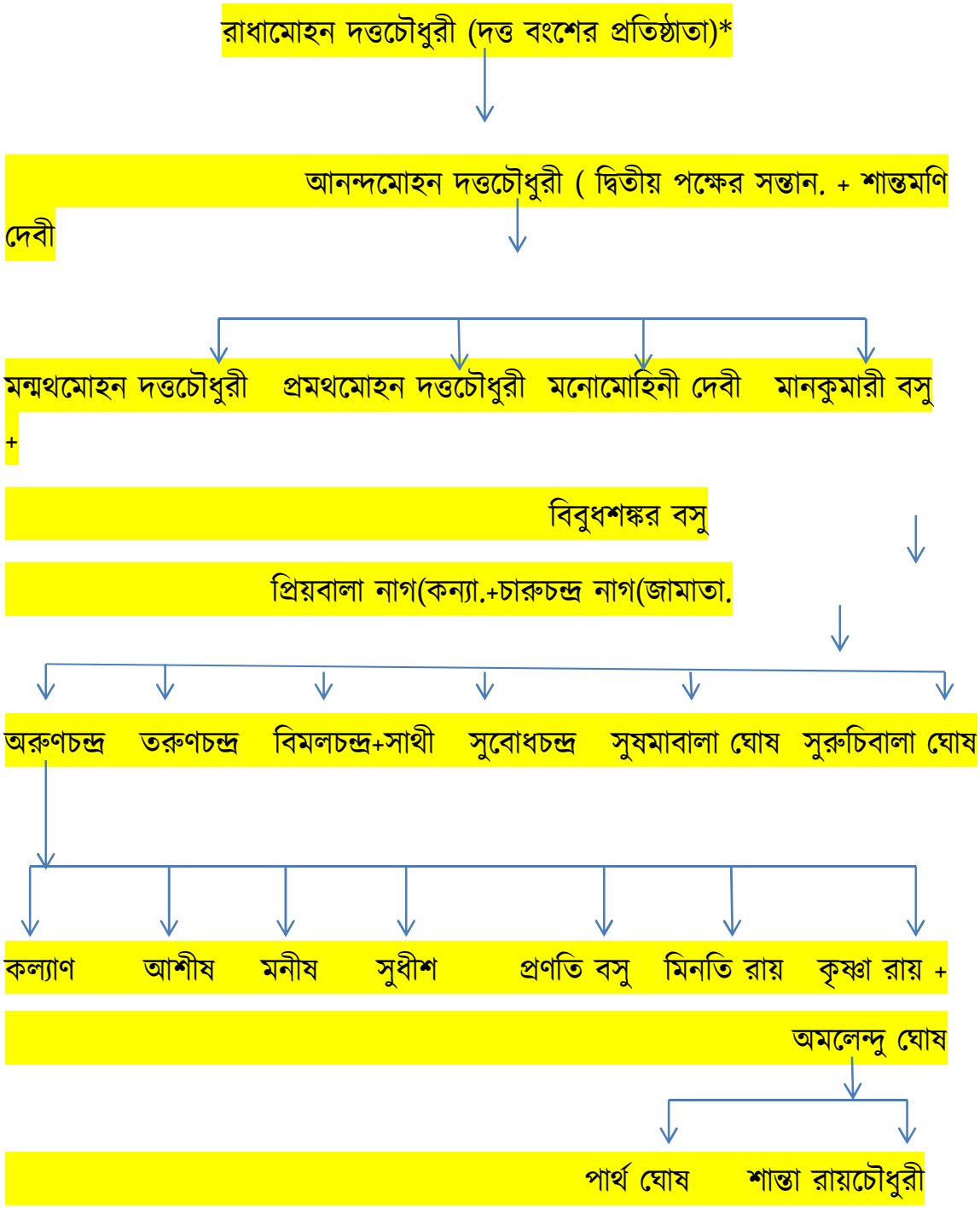
> "আমার কন্যার বয়স যখন কুড়ি দিন তখন আমার পরমারাধ্যতম স্নেহময় বাবা আমাদিগকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গমন করেন।"[৩৭]

পিতার শোক ভুলতে কবির অনেক সময় লেগেছিল, কন্যা প্রিয়বালা এই শোকের মাঝে আলোর দীপ্তি নিয়ে এসেছে। তাহলে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দেই কবির পিতার মৃত্যু হয়েছে বলা যায়। ঠিক এর এক বছর পর বিবুধশঙ্কর বসু মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস. উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। উপাধি পেয়ে স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করবার আশায় তিনি গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। ঐ একই বছরে আবার মানকুমারী বসুর দ্বিতীয় ভ্রাতার স্ত্রী তাঁর সন্তানদের অনাথ করে পরলোক গমন করেছিলেন। ভাতৃপত্নীর মৃত্যুতেও কবি গভীরভাবে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সেই মুহূর্তে কবির একমাত্র সুখ-দঃখের সঙ্গী ছিলেন বিবুধশঙ্কর বাবু। কিন্তু এসুখও কবির ভাগ্যে বেশিদিন সইল না। অল্প দিনেই বিবুধশঙ্কর বসুও পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকগমন করলেন। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস করে এসে বিবুধশঙ্কর বসু বন্ধু-বান্ধবের সহচর্যে সাতক্ষীরা মহকুমায় ডাক্তার হিসেবে যোগদান করেছিলেন এবং অল্প দিনেই তিনি চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভও করেছিলেন। কবির ননদ পীড়িত হলে বিবুধশঙ্কর বসু কিছুদিনের জন্য গ্রামে এসেছিলেন এবং ২৭ বৈশাখ আবার তিনি তাঁর কর্মস্থল সাতক্ষীরায় ফিরে যান। ওই একই বৎসরে অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৮১ সালে, বাংলার আশ্বিন মাসে কবিদের সপরিবারে সাতক্ষীরায় যাবার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু কবির স্বামীর সাতক্ষীরায় ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরেই শ্রাবণ মাসে বিবুধশঙ্কর বসু অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অংশের বর্ণনায় কবির ব্যথাতুর মনের পরিচয় তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে জানিয়েছেন।

> "শ্রাবণ মাসে তাঁহার দারুণ পীড়ার সংবাদ আসিল। আমার শ্বশুর, আমার অন্যতম ডাক্তার দেবর, আমার দাদা প্রভৃতি একান্ত উদ্বিগ্ন

হইয়া সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। কেহ আমাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন না। আমি হিন্দু কুলবধূ লজ্জায় ভয়ে কিছুই বলিলাম না। কেবল তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইবার জন্য পথ চাহিয়া রহিলাম; কেবল তাঁহার মঙ্গল কামনায় ভগবানকে ডাকিলাম।"[৩৮]

কবির এই স্বীকারোক্তিতে বোঝা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে ব্যক্তিবাদের কোন জায়গা ছিল না। একথা শুধু নারীজীবনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল এমনটা নয়, পুরুষের ক্ষেত্রেও সেকথা অনেকাংশে সত্যি ছিল। তার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পের বনোয়ারীলাল চরিত্রে পাওয়া যায়। মনোহরলালের পুত্র বনোয়ারিলাল, নারীজীবনের মতন সমাজযন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। সামাজিক রক্ষণশীলতার কারাগার ভেঙে সে ব্যক্তিত্বের সূচনা ঘটাতে চেয়েছে কিন্তু পরিবারের বড় ছেলে হওয়ার সুবাদে জমিদারতন্ত্রের বূহ্যভেদ করতে সে পারেনি। বরং পরাজয়ের বেদনা তাঁর অন্তরকে দগ্ধ করেছে। আর রক্ষণশীলতার সাক্ষী হয়ে তারই বিপরীতে মূর্ত হয়েছে তাঁর স্ত্রী কিরণলেখা।[৩৯] সমাজের কাঠামো ও মতাদর্শ ব্যক্তি মানুষের ঊর্দ্ধে যে ছিল একথা বেশ বোঝা যায়। মানকুমারী বসুর ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। তাঁর উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকার মধ্যে খবর এলো, তাঁর পতিদেব বিবুধশঙ্কর বসু কবির কমবেশি উনিশ বৎসর বয়সে ২৯ শ্রাবণ সোমবার রাত্রিবেলা ইহলোক ত্যাগ করেছেন।[৪০] সালের কথাটা উল্লেখ না থাকলেও কবির বর্ণনা থেকে সেই তথ্য উদ্ধার করা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর কবির জীবনের ধারাটাই পালটে গেল; এরপরের পুরো জীবনটাই মানকুমারী বসু কাটিয়েছেন সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতাও পালন করেছেন। এই কর্মের মধ্যেই কবির বাকী জীবনটা কেটে গেছে। কবির ব্যক্তিজীবনের এই সমস্ত তথ্য থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী সমাজের অবস্থান ও নারীর বড় হয়ে ওঠার পিছনে সামাজিক ভাবনাগুলি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানকুমারী বসুর ব্যক্তিপরিচয়কে সম্পূর্ণ করতে কবির একটি সম্ভাব্য বংশলতিকা নিম্নে উদ্ধার করা হল।



*তথ্যসূত্র পত্রিকা,সম্পাদক সুব্রত রায়চৌধুরী, পরিশিষ্ট-৩ অংশ থেকে নেওয়া। ভূমিকা অংশে সুব্রত বাবু জানিয়েছেন বংশতালিকাটি কবির প্রপৌত্রী কৃষ্ণা ঘোষ ও তাঁর স্বামী অমলেন্দু ঘোষের সহযোগিতায় তৈরি করা। তাই এটি যথার্থ প্রামাণিক বলে মনে করছি।

খ. শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্যের পরিচয় উদ্ধার

ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে নারী শিক্ষা আন্দোলনের যে বৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টা, তা বহুদিনযাবৎ কোনো সামাজিক আলোড়ন তৈরি করতে পারেনি। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুলে ১১ জন ছাত্রীর সংখ্যা পরের বছর গিয়ে দাঁড়ায় ৭ জনে এবং তার পরের বছর আরও কমে হয় ৩ জনে।[৪১] উপনিবেশীয় ভারতে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের মনোভাব তাঁদের নিজেদের স্বার্থকে কায়েম রাখার ভাবনাতেই আটকে ছিল। জোনাথন ডানকান লর্ড কর্নওয়ালিসকে একটি চিঠিতে যা বলেছিলেন, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ থেকে আমরা তা জানতে পারি:

> "সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হওয়ার দরুণ প্রধান উপকার হবে ব্রিটিশদের, হিন্দুদের চোখে আরো উজ্জ্বল হবে ব্রিটিশের ভাবমূর্তি; হিন্দুরা যখন দেখবে তাদের দর্শন ও শাস্ত্র সম্পর্কে অনীহা বা অবজ্ঞা দূরে থাক, সে-সব বিষয়ে স্থানীয় রাজন্যবর্গের চেয়েও সরকারের আগ্রহ ঢের বেশি, তখন স্বভাবতই বৈদেশিক সরকারের প্রতি হিন্দুদের মনে সম্ভ্রম সম্প্রীতির ভাব আরো জোরদার হবে।[৪২]

এই উক্তি থেকে প্রমাণ হয় যে, শিক্ষা প্রসারের নামে নিজেদের স্বার্থকে আরও কায়েম করার কৌশল ফেঁদেছিল ব্রিটিশ সরকার। পাশ্চাত্যের উদারপন্থীরা(মিল, মেকলে প্রমুখ) অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা সরাসরি প্রাচ্যের দর্শন ও ধর্মকে ভুয়ো প্রতিপন্ন করে পাশ্চাত্যের ইংরাজি শিক্ষার প্রসার করতে চেয়েছেন। মিল, মেকলে প্রভৃতি বিদ্বজ্জন পাশ্চাত্যের দর্শন, বিজ্ঞান, তত্ত্বকে প্রচার করতে চেয়েছেন। তবে ভারতের ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান-ধর্ম-সাহিত্য সম্পর্কে মিল বা মেকলের মত ব্যক্তিত্বদের ধারণা ভিন্ন ছিল। মেকলে মনে করতেন, নিষ্ঠার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করাতেই ভারতীয়দের মঙ্গল। পাশ্চাত্যের শিক্ষা বাঙালির চিন্তা চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে একথা মেনে নিয়েও বলা যায়, প্রাচ্য সম্পর্কে মেকলেপন্থীদের ধারণায় কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক অবধি শিক্ষা নিয়ে একাধিক পর্ব জুড়ে মতানৈক্যের

ধারা অব্যাহত থেকেছে। এই সময়পর্বে বাঙালি বিদ্বজ্জনদের (রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব ,ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ) চিন্তা ও ভাবনার ভিত্তি তৈরিই হয়েছে কিন্তু প্রাচ্যের ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য চর্চা করেই। বাঙালি সমাজের প্রগতির সূচনা কিন্তু এঁদের হাত ধরেই শুরু হয়েছে বলা যায়। মেয়েদের ভালো-মন্দের ব্যাপারেও তাঁরা সদাই উন্মুখ থেকেছেন; অন্দর মহলে প্রচলিত কঠিন সংস্কারের বৃহ্যভেদ, নারীজীবনে প্রথাগত শিক্ষা ও রুচির শুদ্ধিকরণ, নারীর সামাজিক মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী বাঙালি সর্বদাই প্রগতিশীল ভূমিকা রেখেছে। তবু নারীজীবনে প্রথাগত শিক্ষার প্রতিকূলতা সম্পূর্ণভাবে কেটে যায়নি, তবে উচ্চবর্গীয় সমাজে নারীর পারিবারিক শিক্ষার বহর যে বেড়েছে, সেকথা অনস্বীকার্য। ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য'ই ছিল তাঁদের শিক্ষার বিষয়। কবি মানকুমারী বসু এই পারিবারিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই শিক্ষিত হয়েছেন। কবির প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছে তাঁর পিতা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরীর কাছে। এ বিষয়ে কবির স্বীকারোক্তি--

> "প্রায় প্রতিদিন বিকালে বাবা পুরমহিলাদিগকে পুরাণ শুনাইতেন; বালিকাদিগকে সদুপদেশ দিতেন। বাবা বলিতেন, "মিথ্যা কথা বলিও না, পরের জিনিষ চুরি করিও না, কখনও কুপথে যাইও না"- ইত্যাদি।[৪৩]

কবির এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন সময়ে ন্যায়-নীতির শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মানকুমারী বসুর সেই শিক্ষা, পরবর্তী জীবনের তাঁর ভাবনা-চিন্তায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তবে শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়, পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষাও কবির জীবনে ঘটেছিল। সে বিষয়ে কবি জানিয়েছেন—

> "আমি বাবার কাছে, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীর কাছে এবং আমার এক দিদির কাছে প্রথম ভাগ পড়িতে লাগিলাম। ঔকার বানান শেষ হইলেই দ্বিতীয় ভাগ ধরিলাম।"[৪৪]

দ্বিতীয় ভাগের যুক্তাক্ষর তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করবার জন্য কবির পিতা সর্বদা বানান করে কথা বলতেন। তাতে লাভও হয়েছে কবির, খুব দ্রুত তিনি দ্বিতীয় ভাগ পড়া শেষ করতে পেরেছিলেন। কবি তাঁর বাড়ির বাহির ভাগে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ নিতেন, তবে সেখানে কতদিন পড়েছেন, সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়না। এ বিষয়ে কবি যেটুকু বলেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল-

> "আমি দ্বিতীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কথামালা লইয়া পড়িতে স্কুলে চলিলাম। আমার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ দুই মাসের পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল- এরূপ স্বেচ্ছাচারিতায় বাবা কিছুই বলিলেন না।"[৪৫]

পড়াশুনার ব্যাপারে মানকুমারী বসু যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছেন, তাঁর নিজের মতন করে শেখবার প্রবণতাতে কেউ বাধা দেননি। ঘরে বসে মানকুমারী বসু কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, হর-পার্ব্বতী-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেছেন বলে তিনি নিজেই তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন। মানকুমারী বসুর দাদা ছিলেন মাতুলালয়স্থ এনট্রান্স স্কুলের অন্যতম শিক্ষক।[৪৬] তিনি তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ কবির ভ্রাতৃজায়ার জন্য নারী-শিক্ষা, সুশীলার উপাখ্যান, গৃহকর্ম্ম, কুমুদিনী চরিত, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ প্রভৃতি পুস্তক পাঠালে কবিও এইসকল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। কবির ভ্রাতৃজায়া বামাবোধিনী পত্রিকার গ্রাহক বলে তাঁদের বাড়িতে নিত্য সেই পত্রিকা আসতো। মানকুমারী বসুর পরিবারে শিক্ষার এই বাতাবরণ তাঁর আত্মউন্মোচনের পথে সহায়ক হয়ে উঠেছিল বলে আমাদের মনে হয়। কবি নিজেই বলেছেন সেকথা-

> "আমার সধবা ভ্রাতৃজায়া "বামাবোধিনীর" গ্রাহিকা ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় বামা রচনা দেখিয়া তাঁহারাও গদ্য পদ্য রচনা করিতেন। এইসব দেখিয়া আমারও 'রচনা' করিতে মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত।"[৪৭]

মানকুমারী বসু তাঁর বাবার কাছ থেকে বিভিন্ন উপকথার পাঠ পেয়েছেন। এছাড়াও তাঁদের বাড়ির কর্মচারী গোবিন্দ বাবু, পুরাতন ভৃত্য মধু, কবির মাতা ও অন্যান্য সকলের কাছ থেকেও কবি উপকথা শুনেছেন বলে জানা যায়। এইসব উপকথা কবিকে কল্পনার রাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

> "অভিমন্যুর মৃত্যু-কথা শুনিয়া, রাজকন্যার পিতৃবংশে রাক্ষসে খাইল শুনিয়া, অথবা 'চীল-মাকে' গরম জলে পুড়াইল শুনিয়া, আমি চোখের জলে ভাসিয়া যাইতাম।"[৪৮]

রূপকথার কাহিনির সঙ্গে একাত্ম হয়ে না উঠতে পারলে এই অনুভূতি লাভ করা যায় না। এইভাবে প্রাচীন ভারতের লোককাহিনি শুনে কবির মন গঠিত হয়েছিল এবং তাঁর মনে কল্পনা ও ভাবনার বিস্তার ঘটেছে এইসব কাহিনিকে ঘিরে। আকাশে মেঘ দেখলে কবি মগ্ন হয়ে ভাবতেন যে, সেখানে আছে নীলধ্বজ রাজার বাড়ি, আবার কখনও তাঁর মনে হয়েছে সেখানে আছে গিরিরাজের বাড়ি। কোনো মেঘের মধ্যে তিনি আবার দেখছেন বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার আসর—এইসব কল্পনা কবির কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে। স্মরণ শক্তি প্রখর হওয়ার দরুন আট বছর বয়সেই কবি পদ্যপাঠ, চারুপাঠ, বস্তুবিচার, শিশুবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি খুব সহজেই মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। তবে মানকুমারী বসুর হস্তাক্ষর যে খুব ভালো ছিল না, তা আমরা আগেই স্বীকার করেছি। যদিও পরবর্তীকালে কবির জেদের কারণেই সেই হস্তাক্ষর ভালো হয়েছিল। প্রথাগত শিক্ষার পাঠ কতদিন চলেছে তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও আট বছর বয়স অবধি কবির পাঠশালায় যাবার কথা পাওয়া যায়-'একদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া দেখিলাম বাবার হাতে আমার পদ্যের খাতা।'[৪৯] আত্মচরিতে এই ঘটনার পরে আর একবারও পাঠশালায় কবির যাওয়ার কথা পাওয়া যায় না। অতএব বলা যায়, কবি আট বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৭১ সাল অবধি স্কুল শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাওয়ার কারণে অল্প বয়স থেকেই কবির চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এর দু-বৎসর পরেই কবির বিবাহ

হয়েছে, কিন্তু চার-পাঁচ দিন শ্বশুর বাড়ি থেকে আবার তিনি পিত্রালয়ে ফিরে এসেছিলেন। তখনও কবির লেখাপড়া বাকি থাকার কথা জানা যায়, তবে সেটা নিশ্চয় পাঠশালার শিক্ষা নয়। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "তখনও আমার লেখাপড়া চলিতেছিল। বাবার বৈঠকখানায় বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাকে পড়াইয়া যাইতেন। আমি বারো বৎসরে পড়িতেই সেই শিক্ষক অন্যত্র চলিয়া গেলেন; অন্য নূতন শিক্ষকের কাছে বাবা আমাকে আর পড়িতে দিলেন না। তখন আমি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতাম।"[৫০]

মানকুমারী বসুর পাঠশালার পাঠ অজান্তেই ছেদ হয়েছিল কিন্তু গৃহশিক্ষকের কাছে তখনও তাঁর শিক্ষা সচল ছিল। কবির শ্বশুর বাড়িতেও পারিবারিক শিক্ষাকে সবসময় মূল্য দেওয়া হতো। সেখানেও বাড়ির বারান্দায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রচলন থাকার কথা জানা যায়। হাতে-কলমে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থার কথাও জানা যায়; সেখানে মিশনারী মহিলারা এসে গ্রামের (বিদ্যানন্দকাটীতে) মহিলাদের সেলাই শিক্ষা দিতেন। তাই বলা যায়, শ্বশুর বাড়ি গিয়েও মানকুমারী বসুর শিক্ষাতে ছেদ পড়েনি। মানকুমারী বসুর পরিবারে শিক্ষার পরিবেশ, ছোটোথেকেই কবির শিক্ষার আগ্রহকে বাড়িয়ে দিয়েছে। মানকুমারী বসুর স্বামী বিবুধশঙ্কর বসুও শিক্ষার ব্যাপারে কবিকে যে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিতেন, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

> "পরবর্ত্তী কালে তিনি আমার নিকটে- যিনি আমাদের বঙ্গ-মহিলা কুলের শীর্ষস্থানীয়া সেই 'দীপনির্ব্বাণ' 'ছিন্নমুকুল' রচয়িত্রী, সুকবি স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি বিদূষী মহিলাগণের আদর্শ রচনা-শক্তি আমার সম্মুখে ধারণ করিতেন। আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে তাঁহার মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত।"[৫১]

এব্যাপারে কবির উৎসাহও কিছু কম ছিল না, সারাদিনের সাংসারিক কাজের ক্লান্তির পরেও রাত্রিবেলা পড়ার জন্য কবির উৎসাহ বজায় থেকেছে। কবি নিজমুখে সেকথা স্বীকার করেছেন-

> "রাত্রি ১১টা-১টার সময়ে যখন শয়ন গৃহে যাইতাম, তখন আমি পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, তিনি আমার অসুস্থতার আশঙ্কায় নিষেধ করিতেন; সেইজন্য তাঁহার কাছে আমার লেখাপড়া হইত না।"[৫২]

কবির এই উৎসাহ আজও আমাদের প্রেরণা দেয় এবং তৎকালীন সময়ে এই ঘটনা অবশ্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ। পড়াশুনা করতে না পারলে কবি আক্ষেপ করতেন। ইংরাজি শিক্ষার সুযোগও ঘটেছিল কবির জীবনে। বিবুধশঙ্কর বাবু কবিকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন---

> "স্বামী আমাকে কলিকাতা হইতে ইংরাজি শিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আদেশে আমি আনন্দের সহিত আমার একখানা খাতাকে সঙ্গিনী করিয়া বাটির বালকদিগের নিকটে ইংরাজি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৫৩]

অকস্মাৎ পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে বিবুধশঙ্কর বাবু পরলোকগমন করলে কবির পড়াশুনায় প্রাথমিকভাবে বিঘ্নতা তৈরি হলেও, অচিরেই তিনি তা কাটিয়ে উঠেছিলেন। বিধবা হয়েছেন বলে বিদ্যাচর্চা এবং সামাজিক কাজকর্ম তাঁর একমাত্র আশু কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। এই সময়ে কবি পুরাতন বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পাঠ করতেন। এছাড়াও প্রতিনিয়ত নবজীবন, প্রচার, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্রও পাঠ করতেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সাহিত্য পড়তে গিয়ে কবির মধ্যে স্বদেশভাবনা ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিকাশ ঘটে। এই সময় পুনরায় কবি তাঁর দাদার কাছে ইংরাজি ভাষার পাঠ নিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, 'একখানি উপক্রমণিকা ব্যাকরণ

হইতে শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি মুখস্থ করিতাম।'[৫৪] এর কিছুকাল পরেই কবির দাদার প্রথম পত্নী মারা গেলে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই সময় মানকুমারী বসু 'সখা' মাসিকপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং সেইসকল পত্রিকা পাঠ ও সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কবির শিক্ষা শুধুমাত্র ইংরাজি ভাষাতেই আবদ্ধ থাকেনি, তারাকুমার কবিরত্ন ও বামাবোধিনীর সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তের আগ্রহাতিশয্যে পরবর্তীকালে মানকুমারী বসু সংস্কৃত ভাষাও শিখতে চেষ্টা করেছিলেন।[৫৫] অন্যের সাহায্য ছাড়াই, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কবির এই ভাষা শিক্ষার প্রচেষ্টা আজও দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই কর্মপ্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কবি এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'একদিন ইংরাজী পড়িতাম আর একদিন সংস্কৃত পড়িতাম। ইংরাজী এবং দেবনাগর অক্ষর লিখিতেও শিখিতাম।'[৫৬] জীবনের শেষ পর্যায়েও কবি পঠন-পাঠন থেকে বিরত থাকেননি। বিদ্যাভ্যাসে কবির নিয়ত পরিশ্রম আজও আমাদের প্রেরণা দেয়। কবি তাঁর সেই আগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ----

> "তখন আমি ব্যাকরণ-কৌমুদীর খানিকটা মুখস্থ করিতে করিতে, অথবা ইংরাজী বানান শিখিতে শিখিতে গৃহকর্ম্ম করিতাম। আহারের সময় বেশী খাইলে পাছে শরীরে আলস্য হয় সেই ভয়ে সামান্য রূপ আহার করিতাম। দিনের বেলায় ৩/৪ ঘণ্টা এবং রাত্রিতে ৫/৬ ঘন্টা লেখাপড়ার সময় পাইতাম।"[৫৭]

এই সময়ে কবি কঠোর পরিশ্রম করতেন বলে জানা যায়, খুব সকালে উঠে তিনি গীতাপাঠ করতেন এবং তারপর সারাদিন গৃহকর্ম করার পাশাপাশি একইসঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থের পড়াশুনাও করতেন। কিন্তু এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খুব অল্পদিনেই কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়ে একজন নারীর শিক্ষালাভের এই প্রচেষ্টা যেন অবিশ্বাস্য; তৎকালীন সমাজজীবনে নারী হিসেবে মানকুমারী বসুর এই আত্মপ্রত্যয় 'নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকারকেই যেন প্রতিষ্ঠিত করে। মানকুমারী বসুর

মতো মহিলাদের এই নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস বিংশ শতাব্দীর নারী সমাজকে অন্যভাবে বাঁচার সাহস জুগিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে সূর্যমুখী, ভ্রমর[৫৮], সুশীলা[৫৯] প্রমুখ নারী সেকালের নারী-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন; তাঁরা তাঁদের আচার ও ব্যবহারগুণে সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বিনোদিনী, কুমু ও বিমলার[৬০] মত নারীরা সাহিত্যে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এঁরা মূলত ব্যক্তিভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছেন। মানকুমারী বসুর মতো নারীরা আসলে এই ব্যক্তিভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছেন।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস' গ্রন্থে রূপকথার কাহিনি পর্যালোচনা করে সমাজে নারীর অবস্থান দেখিয়েছেন। একই সমাজে বাস করেও নারী এবং পুরুষের শিক্ষা, সামাজিক বিধান, কর্ম সবকিছুই আলাদা ভাবে তৈরি হয়েছে। এরই ফলে যে নারী পিতৃতান্ত্রিকতাকে আত্মস্থ করে, মেনে নিয়েছেন গার্হস্থ্য শাসনের বৈধতাকে, সেই নারীই সমাজে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।[৬১] মানকুমারী বসুকেও এই ধারারই একজন প্রতিনিধি বলা যায়। বাল্যকাল থেকে মানকুমারী বসু এই ধরনের শিক্ষাই পেয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীতে নারী চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে সাহিত্যে সোহিনীর[৬২] মতো নারী চরিত্রেরও উদ্ভব হতে দেখা গেছে। এর ফলে নারীর মধ্যে প্রথাগত কোমলতা ও নারীসুলভ মেয়েলিপনার পরিবর্তন ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় বলেছেন-

> "রূপকথার গল্পে, ভাষার বুননে যে কোমলতা, মাধুর্য ও লাবণ্য আছে তা একান্ত নারীসুলভ, মেয়েলি; রূপকথার 'উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহ'; তাই 'বাঙালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে-সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।"[৬৩]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় প্রচীন ও রূপকথার সাহিত্যে নারীর নারীসুলভ একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, আর এটা তার চিরকালীন স্বভাবগত বলা যায়। অথচ নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা বা তাঁর আধুনিকতা নারীর চিরন্তন স্বভাবের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। নারীর জীবনের এই বাস্তবতাকে নতুন-পুরাতনের সঙ্গে মেলানো দরকার; নচেৎ উভয়ের মধ্যে একটা বিস্তর ব্যবধান তৈরি হতে পারে। এ কথাই স্বীকার করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে -

> "'নিখিল বঙ্গদেশের' সেই আদি ও অকৃত্রিম রস অধুনা দুর্লভ হয়ে পড়েছে, শিক্ষার ফেরে মেয়েরাও তাদের 'স্বাভাবিক' ভাষা ভুলতে বসেছে; অবিলম্বে যদি আধুনিক দিদিমাদের জন্য স্কুল খোলা না-হয়, প্রাচীন ভাব-ভাষার সঙ্গে তাদের যদি পুনঃসংযোগ না-হয় তাহলে তাদের কোম্পানি একেবারে দেউলে হয়ে যাবে।"[৬৪]

এই বক্তব্য থেকে প্রাচীন নারীর নারীসুলভ স্বভাবের সঙ্গে আধুনিক নারীর মূল্যবোধের মিলন যে জরুরী তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বলেছেন সেকথা ---- 'প্রাচীন রসের প্রবাহ বিলুপ্তির কারণে মানুষ সমষ্টিবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ছে। এই অবনতিকে রুখতে, সমাজকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে বাংলার মেয়েদের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে।'[৬৫] মানকুমারী বসু সেই গুরুত্বকে রক্ষা করতে পেরেছেন। কারণ, কবির শিক্ষা ও তার প্রয়োগ সার্বিকভাবে সার্থকতা পেয়েছে। মানকুমারী বসুর রচিত সাহিত্যে তার প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

গ. স্রষ্টা জীবনের পরিচয় উদ্ধার

মানকুমারী বসুর আত্মচরিত 'আমার অতীত জীবন' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে-

> "দেখ দেখি, তোমার কাকা কত বড় ক্ষমতাপন্ন কবি ছিলেন; তুমি তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রী হইলে আমার মুখোজ্জ্বল হইবে।"[৬৬]

মানকুমারী বসুর স্বামী তাঁকে একথা বলেছিলেন। মানকুমারী বসু হলেন মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তিনি তাঁর পরিবার থেকেই সাহিত্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। এছাড়াও মানকুমারী বসুর সাহিত্য রচনার অন্যান্য আগ্রহের কথা আমরা আগেই জানিয়েছি। কবির আত্মকথায় সেই প্রসঙ্গের উল্লেখও পাওয়া যায়-

> "দ্বিপ্রহর সময়ে আমাদের অন্তঃপুরে বিলক্ষণ বিদ্যানুশীলন হইত। আমার সধবা ভ্রাতৃজায়া "বামাবোধিনীর" গ্রাহিকা ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় বামা রচনা দেখিয়া তাঁহারাও গদ্য পদ্য রচনা করিতেন। এইসব দেখিয়া আমারও 'রচনা' করিতে মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত।"[৬৭]

যথারীতি অল্প বয়স থেকেই তিনি গদ্য-পদ্য রচনা করেছিলেন। কবি তাঁর ভগিনীকে দিয়ে একটি ছোট খাতা তৈরি করিয়েছিলেন এবং সেই খাতার নামকরণ করেছিলেন 'লাইবাইটের উপাখ্যান'।[৬৮] খুব সম্ভবত এটিই ছিল কবির সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস। চরিতাবলীর অদ্ভুত নাম শুনে কবির লাইবাইট নামটি মাথায় আসে বলে কবি নিজেই জানিয়েছিলেন।[৬৯] তবে এই খাতা বর্তমানে উদ্ধার করা যায় না। এই খাতায় কবি কী রচনা করেছিলেন তাও জানা যায় না। কবি শুধু এ সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'বোধ হয় যেন যে-সব উপকথা শুনিতাম, তাহারই এক ক্ষুদ্র 'সংস্করণ' করিয়াছিলাম"[৭০]। এতে কিছু গদ্য রচনা স্থান পেয়েছিল।[৬৪] তৎপরবর্তীকালে কবির পদ্য রচনার কথাও জানা যায়। এই সময় কবির বয়স আনুমানিক আট বৎসর। চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসে কবির উপকথা রচনা করার অভ্যাসের কথাও তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে বয়স অতিরিক্ত প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। কবির লেখা দেখে তাঁর বন্ধুদের অবিশ্বাস সেকথার প্রমাণ দেয়। তাঁর জীবনীতেও এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। 'সেই লেখা দুই একজন বালক দেখিয়াছিল, আমাকে বলিয়াছিল, 'ইহা কখনও আমার রচনা নয়'-.....; আমি ইহার পরে পদ্য বা গদ্য অর্থাৎ উপকথা যাহা লিখিতাম। কাহাকেও দেখাইতাম না, বাবাও জানিতেন না'।[৭১] কবির সেসব উপকথার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে খুব ছোট থেকেই কবির সাহিত্য রচনার কথা জানা যায়।যদিও প্রকাশ্যে এহেন

কর্মে কবি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন। একদিন পাঠশালা থেকে ফিরে এসে দেখেন পিতার হাতে তাঁর পদ্যের খাতা। সেই ঘটনায় কবির প্রতিক্রিয়া তিনি নিজেই জানিয়েছেন- 'আমি লজ্জা, সঙ্কোচ আরও কি জানি কি 'অদ্ভুত' ভাবে যেন মরিয়া গেলাম'[৭৩]। কিন্তু মিথ্যা না বলার দরুন কবি স্বীকার করেন যে সেগুলি তাঁরই রচনা, সেখান থেকে কবিতার দুটি ছত্রের উল্লেখও আমরা পেয়েছি-

"রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার,
ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।"[৭৪]
এই একই সময়ে রচিত গদ্যের নিদর্শনও আমরা পেয়েছি-

> "এক রাজ-কন্যার বারান্দায় এক ঝাঁক পাখী আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে হইতে রাজকন্যা একটি পাখী ধরিয়াছিলেন; তাহার গায়ের রং লাল, সবুজ, হলদে আর কালো; এমন সুন্দর পাখী কেহ কখনও দেখে নাই; তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন একটি বাদুড়!"[৭৫]

অল্প বয়সেই মানকুমারী বসুর গদ্যরচনা বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছে এবং তাঁর শব্দচয়ন ও শব্দসজ্জায় কোনো ত্রুটি লক্ষ করা যায় না। তবে তাঁর উপমা সৃষ্টি দেখে তাঁর ভ্রাতৃজায়াদ্বয় খুবই হাসাহাসি করতেন কারণ সৌন্দর্য্যের উপমা বাদুড় এটা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। কবিও বাদুড় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু কবি এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তাঁর জীবনীতে উল্লেখ রয়েছে- 'তোমার পদ্য বেশ হইয়াছে; এখন প্রত্যহ যাহা নতুন দেখিবে, তাহাই একটি পদ্য করিয়া আমাকে দিবে।'[৭৬] এতে কবি বড়ই উৎসাহিত হয়েছেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেই উৎসাহের প্রকাশও লক্ষ করা গেছে। একদিন গ্রীষ্মকালে কবির এক প্রতিবেশিনীর বাড়ির কাছে শুকনো একটি ডোবাতে এক গাভী ঘাস খেয়েছে বলে প্রতিবেশিনী সখী গাভীটিকে মারতে উদ্যত হয়েছেন। এই ঘটনাটিকে কবি পদ্যে রূপ দিয়েছেন এভাবে[৭৭]-----

"জল শুকাইয়া কূপ হয়ে গেছে মাটি;
গাভীতে খেতেছে তেহে ঘাস চাটি চাটি;

আসিয়া সখী তেলিনী মারে ঝাটা লাঠি;
মোর মনে হয় বাবা, তার নাক কাটি।”[৭৮]

এই কবিতা দেখে সকলে কবির খুব প্রশংসা করেন। কবিতাটিতে কোনো গভীর তত্ত্ব না থাকলেও রচনাটির সরল ভাব প্রশংসারযোগ্য। বিবাহের পর কবি তাঁর চোদ্দ বৎসর বয়সে ‘পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা’ শিরোনামে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীররসের একটি কবিতা লেখেছিলেন।[৭৯] তার প্রথম কয় ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা হল।

“দুরন্ত যবন যবে ভারত ভিতরে
পশিল আসিয়া, পুরন্দর মহাবলী
কেমনে সাজিলা রনে, প্রিয়তমা তার
ইন্দুবালা কেমনে বা করিলা বিদায়?
কৃপা করি কহ মোরে হে কল্পনা দেবী!
কেমনে বিদায় বীর হ’ল প্রিয়া কাছে। ”[৮০]

সুদীর্ঘ এই কবিতাটি ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।[৮১] কবিতাটি সকলের খুব প্রশংসাও লাভ করেছিল।পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ও কবিতাটির প্রশংসা করে লিখেছিলেন-

> “আমরা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী; ইনি ইঁহার পিতৃব্য সৃষ্ট বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার গলায় আমরা প্রশংসার শতনরী হার পরাইলাম। চর্চ্চা থাকিলে ইঁহার মধুময়ী লেখনী কালে অমৃত প্রসব করিবে।”[৮২]

সতেরো বৎসর বয়সে কবির একমাত্র কন্যার জন্মের ঠিক কুড়ি দিন পরে কবির পিতা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরী পরলোক গমন করেন। তাঁর শোকে কবি একটি শোকগাথা রচনা করেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি, ‘তাঁহার উদ্দেশে আমি একটি শোক-গাথা লিখিয়াছিলাম’[৮৩]। তারপর অনেকদিন কবি আর কোনো লেখাপড়া করতে পারেন নি।

শোক অনেকসময় সৃষ্টিকে স্তব্ধ করে দেয়। এরপরে সাড়ে আঠারো বছর বয়সে কবির স্বামীর অকালপ্রয়াণ ঘটলে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শোকের আঘাতটি নেমে আসে। মানকুমারী বসুর জীবনে তাঁর স্বামীর চলে যাওয়ার ঘটনাটি বড় অঘটন তো বটেই। তাঁর আত্মজীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে-'এ সময়ে আমি আমার বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত কোন পুরুষের সম্মুখীনা হইতাম না; কোনরূপ আমোদ বা উৎসাহে যোগ দিতাম না; এবং স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গেও বিশেষ মিশামিশি বা রহস্যালাপ করিতাম না।'[৮৪] স্বামীর শোকে কবি রচনা করেছিলেন 'প্রিয়প্রসঙ্গ' নামের একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি গদ্য ও পদ্য সম্বলিত।[৮৫] 'প্রিয়প্রসঙ্গ' গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপটটি কবি জানিয়েছিলেন এভাবে---

> "আমি যখন সেই তরুণ বয়সে নিদারুণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, তখন যেন আমার হৃদয় পিষিয়া কবিত্বশক্তি সকল বাহির হইতে লাগিল।"[৮৬]

স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁরই অর্থানুকুল্যে কবি তাঁর এক আত্মীয়ের সাহায্যে গ্রন্থটি ছেপে বের করেছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি নিজের নাম ও পরিচয় গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। "'প্রিয়প্রসঙ্গ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে, আমার আত্মগোপনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকে বুঝিতে পারিলেন আমিই উহার রচয়িত্রী।'[৮৭] এরপর থেকে কবি শুধু সংসার জীবনে আবদ্ধ থাকতে পারেননি। জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে তিনি নিজেকে সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত করেছিলেন। নবজীবন, প্রচার, নব্যভারত, সখা প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি বিদ্যাচর্চায় আরও বেশি করে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানকুমারী বসু গৃহে বসে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন বলা যায়। একাধিক মৃত্যু কবির জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু তিনি তাঁর অন্তরের শক্তি দিয়ে নিজেকে উজ্জীবিত করে তুলেছেন। প্রমদাচরণ সেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানকুমারী বসু 'সখা' পত্রিকার মাধ্যমে বালক-বালিকাদের জ্ঞানানুশীলন ও নীতিশিক্ষার পাঠ যেমন দিয়েছেন

তেমনই উক্ত পত্রিকায় তিনি সাহিত্যচর্চাও করেছেন। কবির কথা থেকেই সেকথা জানা যায়।

> " 'সখার' উপযুক্ত কবিতা লিখিয়া প্রমদাবাবুর নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি যত্নপূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন। সেই হইতে কিছুদিন পর্যন্ত 'সখায়' লিখিতে লাগিলাম।"[৮৮]

কিছুদিন পর প্রমদাচরণ বাবুও ইহলোক ত্যাগ করলে পুনরায় মৃত্যুশোক কবিকে আচ্ছন্ন করো তুলেছিল। সেই শোকের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'শোকসঙ্গীত' শীর্ষক একটি কবিতার মধ্য দিয়ে। অনেক কবিতার সঙ্গে তাঁর এই কবিতাটিও 'সখা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায়।[৮৯] এরপর মানকুমারী বসু সমাজের নারীদের জন্য কিছু করবার উদ্দেশ্যে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ২৫ বর্ষ পূর্তিতে সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় 'জুবিলী' উৎসব পালন করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে তিনি সাহিত্য রচনার জন্য অনেকগুলি পুরস্কারের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কবি সেখানে তিন-চারটি প্রবন্ধ লিখে ত্রিশ টাকা পুরস্কারও পেয়েছিলেন। 'বামাবোধিনী'র বিজ্ঞাপন অনুসারে তিনি 'বনবাসিনী' নামে একটি উপন্যাসও লিখে পাঠিয়েছিলেন।[৯১] এ ব্যাপারে কবি নিজেই জানিয়েছিলেন-

> "'বামাবোধিনী'র বিজ্ঞাপনানুসারে 'বনবাসিনী' নামক এক ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি উহা অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া 'বামাবোধিনীর' জুবিলীতে বিতরণ করিয়াছিলেন। "[৯২]

বিধবা রমণীর কর্তব্য বিষয়ে কবির ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসটি প্রকাশের পর কলকাতায় দাসাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে উমেশ বাবু পত্র মারফৎ কবিকে জানিয়েছিলেন-

" মা! তোমার 'বনবাসিনী' কল্পনা সফল হইয়াছে, কলিকাতায় দাসাশ্রম নামক এক স্নেহভবন স্থাপিত হইয়াছে।"[৯৩]

এরপর থেকে দেখা যায় উমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে কবির একটি সখ্যতা গড়ে ওঠে। এই সময় থেকে তিনি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় আরও বেশি করে লিখতে শুরু করেছিলেন। কবি নিজেই জানিয়েছিলেন-'এই সময় হইতে 'বামাবোধিনী'তে আমি পদ্য অপেক্ষা গদ্য প্রবন্ধ অধিকাংশ লিখিতে লাগিলাম।'[৯৪] তাঁর সেই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে মানকুমারী বসু অন্তঃপুর-শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামের স্ত্রী-চিকিৎসক এবং ধাত্রীর আবশ্যকতা বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন । এইসময় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় লেখা ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকায় তিনি যে লিখতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে বিষয়ে কবির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি----

"অতঃপর আমি 'নব্যভারত' পত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সঙ্গে অন্যান্য মাসিক পত্রে দুই চারিটি কবিতাও প্রকাশ করিয়াছিলাম।"[৯৫]

এই সময় একাধিক প্রবন্ধ রচনার জন্য কবি বহু প্রশংসার পাশাপাশি একাধিক পুরস্কারও পেয়েছিলেন। ১২৯৬ সালে ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের ঘোষণা করা প্রবন্ধের প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ লিখে কবি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধটি হল 'বাঙালী রমনীদিগের গৃহধর্ম্ম'।[৯৬] এ কথা শুনে কবির কয়েকজন আত্মীয় 'যশোহর-খুলনা সন্মিলনী' সভার বিজ্ঞাপনানুসারে 'বিবাহিতা রমণীর কর্ত্তব্য' বিষয়ে তাঁকে একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। কবি সেই প্রতিযোগিতাতেও উক্ত শিরোনামের প্রবন্ধ রচনা করে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে মিসেস বি, দে প্রদত্ত একটি রুপোর মেডেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।[৯৭] প্রবন্ধটি সম্মিলনীর কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রবন্ধটি বিদ্বজ্জনদের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল এবং প্রবন্ধটি পাঠ করে পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন পত্র প্রেরণ করে তাঁর আনন্দিত হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন। ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত প্রবন্ধ দেখে 'বাঙালী মেয়ের নীতিশিক্ষা' পুস্তকে কবি মানকুমারী বসুর নাম ও তৎসহ বিশেষ গৌরবসূচক একখানি

পত্র মুদ্রিত করে কবিকে উপহার দিয়েছিলেন। [৯৮] প্রবন্ধ রচনায় কবির প্রাপ্তি এখানেই শেষ হয়নি, এরপরেও যশোহর-খুলনা তে দুবার কবি প্রবন্ধ লিখে প্রথম হয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন-

> "...আরও দুইবার আমি যশোহর-খুলনা সম্মিলনীতে 'সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য' এবং 'মহৎ জীবনী' নামক প্রবন্ধ রচনায় প্রথম বিবেচিত হই এবং শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার পাই।"[৯৯]

কবির পিতৃব্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্থলে স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সময় কবি তাঁকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি উমেশচন্দ্র দত্তের আদেশানুসারে লেখা হয়েছিল এবং দত্ত মহাশয় নিজ অর্থ ব্যয়ে সেটি ছেপে উক্ত কার্যস্থলে বিতরণ করেছিলেন। আর সেই সূত্রেই কবি পরিচিত হয়েছিলেন মধুসূদন দত্তের জীবনী প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে।[১০০] এই নিরলস সাহিত্য রচনার জন্য কবির বিদ্যাচর্চার একাগ্রতা ও নিষ্ঠাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। তিনি নিজেও এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন, 'এই সকল সময়ে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত'।[১০১] বামাবোধিনী, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা কবিতাগুলিকে একত্রিত করে তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় স্বেচ্ছাপূর্বক 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যগ্রন্থটি প্রশংসাও লাভ করেছিল। কবি সে বিষয়ে নিজেই জানিয়েছিলেন-

> "সাহিত্য-গুরু বঙ্কিম বাবু, কবিবর হেমবাবু ও নবীনবাবু, মনীষী চন্দ্রনাথবাবু, জাস্টিস গুরুদাসবাবু, ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে যারপর-নাই উৎসাহ দিয়াছিলেন।"[১০২]

এরপর ক্রমানুসারে তারাকুমার বাবুর প্রযত্নে কবির 'কনকাঞ্জলি', 'প্রিয়প্রসঙ্গ'(দ্বিতীয় সংস্করণ), 'বীরকুমার বধ' প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে।[১০৩] 'বামাবোধিনী'র ত্রিশ বৎসর[১০৪] অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দে[১০৫] এক জুবিলী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মানকুমারী বসু 'বিগত

শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা' [১০৬] শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[১০৭] প্রবন্ধটি লিখে কবি পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারও পেয়েছিলেন । সেকালের বিখ্যাত ব্যক্তি রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় ছিলেন তার পরীক্ষক, কয়েকজন পুরুষ ও রমণীদিগের মধ্যে কবি একমাত্র নির্বাচিত হয়েছিলেনন।[১০৮] তৎকালীন সময়ের দেশ ও সমাজ হিতৈষী পণ্ডিত ব্যক্তিদের কবি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ১২৯৮ সালে কলকাতায় থাকার সময়ে শাশুড়ীর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়ে নিমতলার শ্মশান ঘাটে কবি মানকুমারী বসু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেন।[১০৯] এই শোকের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে তাঁর 'শোকোচ্ছ্বাস' শীর্ষক গদ্যকবিতা।[১১০] এটি লিখে কবি বামাবোধিনী পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। এরপর আরও তিন চারটি কবিতা লিখলে উমেশচন্দ্র দত্ত ও তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।[১১১] 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে দেওঘরে গিয়ে কবি রাজনারায়ন বসুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাঁকে প্রণাম অর্পণ করলে বসু মহাশয় তাঁর সৃষ্টির প্রশংসাও করেছিলেন। কবি নিজেই সে কথা জানিয়েছিলেন-'মা! আমাকে মনে রাখিও, তোমার কবিতা আমি মুখস্থ করিয়া থাকি।'[১১২] কবি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ঋণ অকপটে তাঁর কাছে স্বীকার করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যাক্তির প্রেরণা, বিভিন্ন সাহিত্যিকের জীবন ও তাঁদের সৃষ্টি যে কবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, কবির স্বরচিত আত্মকথায় সে কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

> "নব্যভারতের অন্যতম সুকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিত্বশক্তি এবং গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক শক্তির নিকটে আমি বহুল পরিমাণে ঋণী। সকলের অপেক্ষা সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণই আমার গুরুতর।"[১১৩]

কাব্য-কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সেইসঙ্গে একাধিক ছোটোগল্প ও উপন্যাস রচনাও তিনি করেছিলেন। তাঁর 'শোভা' গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল এবং কবি পাঁচ টাকা পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর 'রাজলক্ষ্মী'(১৩০৩ সাল) গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কারের প্রথম বর্ষে[১১৪] বিশেষ পুরস্কার

হিসাবে ১৫ টাকা পুরস্কার পেয়ে কবিকে সম্মানিত করেছিল। কুন্তলীন পুরস্কারের ৩য় বর্ষেও (১৩০৫ সালে) কবির 'অদৃষ্টচক্র' গল্পটি সপ্তম পুরস্কারে(১৫ টাকা) পুরস্কৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। এর বাইরেও কবির একাধিক ছোটোগল্প ও উপন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। মানকুমারী বসু রচিত প্রথম উপন্যাস 'বনবাসিনী', ১২৯৫ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যায় 'বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে 'গৃহলক্ষ্মী', ১২৯৯ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, এছাড়াও 'মহামুহূর্ত্ত', ১২৯৯ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়, 'শৈশবসঙ্গিনী' ১৩০৪ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় আষাঢ়-আশ্বিন সংখ্যায়, 'বিমাতা', ১৩০৪ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও তাঁর বেশকিছু ছোটোগল্প রয়েছে। সেগুলির মধ্যে 'ভিখারিনীর গীতি', ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায়, 'মাতৃহৃদয়', ১৩০২ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, 'দিদিমার রূপকথা', ১৩১৬ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যদিও 'দিদিমার রূপকথা' রচনাটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সূচিপত্রে উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।[১১৫] কবির রচিত 'পত্নী', ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায়, এবং 'অদৃষ্টলিপি', ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ভাদ্র-কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মানকুমারী বসুর খ্যাতি মূলত কবি হিসেবে। তবে তাঁর রচিত গদ্যের পরিমাণও কম নয়, যদিও তার বেশিরভাগটাই প্রবন্ধ। তাঁর সব প্রবন্ধ উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়েছিল। কিছু পত্রিকার সূচিপত্রের কবির রচনাগুলিকে কখনো বিষয় অনুযায়ী, কখনোবা তাদের প্রকরণ অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। মানকুমারী বসুর স্রষ্টা জীবনের পরিচয়কে (মূলত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ) প্রকাশকালের কালানুক্রমিক পরিসংখ্যানসহ একটি সম্ভাব্য তালিকা রূপে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রবন্ধ	প্রকাশকাল
১। বঙ্গ মহিলার পত্র,পৃ. ২০৫	১২৯৫ বঙ্গাব্দ,কার্তিক
২। নব্যগৃহিনীদিগের নতুন অভাব ও উন্মোচন,পৃ. ২৩০	১২৯৫,অগ্রহায়ন
৩। স্ত্রী ও পুরুষ দিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার,পৃ. ৩১৫	১২৯৫,পৌষ
৪। সহধর্ম্মিনী বাঙালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম	১২৯৬ বঙ্গাব্দ,ফাল্গুন-চৈত্র
৫। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য, পৃ. ১৮	১২৯৭,আশ্বিন-কার্তিক
৬। উদাসিনীর সংসার,পৃ. ২২৬	১২৯৭, অগ্রহায়ন
৭। গুণগ্রাহিতা শক্তি,পৃ. ৩১১	১২৯৭, মাঘ-ফাল্গুন
৮। আর্যমহিলা গান্ধারী,পৃ. ৪	১২৯৮,বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
৯। লজ্জাশীলতা ,পৃ. ৩৩০	১২৯৮,ফাল্গুন
১০। আর্যমহিলা পার্ব্বতী,পৃ. ২২৭	১২৯৮,কার্তিক
১১।।নিন্দুক ,পৃ. ৩৪১	১২৯৯,ফাল্গুন
১২।আর্যমহিলা সুমিত্রা,পৃ. ৭	১৩০০,বৈশাখ
১৩। স্বার্থে পরার্থ, পৃ. ৬৬	১৩০০, জ্যৈষ্ঠ
১৪। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ,পৃ. ৭৬	১৩০০,আষাঢ়-শ্রাবণ
১৫। পঞ্চযজ্ঞ ,পৃ. ১৭৭	১৩০০,আশ্বিন-কার্তিক
১৬। শোকের শান্তি, পৃ. ২৭৫	১৩০০,পৌষ-মাঘ
১৭। শোকসন্তপ্ত হৃদয়,পৃ. ৫	১৩০১,বৈশাখ
১৮। কবির পরিণাম ,পৃ. ১০৮	১৩০১, শ্রাবণ
১৯। মাতৃভক্তি ও মাতৃউপাসনায় সন্তানের মুক্তি ,পৃ. ১৩২	১৩০১,মাঘ
২০। স্ত্রীলোকের নির্দোষ আমোদ ,পৃ. ২৫৮	১৩০২,পৌষ-মাঘ

২১। আর্যমহিলা: সীতা ,পৃ. ৭৬	১৩০৭,জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়
২২।আমাদের মহারানী ,পৃ. ৩৬৭	১৩০৭, মাঘ-ফাল্গুন
২৩। দয়া ,পৃ. ৯২	১৩০৮, আষাঢ়
২৪। আমাদের মহর্ষি,পৃ. ৩৫৪	১৩১১,মাঘ
২৫। শোকোচ্ছ্বাস(উমেশবাবুর স্মরণে),পৃ. ১০৯	১৩১৪, শ্রাবণ
২৬। বটবৃক্ষের কাহিনী,পৃ. ২১০	১৩১৫, আশ্বিন
২৭। মৃত্যু, পৃ. ১০৬	১৩১৬, শ্রাবণ
২৮। রামচন্দ্র ,পৃ. ৯৮	১৩১৭, শ্রাবণ
২৯। ভৈরবী , পৃ. ৮২	১৩১৮, আষাঢ়-শ্রাবণ
৩০। বামাবোধিনীর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব,পৃ. ১৭৮	১৩১৯, ভাদ্র
৩১। বঙ্গমহিলা ,পৃ. ৩৪	১৩২০, জ্যৈষ্ঠ
৩২। বর্ষশেষ ,পৃ. ৩৭০	১৩২১, চৈত্র
৩৩। বামাবোধিনীর জন্মদিনে ,পৃ. ১৯৭	১৩২৩, ভাদ্র

উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলিই বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এই সকল গদ্যগুলির বেশিরভাগই গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে। কবির রচিত একাধিক কবিতা তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে, খুব অল্প কবিতাই রয়েছে যেগুলি অগ্রন্থিত। সেগুলি মূলত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[১১৬] মানকুমারী বসুর রচিত মূল গ্রন্থগুলি হল-

১. প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়[১১৭](গদ্য-পদ্য) প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৪, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৩২২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০।

২. বনবাসিনী (উপন্যাস), ভাদ্র ১২৯৫ পৃষ্ঠা-২৩।

৩. বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম (সন্দর্ভ) ১৫ জুলাই ১৮৯০, পৃষ্ঠা-১২। এটা ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা। প্রথমে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৪. শোকোচ্ছ্বাস (স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে রচিত)। এখানে তিনটি রচনা ছিল- শোকোচ্ছ্বাস (গদ্য) এবং শোকাতুরা মা ও বিসর্জন নামে দুটি কবিতা। ১৮৯১, পৃষ্ঠা-৮।

৫. দুইটি প্রবন্ধ। ১২৯৮ সাল। পৃষ্ঠা- ৩২। এখানে দুটি প্রবন্ধ ছিল- বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য, সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য।

৬. কাব্যকুসুমাঞ্জলি(কাব্য)[১১৮] প্রথম প্রকাশ ১৮৯৩, ২য় সংস্করণ ১৮৯৬,৭ম সংস্করণ ১৩২২,৮ম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩২৫(ইং ১৯১৯), শেষ(১১তম) সংস্করণ আশ্বিন ১৩৪১(ইং ১৯৩৪) শেই সংস্করণে গ্রন্থটির মুল্য ধার্য হয়েছিল দেড় টাকা। শেষ সংস্করণে মুল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬১।

৭. কনকাঞ্জলি(কাব্য)[১১৯] প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ ইং ১৮৯৬ এর ২৯এ অক্টোবর, ২য় সংস্করণ ১৩১১, ৩য় সংস্করণ ১৩২০, এই সংস্করণটি শ্রী গুরুদাস মহাশয় কতৃক প্রকাশিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬০। হেয়ার-প্রাইজ এসে ফন্ড থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত।

৮. বীরকুমার-বধ কাব্য, ১৩১০ সাল। গ্রন্থটি কবি তাঁর পিতা স্বর্গীয় আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরীকে উৎসর্গ করেছিলেন।[১২০] পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩৫।

৯. শুভ সাধনা(গদ্য-পদ্য) ১৯১১। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৪। এই বইটি অনেকদিন বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। এর একাধিক প্রবন্ধ 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রথমে বের হয়েছিল।পরে কবি কিছু পরিবর্তন করে সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' থেকে 'সাধক' নামে একটি কবিতা এখানে গৃহীত হয়েছিল।"[১২১]

১০.বিভূতি (কাব্য. ১৯২৪ এর ১২ই এপ্রিল(১৩৩০ এ চৈত্র.। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১২

১১. সোনার সাথী (কাব্য. ১৯২৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০

১২. পুরাতন ছবি (আখ্যায়িকা. ১৯৩৬ এর ২৫এ জুলাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩১।

১৩. মানকুমারি বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা ২০০১ এর সেপ্টেম্বর, বারিদবরন ঘোষ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৯।

উপরিউক্ত বারোটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' গ্রন্থে, আমরা সেখান থেকেই মানকুমারী বসুর উক্ত বারোটি গ্রন্থের তালিকা উদ্ধার করেছি।[১২১] এর মধ্যে অনেক গ্রন্থই আজ দুষ্প্রাপ্য। তাঁর 'বনবাসিনী', 'বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম', 'শোকোচ্ছ্বাস' ও 'দুইটি প্রবন্ধ' যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। যদিও সেগুলি পূর্বে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং আমরা সেখান থেকেই সেগুলি সংগ্রহ করেছি। সারা জীবন ধরেই তিনি সাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং সেই সাহিত্যের জন্য একাধিক সম্মানেও ভূষিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ রচনা করে তিনি পেয়েছিলেন একাধিক পুরস্কার। এছাড়াও তাঁর ঝুলিতে প্রাপ্তির সংখ্যা অগুনতি। ১৯১৯ সালের জুলাই মাস থেকে কবি ভারত সরকারের কাছ থেকে আমৃত্যু কাল প্রথমে ৩০ টাকা ও পরে ৩৪ টাকা করে বৃত্তি পেয়েছেন।[১২২] কবি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে 'কাব্য সাহিত্য' শাখায় সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১২৩] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে প্রথম ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে 'ভুবনমোহিনী সুবর্ণ-পদক' সম্মানে ভূষিত করেন[১২৪] এবং ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবি মানকুমারী বসুকে 'জগত্তারিনী সুবর্ণ-পদক' দিয়ে সন্মানিত করেন।[১২৫] সন্মান প্রদানের মধ্য দিয়েই একজন সাহিত্যিককে উৎসাহিত করা যায়। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' রচিত হওয়ার পর রাজনারায়ণ বসু(১৮২৬-১৮৯৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৯০৩),নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯০৯) প্রমুখ ব্যক্তি কবিকে পত্র মারফৎ তাঁদের প্রশস্তি নিবেদন করেছিলেন।[১২৬]

সাহিত্যিক মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবনের ভাবনা দিয়ে গড়া সাহিত্যজীবন নিস্ফলে যায়নি। গুনগ্রাহিতার আত্মউন্মোচন দেশবাসীর নজর এড়ায়নি। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে খুলনায় অনুরূপা দেবীর সভানেতৃত্বে গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী মহাসমারোহে মানকুমারী বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করেছিলেন।[১২৭] সাহিত্যজীবনের এই প্রাপ্তি কবির ব্যক্তিজীবনকেও

পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। নীলরতন মুখোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য দুটি কবিতা লিখে কবির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেছিলেন।[১২৮] দীর্ঘ ষাট বছরের নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টি তাঁর সাহিত্যজীবনকে যেমন পূর্ণ করেছে, অন্যদিকে তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যিক হিসেবে মানকুমারী বসুর আসনটিও পাকা হয়ে গেছে।

ঘ. আবির্ভাবের পটভূমি বিশ্লেষণ

বিংশ শতাব্দীর সমাজ ব্যবস্থা মূলত মননঋদ্ধ ও ব্যক্তিনির্ভরশীল ছিল। প্রচলিত নৈতিক চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রথাগত ভাবনার বিরোধী চরিত্রকে নস্যাৎ করার যে সামাজিক প্রেরণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছিল, বিংশ শতাব্দীতে তা আর বজায় থাকেনি। হ্যাকমান উপন্যাসের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট বোঝাতে গিয়ে একটি আসাধারণ কথা বলেছিলেন, "reflects the tendencies of a new world still in the making."[১২৯] বাংলার বিংশ শতাব্দী ছিল সেই তৈরির কাল, যেখানে নতুন ভাবনা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ ধারণ করেছে। মূলত এই কারণেই সমালোচক বলেছেন—

> মননধর্ম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ, অন্ধ সংস্কার-কিংবা রক্ষণশীল-মুক্ত দৃষ্টি, আবেগ আতিশয্যের প্রতি আঘাত .....প্রমথ চৌধুরীর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে এসে উত্তরকালের কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে।"[১৩০]

সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্য সেক্ষেত্রে সমাজ ভাবনা সংস্কার ও তথাকথিত রক্ষণশীল নীতি-নৈতিকতার চর্চায় আবদ্ধ থেকেছে বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথাগত চিন্তা ভাবনা আর বিংশ শতাব্দীতে সংস্কারমুক্ত চিন্তাভাবনা, এই দুই ভাবনাই ছিল দুই শতাব্দীর সমাজ গঠনের মূল আধার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিধবা রোহিণীর[১৩১] প্রেমকে উক্ত সমাজের সংস্কারী দৃষ্টিতে বিচার করা হয়েছে, আর বিংশ শতাব্দীতে সেই বিধবা বিনোদীনির[১৩২] প্রেমকেই কিছুটা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয়। মানকুমারী বসুর মৃত্যু হয়েছে ১৯৪৩ সালে, তাই মানকুমারী বসু বিংশ শতাব্দীতেও সাহিত্য রচনা

করেছেন। কিন্তু তাঁর বেড়ে ওঠা বা জীবনভাবনা তৈরি হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে। মানকুমারী বসুর আত্ম-উপলব্ধি সমাজের প্রথাগত নৈতিক-অনৈতিক এবং ভালো-মন্দের মাপকাঠিতেই গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, ব্যক্তির ভাবনা, চরিত্র সবসময় নির্দিষ্ট কালের মূল্যবোধের দ্বারা গড়ে ওঠে। মানকুমারী বসুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কবির চিন্তাভাবনা তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপট হিসেবে তাঁর শৈশবকালীন শিক্ষাটিকেও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে--

> "বাবা বলিতেন, "মিথ্যা কথা বলিও না, পরের জিনিষ চুরি করিও না, কখনও কুপথে যাইও না"-ইত্যাদি।আমি সকলের অপেক্ষা ছোট; সকল কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু কথাগুলি আমার খুব মনে থাকিত। "[১৩৩]

কথাগুলি যে কবির মানসিকতা গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের এই নৈতিক পারিবারিক শিক্ষার আবহেই মানকুমারী বসু বড় হয়ে উঠেছিলেন। শৈশবকাল থেকে কবিও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এই ভাবনাগুলিকেই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর নৈতিক শিক্ষার পাঠ কতটা সুদৃঢ় ছিল, তা কবির একটা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জানতে পারা যায়। একদিন ফুল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ছোট্ট মানকুমারী বসু দীর্ঘাকায় এক শিংওয়ালা গরুর সামনে পড়লে, তিনি ঘুরপথে বনের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। কবি এ ব্যাপারে জানিয়েছিলেন-

> " 'বাবা! আজ আমি কুপথে গিয়াছিলাম।' বাবা আমার চোখের জল মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন করিয়া কুপথে গিয়াছিলে মা?' আমি বলিতে লাগিলাম, 'আপনি ওদের কুপথে যাইতে মানা করিয়াছেন, আমিও কুপথে যাই না, আজ রাস্তার উপরে একটা গরু ছিল বলিয়া কুপথ দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।'"[১৩৪]

কন্যার এহেন ধারণায় পিতা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরী কী ভেবেছিলেন তা জানা যায় না। তবে কবি জানিয়েছিলেন-'সেই দিন হইতে আমাকে লেখাপড়া শিখাইতে মনোযোগ করিলেন।'[১৩৫] পরবর্তী জীবনে যাতে মেয়ের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হতে পারে, সেই

কারণে আনন্দমোহন বাবু কন্যাকে শুধু নীতিশিক্ষা নয়, লেখাপড়া শেখাতেও মনোযোগী হয়েছিলেন। আনন্দমোহন বাবু কবিকে ছোটো থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, মানুষের জীবনের দর্শন আসলে ছোটোবেলার শিক্ষাতেই তৈরি হয়। কবির কথাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

> 'অতি বাল্যকাল হইতে ভগবানকে আমি ভক্তি বিশ্বাস করিতাম। আমার পিতৃদেব সেই ভক্তি বিশ্বাসের বীজ বপন করেন এবং স্বামী ইহার বিকাশ সাধন করেন।'[১৩৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর এহেন সামাজিক ভাবনাচিন্তাই মানকুমারী বসুর জীবনবোধকে গঠন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নতুন করে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছিল এবং মানকুমারী বসুর আবির্ভাবকালীন প্রেক্ষাপট হিসেবে এই ঘটনাটিরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ তাঁর পরবর্তী সাহিত্য-জীবনে এর সমধিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

আসলে মানকুমারী বসুর আবির্ভাবকালীন সময়ের মূল্যবোধ তৎকালীন আপামোর বাঙালি জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। মানকুমারী বসুর জীবনভাবনা এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে বলা যায়। উনিশ শতক জুড়ে ব্রাহ্মসমাজের নীতি নির্ধারক মানুষজন নারী মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির ব্যাপারে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের সেই উদ্যোগে নতুন করে জোয়ার এনেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর আগমনে ব্রাহ্মসমাজ একাধিক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ, বর্ণভেদ বিলোপ, উপবীত ত্যাগ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীর সমানাধিকার, বাল্যবিবাহ বর্জন প্রভৃতি একাধিক সংস্কার করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর আগমনের পরেই প্রথম ব্রাহ্মসমাজে অব্রাহ্মণ কোনো ব্যক্তিকে আচার্যের পদ দেওয়া হয়েছিল।[১৩৭] এর ফলে নতুন করে সামাজিক আলোড়ন তৈরি হয়। সেই সময়কে অর্থাৎ ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের সময়কালকে শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের নব উত্থান বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৩৮] ব্রাহ্মসমাজের এই জাতীয় নব উত্থানের ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরদিকে তেমনি তার ফলে সমাজের বিশেষ পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অলোক রায়ের

একটি মন্তব্য আমরা উদ্ধার করতে পারি। তিনি বলেছেন '...এই সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজে প্রাচীন ও নবীন দলের ভেদ সৃষ্টি হল।'[১৩৯] এই সময়পর্বেই ব্রাহ্মসমাজের ভাঙন ধরে এবং দুটি পৃথক দলের সৃষ্টি হয়। আরো একটু পরে গিয়ে নতুন তৈরি হওয়া ব্রাহ্মসমাজ পুনরায় আর একটি পৃথক দলে বিভাজিত হয়। যদিও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে হিন্দুধর্মের একটা সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে অলোক রায় বলেছেন-'দেবেন্দ্রনাথ কখনও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি।'[১৪০] এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মসমাজের আমূল বদল ঘটিয়েছেন। যদিও নতুন ব্রাহ্মসমাজ নব্য সংস্কারের ফলে জনমানসে বিশেষ আলোড়ন তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তার ফলে সমকালীন সমাজে প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তার প্রসারও ঘটেছিল। কিন্তু এই ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে উনিশ শতকের শেষের দশকগুলিতে সমাজে একটা নেতিবাচক প্রভাবও পড়েছিল। কেশব সেনের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' এর বিবাহরীতি হিন্দুসমাজ বা আদি ব্রাহ্মসমাজ কেউই মেনে নিতে পারেননি। এর ফলেই সমাজে নতুন করে হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে অলোক রায় মন্তব্য করেছেন-'শিবনাথ শাস্ত্রীর মনে হয়েছে এই সময় থেকে 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান প্রয়াস' বাড়তে থাকে।'[১৪১] উনিশ শতকের শেষের দিকে এই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ফলে সমাজে নতুন করে প্রথাগত মূল্যবোধ ও ন্যায়-নীতি বোধের প্রসার ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সনাতন হিন্দু ভাবধারার আলোকে নতুন করে জেগে উঠতে শুরু করে। আর এই সকল ভাবনা বা মূল্যবোধ সমসাময়িক হিন্দু বাঙালির পারিবারিক শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে। আবার এই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ফলেই উনিশ শতকের শেষের দিকে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজে নারী শিক্ষার ব্যাপারে বাঙালির মনের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মানকুমারী বসুর ব্যক্তি জীবন, শিক্ষা, ন্যায়-নীতি বোধ সকল কিছুই উনিশ শতকের এই তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময়পর্বের একাধিক মহিলা লেখিকা এই সময়ের প্রভাবকে স্বীকার করেই সাহিত্য রচনা করছেন। সেই কারণে তাঁরা স্বশিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন চিন্তায় ও কর্মে সচেতন হলেও, তাঁদের মূল্যবোধ ও ন্যায়-নীতি চেতনার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা রক্ষণশীল হয়ে

উঠেছিলেন। এই সময়পর্বের শিক্ষিতা মহিলাগণ সামাজিক কর্মে অনুরাগী ছিলেন। এর একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক কারণ হল এই পর্বের মহিলা সাহিত্যিকদের অনেকেই ছিলেন বিধবা, তাই তৎকালীন নারী সমাজের মঙ্গল কামনায় তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। মানকুমারী বসুর ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। তাঁর ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য অনুসন্ধান করলে উনিশ শতকের এই প্রেক্ষাপটটির প্রভাব বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। বিবুধশঙ্কর বসু মারা যাবার পর কবি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যকে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করার সংকল্প করেছিলেন। তাঁর মতে-

> "আমি মনে করিলাম, সধবা মহিলাদিগের যেমন সংসারের কাজ করা কর্তব্য, বিধবা মহিলাদিগের সেইরূপ সমাজের কাজ করা কর্তব্য। ইহা যখন আমার 'সত্য' বলিয়া ধারণা হইল, তখন সেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।"[১৪২]

স্বামীর মৃত্যুর পর কবি সংসারে আবদ্ধ থেকে শান্তি পাচ্ছেন না, 'কেবল গুরুজনের সেবা, শিশুপালন অথবা সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না।'[১৪৩] স্বামীর বিচ্ছেদ ব্যথায় কবির মন পরিপূর্ণ। তাই তিনি ঈশ্বর সেবায় নিজের মনের দৃঢ়তাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। তাঁর অনুভব- 'ক্রমে মনে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিশ্ববিধাতার কাছে আত্মোৎসর্গ করা উচিত।'[১৪৪] এই ধর্মীয় ন্যায়-নীতিমূলক ভাবনা কবির জীবনের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে মানকুমারী বসুর মতো মহিলারা এই ভাবনাকে আত্মস্থ করেই বড় হয়ে উঠেছেন। সেই সময় প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত 'সখা' পত্রিকায় বিধবা মহিলা এবং বালক-বালিকাদের জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য লেখা প্রকাশ করা হতো; এই কারণে কবিও 'সখা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। শুধু 'সখা' নয়, একই ভাবনা নিয়ে তিনি 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত হন। এবিষয়ে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

> "আমার জাতীয় ভগিনীগণের জন্য কিছু কাজ করিতে আমার আকাঙক্ষা বড়ই প্রবল ছিল। সেইজন্য অনেক চেষ্টা করিয়া আমি 'বামাবোধিনী'তে লেখিকা-শ্রেণীভুক্তা হইলাম।"[১৪৫]

কবি ১৮৮৮ সালে 'বনবাসিনী' নামে একটি ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস লিখেছিলেন। এই লেখার পিছনে কবির মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বিধবা মহিলাদের অবশ্যকর্তব্য সম্বন্ধীয় সামাজিক নীতিশিক্ষা প্রদান করা। লেখিকার উক্তি থেকেই সেকথা জানা যায়-

> "... বিধবা রমণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি অনেক সময়ে চিন্তা করিতাম। আমার এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপন্যাসাকারে 'বনবাসিনী' লিখিয়াছিলাম।"[১৪৬]

তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। মানকুমারী বসু অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও সুশীল ছিলেন। গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সদুপদেশ সকল সময়ে তিনি নতশিরে গ্রহন করতেন। সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবি সর্বদা চিন্তা করতেন, তারই ফলস্বরূপ তাঁর একাধিক ভাবনা প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হয়েছে 'বামাবোধিনী'র পৃষ্ঠায়। নারীসমাজের উন্নতি নিয়ে তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ,[১৪৭] পল্লীগ্রামের স্ত্রী-চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা,[১৪৮] ধাত্রীর আবশ্যকতা,[১৪৯] প্রভৃতি বিষয়ে কবি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী জীবনের সবথেকে বড় সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বরপণ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি গর্জে উঠেছিলেন। উনিশ শতকের সেই সময়পর্বে সকল মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যেই এইরূপ সামাজিক দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়। 'বাল্য-বিবাহ এবং বরপক্ষের অর্থলুব্ধতা নিবারণ জন্যও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম।'[১৫০] হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে পুরানো সংস্কার এবং সমাজের কঠিন বাধাগুলি কিছুটা হলেও শিথিল হয়েছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সমাজে রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো বজায় ছিল, যার প্রভাব সেকালের সমাজের নারীদের উপরও পড়েছিল। তাই সেকালে বারবার সংরক্ষণশীল সমাজের প্রভাবে প্রান্তসীমানায় এসে ঠেকেছিল নারীর জীবন। মানকুমারী বসু সেই নারীসমাজেরই প্রতিনিধি। তাই তাঁর বেশিরভাগ প্রবন্ধের বিষয় সধবা বা বিধবা মহিলার আচরণীয় ও পালনীয় ধর্ম ও কর্তব্য। প্রগতিবাদী কোনো আধুনিক ভাবনা আমরা মানকুমারী বসুর কাছ থেকে যেমন

পাইনি, তেমনি একথাও সত্য যে তিনি সেই ভাবনাকে সমর্থনও করতেন না। কারণ, তাঁর পারিবারিক শৈশবকালীন শিক্ষা এর থেকে বেশি তাঁকে উদার হতে অনুমতি দেয় না। এমনি সমাজ-পরিবেশ, বিশ্বাস এবং পরিস্থিতিতে মানকুমারী বসু আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেই সামাজিক ভাবনাগুলিকে আত্মস্থ করেই তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ।

আলোচ্য সময়পর্বে মহিলা লেখিকাদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক সহনশীলতা লক্ষ করা যায়। এর পিছনে আসলে ছিল উনিশ শতকের পারিবারিক শিক্ষা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উনিশ শতক জুড়ে একাধিক মানবহিতৈষি ব্যক্তির আর্বিভাব ঘটেছিল। বাংলা সমাজ, সাহিত্যে তাঁদের অবদানও ছিল যথেষ্ট। মানকুমারী বসু সেইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্মরণ করে সম্মান জানিয়েছেন। এই পর্বের লেখিকাদের এটা একটা বিশেষ গুণ বলা যায়। মানকুমারী বসুর মধ্যেও এই ভাবধারা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে-'যাঁহারা দেশ-হিতৈষী, নারী-হিতৈষী এবং সমাজ-শিক্ষক তাঁহাদিগকে আমি মনে মনে গভীর ভক্তি করিতাম। বরিশালের শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের 'ভক্তিযোগ' পড়িয়া অবধি প্রত্যহ প্রত্যূষে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতাম।'[১৫১] বিশিষ্ট জনের প্রতি লেখিকার এই সম্মান প্রদর্শন সমাজের সহনশীলতার পরিচয় বহন করে। তার ফলে সমাজের বন্ধন দৃঢ় হয়। ১২৯৮ সালে ১৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত হয়ে মানকুমারী বসু 'শোকোচ্ছ্বাস' নামে একটি গদ্য রচনা করেছিলেন।[১৫২] 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' প্রকাশিত হওয়ার পর কবি দেওঘরে গিয়ে রাজনারায়ন বসু মহাশয়কে প্রণাম করে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন।[১৫৩] একইভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়ে তাঁর জীবন ধন্য হয়েছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন।[১৫৪] শুধু গুণী পুরুষের প্রতি নয়, গুণী মহিলাদের প্রতিও কবি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'যাঁহারা আমাদের বর্তমান মহিলা-কূলের গৌরব, সেইসকল বঙ্গবাসিনী দেবীদিগকে আমি চিরদিনই ভক্তিশ্রদ্ধাসহ পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।'[১৫৫] এই সকল ঘটনা থেকে মানকুমারী বসুর চরিত্র সম্পর্কে আমাদের একটা বিশেষ ধারণা তৈরি হয়। বিশিষ্টজনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ফলে সমাজে পারস্পরিক আদান-প্রদানের

বাতাবরণ তৈরি হয়, ব্যক্তির সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পায়। এই মূল্যবোধকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের একটি বিশেষ প্রবণতা বলা যায়। বিশিষ্টজনরা চিরকাল পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করে এসেছেন এবং মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে ও জীবনে চলার পথে সঠিক পথ অনুসরণে তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেন। মানকুমারী বসু এই শিক্ষা পেয়েই বড় হয়েছেন। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিতে এই কথার সত্যতা স্পষ্ট হয়।

> "এই বঙ্গদেশে যাঁহারা সমাজ-শিক্ষক রূপে পরিগণিত- যাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, নীতিবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সুকবি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে মনুষ্যত্ব লাভে সহায়তা করিয়াছেন (ব্যক্তিগত ভাবে না হইলেও শক্তিগত ভাবে)।"[১৫৬]

সত্যতা জানিয়ে কবি ঋণ শোধ করেছেন। সেইসব ব্যক্তিবর্গের কর্ম কবির নৈতিক জীবন গঠনে সহায়ক হয়েছে। পারস্পরিক সম্মান, শ্রদ্ধা অর্পণ করে মানকুমারী বসু আমাদের কাছেও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। এই পথেই বাঙালির যথার্থ অগ্রগতি হতে পারে কিনা সেটি অবশ্য বিচার্যের বিষয়।

উনিশ শতকের সমাজে বহু কিছু ঘটলেও এবং সমাজে একাধিক দ্বন্দ্ব তৈরি হলেও তার প্রভাব এই সময়পর্বের মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষত মানকুমারী বসুর জীবনে পড়েনি। পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্য শিক্ষা, সংস্কৃতি বা বোধটুকুই তাঁদের, বিশেষকরে মানকুমারী বসুর আবির্ভাবের মূল পটভূমি বলা যায়। সেই পটভূমিতে রয়েছে হিন্দু বাঙালির রক্ষণশীল সমাজ, যে সমাজ উপনিবেশীয় ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে মানবিক হয়ে উঠেছে। সেই সমাজের শিক্ষা, ভাবনা, সংস্কৃতি ও মুল্যবোধের পাঠ এবং তার মধ্য দিয়েই আত্মউন্মোচন— এটিই হল এই সময়ের মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাবের মূল পটভূমি। এই প্রেক্ষাপটেই তাঁদের আত্মপ্রকাশ। মানকুমারী বসুর ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য

১. ঊনবিংশ শতাব্দীর মানকুমারী ব্যতীত তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য মহিলা কবিদের মধ্যে রয়েছেন 'প্রসন্নময়ী দেবী'(১৮৫৭-১৯৩৯), 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী'(১৮৫৮-১৯২৪), 'কামিনী রায়'(১৮৬৪-১৯৩৩) প্রমুখ মহিলাকবি। দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, এবং সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস',তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০০।

২. দ্রষ্টব্য: গৌতম সান্যাল, 'মানকুমারী: অতীতের হিমঘর থেকে', 'তথ্যসুত্র' পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃ. ১২।

৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আমার অতীত জীবন', 'উত্তরা' পত্রিকা ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৩৩, পৃ. ১১৮।

৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১৮ ।

৫. দ্রষ্টব্য: গৌতম সান্যাল, 'মানকুমারী: অতীতের হিমঘর থেকে', 'তথ্যসুত্র' পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃ. ১২।

৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২।

৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২।

৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২।

৯. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩,কলকাতা, পৃ. ৯৮।

১০. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থের 'মানকুমারী বসু' প্রবন্ধ, অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩ কলকাতা, আরো জানতে দ্র: সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.) 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পরিশিষ্টে উল্লিখিত মানকুমারী বসু রচিত 'আমার অতীত জীবন অংশটি।'

১১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আমার অতীত জীবন', 'উত্তরা' পত্রিকা ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৩৩, পৃ. ১২২।

১২. দ্রষ্টব্য: আট বৎসর বয়সে কবির শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা আছে। দ্র: মানকুমারী বসু, 'আমার অতীত জীবন', 'উত্তরা' পত্রিকা ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৩৩, পৃ. ১২০।

১৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'সাতক্ষীরায়', তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি সংরক্ষিত, একাদশ সংস্করণ, পৃ.-২৫২।

১৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ.-২৫২।

১৫. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ১০৭।

১৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ.-১০৭।

১৭. মানকুমারী বসু, 'আমার অতীত জীবন', 'উত্তরা' পত্রিকা ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৩৩, পৃ. ১১৮।

১৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১৮।

১৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১৯।

২০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২০।

২১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১২১।

২২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২২।

২৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২১।

২৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১২২।

২৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১২২।

২৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১২২।

২৭. দ্রষ্টব্য: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ সমাস', কারিগর, এপ্রিল ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৯৬-৯৭।

২৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আমার অতীত জীবন', 'উত্তরা' পত্রিকা ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৩৩, পৃ. ১২৩।

২৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১২৩।

৩০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১২৩।

৩১. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু',অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং ,আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ১০৪।

৩২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১২৪।

৩৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১২৪।

৩৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১২৪।

৩৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

৩৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

৩৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

৩৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

৩৯. দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হালদার গোষ্ঠী', 'রবীন্দ্র রচনাবলী',দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১৭, পৃ. ।

৪০. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১০৭।

৪১. দ্রষ্টব্য: অন্তরা চৌধুরী, 'আমার অতীত জীবন-এক অন্তঃপুরিকা কবির জীবন ইতিহাস', 'তথ্যসুত্র' পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃ. ২৭।

৪২. দ্রষ্টব্য: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ সমাস', কারিগর, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ১০১।

৪৩. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৯৯।

৪৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৯।

৪৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৯।

৪৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০০।

৪৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০০।

৪৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০০।

৪৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০১।

৫০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৪।

৫১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

৫২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

৫৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৫৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮।

৫৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

৫৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

৫৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

৫৮. সূর্যমুখী বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র এবং ভ্রমর তৎব্যক্তির 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নায়িকা চরিত্র। সুশীলা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান'-শীর্ষক গাথার প্রধান চরিত্র।

৫৯. সুশীলা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান'-শীর্ষক গাথার প্রধান চরিত্র।

৬০. বিনোদিনী, কুমু ও বিমলা যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি', 'যোগাযোগ' ও 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসের ব্যক্তিবোধে উদ্বুদ্ধ তিনটি চরিত্র।

৬১. দ্রষ্টব্য: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ সমাস', কারিগর, এপ্রিল ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৯২।

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ল্যাবরেটরি' গল্পের মহিলা চরিত্র।

৬৩. দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঠাকুরমার ঝুলি প্রসঙ্গে', দক্ষিণারঞ্জন সাহিত্য সমগ্র, ১ম খন্ড, পৃ. ৫।

৬৪. দ্রষ্টব্য: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ সমাস',এপ্রিল ২০১৫ কলকাতা, পৃ. ৯৬।

৬৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৭।

৬৬. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১০৬।

৬৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৬৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৬৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৭০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০০।

৭১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০০।

৭২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০০।

৭৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০১।

৭৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০১।

৭৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০১।

৭৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০১।

৭৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০২।

৭৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০২।

৭৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০২।

৮০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

৮১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৮২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৮৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৮৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৮৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮।

৮৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৭।

৮৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৭।

৮৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮।

৮৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

৯০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

৯১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

৯২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

৯৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

৯৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

৯৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

৯৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

৯৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

৯৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

৯৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

১০০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

১০১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

১০২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১১।

১০৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১১ ।

১০৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১১।

১০৫. ১৩০০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয়।

১০৬. দ্রষ্টব্য: 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭০ সালে ভাদ্র মাসে।

১০৭. ১৩০১-০২ সালে একাধিক সংখ্যা জুড়ে প্রবন্ধটি বের হয়।

১০৮. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১১০।

১০৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

১১০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

১১১. এর পরে পরেই কবি লিখেছেন 'শোকাতুরা মা' ও 'বিসর্জন' এই দুটি কবিতা প্রথমে 'বামাবধিনী'তে ১২৯৮ সংখ্যায় শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে এগুলি গ্রন্থাকারে 'স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস' নামে প্রকাশিত হয়।

১১২. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১১২।

১১৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২।

১১৪. দ্রষ্টব্য: ১৩০৩ সাল থেকে হেমেন্দ্রমোহন বসু নিজের দ্রব্যের বিজ্ঞাপন স্বরূপ 'কুন্তলীন' পুরস্কার চালু করেন। দ্র: সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', পঞ্চম খন্ড, মাঘ ১৪১৮, কলকাতা, পৃ. ৪৬।

১১৫. দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৩১৬ বঙ্গাব্দের 'বামাবোধিনী' পত্রিকার পত্রিকার সূচিপত্রের জন্য পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ১ দ্রষ্টব্য ।

১১৬. দ্রষ্টব্য: বারিদবরণ ঘোষ(সম্পা.), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, ২০০১ কলকাতা। 'ব্যর্থতা', 'ভরত', 'আর কেন?', 'কোসনে কথা', 'দীনের পূজা', 'আবাহন', 'আনন্দ', 'পূজার সাধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১১৭. দৃষ্টান্তস্বরূপ 'প্রিয়প্রসঙ্গ' গ্রন্থের প্রচ্ছদের জন্য পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ২ দ্রষ্টব্য।

১১৮. দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যের প্রচ্ছদের জন্য পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ৩ দ্রষ্টব্য।

১১৯. দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের প্রচ্ছদের জন্য পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ৪ দ্রষ্টব্য।

১২০. দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের উৎসর্গ পত্রের জন্য পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ৫ দ্রষ্টব্য।

১২১. দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৫ম খন্ড, ১৩৬৯, পৃ. ২০-২৩।

১২২. দ্রষ্টব্য: রমেন চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক' প্রথম খন্ড, বি. সেন. য়্যাণ্ড কোং, ১৩৬১, পৃ. ৪৬।

১২৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৬।

১২৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৬।

১২৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৬।

১২৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের জন্য পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ৬ ও ৭ দ্রষ্টব্য।

১২৭. দ্রষ্টব্য: রমেন চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক' প্রথম খন্ড, বি. সেন. য়্যাণ্ড কোং, ১৩৬১ পৃ. ৪৬।

১২৮. কবিতা দুটি যথাক্রমে 'নব্যভারত' পত্রিকায় ১৩২৫ এ আশ্বিন সংখ্যায় ও 'শিশুসাথী' পত্রিকায় ১৩৫০এ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১২৯. দ্রষ্টব্য: PAUL STEWART HACKMAN, 'THE MEDIA ASSEMBLAGE: THE TWENTIETH-CENTURY NOVEL IN DIALOGUE WITH FILM, TELEVISION, AND NEW MEDIA', Ph.D Thesis, University of Illinois,2010, pp 1

১৩০. দ্রষ্টব্য: গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং ২০১৪, পৃ. ১৯।

১৩১. রোহিণী বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অন্যতম মহিলা চরিত্র।

১৩২. বিনোদীনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাসের অন্যতম মহিলা চরিত্র।

১৩৩. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৯৯।

১৩৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৯।

১৩৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৯।

১৩৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৯।

১৩৭. দ্রষ্টব্য: অলোক রায়, 'উনিশ শতকে নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান', 'ব্রাহ্মসমাজ ও সংস্কার আন্দোলন', অক্ষর, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৬৯।

১৩৮. অলোক রায় এহেন মন্তব্য করেছেন। দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৬৯, আরো জানতে দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদ 'ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান— ১৮৬০-১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি.,২০১৬।

১৩৯. দ্রষ্টব্য: অলোক রায়, 'উনিশ শতকে নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান', 'ব্রাহ্মসমাজ ও সংস্কার আন্দোলন', অক্ষর, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৭০।

১৪০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৭০।

১৪১. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৭২। আরো জানতে দ্রষ্টব্য: বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৬। উক্ত পরিচ্ছেদে এর সময়কাল আছে ১৮৭০-১৮৭৯ সাল পর্যন্ত।

১৪২. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১০৮।

১৪৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮।

১৪৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮।

১৪৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

১৪৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

১৪৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

১৪৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

১৪৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

১৫০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

১৫১. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১১১।

১৫২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২।

১৫৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২।

১৫৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২।

১৫৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২।

১৫৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২।

-----o-----

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবি মানকুমারী বসুর কাব্য প্রতিভার স্বরূপ সন্ধান

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবি মানকুমারী বসুর কাব্য প্রতিভার স্বরূপ সন্ধান

প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটোগল্প প্রভৃতি একাধিক সাহিত্য প্রকরণে বিচরণ করলেও মানকুমারী বসুর পরিচিতি মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন কবি হিসেবেই। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। বাল্যকালে মানকুমারী বসু তাঁর ভগিনীকে দিয়ে একখানি খাতা তৈরি করিয়েছিলেন এবং সেটাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম নিদর্শন। কবির জীবনকথা থেকে সেকথা জানা যায়-

> "অত নির্জনে বসিয়া সেই খাতা এবং দোয়াত কলম লইয়া তাহার নামকরণ করিলাম 'লাইবাইটের উপাখ্যান'।.....যেন যে সব উপকথা শুনিতাম, তাহারই এক 'সংস্করণ' করিয়াছিলাম। যাহা হউক, সেই লাইবাইটই আমার প্রথম রচনা।"[১]

এই খাতার কোনো খোঁজ না পাওয়া গেলেও এটি খুব সম্ভব গদ্য রচনা।[২] একই সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই কবির পদ্য রচনারও সন্ধান পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে কবি জানিয়েছেন- 'একদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া দেখিলাম বাবার হাতে আমার পদ্যের খাতা।'[৩] সেই খাতায় কবির রচিত দুটি ছত্র-

"রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার,

ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।"[৪]

এটাই বোধহয় কবির রচিত প্রথম পদ্য। এরকম কাঁচা হাতের আরও পদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন।[৫] কবিতাটি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়[৬] এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়। কবি জানিয়েছেন এটাই কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা।[৭]এর কিছুদিনের মধ্যেই কবির লেখা 'প্রিয়প্রসঙ্গ' বের হয়।[৮] মানকুমারী বসুর রচিত কবিতাগুলি একাধিক পত্রিকায় যেমন-'বামাবোধিনী', 'নব্যভারত', 'সখা',

'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল কবিতাগুলি নিয়ে কবিরত্ন মহাশয় 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেছেন।[৯] কাব্যটি প্রকাশিত হলে অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তি এর প্রশংসা করেন।[১০] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন-

> "কাব্যকুসুমাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা পড়িলাম।কয়টীই বড় সুমধুর।এখানকার বাঙ্গালা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে।ইংরেজি যে না জানে, সে বোধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারে না।এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই।.....কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও সুপাঠ্য।"[১১]

বঙ্কিম বাবু ছাড়াও আরও অনেকে তাঁর উক্ত কাব্যগ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। এরপর কবির লেখা আরও কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি, এছাড়াও তাঁর লেখা কাব্যগুলির মধ্যে 'বিভূতি', 'সোনারসাথী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-কবিতার মূল বিষয়গুলি হল স্বদেশ বা জাতীয়তাবাদীমূলক, সামাজিক, ধর্মীয় বা পৌরাণিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি। মানকুমারী বসুর কবিতা এই বিষয়ের আধারে রচিত হলেও এর বাইরে আরও বিভিন্ন ভাবনা তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্য এনেছে। প্রচলিত কিছু বিষয়কে বাদ দিয়ে তাঁর কবিতায় সেই বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান আমাদের মূল লক্ষ্য। কবি সাধারণত গীতিকবিতাই রচনা করেছেন, তবে তা সবসময় মনের নিবিড় অনুভূতি থেকে রচিত হয়েছে এমনটা নয়। বেশিরভাগ কবিতায় আবার একটা বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর গীতিকবিতায় একাধিক ভাবনার যেমন প্রকাশ ঘটেছে, আবার অপরদিকে একাধিক বিষয় বৈচিত্র তাঁর বিষয়ভিত্তিক কবিতাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আমরা একাধিক উপঅধ্যায় বিভাজনের মাধ্যমে তাঁর কবিত্ব প্রতিভার বিশ্লেষণ করেছি।

১) লিরিকধর্মী কবিতার বিশ্লেষণ

বঙ্কিম বাবু তাঁর 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বলেছেন, 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্রই যাহার উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য।'[১২] কবি মানকুমারী বসুর কবিতায় এই ভাবের

পরিস্ফুটন অবশ্যই রয়েছে।যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মানকুমারী বসু সম্পর্কে বলেছেন- "মানকুমারী সাধারণত গীতি-কবিতাই রচনা করিতেন।গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্য দিয়াই কবি ও তাঁহার কাব্যকে বুঝিতে পারি।"[১৩]

মানকুমারী বসুর গীতিকবিতাগুলি আবার ভাবের বৈচিত্রে বিচিত্রধর্মী। আমরা সেইসব ভাবগুলিকে আবার একাধিক নামে বিভাজন করে আলোচনা করেছি।

ক) ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কবিতা

বাল্যকাল থেকেই মানকুমারী বসু ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁর পিতার কাছ থেকে তিনি পুরাণ বা হিন্দুধর্মীয় মূল্যবোধের পাঠ পেয়েছেন। খুব স্বভাবতই কবির মানসিকতা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনাগুলিও কবির জীবনভাবনায় বা জীবনদর্শনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তারই ফলস্বরূপ কবির কবিতাতেও ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভাবের প্রভাব পড়েছে। 'ঈশ্বর' কবিতাটির মধ্যে সেই প্রভাব অনুভব করা যায়। আলোচ্য কবিতায় কবি মনে করেছেন সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে শুধু ঈশ্বরের করুণা। তাঁরই আদেশে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি চলমান। জগতের বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ডের মধ্য দিয়ে শুধু পরম ঈশ্বরের মহিমাই যেন প্রকাশিত হয়-

"আঁধার গগনে যবে
কোটি তারা দেখা দেয়,
তোমার মহিমা যেন
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।"[১৪]

প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ভগবানেরই বিচিত্র কৌশল, প্রকৃতি ও জীবনের স্থিতবস্থা তাঁরই স্নেহের বহিঃপ্রকাশ। তিনি পরম স্নেহময়, কোন কিছুর বিনিময়ে ছাড়াই ঈশ্বর আমাদের নীরবে ভালোবাসেন-

"নাহি চাও প্রতিদান
নাহি রাখ কোন আশা
নীরবে বাসিছ ভালো
ধন্য বটে ভালোবাসা!"[১৫]

তাই নতুন করে তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার নেই বলে কবি মনে করেছেন। শুধু ঈশ্বরকেই তিনি নিজের করে পেতে চেয়েছেন। জীবনের সকল সময় শুধু পরম স্নেহময় ঈশ্বরের সেবা করতে চান

"যতটুকু, যত বিন্দু,
যা হয় এ ক্ষমতায়,
সাধিয়া তোমারি কাজ,
যেন এ জীবন যায়।"[১৬]

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, ' 'ঈশ্বর' কবিতাটির মধ্যে কোন অন্তর্দৃষ্টি বিংবা বিরাটের আভাস অনুভূত না হইলেও প্রকৃতির মাধুর্য অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।'[১৭] কবি বলেছেন-

"ভূধর, সাগর, মেঘ,
বসন্ত, বরিষা-ধারা,
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তা'রা।"[১৮]

কবিতাগুলিতে প্রকৃতির রূপও অসাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। শিব হিন্দুধর্মের ঐশ্বর্যবান দেবতা, হিন্দুনারী শৈশব থেকেই তাঁর আরাধনা করেন। শিবের ষড়ৈশ্বর্য, ভুবনমোহন রূপ ও অন্যান্য গুণ প্রত্যেক হিন্দুনারী তাঁদের পতির মধ্যে দেখতে চান। তাই প্রত্যেক নারীর হৃদয়েই সৌন্দর্যের অধিকারী হয়ে তিনি অবস্থান করেছেন। আলোচ্য কবিতায় কবি মানকুমারী বসু এমনটাই বলতে চেয়েছেন। বিভিন্ন রূপে ও ভাবে কবি শিবকে কল্পনা করেছেন।

"খুঁজিয়া ব্রহ্মান্ডময় দেখেছি সকল,
দেখেছি সে শচীপতি,
কনক অমরাবতী,
দেখেছি নন্দন বনে অমরের দল;
.....

"দেখেছি তেত্রিশ কোটি,
দেখেছি গন্ধর্ব্ব নাগ- স্বর্গ রসাতল;
এমন আপন-ভোলা,
এমন প্রাণ-খোলা,
এমন রজতগিরি-শ্বেত শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল।"[১৯]

কবি কখনো সুধা বলে কালকূট খেতে কাউকে দেখেননি। মহান শিব ভূত-পিশাচদেরকে প্রীতি-মমতায় পালন করেন। বিষধর ভুজঙ্গকে পরম স্নেহে হৃদয়ে ধারণ করেন। যশ, বৈভব থাকা সত্ত্বেও শিব ম্লান জীবন-যাপন করেন। তাই শিব কবির অত্যন্ত প্রিয়।

"সদানন্দ ভোলানাথ আমি ভালবাসি,
অনাসক্ত অনুরাগী,
সংসার সংসারত্যাগী,
শ্মশানে সুখের বাস, নিত্য স্বর্গবাসী"[২০]

শিবের সমস্ত আচরণই কবির কাছে নান্দনিক হয়ে উঠেছে। তাই কবি মনে করেন পুরো স্বর্গ জুড়ে এমন দেবতার কোন বিকল্প নেই। কবি তাই বলেছেন-'প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় আমি ভালবাসি।'[২১]-এই বক্তব্যের পিছনে রয়েছে কবির আন্তরিক ভাবনা ও নিবিড় অনুভূতি। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন- 'এই কবিতার মধ্যে ভক্তি আছে বিশ্বাস আছে, সাধারণ হিন্দু-হৃদয়ের পরিচয় আছে এই মাত্র।'[২২] 'ভাঙিও না ভুল' কবিতার মধ্যেও কবির একই ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যতদিন বেঁচে থাকবেন ঈশ্বরকেই নিজের বলে জেনে তাঁর চরণতলে আশ্রয় নেবেন কারণ-

"তুমি ব্রহ্মান্ডের পিতা,
তুমি মোর রচয়িতা,
কি কাজ খুঁজিয়া মম সৃষ্টিতত্ত্ব-মূল।"[২৩]

কবি ঈশ্বরকেই পরম বলে মেনেছেন, তাই কোনোভাবেই তিনি যেন কবির এই ভুল না ভেঙে দেন। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে তাঁরই সৌন্দর্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর জীবনে

ধর্মীয় ও নৈতিক ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে। মানকুমারী বসুরও ভাবনা, চেতনা জুড়ে বিরাজ করেছে সর্বময় ঈশ্বর। কবি মনে করেন, ঈশ্বর এ জগতের নিয়ন্তা শক্তি। তাই কবির আর্জি-

"প্রভো! ভাঙিও না ভুল,
তোমারি স্নেহের শ্বাসে,
চাঁদ হাসে রবি হাসে,
তোমারি সোহাগ-মাখা কুসুম-মুকুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল!"[২৪]

জীবনে পিতা-মাতা-ভাই-বোন, দম্পতির সম্পর্ক সকলই ভগবানের দান। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, 'কবি তাঁহার সরল বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়াই জীবন কাটাইতে চান, কোনরূপ তর্ক-মীমাংসা চান না।'[২৫] কবির কিছু কবিতার উদ্ধৃতি থেকে এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়-

"তবু এ নিখিল বিশ্ব,
তুমি গুরু আমি শিষ্য,
আমারে শিখায়ে দিও কর্ত্তব্যের মূল।"[২৬]

আবার,

"ভয় কি শোক-রোগে
ভয় কি অশান্তি-ভোগে,
আমার "আমিত্ব" যাহে তুমি তারই মূল।"[২৭]

কবি অকপটে সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরকে মেনে নিয়েছেন । মানকুমারী বসুর কবিতায় এই আধ্যাত্মিক ভাবনা কাল উত্তর পাঠকের কাছে অতিরিক্ত মনে হতে পারে। যদিও মানকুমারী বসুর আবির্ভাবকালীন পটভূমি বুঝতে কবিতাগুলির গুরুত্ব সমধিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে একজন নারীর ভাবনা ধর্মীয় অনুভূতির বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু মানকুমারী বসুর ধর্মীয় অনুভূতি উচ্চ পর্যায়ের। কবি বলেছেন-

"বুঝিনে বেদান্ত, তন্ত্র,
জানিনে তপস্যা, মন্ত্র,

আমি তব, তুমি মম-এই জানি স্থূল।”[২৮]

অথবা

“আমি কে? তা বুঝি এই,
তুমি ছাড়া আমি নেই,
আমি তব অণুকণা তব পদধূল।”[২৯]

কবিতাগুলির মধ্যে গভীর ভাব না থাকলেও, এর মধ্য দিয়ে কবির আধ্যাত্মিক ভাবনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। ‘তুমি তো আমার’ কবিতায় কবি সেই ঈশ্বরের আরাধনা করেছেন। এই পর্যায়ের সকল কবিতা ভাবের দিক থেকে একে অপরের পরিপূরক যেন।

“তুমিই সকল হরি! তোমারি সকল,
কে আমি যে নিত্য মাগি ভবের কুশল?”[৩০]

জগত জুড়ে ঈশ্বর বিরাজ করেন এবং তিনিই সকল কিছুর মালিক বলে কবি মনে করেছেন। মানবের সকল আকাঙ্ক্ষা বৃথা, মানব নিমিত্তমাত্র। কবি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন এ সংসারে কোন তত্ত্ব না বুঝে সকলে ‘আমি’তে মত্ত হয়ে আছে। কিন্তু এ জগৎ সংসারে সকলের দিন ফুরাবে, তাই আমার আমার করা মিথ্যা।

“তোমার এ ঘরে বিভো! “আমি” কি আবার?
“আমার””আমার” করি, কি আছে আমার?
সকলি এখানে র’বে,
আমারেই যেতে হবে,
আমারি ফুরাবে দিন ফুরাবে সংসার!”[৩১]

এই দর্শন চিরসত্য। কবির সরল স্বীকারোক্তি আমাদের মুগ্ধ করেছে। জীবনের সত্যতাকে কবি ধরতে চেয়েছেন আলোচ্য কবিতায়। কবি আক্ষেপ করে বলেছেন তাঁর চলে যাওয়াটা তো সত্য, তাই তাঁর জীবনদর্শন, ‘এসেছি যখন আমি খেটে খুটে যাই।’[৩২] হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি ক্ষণিকের তরে। কবি আরো বলেছেন-

“তোমার এ বিশ্ব দেছ করি মোর ঘর,
যে ক’দিন থাকি, কেন রব “পর পর”?”[৩৩]

কবির এই ভাবনার গুণে কবিতাটি নান্দনিক হয়ে উঠেছে। আপমর জগতবাসীর মধ্যে এই চেতনার জাগরণ ঘটলে বর্তমান পৃথিবী সংকট থেকে মুক্তি পাবে। কবির কোনো কিছু অপ্রাপ্তি নেই, তাই ঈশ্বরকে স্মরণ করে বলেছেন-

"কি না দেছ তুমি মোরে করুণাসাগর!
না পেয়েছি কি বা তব জগত-ভিতর?"[৩৪]

পিতার থেকে মানকুমারী বসু নীতি, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় জ্ঞান পেয়েছেন, তাই কবির মধ্যে ধর্মের বা ঈশ্বরের প্রতি একটা বিশ্বাস বা ভক্তি খুব স্বভাবতই গড়ে উঠেছে। আর এই ভাবনার উপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে কবির জীবনদর্শন। জগতে সবকিছু তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটে এবং তিনি সকল সময় মঙ্গলময়। তাই কবি বারবার তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁর গীত গেয়েছেন, বিভিন্ন ভাবে বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁকে ধরতে চেয়েছেন। কখনো তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম করে দিতে চেয়েছেন, আবার কখনো বা ভগবানের চরণে নিজের অস্তিত্বকেই বিলীন করে দিতে চেয়েছেন। 'নরবলি' কবিতায় কবির মনের চাওয়া-পাওয়া কতকটা এইরকমই-

"আজি এই ছোট-খাট প্রাণ
মা'র পা'ইয়ে দিব বলিদান!"[৩৫]
অথবা

"বড়সাধ হয়েছে এ চিতে
ক্ষুদ্র প্রাণ বলিদান দিতে!"[৩৬]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কবির আধ্যাত্মিক দর্শন গভীর হয়েছে বলা যায়। কবির প্রথম দিকের কবিতাগুলির মধ্যে শুধু ভগবানের বন্দনা পাওয়া যায়, কিন্তু আস্তে আস্তে কবির ঈশ্বর বিশ্বাস ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে একটা দর্শনের আকার নিয়েছে -

"ছোট-খাট এক ফোঁটা প্রাণ
মা'র পা'য়ে দিব বলিদান,
মরিয়া অমর হয়,

দিগন্তে অনন্তে রয়,
চির-অমরতা লভে মায়ের সন্তান!”[৩৭]

অস্তিত্বের বিনিময়ে কবি অমরত্ব লাভ করতে চেয়েছেন। এই কবিতায় কবির পরিণত জীবনের বিশ্বাস বা ভাবনার ছায়াপাত ঘটেছে। ‘আবাহন’ কবিতায় কবির ঈশ্বরদর্শন একটু ভিন্নরকমের। কবিতার শুরুতেই কবি প্রশ্ন তুলেছেন সারা বিশ্ব কেন তাঁকে ডাকে? এরই বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সারা কবিতা জুড়ে। ঈশ্বর সর্বময় এবং সকল কর্মের হেতু। কবি এখানে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি, শুধু পরম করুণাময় ঈশ্বরের অবস্থান বর্ণনা করে গেছেন। ‘ধাঁধা’ কবিতায় আবার কবি একটা ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন-

“তাই ভেবে দিবা নিশা
দিশা-হারা হই,
ও নাম স্মরিলে কেন
আমি আমি নই?”[৩৮]

কবি বলেছেন তিনি নিজেও জানেন না, কেন তিনি বিশ্বময় অনন্ত জুড়ে ঈশ্বরকে খুঁজে চলেছেন। কবির নিজের মধ্যেও অস্পষ্টতা রয়েছে, কবি কোনো ভাবনা দিয়েই তাঁকে ধরতে পারছেন না। কি জন্য হচ্ছে, কি ভাবে হচ্ছে, কেন কবি খুজঁচ্ছেন- সবই ধাঁধা যেন। তাই কবি বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেছেন-

“আমি কেন শব-সম
তুমি কেন সব?”[৩৯]

ঈশ্বর-মানব সম্পর্কে মানুষের অবস্থান কি? এখে কবি মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু তবু বলতে হয় মানব চিরদিন দেবতার কৃপাধন্য, এ জগতে মানব অতি ক্ষুদ্র। ‘ভিক্ষা’ কবিতায় কবির মনের অনুভূতি এই বক্তব্যেরই অনগামী বলা যায়। কবি বলেছেন-

“তোমার এ নাট্যশালা-মাঝে
আমি এক খেলার পুতুল,

তোমার এ নন্দন-বাগানে
আমি অতি ক্ষুদ্র যুঁই ফুল!”[৪০]

কবির সমস্ত শক্তি তাঁর থেকেই পাওয়া, তিনি সবই দিয়েছেন কবিকে, একথা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাও কেন কবি নিজের জালেই বাঁধা থাকেন, এ সংসারের মায়া কাটাতে পারেন না।পরম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছুই করতে পারেন না।

“অভাগার যাহা কিছু আছে,
দীননাথ! সকলি তোমার।
কেন তবে ঊর্ণনাভ সম
আপনার জালে বাঁধা রই?”[৪১]

কবি ভক্তিস্রোতে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছেন। কবির যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে, দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে তিনি সর্বময় ঈশ্বরের ধ্যান করে যাবেন। ‘বিদায় সঙ্গীত’ কবিতায় তাই কবি বলেছেন-

“যতক্ষণ রবে প্রাণ
যতক্ষণ রবে জ্ঞান,
সেই মন্ত্র- ইষ্ট মন্ত্র
মরমে করিব ধ্যান।”[৪২]

কবি বিদায় নিতে চেয়েছেন, কিন্তু স্বর্গ প্রাপ্তি চাননি। কারণ কবি নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করেছেন তাই তাঁর ঈশ্বর প্রাপ্তি তার সইবে না। সেকারণেই তিনি নিরালায় চলে যেতে চেয়েছেন। কবি আবেদন জানিয়েছেন তাঁর অশ্রুটুকু যেন ভগবান কেড়ে না নেন, তাহলে কবির আর কিছু থাকবে না। কবি এই জগত সংসারে একা, শুধু আঁখি জলটুকুই সম্বল। তাই আক্ষেপ করে বলেছেন-

“যাহা কিছু দিয়েছ মা!
ফিরাইয়ে লহ তাই,
নিও না এ আঁখি-জল
এই নিয়ে মরে যাই!”[৪৩]

কখনো কবি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন এ জগতে তিনি ক্ষুদ্র, অধম, একা। কখনোবা নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করতে চেয়েছেন, কখনো মনে করেছেন এ জগতে ঈশ্বর সর্বময়। আবার কখনো তাঁর মনে হয়েছে তিনি এ সংসারে আছেন ঈশ্বর আছেন বলেই। সর্বময় ঈশ্বরের সঙ্গে কবি নিজেকে একাত্ম করে তুলেছেন, ভক্তি বা বিশ্বাসের প্রবলতা কবির হৃদয়ে এই অনুভূতি জন্ম দিয়েছে।

"কেন আছি? আছি,মোর তুমি আছো ব'লে,
"যতই "আত্মীয়" বেশে
সংসারে দাঁড়াই এসে,
গর্ব্বিত সংসার তত পা'য় যায় দ'লে;
সে ব্যাথায় কি যাতনা!
সে তো তাহা বুঝিল না,
সে যে গো! ফিরায় মুখ মুখোমুখি হ'লে;
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছো ব'লে।"[৪৪]

কবি সমস্ত দুঃখ বেদনা ভুলে যেতে পারেন ঈশ্বরকে ভেবে। কবি যখন কোথাও শান্তি খুঁজে পান না, যখন কেউ আপনার বলে ডাকে না, তখন তিনিই ভরসা। তাঁকে স্মরণ করেই শোক ভুলে যান, প্রেমানন্দে বুক পূর্ণ হয়ে যায়। কবির মর্ম জুড়ে রয়েছেন সেই ঈশ্বর।

"কিন্তু মম তোমা বই
"আমার" বলিতে কই?
আমারি সর্ব্বস্ব তুমি ব্রহ্মান্ডমন্ডলে,
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছো ব'লে।"[৪৫]

'কেন আছি' কবিতায় কবি ভাবনা ও কর্ম দিয়ে একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 'কি চাই' কবিতাটির মধ্যেও কবি বলতে চেয়েছেন কবির আর কোন কিছু প্রাপ্তি নেই এই বৈষয়িক জগতে। সমস্ত কিছুই তিনি কবিকে দিয়েছেন, তাও না চাইতে।

"আমি কি চাহিব আর-
তুমি তো দিয়েছ সবই;

যা কিছু "অভাব" দেখি
সব তাহা পূরিয়াছে,"[৪৬]

তাই কবির ভয় করে যদি তাঁর আরও প্রাপ্তি ঘটে, সে ভার কবির সইবে না। কবি নিজেই সে প্রসঙ্গে বলেছেন-

"বোঝার উপর বোঝা
কে পারে সহিতে এত?"[৪৭]

এখানে কবির লোভহীন, নির্মোহ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির জীবনে একটাই অতৃপ্তি, একটি কিছু পাওয়া কবির বাকি থেকে গেছে। সেটা পেতেই কবির মূল আকাঙ্ক্ষা।

"আমি চাই-তুমি-আমি
মিশামিশি হ'ইয়ে থাকি!"[৪৮]

কবির এই ধরনের প্রত্যেকটি কবিতায় ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনা ছড়িয়ে রয়েছে। ঈশ্বরকে সর্বময় মনে করে কবি তাঁর মহিমায় লীন হতে চেয়েছেন। সর্বময় ঈশ্বরের ভাবনা মানকুমারী বসুর সৃষ্টির অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। কবিতাগুলির ভাব প্রায় একই বলা যায়। 'বাণী-বন্দনা' কবিতায় অবশ্য কবির অনুভূতি দেবী সারদার স্বরূপ ঘিরে। দেবীর ঐশ্বর্যের জন্য কবি তাঁর বন্দনা করেছেন।

"জননি আমার! চরণে তোমার
করিছে প্রণতি এ দীন ভক্ত,
এস স্মিতাননে শ্বেত পদ্মাসনে,
সন্তানে কর মা! সমর্থ শক্ত।"[৪৯]

কবিতাটির ছন্দ-মাধুর্য পাঠকের শ্রবণ ধারাকে তৃপ্ত করেছে। কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "যে দীন উঠিলে জলধি হইতে" সংগীতের সুরে সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে গাওয়া হয়।[৫০] কবির জীবন ঈশ্বর ভাবনায় পরিব্যাপ্ত। কিন্তু সারা জীবন ধরে তাঁর সেবা করেও কবির জীবন বিষাদময়-এর কারন হিসেবে তিনি ঈশ্বরকেই দায়ী

করেছেন। এতদিন যাঁর সেবায় জীবন কাটালেন, তিনি কবির প্রতি বিরুপ। তাই কবির আক্ষেপ-

"দেবি! আমি "পাষাণ প্রতিমা"?
ভেঙে যাব পাষাণের মতো?
তোমার দয়ার নাহি সীমা,
পাষাণেও করুণা নিয়ত!"[৫১]

ঈশ্বরের দয়ায় পাষাণেও নিয়ত করুণা বিরাজমান, কিন্তু কবির হৃদয়ে কোন স্নেহ তিনি দেন না। তাই রেগে গিয়ে কবি অভিমানী হয়ে উঠেছেন।

"আমি দিব কুসুম-অঞ্জলি,
তুমি দিয় দূরে তা ফেলিয়া;
আমার বাসনা-সাধগুলি
দিয় সব চরণে দলিয়া।"[৫২]

এতদিন ধরে কবি নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম করে তুলতে চেয়েছেন, তাঁর জন্যই কবির এই জগতে থাকা। কিন্তু আজ কবি সরাসরি ভগবানের উদ্দেশ্যে অভিযোগ করেছেন-

"কিন্তু ভেবে দেখ একবার
কে আমারে করেছে পাষাণী!"[৫৩]

সংসার(স্বামী) হারিয়ে আজ কবির হৃদয় বিষাদে পাষাণ হয়ে উঠেছে। কারন, 'বিধবার লুকানো সন্তাপ/খুঁজিবে "কোথায় প্রাণাধিক"!'[৫৪] ঈশ্বর এর কোন উপায় করেননি। কবি শুধু হারিয়েই গেছেন ফিরে পাননি কিছুই। তাই কবি ঈশ্বরের প্রতি অভিমানী হয়ে উঠেছেন। নিবিড় প্রেম বা গভীর ভক্তি ছাড়া এই অনুভূতি জন্মানো সম্ভব নয়। কবির সৃষ্টির বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ঈশ্বরভাবনা, এ থেকেই প্রমাণিত হয় তাঁর জীবনভাবনায় ঈশ্বরের প্রভাব কতখানি। তবে এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে কবির ভাবনাকে ধরা যায় ঠিকই, কিন্তু কবিতাগুলি কবি মনের সরলরৈখিক এক অনুভুতির বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাব ও দর্শনের গভীরতায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান কবি তাঁর এই কবিতাগুলিতে রাখতে পারেননি। প্রথদিকের কবিতাগুলির মধ্যে ভক্তির আধিক্য

লক্ষ করা যায় এবং কবিতাগুলি বর্ণনাধর্মী। পরবর্তীকালের কবিতাগুলির মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। নিছক ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থেকে তাঁর কবিতায় একটা ধর্মীয় দর্শন তৈরি হয়েছে।

খ) স্নেহ ও শোক কবিতা

সন্তান-বাৎসল্য, মাতৃ-স্নেহ মানকুমারী বসুর কবিতার একটি অন্যতম প্রধান ধারা বলা যায়। কবি শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সংসারকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বভাবতই স্বামী, কন্যার প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহে কবির কোনো খামতি দেখা যায় না। কিন্তু কবির ভরা সংসার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, ক্রমে একের পর এক ফুল কবির বাগান থেকে ঝরে যায়। এ ব্যাথায় কবির হৃদয় বারবার বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। শুধু নিকট আত্মীয় বলে নয়, সম্পর্ক ভেদে কবির স্নেহ, ভালোবাসা সকলের মধ্যেই ব্যাপ্ত ছিল। পরিচিতসূত্রে যে কোনো ব্যক্তির অঘটন কবিকে বিপর্যস্ত করেছে। কবির সেইসব স্নেহ, শোক, ভালোবাসার অনুভূতিগুলি কবিতায় রূপ পেয়েছে। তাঁর 'মা' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মা যেন জগতের ধাত্রী স্বরূপ, তাঁর স্নেহেই সংসার লালিত ও পালিত হয়। তাই কবি তাঁকে কল্পনা করেছেন-

"স্বরগের দেবী তুমি,
মানবের দেশে।"[৫৫]

কবির শৈশবের বেশিরভাগটাই তাঁর পিতার সঙ্গে কেটেছে, তবু মাতৃস্নেহ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। সন্তানের একমাত্র আশ্রয়স্থল মায়ের আঁচল, কবির মন তাই বারেবারে ফিরে যেতে চেয়েছে সেই স্নেহ ও ভালোবাসার নীড়ে। কবির ভাবনায় মাতৃস্নেহ সীমাহীন।

কেউ কোথা নাহি যার,
"তুমিই সকলি তার,
জুড়াও পরাণ;
তাই মা! তোমার নাম
আনন্দ-শান্তির ধাম,"[৫৬]

‘মা’ সকল সন্তানের আনন্দধাম। সন্তান চাইলেই তাঁর জীবনের যে কোনো দুঃসময়ে, যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় মায়ের সঙ্গ পায়। যে শত অভাগা, সংসারে অবজ্ঞেয়, অবহেলিত তার জন্যও মায়ের অপার স্নেহে ঘাটতি নেই। কবি সেই মায়ের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

“প্রীতির অমিয়া মূর্ত্তি,
ভকতির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি,
অমৃতের খনি;
“মা” ব’লে ডাকিলে মন,
সুধারসে নিমগন,
শত ভাগ্য গণি!”[৫৭]

কবির মতে ‘মা’ দর্শন ও বিজ্ঞানের উর্দ্ধে; কেউই মায়ের মহিমার সীমা ধরতে পারে না। তাই সন্তান হিসেবে কবির সাধ যে কদিন তিনি বেঁচে থাকবেন যেন মায়ের পদতলে সুখের অশ্রুজলে ‘মা’ সম্বোধনে কাটিয়ে দিতে পারেন। আলোচ্য কবিতায় কবি এইভাবেই মায়ের স্নেহের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। আবার ‘মায়ের কুটীর’ কবিতায় দেখা যায় মাতৃস্নেহ দিয়ে সন্তানের নীড় রচিত হয়েছে। বাইরের বৈভব ও ঐশ্বর্যের থেকে দীন-হীন মা সন্তানের কাছে অনেক আদরের। সকল দারিদ্রতার মধ্যেও মা সন্তানের বাসনা পূরণে সদাই উন্মুখ। তাই কবি বলেছেন-

“ঘুঁটে ভাঙি, কাটি ঘাস,
তবুও পরাণে আশ,
হেসে খেলে খেয়ে মেখে ওরা থাকে সুখে!”[৫৮]

মাতৃহৃদয়ের আন্তরিকতাকে ঘিরে কবির স্নেহ ভাবনা কবিতাটিকে নান্দনিক রসে ভরিয়ে দিয়েছে। গরীব মায়ের শিশুরা মজার পাত্র হয়ে ওঠে বৈভবশালী মানুষজনদের সন্তান্দের কাছে। কবি সেই চিত্র বর্ণনা করেছেন-

“ধনীর দুয়ারে গেলে,
খেপায় তাদের ছেলে,
ছেঁড়া বাস দেখি দেহে রুখু রুখু চুল।”[৫৯]

কিন্তু প্রত্যেক মায়ের কাছে তাঁর সন্তান নারায়ণ স্বরূপ। তাই মা শত বেদনা পেলেও, সন্তানের বেদন মা সহ্য করতে পারে না। সন্তানের দিকে তাকিয়ে মা শত দুঃখকে উপেক্ষা করতে পারেন। কবির ভাষায় মাতৃস্নেহের সেই আবেগ ধরা পড়েছে।

"না গো না সকলি স'ব,
এই স'য়ে বেঁচে র'ব,
শুকাব এ অশ্রুজল ওদেরি হাসিতে;
তোমার চরণে হরি!
এই নিবেদন করি,
নীতি যেন পাই কিছু চাঁদ-মুখে দিতে"[৬০]

কবির হৃদয়ে স্নেহের গভীরতা লক্ষ করার মতন, তাই সন্তান হারানো বা না-প্রাপ্তির শোক বারবার কবির হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছে। 'একা' কবিতাটি কবির নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা ভরা অনুভূতি দিয়ে রচিত। শুরুতেই কবি বলেছেন-

"একা আমি, চিরদিন একা
সে কেন দু'দিন দিল দেখা?"[৬১]

আনন্দ বা উল্লাস কবির জীবনে ক্ষণিকের তরে দেখা দিয়ে চলে গেছে। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেছেন, এই ধরাতলে কবি একা। তাঁর আপনার বলতে কেও নেই। বিবুধশঙ্কর বসু অল্প বয়সেই কবিকে একা রেখে চলে গেছেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁকে কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। সেই অনুভূতির সূক্ষতা এ কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত।

"জগৎ-সংসার মোর শত দূরে র'বে,
আমারে মমতা-স্নেহ
দেয় নি- দিবে না কেহ,
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে?"[৬২]

কবির আক্ষেপ, কেউ যখন স্নেহ দেবে না, তখন কেন সে কবির জীবন তরে ধরা দিয়েছে। তবু কবি তাঁর স্নেহ ভুলতে পারেননি। তাই কবির ব্যাকুল প্রার্থনা-

"যে ক'দিন থাকে প্রাণ
এই কোরো ভগবান!
গাই যেন তারি গান বসি' একা একা।"[৬৩]

কবির একা জীবনেও তিনিই সঙ্গী। এখানেই কবির অনুভূতি ব্যাপ্তি লাভ করেছে। মানকুমারী বসুর আর একটি কবিতা 'প্রিয়বালা'। কবিতাটিতে কবির সন্তানস্নেহ যেমন রয়েছে, অপরদিকে স্বামীকে ঘিরে কবি মনের শোক কবিতায় ভাষা পেয়েছে। কবির স্বামী বিবুধশঙ্কর বাবু তাঁদের একমাত্র শিশুকন্যাটিকে রেখে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর একমাত্র স্মৃতি স্বরূপ মানকুমারী বসুর কন্যাটি কবির একমাত্র শান্তির আশ্রয়। সেই সন্তানের মুখ দর্শনেই কবির মন ভরে ওঠে। এই অনুভূতি কবিতাতে কাব্যিক রূপ পেয়েছে।

"চাইলে তোমার মুখের পানে,
দেখলে তোমার মধুর হাসি,
আমি কি আর আমায় থাকি!
প্রাণ চ'লে যায় কোথায় ভাসি'!"[৬৪]

শুধু পতির মৃত্যুতেই কবি আঘাত পেয়েছেন এমনটা নয়, সমাজের বিশিষ্ট ভাবপ্রবণ সহানুভূতিশীল ব্যক্তির মৃত্যুতেও কবির হৃদয় ব্যাকুল হয়েছে। একাধিক কবিতায় তার পরিচয় রয়ে গেছে। এমনই একটি কবিতা 'শোকোচ্ছ্বাস', ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে লিখিত।[৬৫]

"ওরে কাল! কি করিলি
কারে আজ কেড়ে নিলি!
কেমনে এমত জ্যোতিঃ সহসা নিবালি?
কাঁদালি কাঁদালি কার-
ভাই-বন্ধু-পরিবার,
এঃ! আবার বঙ্গ-মা'র কপাল পোড়ালি!"[৬৬]

কবির ভাষাতেই তাঁর সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই কালের কাছে কবির আক্ষেপ, এমন সমাজসজ্জন ব্যক্তিকে কেন কেড়ে নিলেন? তাঁর চলে যাওয়াকে ঘিরে

কবির কল্পনা বিভিন্ন ভাবনাতে আশ্রয় খুঁজে নিতে চেয়েছে। কবির ভাবনা কোন্ অভিমানে তিনি এ মর্ত্যধাম থেকে বিমুখ হয়েছেন। তাঁর জীবনে তো সকল প্রাপ্তিই ঘটেছে, তবু তাঁর কি অভাব হয়েছে? তাই কবির প্রশ্ন এ সুখ ছেড়ে তিনি কোথায় যেতে চাইছেন?

"এ সুখ সম্পদ হায়!
অবহেলি সমুদায়,
কোথা যাও মহামতি! কি সুখ লভিতে?
কি কাজ রয়েছে বাকি
এ জগতে হ'ল না কি?
যাও তাই বিভু-আজ্ঞা যতনে পালিতে?"[৬৭]

কবি হৃদয়ের শোক যে গভীর, কবিতাটির এই উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়। কবি নিজে বিধবা হওয়ার দরুন গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর পত্নীর শোকজ্বালা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কবির ভাষায় সেই অনুভূতি আসাধারণ ভাবে ধরা পড়েছে-

"সুভগা সরলা আজি
রহিল বিধবা সাজি!
শত চিতা রাবণের হৃদয়ে বহিয়া;
লিখিতে পরাণ ডরে,
লেখনী খসিয়া পড়ে,
বিধাতঃ! কি বেশে কারে দাও সাজাইয়া!"[৬৮]

'শোকাতুরা মা' শীর্ষক কবিতাটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লেখা।[৬৯] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল মায়ের সন্তান। তাই তাঁর মৃত্যুতে কবি সন্তান শোক অনুভব করেছেন। কবির মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা যেন সকল মায়ের আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে।

"জানেন অন্তরযামী,
বড় অভাগিনী আমি,

অমূল্য রতন তুই বুক পূরাবার;
আভাগী মায়ের তরে
চাঁদমুখে কথা ক'রে!
"মা" বলিয়া ডাক বাছা! আর একবার।"[৭০]

সন্তানের মধ্যেই মা তার পৃথিবীকে খুঁজে নেয়। তাই সন্তানকে মা তার বুক আগলে রাখে। এই চিরন্তন সত্য মধুর বাণী হয়ে কবিতায় ধরা দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুকে ঘিরে কবির এই অনুভূতি চিরন্তন এবং কবিতাটির মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক মূল্যবোধের পরিচয় উঠে এসেছে।

"তুমি না থাকিলে বুকে
অভাগী কি পোড়ামুখে—
জগতের কাছে মুখ দেখাইবে ফিরে?
পোড়া বুক ফেটে যায়,
আয় যাদু! কোলে আয়!
লুকায়ে রাখিগে তোরে শত বুক চিরে?"[৭১]

এ যেন আপন মায়ের শোক। কবির অনুভূতির গুণে তা যেমন কবির হয়ে উঠেছে, আবার সার্বিক রূপ লাভ করেছে। কবিতার শেষে কবির নিজের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে-

"কবি যে আপন-হারা,
চোখে বয় শত ধারা,
কলিজা পরাণ সহ হয়ে গেল জল,"[৭২]

সামাজিক মানুষ হিসেবে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে কবির শোকগ্রস্ত। এই অনুভূতি কবির একান্ত নিজের। আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে বিদ্যাসাগের মায়ের কথনে সর্বকালের ও সর্বস্থানের মায়ের শোককে কবি ভাষা দিয়েছেন। মানকুমারী বসুর এই প্রতিভা যে অনবদ্য, সর্বকালের পাঠকই সেকথা স্মরণ করবেন। 'বিসর্জন' কবিতাতেও একইভাবে বিদ্যাসাগরকে ঘিরে কবির হৃদয়ের বেদনা কাব্যরূপ পেয়েছে।

"থাম রে বিহগকুল! গেয়ো নাকো আর

ও প্রভাতী গান!
যে যেখানে আছ সবে
নীরবে নীরবে ‘র’বে,
মার বুকে নাই আজি প্রাণের সন্তান!”[৭৩]

সন্তান হারানোর বেদনাকে কবি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে। কারন এই বেদনা শুধু কোনো মায়ের একার নয়। এই শূন্যতা বঙ্গের, এই শোক কালের। কবি তাই বলেছেন বঙ্গের উজ্জ্বল রবি কালের অতলে হারিয়ে গেল। কবি এই ব্যক্তিশোককে বিশ্বশোকে উন্নীত করেছেন।

“কাঁদিছে পঞ্জাব, বম্বে, কাঁদিছে মাদ্রাজ
হ’য়ে পাগলিনী!
কাঁদিছে বৃটনবাসী,
যায় বিশ্ব শোকে ভাসি!
দিগন্তে অনন্তে ওই হয় প্রতিধ্বনি!”[৭৪]

এখানেই কবির শোকভাবনা চিরন্তন হয়ে উঠেছে। উক্ত বিশ্বশোক যদিও বিদ্যাসাগরকে ঘিরে, কিন্তু বলাবাহুল্য যে সন্তান শোক সকল মায়ের কাছে একইরকম। কবি এই একা মায়ের শোককে তাই বিশ্বমায়ের শোকে উন্নীত করতে চেয়েছেন। এখানেই কবিতাটির মাহাত্ম্য। শোকমূলক কবিতাগুলিতে কবির প্রতিভা অবিস্মরণীয়। কবির মন সদা স্নেহময়ী, তাই তাঁর বেশিরভাগ কবিতা জুড়ে রয়েছে বাৎসল্য প্রীতি, স্নেহ ও ভালোবাসা। ‘তিন দিনের কথা’ কবিতায় কবি তাঁর একমাত্র কন্যার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। নিম্নে উদ্ধৃত পঙক্তিগুলিতে সেই অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়-

“নয় বছরের মেয়ে প্রিয়টি আমার,
স্বরগের কচি ঊষা,
বসন্তের নব ভূষা,
আশীর্ব্বাদী ফুলটুকু ইষ্টদেবতার!
কত সুখ কত দুখ---
মাখানো ও চাঁদমুখ!

কত স্মৃতি, কত প্রীতি সীমা নাই তার,
পরে কি তা বোঝে প্রিয়! কি তুই আমার।"[৭৫]

কবির উদাস প্রাণে একটি বন্ধন রয়েছে। কবির এই সংসারে সুখসাধ বলতে প্রিয়বালার সরল ও স্নিগ্ধ মুখখানি। সেই মুখের স্মরণে কবি সমস্ত কিছু ভুলে থাকতে পারেন। দুঃখ-শোক-তাপে ভরা এ সংসার বড়ই নিষ্ঠুর, চারিদিকে শুধুই হিংসা, দ্বেষ। কবি এর মাঝে তাঁর স্নেহের সন্তানকে কোথায় রাখবেন?, কোথায় রাখলে তাঁকে এই নিষ্ঠুর সংসার ছুঁতে পারবে না? সন্তানকে ঘিরে এই ভাবনা কবিকে ব্যাকুল করেছে। 'পূর্ব্ব-স্মৃতি' কবিতায় দেখা যায় পুরানো দিনের কথা ভেবে কবিব মন দুঃখী হয়ে উঠেছে। যখন কবি জীবনে সুখের লহরী ঢেউ তুলেছে, মনের ঘরে ভালোবাসা দুয়ার খুলেছে, তখনই কবির পরমপ্রিয় তাঁর জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন। আজ কবি পুনরায় সেই দিনগুলির কথা ভেবে শোকা অনুভব করেছেন। কবিতায় সেই পঙক্তিগুলি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

"কবে সে গিয়াছে চ'লে,
নিভেছে সাধের হাসি,
লাগে না মরমে আলো
বাজে না বিজনে বাঁশী।"[৭৬]

আজ আর কেউ নেই যে কবিকে আমার বলে ফিরে চাইবে। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেছেন কবির জীবনে সুখ-সাধ-স্নেহ সবই যেন ফুরিয়ে গেছে। কবির অশ্রুধারা এখনও বহমান। কিন্তু তাঁর স্মৃতিটুকু ছাড়া কবির আর কিছুই নেই। তাই কবির বেদনা যেন সীমাহীন, সেই স্মৃতি আজও কত স্পষ্ট যেন। এই প্রসঙ্গে কবির সংলাপ—

"শূন্য বুকে শুন্য মনে
কেবলই রয়েছি মরি,
তার সে অমৃতমাখা
স্মৃতিটুকু প্রাণে ধরি!"[৭৭]

‘সাধের মেয়ে’ কবির একমাত্র সন্তানকে ঘিরে রচিত কবিতা। কবির সন্তান আকাশের চাঁদ ধরতে চায়, কিন্তু না পেরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সন্তানের সেই ব্যাকুলতায় চারিদিকে যেন আঁধার নেমে এসেছে। তাই কবি বলেছেন-

“হাস প্রিয়! একবার, দূর হ’ক এ আঁধার
দেখি মা! স্বর্গের শোভা ও মুখ-নলিনে।”[৭৮]

কবির মনে হয়েছে সন্তানের সঙ্গে মায়ের এই সমস্ত সুখের দিনের কথা তাঁর আদরের দুলালীর মনে থাকবে কিনা। কবিকে এ সংসারে একা করে তাঁর স্বামী অকালে বিদায় নিয়েছেন। কবির সুখ-দুঃখের কোনো সঙ্গী নেই। কবির সেইসব কষ্টের কথা তাঁর সন্তান কি বুঝতে পারবে? কবির সেই ব্যাথাভরা সংলাপ-

“কি আগুনে জ্বলি আমি কিছুই জান না তুমি
তোর হাসি তোর কথা কার সনে কহিব?
ওরে বিধি! এ যাতনা কত দিন সহিব!”[৭৯]

উক্ত কবিতাটিতে একই সঙ্গে কবির সন্তানস্নেহ ও পতিশোকের অনুভূতি ছড়িয়ে রয়েছে। কবির সব কিছু বলার মানুষটি হারিয়ে গেছে, তাই বিধির কাছে কবির আক্ষেপ এ যাতনা সইব কি করে? আলোচ্য কবিতাটিতে স্বামী হারিয়ে সন্তানকে ঘিরে কবির অনুভূতি রূপ পেয়েছে। তাই একই সঙ্গে কবিতাটি শোক ও স্নেহের কবিতা বলা যায়। কবিতাটিতে কবির আক্ষেপের সুর ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন তাঁর মতো কাঙালিনীকে এই অমূল্যরতন দেওয়ার কিই বা প্রয়োজন ছিলো। যে যেটার মূল্য বোঝে না তাঁকে সেটা দেওয়ার প্রাসঙ্গিকতাও মিথ্যা বলে কবি মনে করেন। পেয়েও না পাওয়ার বেদনায় কবি মর্মাহত। তাই তাঁর মনের শোক বিচিত্রভাব অবলম্বন করেছে। এই প্রসঙ্গে কবিতার দুটি ছত্র নিম্নে উল্লিখিত হল-

নিদারুণ বিধি! যদি এই ছিল মনে,
শ্মশানে সোণার ফুল ফুটাইলে কেনে?”[৮০]

কবি অন্তরের শোক যখন অশ্রুকারে ফুটে উঠেছে তখন কবির ছোট্ট সন্তান সমস্ত খেলা, হাসি ছেড়ে নীরবে কবিকে নিরীক্ষণ করেছে। কবি ওই স্নিগ্ধ মুখ দেখে সমস্ত শোক ভুলে গেছেন এবং তখন তাঁকে তুলনা করেছেন 'স্বরগের ফুল'[৮১] বলে। কবি মুক্তি চাইলেও সন্তানস্নেহ তাতে বাধা তৈরি করেছে। কবির সেই বাৎসল্যভাবনার পরিচয়ও রয়েছে আলোচ্য কবিতায়-

মরমে মরিয়া যাই মরণ শরণ চাই
অমনি আঁচল টেনে হাসে বোকা মেয়ে,
মরিতেও ভুলি প্রিয়! তোরি মুখ চেয়ে;
অনলে পুড়িব তবু ম'রে কাজ নাই,
ননীর পুতুলটুকু কারে দিয়ে যাই?"[৮২]

কবির অন্তরের এই স্নেহভরা অনুভূতি তাঁর জীবন ভাবনাকেই পালটে দিয়েছে। একদিকে অন্তরে রয়েছে শোক, আবার তারই উল্টোদিকে প্রেরণা স্বরূপ রয়েছে সন্তানপ্রীতি। একই সঙ্গে এই দুই অনুভূতি পাশাপাশি থেকে কবিতাটি চিরন্তন এক সত্যে উন্নীত হয়েছে। কবির সেই বর্ণনার অংশটি এইরকম-

তোরে দিয়া অভাগীরে মহাপাশে বাঁধিয়া
চলি গেছে, তোরে মোরে "একাকিনী" ফেলিয়া
পরাণ পাষাণময় সহজে হ'ল না লয়,
মরিতে পারিনি মা গো! তোর মুখ চাহিয়া,
নিবারি চোখের জল তুমি কাঁদ বলিয়া!"[৮৩]

কবিতার শেষ স্তবকে কবি পুনরায় প্রথম স্তবকের পুনরাবৃত্তি করেছেন। চাঁদ ধরার আশায় সন্তানের ব্যাকুলতা ও কান্নাকে থামাতে কবি চাঁদকে শেষমেশ মর্তে আহ্বান করেছেন। বোঝাই যায় একইসঙ্গে কবির অন্তরআত্মা সন্তানের কান্নায় বাৎসল্যভাব যেমন অনুভব করেছে আবার স্বামীর হারানোর নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছেন। এই দুটি ভাবকে কবিতায় ফুটিয়ে তুলে মানকুমারী বসু উক্ত ভাবদুটির সত্যতাকে একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। এখানেই কবিতাটির মাহাত্ম্য।

কবির স্বামী ইহলোক ত্যাগ করায় কবিকে তাঁর সন্তানকে নিয়েই জীবন কাটাতে হয়েছে। তাই একসঙ্গে দুজনে শান্তির নীড় গড়ে পথ চলতে চেয়েছেন। দুজনে মিলেই এই সংসার নদীতে পাল বইবেন, সেই স্বপ্নের চিত্র এঁকেছেন 'সহযোগিনী' কবিতাটিতে-

"আসিবি কি সোণামুখি?—
আয় আয় আয়!
দু'জনে বান্ধিব ঘর
শ্যাম-কুঞ্জ-ছায়।"[৮৪]

কবি তাঁর বাকি জীবনটায় সন্তাননের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে চেয়েছেন। তাই বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সন্তানকে আহ্বান জানিয়েছেন। স্নেহের গভীরতায় সেই পঙক্তিগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"আসিবি কি সোণামুখি?
আয় আয় আয়!
দু'জনে সাঁতার দিব
নীল বরষায়।

"দুজনে হাসিব বসি
চারু চান্দিমায়।

"দু'জনে কান্দিব গিয়ে
দূর নিরালায়!"[৮৫]

কবির সন্তান তাঁর একমাত্র সহযোগী রূপে বিরাজ করেছে। তাই কবি তাঁর সন্তানকে ঘিরে সমস্ত সুখ-দুঃখকে একসঙ্গে বাঁধতে চেয়েছেন।

"দু'জনের সুখ-দুখ
মা'খি কবিতায়।"[৮৬]

নারী জীবনের অসহায়তাও কবি উপলব্ধি করেছেন। নিজের বৈধব্য জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কবি বিধবা নারীর নিঃসঙ্গতার বেদনাকে নিবিড় ভাবে অনুভব করেছেন। বিধবা রমণী দেখলেই কবির মন স্নেহ ও শোকের অনুভূতিতে ভরে যায়। এরকমই অনুভূতি

দিয়ে গড়ে ওঠা একটি কবিতা 'অভাগিনী', একটি বিধবা বালিকা দর্শনে[৮৭] কবি মনের শোক, খারাপ লাগা 'অভাগিনী' কবিতায় ভাষা পেয়েছে। স্বামী হারালে রমণী জীবন থেকে সব হারিয়ে যায়; সাঁঝের বেলায় এলোচুলে সেই নারীর সৌন্দর্য তখন মলিনতার রূপ নেয়। তাই কবির আক্ষেপ অমন সোণার বালিকার মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার কোথায়? তাঁর জীবনে কোথাও আর কিছুই নাই। তাই কবি তাঁদের শোক, দুঃখকে অনুভব করে সেইসমস্ত নারীদের নিয়ে একসঙ্গে বাঁচতে চেয়েছেন। আসলে বিধবা নারী নিঃসঙ্গ, সমাজে সে একা হয়ে রয়েছে। কারণ তাঁর সিথির সিন্দুর বিধি মুঝে দিয়েছে, তাই সকল সুখও তার থেকে বিমুখ। কবিতায় কবির খেদ তাই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে-

"কেমনে কাটাবে কাল চিতা রাখি বুকে !
জ্বলন্ত আগুন জ্বালা,
কেমনে সবে রে! বালা,
জীবন্তে পুড়িবে বাছা মা'বাপ-সম্মুখে!
বোঝে না যে "বিয়ে" হায়!
তার আজি এ কি দায়!
'বিধবা' কহিতে বুক ফেটে যায় দুঃখে,"[৮৮]

বিধবা নারীর জীবনে শুধু পতি হারানোর দুঃখই থাকে না, সামাজিক বিধিনিষেধে বিধবা রমণীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে যায় সঙ্গী-সাথী, হারিয়ে যায় সাজ-পোষাক, গহনা-অলঙ্কার। এই বাস্তব দুঃখবোধও কবিতাটিতে কাব্য-সৌন্দর্য লাভ করেছে।

"সাথীদের বিয়ে হবে যাবে পতি-স্থানে;
অবোধ অভাগী মেয়ে,
বেড়াবে যে মুখ চেয়ে,
ওর যা হয়েছে ও তা স্বপনে না জানে!"[৮৯]

ধর্মীয় ও সামাজিক শোষণের ফলে তাঁদের মানবিক আবেদন ব্যাহত হয়, তাঁরা সমাজযন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়। নারীর প্রতি সমাজের এই শোষণের বিরুদ্ধে কবি

সোচ্চার হয়েছেন, প্রগতিবাদী না-হলেও কবি মানকুমারী বসু নারীর প্রতি এই বর্বরোচিত সংস্কারকে মেনে নিতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে কবির ভাষা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

"অফুটন্ত কলিকায়
রাক্ষসে দলিবে পা'য়
সাবাসি সাবাসি বটে হিন্দুর সন্তান!
গড়া কি তোদের বুক নিরেট পাষাণে!"[৯০]

হিন্দুধর্মে নারীর জীবনে আর একটি প্রতিকূলতা হল বাল্যবিবাহ। খুব অল্প বয়সী রমণীর সঙ্গে অধিক বয়সের পুরুষের বিবাহ স্বরূপ নারী অতি অল্প বয়সেই বিধবা হয়। অল্প বয়সী সেই রমণীর উপর আরোপিত হতো শাস্ত্রের বিধিনিষেধ। কবি মানকুমারী বসু হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভ করলেও এই অনিয়মকে মানতে পারেননি। কবির কণ্ঠে তাই একইসঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়েছে আক্ষেপ ও ধর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ।

"নয় আট নয় দশে
সীঁথির সিঁদুর খসে,
বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি!
বোঝে না যে খাদ্যাখাদ্য,
"ব্রহ্মচর্য" তার সাধ্য ?
না হ'লে থাকে না মান, লোকে কাণাকাণি,
এই তোর শাস্ত্রতত্ত্ব—হায় অভিমানী!"[৯১]

জীবন সম্পর্কে যার পূর্ণ ধারণা তৈরি হয়নি সে ব্রহ্মচর্য পালন করবে কি কোরে? কিন্তু তবু নারী বাধ্য হয়, না হলে তার মান থাকবে না, সমাজ তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। সমাজের তত্ত্ব বিজ্ঞদেরও বোঝার অতীত, বিজ্ঞরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা রেখেও বিধবার প্রতি অন্ধ সংস্কারে আবদ্ধ। তাহলে অবলা বালিকা সেই তত্ত্ব ধারণ করবে কি কোরে? এই যুক্তি কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। সেই পঙক্তিগুলি নিম্নে উল্লিখিত হল-

"ভারত ! ভারত! তোর কি হবে মা! গতি?
এদের নিঠুর প্রাণ,

মুখে করুণার ভাণ,
শুনায় অধ্যাত্মযোগ তপস্যা মুকতি,
বিজ্ঞেও বুঝিতে নারে,
সে কি তা বুঝিতে পারে!
দশ বছরের মেয়ে--- বোঝে কি সে গতি?
বোঝে কি সে ধর্ম্ম মোক্ষ, বোঝে কি সে পতি?"[৯২]

এই ধারণা কবির স্বঅভিজ্ঞতাজাত। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার কারণে কবি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন-'বাল্য-বিবাহের ফলে আমি তাঁহার গুণের মর্ম্ম বুঝিবার অবকাশ পাই নাই;'।[৯৩] হিন্দু নারীর বিবাহিত জীবন ও বিধবা জীবন দুটোই খুব কষ্টের। এদের জীবন ঘিরে কবির দুঃখের অনুভূতি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কবি তাঁর সহানুভুতিপ্রবণ মন নিয়ে সমাজের কাছে তাই বিধবা নারীর অসহায়তাকে উপলব্ধি করার আবেদন জানিয়েছেন। কবির এই ভাবনা আলোচ্য কবিতায় দীর্ঘ পঙক্তির আকার পেয়েছে।

"হ্যাদে তর পায়ে পড়ি বঙ্গবাসি ভাই !
একবার দেখ চেয়ে—
ননির পুতুলী মেয়ে
জীয়ন্তে ধরিয়া মোরা আগুনে পোড়াই;

"তার তরে একাদশী কি বলিস ছাই!
যে জানে না পতিসেবা,
পতিকে বোঝে না যেবা,
তার বিয়ে দিতে বিধি তোর শাস্ত্রে নাই?"[৯৪]

বঙ্গবাসীর নিকট কবির এই আবেদন কত সরল, আবার তীক্ষ্ণও বটে। একটি বিধবা দর্শনে কবির মনে যে শোকের উদয় হয়েছে আলোচ্য কবিতায় তিনি তারই বর্ণনার দিয়েছেন। কবি তাঁদের জীবনের মুক্তির পথ খুঁজতে চেয়েছেন কিছু সরল প্রশ্ন উত্থাপন করে। স্বামীকে হারিয়ে কবির ব্যাথাতুর হৃদয়ের চিহ্ন একাধিক কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'অভিমানে' কবিতায় নিঃসঙ্গ জীবনের আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে।

"অভাগা অধম আমি

জগতে মিলে না ঠাঁই,
কাঁদিব কাহার কাছে?
তুমি ত জগতে নাই!”[৯৫]

কবিতাটিতে বিশেষত্ব কিছু না থাকলেও কবির ভালোবাসার ব্যাপ্তি ধরা পড়েছে। ত্রয়োদশ বর্ষ পরে[৯৭] কবি তাঁর স্বামীর কর্মস্থল সাতক্ষীরায় গিয়ে পতি হারানোর বেদনায় শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তারই প্রকাশ ঘটেছে মানকুমারী বসুর লেখা ‘সাতক্ষীরা’ কবিতাটিতে। কবিতাটি ১৪ই আশ্বিন ১৩০৩ বঙ্গাব্দে লেখা।[৯৬] সাতক্ষীরা খুলনা জেলার একটি মহকুমা,[৯৮] কবির স্বামীর চাকরীস্থল।[৯৯] এখানেই অসুস্থ অবস্থায় কবির স্বামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১০০] দীর্ঘ দীন পরে সেই স্থানে গিয়ে কবি পুনরায় পতি শোকে ব্যাকুল হয়েছেন।

“হায় দেবতা আমার !
এ মহাশ্মশানে তুমি
কি সুখে রয়েছ ঘুমি’,
কেন বা দিলে না দাসে কোন সমাচার?
গণিয়া গণিয়া দীন,
কাটাইনু এত দীন,
বিধাতা আনিলা আজি চরণে তোমার,
হায় দেবতা আমার!”[১০১]

বিবুধশঙ্কর বাবু সাতক্ষীরায় চাকরি করার সূত্রে কবিকে বিবাহিত জীবন স্বামী ছাড়াই একাকী কাটাতে হয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সপরিবারে যাওয়ার বন্দোবস্ত হয় বলে জানা যায়।[১০২] তবে সেই দীন আর কবির জীবনে আসেনি। সাতক্ষীরাতেই কবির স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় কবি তাঁকে শেষ দেখা দেখতে পারেননি। হিন্দু কূলবধু হিসেবে সেখানে যাওয়ার অনুমতি কবির মেলেনি। তাই আজ তেরো বছর পরে সাতক্ষীরায় কবির আগমন ঘটলেও স্বামী হারানোর শোক জীবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে কবিতায়। আসলে শেষ দেখা না হওয়ায় কবির জীবনে যেন অনেক শূন্যতা রয়েছে। কবি কল্পনা করেছেন স্বামী ছাড়া তিনি যেন জগতের গলগ্রহ হয়ে উঠেছেন, কোথাও তাঁর আশ্রয় মেলে না। সাতক্ষীরায় উপস্থিতিকালে তাঁদের স্নেহের সন্তানটিও কবির সঙ্গে রয়েছে।[১০৩]

স্বামী ছাড়া এ সংসার জীবন কবির কাছে অপূর্ণ, তাই কবি তাঁর স্বামীকে ফিরে আসার আবেদন জানিয়েছেন। কবির এই অনুভূতির গভীরতা পাঠক হৃদয়কে বিগলিত করে। যেন মনে হয়েছে সাতক্ষীরার সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর স্বামীর চিহ্ন। কবির প্রত্যক্ষ দর্শন তাঁর উপলব্ধিকে প্রগাঢ় করেছে, কবির বর্ণনা তাই লিরিকগুণে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে-

"যত চাহি চারিদিক
তত দেখি বাস্তবিক
সাতক্ষীরা-ভরা প্রভো আলোক তোমার,
একটী হৃদয়ে কেন এতটা আন্ধার?"[১০৪]

কবি তাঁর সমস্ত অতৃপ্তিকে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছেন এই ভূমি পরিদর্শনে মধ্য দিয়ে। সাতক্ষীরা যেন নীরবে কবিকে তাঁর স্বামীর না বলা কথা শুনিয়ে দেয়। সেই শব্দে ও গন্ধে উপলব্ধ অনুভূতির বিস্তার ঘটেছে 'সাতক্ষীরা' কবিতাটির ছত্রে ছত্রে।

'সুখী' কবিতায় একই আক্ষেপের সুর শোনা যায়। নিজের জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ করেই বোধহয় কবিতার এহেন নামকরণ। কবিতার শুরুতে কবি বলেছেন তাঁকে যেন কেউ অভাগা বা জনম-দুখী না মনে করেন এবং এই কথা বলে শুরু করে পুরো কবিতা জুড়ে রয়েছে কবি জীবনের দুঃখ কথা। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি পড়লেই সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

"চিরদিন পথে পথে
ফিরিয়াছি, শ্রান্ত দেহ,
চাহেনি মুখের পানে
নিকটে ডাকেনি কেহ।"[১০৫]

কবি সদাই চোখের অশ্রুজল ঢেলেছেন এবং তা মুছে দেবার মতো কেউ কবির জীবনে নেই। ধরাতলে কারোর কাছেই কবির ঠাঁই মেলেনি, সমব্যাথী হওয়ার মতোও কেউ কবির পাশে থাকেনি। গীতিসুলভ সুরে এই অনুভূতির রেশ পাঠক হৃদয়কেও বিমর্ষ করেছে।

"দাঁড়াতে মেলেনি ঠাঁই,
কাঁদিতে মিলেনি বন,

মিলেনি ব্যথার ব্যাথী

ধরাতলে একজন ”[১০৬]

কবির সর্বসময়ের সাথী বলা যায় তাঁর স্বামী বিবুধশঙ্কর বসুকে। তাই তিনি মারা যাবার পর কবি অধ্যাত্মচর্চা ও সাহিত্যচর্চাকে আঁকড়ে ধরেছেন। কবির হৃদয়ের স্নেহ, ভালোবাসা, খারাপ লাগা এইসব অনুভূতি প্রকাশের স্থান ও পথ সম্পূর্ণত রূদ্ধ, ফলস্বরূপ কবি হৃদয়ে তৈরি হয়েছে শূন্যতা। তারই প্রকাশ ঘটেছে উক্ত কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবিতা ‘ফটো বিচার’। ভাইবোনের অপত্য স্নেহের সরলীকরণ ঘটেছে আলোচ্য কবিতাটিতে। কবিতার শুরুর পঙক্তিতেই প্রকাশিত সেই স্নেহ আজও বিরল।

“তুই আর আমি ভাই ! ছবির ভিতর,
ভাই বোন দুই জনে
বসে আছি এক সনে,
এঁকেছে সুখের চিত্র কৃতী চিত্রকর;”[১০৭]

এই ছবির মধ্যে সেই সুখভরা স্মৃতি অমর হয়ে থাকবে। দিন, বৎসর, কাল অতীত হলেও ব্যক্তি ও তাঁর ভালোবাসা কখনোই হারায় না। স্নেহের সূত্রে তাঁরা পারস্পরিক বন্ধনে যুক্ত থাকে। কবি সেই ছবি দেখে তৃপ্তি লাভ করেছেন। তাই কবির কল্পনা, এই দুজনের মত আর সুন্দর কি আছে? কবির এই অনুভূতি যে ব্যক্তিভেদে সত্য হয়ে উঠেছে, তা বলাইবাহুল্য। স্নেহের সুরে গাঁথা ‘দেবশিশু’ কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। কবি মানকুমারি বসু এখানে নিজের বাৎসল্যরসে নিজেই ধরা দিয়েছেন। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলেছেন-

“স্বরগের ফুল সে, তা চিনিতে পারিনি,
সে ভাবিত সব গেহ
ভরা তার পিতৃস্নেহ,
শিশু সব তারি ভাই তারি তো ভগিনী!
সে ভাবিত ঘরে ঘরে
জননী বিরাজ করে,

সকলে মা স্নেহময়ী আনন্দদায়িনী!
তারে চিনিতে পারিনি !"[১০৮]

সন্তান স্নেহের মধ্য দিয়ে কবি হৃদয়ের বাৎসল্য ভাবটাই মুখ্য হিসেবে ধরা দিয়েছে। সন্তানকে ঘিরে কবির ভাবনা লালিত হয়েছে, তাই কবি বলেছেন-

"শুধুই আদর করি,
শুধুই কোলেতে ধরি,
শুধু চুম্বিয়াছি ধরি চান্দমুখখানি!"[১০৯]

সন্তানের প্রতি প্রেম ও স্নেহ, ব্যক্তির প্রতি শোক এসব আসলে কবি হৃদয়ের অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব ভাবনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবির সহানুভুতিশীল হৃদয়ই ধরা পড়ে। কবির সেই সহানুভূতিশীল মনের ও তাঁর ফেলে আসা স্মৃতি, অনুভূতির জারণে মূর্ত রূপ পেয়েছে এই ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে। তাই কবির এই অনুভূতি সকল অনুভূতিপ্রবণ মানুষের মানবিক আবেদন হিসেবে চিরন্তনতা লাভ করেছে।

কবি মানকুমারী বসুর 'বিভুতি' কাব্যগ্রন্থের 'আমার ভ্রমর' কবিতায় কবি তাঁর নিজের সন্তানের সুখে থাকার ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। এই আবেদনের সীমা খোঁজা ভার; যুগ যুগ ধরে এই ভাবনা্র নিত্যতা অপরিবর্তনশীল। কবি মানকুমারী বসু কখনো মা হয়ে, আবার কখনো বা সন্তান হয়ে স্বভাবনার বিচরণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। 'মাতৃহারা' কবিতায় কবি সন্তান হয়ে মায়ের স্নেহ পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

"মা আমার! মা আমার!
মাতৃস্নেহ-পিপাসায়
হিয়া যে শুকিয়ে যায়,
চাতকের তৃষা যে মা তব তনয়ার;
কই মা, মমতা কই,
তোমারি করুণা বই,
কভু যে এ মহাতৃষা মিটে না আমার।"[১১০]

কবি এখন সর্বত্র মাকে খুঁজে যান, কিন্তু সেই স্নেহের সন্ধান কোথাও মেলে না। কবি যেমন তাঁর সন্তানকে স্নেহভরে আঁকলে রাখেন তেমনি নিজেও সেই স্নেহের কাঙাল। তাই তিনিও বারবার ফিরে যেতে চান মায়ের ভালোবাসার আশ্রয়ে। 'আমার ভ্রমর' কবিতায় কবি যে মাতৃভাবনা থেকে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেছেন, তার বিস্তারিত বর্ণ্না পাওয়া যায় এই কবিতায় । নিম্নে তা উল্লেখিত হল-

"মা আমার! মা আমার!
ধরার বিষাক্ত বায়ু
লাগে পাছে মম গায়,
তাই সে রাখিতে ঢাকি আঁচলে তোমার,
আজি কোথা সেই ছায়া,
কোথা সে মমতা, মায়া,
কোথা সে আরাম-দাত্রী অভয়া আমার!"[১১১]

গাভিহীন বাছুর বা জলহীন মাছের যেমন কষ্ট মাতৃহীন কবির ব্যাকুলতাও ততটাই। মা ছাড়া কবি মরুভূমির শূন্যতা অনুভব করেছেন। এরপরের কবিতাটিতে স্বামী হারিয়ে কবি মানকুমারী বসুর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের কথা ব্যক্ত হয়েছে। কবির লেখা এই ধরনের কবিতার সংখ্যা নেহাৎই কম নয়। তার মধ্যে অন্যতম আর একটি কবিতা 'ব্যথিতা', 'বিভুতি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। আলাদা করে এই কবিতাটির গুরুত্ব হয়ত নেই, তবে কবি মনের একান্ত সুর এখানেও ধরা পড়েছে। কবিকে বুঝতে তাই আলোচ্য কবিতাটির গুরুত্ব নিছক কম নয়।

"আজি তুমি আছ কোনখানে
উজলিয়া চাঁদের কিরণ,
আমি যে তোমার লাগি,যুগ যুগ আছি জাগি
জারত নয়নে দেখি
সে শুভ স্বপন!"[১১২]

কবির বিবাহিত জীবনকে সুখী দাম্পত্যের এক বিরলদৃষ্টান্ত বলা যায়। এই কবিতাগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করেছে। মধুরস্মৃতি ব্যক্তিমানব বহন করে চলে, কবিও তাই

করেছেন। সেই পুরানো দিনগুলি কবির জীবনের এক উজ্জ্বল সময় বলেই তা আজও কবিকে কষ্ট দেয়, পুরানো দীন ও মানুষকে হারিয়ে তাই তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন। সন্তানের মঙ্গল কামনায় স্নেহ ভরা আর একটি কবিতা 'বিমল'[১১৩]। কবি শুধু মঙ্গল কামনা করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁর চাঁদ মুখখানি দেখে তৃপ্ত হতেও চেয়েছেন। কবির সীমাহীন স্নেহের প্রাপ্তির ঝুলি পূর্ণ নয়, তাই বারেবারে সন্তানের সান্নিধ্য পেয়ে কবির মন তৃপ্তি পেতে চেয়েছে।[১১৪] কবির জীবন সায়াহ্নে কিছু প্রাপ্তির ভাবনা নিয়ে লেখা কবিতা 'শেষ'। কবিকে একা রেখে তাঁর স্বামী চলে যাওয়ায় কবির কোন সাধ পূর্ণ হয়নি। কবির আশা-

"বড় সাধ ছিল মনে—মরণের বেলা
ধীরে ধীরে কাছে তুমি বসিবে আসিয়া;"[১১৫]

কিন্তু এই সাধ কবির পূর্ণ হবে না কারণ-

"স্বরগে রহিলে তুমি আমি ধরাতলে
সব সাধ ডোবে আজি নয়নের জলে"[১১৬]

সাধ পূরণ হবার কোন অবকাশ আর কবির জীবনে নেই, কবিকে শুধু স্মৃতিই বহন করে বেরাতে হবে।

কবি মানকুমারি বসু ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। স্বভাবতই মধুসুদনের মৃত্যু কবির জীবনে একটা বড় অঘটন। তাঁরই শোকে কবি ব্যাকুল, সেই হৃদয় বেদনাই প্রকাশিত হয়েছে 'কবির শ্মশান' কবিতাটির মধ্যে। শুরুতেই কবি বলেছেন-

"এখানে আসিছ যারা
নীরবে কহিয়ো কথা,
দেখো যেন ভাঙেনাকো
এ গভীর নীরবতা।"[১১৭]

মধুসুদনের সমাধিস্থলে সকলের আগমন ঘটেছে এবং কবি সকলকে নীরব থাকতে বলেছেন। মৃত্যু শোক মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তোলে, গভীর একটা বিষাদে মন

ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাই নীরবতাতেই শান্তি মেলে, গভীর শোকের কারণে কবি মনও নীরবতা খুঁজেছে। কবিতার শেষে কবির আবেদন শোকভরা হৃদয়েরই পরিচয় বহন করে-

"নীরবে ফেলিয়ো অশ্রু,
নীরবে মাগিও বর,
স্বরগে আরামে থাক
শ্রান্ত বঙ্গ-কবিবর।"[১১৮]

মা তাঁর সীমাহীন কষ্টের মধ্য দিয়ে দশ মাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, স্বভাবতই সন্তানের সঙ্গে মায়ের তৈরি হয় নাড়ীর টান। এই সন্তানের মৃত্যু তাই মায়ের কাছে সবথেকে বড় বিপর্যয়। 'বিষাদ'[১১৯] কবিতায় কবির এই করুণ হৃদয়ের মর্মকথা উচ্চারিত হয়েছে। সন্তান চলে গেলে তাঁর স্মৃতি মাতৃহৃদয়কে বড়ই বেদনা দেয়। এই বেদনা কবিতায় অন্য মাত্রা পেয়েছে।

"সে যদি চাহেনি মরতে থাকিতে
গেছে যদি দেবপুরে
তবে কেন মা'র স্মৃতিপটে সদা
তারি ছবিখানি পূরে?"[১২০]

এরকমই কোন এক শিশুর মৃত্যুতে শোকাহত কবি লিখেছেন 'অতিথি'[১২১] নামে শীর্ষক একটি কবিতা। কবির একটি প্রশ্ন ও একটি উত্তরের মধ্য দিয়ে কবিতার সারমর্মটি ধরা পড়েছে।

"তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন ?
তুমি তো "অতিথি" চলিয়া গেলে !!"[১২২]

এছাড়াও এই পর্বে আরও কিছু শোকমূলক কবিতা রয়েছে, যেগুলি কবির সহানুভুতিশীল মনের পরিচয় বহন করে। মানবিক অনুভূতিতে রঙ চরিয়ে, দামি পোশাক পরিয়ে তাঁকে পরিবেশন করার মানসিকতা কবির মধ্যে লক্ষ করা যায় না। এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে কবির মানবিক অনুভূতি ও সামাজিক চরিত্রের একটা ধরন

য়আমাদের স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির 'আমার আতীত জীবন' অংশে এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে কবি জানিয়েছেন-

> "...১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ আমার অন্যতমা শাশুড়ির সহিত নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া বঙ্গবাসিনীগণের পিতৃতুল্য সুহৃদ, বঙ্গভূমির উজ্জ্বলতম রত্ন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত দেহ দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে মৃত দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে কই আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমি বাড়ীতে ফিরিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে তখনই 'শোকোচ্ছ্বাস' শীর্ষক এক গদ্যকবিতা লিখিয়া চির সুহৃদ 'বামাবোধিনী' সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম।"[১২৩]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে মানকুমারী বসু আপন আত্মীয়ের ন্যায় ব্যথিত হয়েছেন বলা যায়। কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে কবির সন্তান প্রীতি, বাৎসল্য ভাব, স্বামী প্রেম প্রভৃতি অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। কবির শুধু নিজের সন্তানের প্রতিই ভালোবাসা ব্যক্ত করার মধ্যে কবিতাগুলি সীমাবদ্ধ থাকেনি। সীমাহীন মাতৃ স্নেহের অপার ভালোবাসার শাশ্বত রূপ কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেক সন্তানের প্রতি তাঁর মায়ের ভালোবাসা কবির বর্ণনার মাধ্যমে সাহিত্যে রূপ পেয়েছে। তাই কবিতাগুলি কালের সীমানা ছাড়িয়ে চিরন্তন হয়ে উঠেছে। পরম স্নেহময়ী কবি মানকুমারী বসুর মানবিক অনুভূতি ধরা পড়েছে এই পর্বের একাধিক কবিতার মধ্য দিয়ে। আলোচ্য কবিতাগুলি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা, তার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা মানকুমারী বসুর মূল্যবোধ ও তাঁর সামাজিক মননের একটা পরিচয় ধরা পড়েছে বলা যায়। উক্ত কবিতাগুলি পাঠ করে মানকুমারী বসু আমাদের কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি আদর্শ চরিত্র হয়ে উঠেছে। শুধু এটাই নয় মানকুমারী বসুর এই স্বরূপের মধ্য দিয়ে সমকালীন প্রত্যয়বাদী একটি সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, পতি-পত্নীর সৌহার্দ আজ কিছুটা হলেও আঘাত প্রাপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে মানকুমারী বসুর আলোচ্য কবিতাগুলির মূল্য কোনোদিক থেকেই অস্বীকার্য নয়

গ) প্রকৃতি ও স্বদেশপ্রেমের কবিতা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বাদেশিকতাবোধ বাঙালিকে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাব্য-কবিতায় তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। আত্মসম্মানবোধ শিক্ষিত বাঙালিকে স্বদেশ ভাবনায় উত্তীর্ণ করেছে- এর মূলে রয়েছে বাঙালির শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন- 'এ সময়ে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা যে যে নূতন দিকে ঝুঁকিল তাহার মধ্যে প্রধান-জাতীয়তাবোধ ও স্বাজাত্যগর্ব।'[১২৪] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্বদেশভাবনার মধ্যে নতুন সংযোজন হল জাতীয়তাবাদী চেতনা। জাতীয়তাবাদী ভাবনা আরও অনেক বেশি নির্দিষ্ট বলা যায়। একটি নির্দিষ্ট জাতির প্রেক্ষাপটে স্বদেশের কল্পনা বা দেশকে ভালোবাসার মধ্যেই জাতীয়তাবাদী ভাবনা সীমিত থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই প্রবণতা গতি লাভ করেছে বলা যায়। মানকুমারী বসুর এই ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রেক্ষাপটে স্বদেশপ্রেমের সুর শোনা যায়। এ বিষয়ে বিকাশ রায় বলেছেন- আমাদের আলোচ্য কবি মানকুমারী বসুর কবিতায় স্বদেশ প্রেম বা জাতীয় চেতনা কতটা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের কিংবা কতটা জাতীয় আন্দোলন প্রসূত ইতিহাস নির্ভর?[১২৫] এই প্রশ্ন অবশ্যই যথাযথ।

স্বদেশপ্রেমের পাশাপাশি প্রকৃতি চেতনাও এই সময়ে কবিদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে এই ভাবনার প্রসার ঘটেছে মূলত বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে। মানকুমারী বসুর কবিতাতেও এই সকল ভাবনা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ফুটে উঠেছে। মানকুমারী বসুর কবিতায় এই প্রকৃতি ভাবনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে আসলে স্বদেশভাবনা। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রেক্ষাপটে দেশের প্রকৃতির মধ্যেও মানকুমারী বসু স্বাদেশিকতা অনুভব করেছেন বলে আমরা মনে করি। আর্য জাতির বংশধর রূপে পুরাতন ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে ঘিরে এই সময় বাঙালি গর্ব অনুভব করেছে এবং এই একই অনুষঙ্গে মানকুমারী বসুর কবিতায় প্রকৃতি স্বদেশের সম্পদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর একই কবিতায় এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কবি মানকুমারি বসু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগের কবি

অর্থাৎ এই আবহের অন্তিমপর্যায়ে তাঁর আবির্ভাব বলা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য এই সময়ের সকল কবির মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যদিও প্রকৃতি তাঁর একাধিক কবিতায় নান্দনিক গুণে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। 'মলয়-বাতাস' কবিতায় প্রাণ জুড়ানো দক্ষিণা বাতাসের স্নিগ্ধতা ফুটে উঠেছে। কবি বলেছেন মলয় বাতাসের আগমনে প্রকৃতির রূপই যেন পালটে যায়। প্রকৃতি যেন ম্লান হয়ে থাকে মলয় বাতাসের অভাবে।

"এত দিন ছিলে কোন দেশ,
কও তাই জানি সবিশেষ;
প্রকৃতি তোমারি তরে,
বেঁচে ছিল ম'রে ম'রে,
জগতে ছিল না কিছু আরামের লেশ;
তুমিই ছিলে না তাই,
সব ভস্ম সব ছাই,
স্নেহের ভবন যেন বড়ই বিদেশ।"[১২৬]

মলয় বাতাসের আগমনে শান্ত, সমাহিত প্রকৃতি মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। জগতের বিচিত্র ও সুবাসিত রূপ ও গন্ধ সে বহন করে বেড়ায়, কবি তাই বলেছেন-

"ফুলের সুবাস বও,
চাঁদের জ্যোছনা লও,
নদীর হৃদয় দাও সুখে মাতাইয়া;
ব্যথিত মানব-গা'য়
সুধা হ'য়ে প'ড় হায়!"[১২৭]

মলয় বাতাস প্রকৃতির রূপকে ব্যাপ্ত করেছে সারা জগৎ-সংসার জুড়ে। প্রকৃতির এই রূপ পাঠকের হৃদয়কে মোহিত করে। 'বর্ষা-সুন্দরী' কবিতায় প্রকৃতির অসাধারণ মোহময় চিত্র ফুটে উঠেছে। কবির বর্ণনায় বর্ষা মূর্ত বা বাস্তবিক হয়ে উঠেছে।

"রাত দিন ঝম ঝম
রাত দিন টুপ টুপ,"[১২৮]

কবির ভাবনা গীতিময়তা লাভ করেছে আলোচ্য কবিতায়। অসাধারণ উপমায় কবি সজ্জিত করেছেন বর্ষার মেঘকে।

"আননে বিজলী-হাসি
গলায় কদম-হার,
আঁচলে কেতকী ছটা
এ আবার কি বাহার!"[১২৯]

শুধু মেঘই নয়, প্রকৃতিও আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে বর্ষার আগমনে। বর্ষার আগমনে ময়ূর পেখম মেলে নাচতে শুরু করেছে, মেঘের গর্জনে ভেকের দল সমস্বরে গেয়ে উঠেছে। পৃথিবী যেন বৈচিত্র্যমূলক আনন্দের আয়োজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কবি এ হেন রূপ কোথাও দেখেননি।

"রাত দীন ঝম-ঝম
রাত দিন টুপ-টুপ,
দেখেছি অনেকতর
দেখিনি তো এত রূপ!"[১৩০]

বারিধারা শুধু প্রকৃতির গ্লানিকেই মুছে দেয়নি, ক্ষুদ্র মানবের প্রাণকেও মাতিয়ে তুলেছে। বর্ষার স্নিগ্ধতা সকলকে যেন এক করে দিয়েছে, মনের সকল গ্লানি ও ক্ষুদ্র চেতনাকে মুক্তি দিয়েছে; সকলকে এক ছত্রে স্থান দিয়েছে। কবি তাই বলেছেন-

"সসীমে অসীমে আজ
হ'য়ে গেল মিশামিশি,
কারে যেন ডাকি নীতি
শত প্রাণ দিয়ে তাই!"[১৩১]

বর্ষার স্নিগ্ধতা প্রকৃতিকে যেমন শস্য-শ্যামলা করে তোলে, তেমনি মানব হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার ঘটায়। বর্ষায় প্রকৃতিও এই প্রেমের বার্তা বহন করেছে, আলম্বন বিভাব হিসেবে প্রকৃতির অপরূপ মাধুর্য মানবচিত্তকে প্রেমের রসে মাতিয়ে তুলেছে। কবিতায় এই

নান্দনিক ভাবনার রসমাধুর্য বর্ষার স্নিগ্ধতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কবি বর্ণনায় তারই সঞ্চার ঘটেছে।

"শরত বসন্ত শীত
জানে শুধু হাসাহাসি,
বরিষা! তোমারি বুকে
অনন্ত প্রেমের রাশি!"[১৩২]

কবি বাংলার বুকে বেড়ে উঠেছেন, তাই বিভিন্ন রূপে তাঁকে দেখার সুযোগ কবির ঘটেছে। কবির সংবেদনশীল হৃদয় তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছে বারে বারে, তাঁর সাহিত্যেও তাই প্রকৃতির বিভিন্ন মোহময়ী রূপ ধরা পড়েছে। 'অন্ধকার নিশি' কবিতায় নিশীথের মাধুর্য ফুটে উঠেছে। অন্ধকার রাত্রির একটা আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে যেটা আলো ভরা দিনের নেই। নিশীথকে ঘিরে সেই সৌন্দর্যের মোহ ছড়িয়ে রয়েছে এই কবিতায়। অস্পষ্টতা ও নিঃশব্দতাকে ঘিরে ঘনিয়ে থাকে এক রহস্য, নিশীথের অন্ধকারেও এই রহস্য মানবমনকে ব্যাকুল করে। দিনের আলোয় এই রহস্যময় সৌন্দর্য তিরোহিত হয়, আর এটাই কবির মনে গভীর ছাপ রেখেছে। কবি মনের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে কবিতাটিতে।

"চাই না ঊষার হাসি, আলো চাঁদিমার,
চাই না জলদ-কোলে
সোণালী চপলা দোলে,
চাই না গগনে তারা হীরকের হার;
ঢালো—ঢালো অমা! ঢালো
আঁধার আঁধার কালো,
আঁধারে যোগিনী-বেশ প্রকৃতি-বালার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য মিশাইয়া করে একাকার!"[১৩৩]

কবি দিনের আলোর স্পষ্টতা চান না, তাই নিশীথের অন্ধকারকে কামনা করেছেন। 'ঊষা-সমাগমে' কবিতায় ঠিক এর বিপরীত ছবিটি ধরা পড়েছে। ঊষার উদয়ে প্রত্যুষের

মাধুর্য কবির চোখ এড়িয়ে যায়নি, প্রভাতের স্নিগ্ধতা কবি হৃদয়কে জারিত করেছে। আর তাই কবি বলেছেন-

"হেরি ও রূপের ছটা
জুড়ায় নয়ন-প্রাণ,
অঙ্গের মাধুরী কিবা
আনন্দে পুরিছে ঘ্রাণ!"[১৩৪]

কবির কল্পনা গুণে আলোচ্য কবিতাটি সার্থক গীতিকবিতা হয়ে উঠেছে। প্রত্যুষের ঊষাকে বাংলা সাহিত্যে একাধিক কবি বিভিন্ন রূপে চিত্রিত করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনাতেই 'ঊষা' নব নব হয়ে ধরা দিয়েছে। কবি মানকুমারী বসুর বর্ণনাতেও ঊষা বিচিত্র রূপে ধরা দিয়েছে। কবির বর্ণনা এখানে আমাদের বিশ্লেষণের থেকেও অধিক গুরুত্ব রাখে।

"আহা! কি ললিত রাগে
ভরিয়াছে সপ্ত-স্বরা!
ব্যজন করিছ যেন
স্বরগের সুধাভরা।

"অমনি সোণার মুখ
আমি বড় ভালবাসি,
মলিনতা লেশ নাই
কথায় কথায় হাসি!"[১৩৫]
অথবা

"এমন মনের মত
কে তোমারে সাজাইল?
অমূল্য রতন এত
কাহার ভান্ডারে ছিল?"[১৩৬]

ঊষা ললিত রাগে এই জগৎ সংসারকে সপ্তসুরে ভরিয়ে দিয়েছে যেন, তাই কবি তাঁকে শিশুকন্যা রূপে কল্পনা করেছেন। কবি ঊষার রূপের প্রশংসা করে বলেছেন, যে জন

তাঁকে এমন ভাবে সাজিয়েছে ধন্য তাঁর কারিগরি। ঊষার আগমনে প্রকৃতি যেমন জেগে ওঠে, তেমনি জেগে উঠেছে তার কোলে ঘুমিয়ে থাকা পাখিকূল। প্রভাতে তাদের কলস্বর ছড়িয়ে পড়েছে ঊষার উষ্ণ আলোর মতো করে। প্রকৃতির এই সৃষ্টিও মানুষের মনকে মাতিয়ে তোলে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য নিয়ে লেখা আর একটি কবিতা 'প্রভাতি-চাতক'। আলোচ্য কবিতায় প্রভাত চাতকের বর্ণনা পাঠকের মনকে নান্দনিক রসে ভরিয়ে দিয়েছে।

"মধুর কাকলী মুখে,
খেলিছ মনের সুখে,
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুড়ায়!
সুনীল গগন-কোলে
কাঞ্চনের ফোঁটা দোলে!
সজীব কুসুম যেন পবনে উড়ায়!"[১৩৭]

প্রভাত চাতকের কূজনে মানব সংসার মোহময় হয়ে উঠেছে। প্রভাতের কিরণে সেই কূজন যেন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কবির বর্ণনায় সেই চিত্রকল্প ধরা পড়েছে—

"ওই যে চাতক তুমি,
প্রভাতি কিরণ মেখে কর ঝলমল;

"কে যেন অমৃত- ধারা ঢালিছে ধরায়;
ছুটিছে অমৃত- রাশি
অমৃত- হিল্লোলে ভাসি,
অমৃত- তুফানে যেন মন ভেসে যায়।"[১৩৮]

চাতকের সুললিত গীতি আমাদের কানে অমৃতধারা বর্ষণ করেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবির প্রতিভা সত্যই প্রশংসাযোগ্য। 'আমাদের দেশ' কবিতায় বাংলার শ্যামল, স্নিগ্ধ প্রকৃতিকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন-

"আমাদের দেশ তারা! "সুজলা" সুফলা"

ছয় ঋতু যায় আসে,
চাঁদ ফোটে রবি হাসে,
আমাদের দেশে করে সুরধুনী খেলা;
বনে শোভে রাঙা ফুল,
গাছে গাছে পাখিকুল,
আমাদের দেশে হয় স্বভাবের মেলা;
কোথাও নগর, বন,
কোথা দেব-নিকেতন,
কোথাও শ্মশান, কোথা জলধি অতলা;"[১৩৯]

বাংলার এই শ্যামল বিচিত্র রূপ একাধিক বার বিভিন্ন কবির বর্ণনায় উঠে এসেছে, তবে এ ব্যাপারে কবির দৃষ্টিভঙ্গিও উল্লেখযোগ্য। শীতের পর বসন্ত প্রকৃতিকে নব রূপে সাজিয়ে তোলে তার মাধুর্য দিয়ে। তাই কবিদের কাছে বসন্ত ঋতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবির ভাবনাতেও বসন্ত কাব্যিক রূপ পেয়েছে 'বসন্ত-সুহৃদ' কবিতাটির মধ্য দিয়ে। বসন্তের সৌন্দর্য কবিতার শুরুতেই ফুটে উঠেছে-

"জগতে এসেছ যদি
দীন কত যাও থেকে,
জুড়াব দগধ চিত
ওই হাসি-মুখ দেখে।"[১৪০]

বসন্ত সকলের জীবনেই মধুর বার্তা বয়ে আনে, তাই জগৎ সংসারের সকলের কাছেই বসন্ত প্রিয়। কবিও বসন্তকে তাই না ভালোবেসে থাকতে পারেন না। বসন্তের আগমনে দেহের সমস্ত জ্বালা যেন মিটে যায়। মনের জ্বালাও জুড়িয়ে যায়, তাই কবি বলেছেন-

"তোমারি মলয়া-বা'য়
পেয়েছি নবীন প্রাণ,
গড়িছে ভগন হৃদি
তোমারি বিহগ তান!"[১৪১]

বসন্ত মানব মনে যেন কখনো ক্লান্তি আসতে দেয় না। কবি তাই বসন্তকে চিরদিন ধরে রাখতে চেয়েছেন। বসন্তের মাহাত্ম্য শেষ হওয়ার নয়, তাই কবি বলেছেন-

"বাহিরে আসিবে গ্রীষ্ম
তপনে তাপিবে ভূমি,
ভিতরে জাগিও মোর
সোণার বসন্ত তুমি।"[১৪২]

কবি বসন্তকে 'সোণা' সম্বোধনে ভূষিত করেছেন। বসন্তের অমোঘ চিত্র যেমন আলোচ্য কবিতায় ধরা পড়েছে, তেমনি আবার বসন্তকে ঘিরে কবির ভাবনা শাশ্বত ও নান্দনিক হয়ে উঠেছে। এখানেই এই কবিতাটির যথার্থতা।

মানকুমারী বসুর কাব্যধারায় প্রকৃতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। তিনি শুধুমাত্র ক্ষণিকের তরে সৌন্দর্যের প্রতি মোহিত হয়ে দু-একটি প্রকৃতির কবিতা লিখে ক্ষান্ত হননি। প্রকৃতি আসলে কবিকে কাছে টেনে নিয়েছে, আর তিনিও বার বার তাঁর কাছে ছুটে গেছেন। 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের 'প্রভাতী', কবিতাটিতে রাগ ও লয়ের উল্লেখ আছে- মিশ্র কাফি-একতালা[১৪৩] । কবিতাটি শুধুমাত্র প্রভাতের ঊষাকে ঘিরে; কবি তাঁর সৌন্দর্য ভাবনা দিয়ে ঊষার বিচিত্র রূপকে শিল্প সমন্বিত করে তুলেছেন। এখানে ঊষা কবির মনের বিলাসে কল্পিত হয়েছে।

"সোণার সুমেরু-শিরে
দুয়ার খলিয়া যায়,
জাগিয়া বালিকা ঊষা
পরিছে রতন-ভূষা,
পড়িছে কনক-ছটা,
আঁধার জগত-গায়।
প্রকৃতির ঘুম ভাঙা
নয়ন অলস রাঙা,
মল্লিকাফুলের মতো
হাসিটী ভাসিছে তা'য়;"[১৪৪]

নূতন দিনের শ্যামল আভা নিয়ে ঊষার আগমন। তাঁর আগমনে প্রকৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, নিশার নীরব ঘরে ঊষা কোলাহল বয়ে এনেছে। আবার তাঁরই প্রেরণায় গোলাপ উল্লসিত হয়ে গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। মানবগণও স্নেহ-প্রীতি-মমতা নিয়ে সংসারে নূতন করে তার প্রাণের স্পন্দন ছড়িয়ে দিয়েছে। কবির প্রাণও জেগে উঠেছে ক্ষুদ্র গণ্ডির বন্ধন ভেঙে। তাই কবি বলেছেন-

"এ ক্ষুদ্র জীবন মম,
স্ফুট-সূর্যমুখী-সম"[১৪৫]

এ ভাবনা অকল্পনীয়, কবি ঊষাকে প্রাণের দ্যুতি হিসেবে কল্পনা করেছেন। আর তাতেই ঊষা চিরসত্য হয়ে কবি ভাবনায় সৌন্দর্যের আধারে পূজিত হয়েছে।

তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ণনাধর্মী। স্বাদেশিকতাবোধের দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন বলে তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি বর্ণনাধর্মী হয়ে উঠেছে বলে আমাদের মনে হয়। এছাড়াও তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি পাওয়া যায়। এটাই মানকুমারী বসুর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বলে আমরা মনে করি।

মানকুমারী বসুর কবিতায় গভীর ভাবের অভাব রয়েছে বলে সমালোচকরা মত পোষণ করেছেন। তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার ক্ষেত্রেও একথা কতকটা সত্যি। কিন্তু কবি মানকুমারী বসুর এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে উচ্চ ভাব বা দর্শনের আধিক্য না থাকলেও গভীর সংবেদনশীলতার ছাপ অবশ্যই রয়েছে। 'আমাদের দেশ' কবিতায় স্বদেশ এবং স্বদেশের মানুষের প্রতি সহমর্মিতার বোধ উচ্চারিত হয়েছে। কবি বলেছেন-

"ভবের মানুষ ভাই!
নিয়ত উন্নতি চাই,
তাই শুধু দুখ জ্বালা ভাবনা অশেশ;
উন্নতি কি অবনতি,
কি করি কি হয় গতি,

জানি না বুঝি না তবু করি এই ক্লেশ-
যা' হোক, "আমরা" তারা! আমাদের দেশ"[১৪৬]

সকল মানুষ নিজের উন্নতি চায়, চায় ভালো থাকতে। তবু দুঃখ জ্বালা তাঁকে গ্রাস করে। চারিদিকে শুধুই অবনতি আর বিষণ্ণতা। এতদসত্ত্বেও কবি এই দেশ ও মানুষকে নিজের বলে অনুভব করেছেন। এই দেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধার অন্ত নেই, তাই কবি জানিয়েছেন-

"কোথায় আমার বাস শুন সবিশেষ,
মরতে অমরাবতী আমাদের দেশ;"[১৪৭]

এটুকু বলেই কবি থেমে থাকেননি। আলোচ্য কবিতাটিতে দেশের মানুষের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির জাতিপ্রীতির এক অমোঘ নিদর্শন এই কবিতাটি। স্বজাতি সম্পর্কে কবির অভিমত-

"মলয়জ-শীতলা" সে আমাদের দেশ,
আমাদের দেশী লোক,
বুক-ভরা কত শোক,
নাই সুখ, নাই যেন আরামের লেশ।
সদা ভোগে কর্ম্মভোগ,
দেহে ভরা নানা রোগ,
বয়স না হ'তে কুড়ি, আগে পাকে কেশ!
জাতিতে পুরুষ যারা,
লিখি' পড়ি' হাড়-সারা,
ভাই ভাই দলাদলি সদা হিংসা দ্বেষ;"[১৪৮]

জাতির কথা বলতে গিয়ে কবি নিজের জাতির একাধিক নেতিবাচক দিকের কোথাও জানিয়েছেন। কিন্তু সেগুলি আসলে বাঙালির নিজস্ব ঘরানা, আর তা বলতে গিয়ে কবি ব্যঙ্গ করেননি। বাঙালির স্বরূপ বর্ণনায় কবির অকৃপণ হস্তের লেখনি আমাদের চমকিত করেছে। উদ্ধৃতিগুলির ছত্রে ছত্রে মিশে রয়েছে কবির গভীর আন্তরিকতাবোধ। জাতির

প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও গভীর নিরীক্ষণের কারণেই কবির সৃষ্টি প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে পেরেছে। নারীর পরিচয় প্রসঙ্গেও কবির স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনার প্রকাশ লক্ষণীয়।

"আমাদের দেশে নারী বিচিত্র-মূরতি
লক্ষীরূপা হয় কেহ,
কেহ অলক্ষীর গেহ,
কারো বা সপক্ষ কারো বিপক্ষ ভারতী;
জ্ঞানে অন্ধ, ধর্ম্মে কাণা,
যুক্তিহীন তর্ক নানা,
উপধর্মে রত সদা অকর্ম্মে ভকতি;"[১৪৯]

দোষে গুণে মানুষের চরিত্র তৈরি হয়। নিজের জাতির শত দোষ থাকলেও মাতৃভূমিকে অস্বীকার করা যায় না । কবিতার শেষ অংশে কবির নির্লিপ্ত স্বীকারোক্তি-

"বাঁচি তো আসিব ফিরে- মনে রেখ শেষ,
"বাঙ্গালা মুলুক" ভাই! আমাদের দেশ!"[১৫০]

বিপুল জনজাতির নেতিবাচক ক্রিয়া-কর্মের ভিড়েও কবি ক্লান্ত হননি। বরং দম্ভ ভরে এই মাটিতেই পুনরায় ফিরে আসার কথা জানিয়েছেন। কারণ তা 'আমাদের দেশ'। আলোচ্য কবিতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতিয়তাবাদী ভাবনার প্রকাশ লক্ষণীয়। এই জাতীয়তাবাদী ভাবনাই বাঙালির স্বদেশপ্রেম। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বাংলাকে ঘিরেই তাঁর স্বদেশভাবনাকে লালন করেছেন। কতকটা একই ভাবের পুনরুক্তি ঘটেছে 'মায়ের সাধ' কবিতাটিতে। এখানে কবি দেশ মাতৃকাকে স্মরণ করে তাঁর দুঃখের কথা নিবেদন করেছেন। কবি নিজে মায়ের স্থান গ্রহণ করে দেশের সন্তানকে রক্ষা করতে চেয়েছেন-

"ঘুমে ঢল ঢল শিশু দুরবল
পঞ্চবিংশ কোটি-আঁচলে রাখি',
এ আঁধার রাতি, জ্বালি আশা-বাতি,
আমি অভাগিনী জাগিয়া থাকি।"[১৫১]

কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে কিছু সরল বাণী, এখানে কবি দেশ-মাতৃকার কণ্ঠেই কিছু প্রশ্ন করতে চেয়েছেন।

"বিষাদ-বিবাদ-দলাদলি যত
এক দিন তোরা যাবি কি ভুলে?
"ভাই-ভাই" বলি হ'য়ে গলাগলি
দিবি ভালোবাসা মরম খুলে?"[১৫২]

অনন্ত দুঃখকে মুছে দিয়ে একসঙ্গে বাঁচার বাণী কবির স্বদেশপ্রেমের ভাবনাকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। স্বদেশের সন্তানদের অক্ষমতা ও দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার প্রেরণা জুগিয়েছে এই কবিতাটি। মানকুমারী বসুর 'আমরা কারা?' কবিতাটি স্বদেশপ্রেমের আর একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। কবিতায় প্রথম অংশে কবি প্রশ্ন করেছেন আমরা কারা? আমরা আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতিকে ভুলে ভিন্ন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তাই কবি কণ্ঠে আক্ষেপের সুর।

"আমরা কা'রা?-
দেহ জীর্ণ বাস,
মর্ম্মভেদী বহে শ্বাস,
সুখ-সাধ শান্তি সব হয়েছি হারা
কি দেখে চিনিবি ভাই! আমরা কা'রা?

"আমরা কা'রা?-
নির্ম্মেমের সেবা-রত,
অক্ষমের পদানত,
অধমের মন তুষি, হায় মা তারা।
অর্থলোভী স্বার্থপর,- আমরা কা'রা?"[১৫৩]

উপনিবেশীয় শিক্ষা আমাদের আদব-কায়দা ও সভ্যতাকে ক্ষয়িষ্ণু করেছে। আমরা বিদেশী বুলি শিখতে গিয়ে মাতৃভাষাকেই ভুলতে বসেছি। কবি বলেছেন- 'জ্ঞান ভাবি অজ্ঞানতা করেছি খাড়া,'।[১৫৪] তাই কবির আক্ষেপ কেমনে আজ জানাব আমরা কারা? কবি আবার আক্ষেপের সুর নরম করে আমাদের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছেন গর্বভরে।

"আমরা কা'রা?-
যাদের দরপ-ভরে
অবনী গরব করে
আকাশে হাসিত শশী তপন তারা,
কেমনে কহিব হায়-আমরা তা'রা!"[১৫৫]

আমাদের সব ছিল, কিন্তু নিজেদের বিলাসী চেতনায় তা অবনমনের ধারায় বয়ে গেছে। তাই জাতির চেতনাকে কবি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন,তাঁকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর নিজস্ব স্বরূপ।

"আমরা তা'রা?-
মুছ ভাই! আঁখিজল
শুন্য বক্ষে কর বল,
ত্রিশ কোটি একেবারে যাবে না মারা,
কলমে জনমে তরু-- আমরা তা'রা!"[১৫৬]

কবিতাটিতে জাতির প্রতি আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে আবার গর্বভরে কবি নিজেদের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন। পূর্বপুরুষদের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য যেমন বিষাদ রয়েছে, আবার প্রেরণা দিয়ে পুনরায় উত্তরণের স্বপ্নও কবি দেখিয়েছেন। জাতিপ্রীতির এ এক বিরল নিদর্শন। নিজেদের জাতাভিমান ভুলে যাওয়ার জন্য কবি একদিকে আক্ষেপ করেছেন, আবার জাতির উন্নত প্রজ্ঞাবাদী, নৈতিক, সরল জীবনচর্চার ইতিহাসকে অহংকারের সঙ্গে জগতের কাছে তুলে ধরেছেন। আমাদের কর্মশক্তিকে উচ্চশিরে ঘোষণা করে জাতির মর্যাদার শৌর্য পতাকাটিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। নিজের জাতির ও স্বদেশের প্রতি এই ভালোবাসার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় রয়েছে। 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটিতেও কতকটা একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। কবিতার শুরুতেই জাতির অভ্যুত্থানের উপায় নিয়ে কবির চিন্তাভাবনা ব্যক্ত হয়েছে।

"সখি! সে অমূল্য নিধি কোন খানে পাইব?-
যাহার পরশ পেয়ে,

ভারতের ছেলে মেয়ে,
ত্যজিয়া এ মোহনিদ্রা, এক সনে জাগিব,
সখি! সে অমূল্য নিধি কোন খানে পাইব?"[১৫৭]

কবি সকলে মিলে একসঙ্গে থাকার ও বাঁচার স্বপ্নকে লালন করেছেন আলোচ্য কবিতায়। সকলকে এক ভূমিতে দাঁড়িয়ে দেশ মাতার আরাধনা করতে বলেছেন কারণ সকল স্বদেশবাসীকে কবি ভাই-বোন মনে করেন। কবি কামনা করেছেন কবে অসহায় দেশবাসীর দীনতা মিটিয়ে দিতে পারবেন, আর তাতেই তাঁর এ জীবন ধন্য হবে।

"সবার একই লক্ষ্য, এক মারে পূজিব!-
সে দীন- সে শুভদিন কবে সখি! পাইব?

"সখি! সে সোণার দীন কত দিনে পাইব?-
দীন দুঃখী যথা আছে,
যাইয়া তাহার কাছে,
আপন মুখের গ্রাস তার মুখে তুলিব,"[১৫৮]

জাতিপ্রীতির এই বাণী স্বদেশবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাটি প্রত্যেক ব্যক্তির জাতিপ্রীতির অনুভূতিতে নিঃসন্দেহে প্রেরণা জোগাবে। তাই বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে মানকুমারী বসুর এই পর্যায়ের কবিতাগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ঘ) প্রশস্তি ও স্মরণমূলক কবিতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে একাধিক মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের কবিতায় মহান ব্যক্তিদের মহৎ বাণীগুলি উচ্চারিত হয়েছে বারেবারে। শ্রেষ্ঠত্বের কাছে তাঁরা মাথা নত করতে দ্বিধা করেননি। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি নিবেদন করেছেন এবং নিজেদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের স্মরণ করে সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। কবি মানকুমারী বসুর সাহিত্যে এ ধরণের একাধিক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবি এই সমস্ত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন তাঁদের কর্ম, সৃষ্টি বা উন্নত চিন্তা-ভাবনার গুণে। আর এই গুণগুলিকেই মূলত কবি স্মরণ করেছেন বা

গুণগুলির প্রতি তিনি প্রশস্তি নিবেদন করতে চেয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিবাদী সমাজে এই সকল ভাবনা ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু হয়েছে, সেখানে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছে বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের চিত্রটি ঠিক এর উল্টো। কবি মানকুমারী বসুর কবিতায় গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই এই ভাবধারা প্রমাণিত হয়ে ওঠে। কবির বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে এই ধারার একাধিক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কোনো কবিতায় মহৎ ব্যক্তির প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করেছেন, আবার কখনো মৃত্যুর পরে তাঁদের স্মরণ করেছেন। তাঁর এই পরলোকগমন হেতু রচিত কবিতাগুলি আমাদের আলোচনায় 'শোকধর্মী' কবিতা হিসেবে স্থান পেয়েছে, আবার ওই একইকবিতা স্মরণমূলক কবিতাতেও আলোচিত হয়েছে। অবশ্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি স্বতন্ত্রপর্যায়ের কবিতাকে বিশ্লেষণ করেছি। শোকধর্মী কবিতাগুলিতে মূলত মৃত্যুর ফলে কবি মনের নিবিড় দুঃখ ভাষা পেয়েছে। আর স্মরণমূলক কবিতায় মূলত কবি কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি, কর্ম, চিন্তন প্রভৃতি গুণের মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করতে চেয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারাই একই কবিতাকে দুটি পর্যায়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'শোকোচ্ছ্বাস' কবিতাটি ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে লেখা।[১৫৯] গঙ্গাদাস বাবু হলেন সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাই এখানে কবি তাঁর কর্মকে স্মরণ করেছেন-

"ধর্ম্মশীল সত্য প্রাণ,
জিতেন্দ্রিয় সুবিদ্বান,
লক্ষ্মী-সরস্বতী সদা ঘরে বিরাজিত;
স্বদেশ-কল্যাণে রত,
উচ্চ সাধ অবিরত,
কোমলতা-মধুরতা মরমে পূরিত!"[১৬০]

ডাক্তার হিসেবে তিনি আপামর জনজাতির সেবা করেছেন। তাঁর সেই নিরলস সেবাকে কবি শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছেন আলোচ্য কবিতার মধ্য দিয়ে। সেই মহান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ কবি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন । কবিতার শেষ অংশে তাই কবি জানিয়েছেন-

"যাও তবে যশোধাম,
যেথা সে স্বরগ নাম—
অজর অমর দেশে সুখ-শান্তিময়;
রোগ-শোক-তাপ-শূন্য
আনন্দ-অমৃত পূর্ণ,
ধার্ম্মিককুলের চির-পবিত্র আলয়!"[১৬১]

সমকালীন সময়ের মহিলা কবিদের রচনা সম্পর্কে সমালোচকগণের অভিমত, 'ঠিক প্রেমের কবিতা তাঁরা লেখেননি। তবে প্রয়াত স্বামীকে স্মরণ করে শোকের অভিব্যক্তি তাঁদের কবিতার একটা বড়ো লক্ষণ ছিল।'[১৬২] কবি মানকুমারী বসুও তাঁর একাধিক কবিতায় স্বামীকে স্মরন করেছেন। যদিও শোক অনুভূতি থেকেই কবি তাঁর স্বামীকে স্মরণ করেছেন কিন্তু স্মরণ প্রসঙ্গে তাঁর স্বামীর কর্মজীবন, কবির জীবনে তাঁর অবদানের দিনগুলির স্মৃতি কবিতাগুলিতে ফুটে উঠেছে। 'পূর্ব্ব-স্মৃতি' কবিতাটি তারই দৃষ্টান্ত। কবি এখানে তাঁর স্বামীর চলে যাওয়াকে কৃষ্ণের রাধাকে পরিত্যাগ করে মথুরা গমনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিতাটির নামকরণও এই দৃষ্টিকোণ থেকে সার্থক হয়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি। অতীত দিনের স্মৃতি কবির ভাবনার গুণে শৈল্পিক রূপ পেয়েছে।

"মুখোমুখি দু'টী পাখা
তুলিল করুণ তান,
এমনি সময়ে শ্যাম
গাহিল বিদায়-গান!"[১৬৩]

যখন কবির কাছে আসার সময় হয়েছে, তখনই কবির স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। স্বামীকে স্মরণ করার প্রসঙ্গে কবির সেই শূন্য মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে।

"শূন্য বুকে শূন্য মনে
কেবলই রয়েছি মরি,
তার সে অমৃতমাখা
স্মৃতিটুকু প্রাণে ধরি!"[১৬৪]

কবির স্বামী কর্মসূত্রে সাতক্ষীরায় বসবাস করেন। স্বামীর মৃত্যুর তেরো বছর পর সাতক্ষীরায় গিয়ে কবি তাঁকে স্মরণ করেছেন।

"তুমি যে এসেছ চলি;
"ত্বরায় আসিব বলি,"
ত্রয়োদশ বর্ষে ফিরে গেলে না তো আর!
হায় দেবতা আমার!"[১৬৫]

কবিতাটিতে যদিও শোকভাবই মুখ্য, তবু বলা যায় স্বামীকে ভেবে পুরানো দিন, অতীত ভালোবাসা নতুন করে কবি স্মরণ করেছেন।

'উচ্ছ্বাস' কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের উদ্দেশ্যে কবি প্রশস্তি নিবেদন করেছেন। কবিতাটি মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত হয় বলে জানা যায়।[১৬৬] বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের অবদান ইতিহাস তৈরি করেছে। সেই কৃতিত্বের কথা মাথায় রেখে কবি সেই মহান ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রশস্তি নিবেদন করেছেন-

"স্বভাবের শিশু, "বং-কবিকুলেশ্বর"
বাল্মীকির প্রিয়ানুজ, বঙ্গের হোমর,
আজি তাঁরে সমাদরে
বংবাসী পূজা করে!
পাষাণে চিত্রিত ওই সমাধি-উপর—
"শ্রীমধুসূদন দত্ত অক্ষয় অমর!""[১৬৭]

অথবা

"দিবাকর-কর দিয়া
পড়িতেছে ছড়াইয়া,
সন্মুখে স্মরণ-স্তম্ভ উচ্চরবে কয়—
"শ্রীমধুসূদন দত্ত অক্ষয় অমর।" "[১৬৮]

কবি মধুসূদন দত্তের অবদান আমাদের নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কবি মানকুমারী বসু সকলসময় ব্যক্তির মহত্ত্বকে উপযুক্ত জায়গা দিয়েছেন। এখানে তিনি কবিবরের সৃষ্টিকে স্মরণ করে তাঁর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন।

"যার "মধুধ্বনি" শুনি মোহিল ভুবন,
কেমনে ভুলিবে বঙ্গ সে "মধুসূদন"?
নিয়ত সে বীরনাদ
নিনাদিছে "মেঘনাদ,"
"বীরাঙ্গনা" "ব্রজাঙ্গনা" চমকিছে মন!
ভুলিলে কি বঙ্গমাতা "আঁচলের ধন"?"[১৬৯]

এর উত্তর অবশ্যই না, বঙ্গবাসী কখনোই ভুলবে না এই মহান মানবকে। কবির বাক্যসজ্জার ধরন থেকে ইতিবাচক উত্তর উঠে এসেছে। আলোচ্য কবিতার মধ্য দিয়ে মানকুমারী বসু বাঙালির মনে মধুসূদন দত্তের গুরুত্ব কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে আমরা মনে করি।

কবি মধুসুদন দত্তের স্মরনে লেখা আর একটি কবিতা হল 'কবির শ্মশানে'। মাইকেল মধুসুদন দত্তের দ্বাত্রিংশ সাংবৎসরিক বন্ধু সমাগম উপলক্ষ্যে সমাধি স্থলে কবিতাটি পঠিত হয়।[১৭০] আলোচ্য কবিতাটিতেও মধুসূদন দত্তের প্রতি কবি প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করেছেন।

"ভারতীর বর পুত্র,
কাব্য-কমলের রবি,
বং-কবি-শিরোমণি—
শ্রীমধুসূদন কবি;"[১৭১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবি কামিনী রায়ের[১৭২] প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করে লেখা কবিতা 'অভিনন্দন'[১৭৩]। কামিনী রায় কবি মানকুমারি বসুর প্রায় সমসাময়িক। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনেও কবি অকৃপণ। তিনি কবিতার ভাবে কামিনী রায়ের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিয়েছেন । কবি বলেছেন-

"ভাসিছে পূর্বাকাশে
তোমারি পূরবী তান,
মরমে পশিছে মোর

শিহরি উঠিছে প্রাণ!
জাগিয়া স্বপনে শুনি
তোমার অমিয় বাঁশি,
মনে মনে পূজি তাই
প্রাণে প্রাণে ভালবাসি।"[১৭৪]

মহান ব্যক্তিদের প্রতি সামাজিক সম্মান ও মহত্ত্ব জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কবিতাগুলি ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে বলে আমরা মনে করি।

'বিভূতি' কাব্যগ্রন্থের 'রাজেন্দ্রনাথ' কবিতাটি লেখা হয়েছে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের স্মরণার্থে।[১৭৫] রাজেন্দ্রনাথ বাবুর মৃত্যুতে সমাজের শূন্যতা কবি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। রাজেন্দ্র বাবু হলেন আলস্য ঔদাস্যহীন একজন ব্যক্তি, কর্তব্যকর্মে তিনি কোনোদিন ফাঁক দেননি । তাই কবি তাঁকে স্মরণ করে লিখেছেন-

"স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায়?
পরের মঙ্গল তরে
খাটিলে সহস্র করে
ব্যথিতে টানিয়া নিলে স্নেহার্দ হিয়ায়;
উদ্যমী, সংযমী, যতি,
বিশ্বের কল্যাণ ব্রতী
অতুল অমূল্য ধন,দীন বাঙ্গালায়!"[১৭৬]

আবার কবি তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন-

"সত্য ধর্মে সদা মতি,
বিজ্ঞতায় বৃহস্পতি,
শান্ত ধীর যুধিষ্ঠির লক্ষ্মণের প্রায়।"[১৭৭]

পঙক্তির ছত্রে ছত্রে ব্যক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এমন মানবকে কবি অমরত্ব দান করতে চেয়েছেন আলোচ্য কবিতার মধ্য দিয়ে। কবি খুব প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচ্য কবিতায় ঐতিহাসিক শব্দবন্ধের ব্যবহার করেছেন। রাজেন্দ্রনাথ বাবুর প্রতি কবির শ্রদ্ধার ব্যপ্তি কবিতার শেষ ছত্রে নিবিড় ভাবে ধরা পড়েছে।

"কর্মে বুদ্ধি, মর্মে বল, সেবক সেবায়,
তোমার অমর স্মৃতি,
প্রাণের পবিত্র-গীতি,
পূজিব হৃদয়-রক্তে নিত্য নিরালায়;
যাও বাবা, মার কলে স্বর্গ অমরায়।"[১৭৮]

'স্বাগত' কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনা উপলক্ষে লেখা।[১৭৯] ত্রিপদী আকারে লেখা কবিতাটিতে কবি মানকুমারী বসু বিশ্বকবিকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করেছেন।

"স্বাগত হে দেশের বাঞ্ছিত!
চেয়ে আছে মাতৃভূমি, কখন আসিবে তুমি
লইয়া ভরসা, বল, অমিয় সংগীত;
কবীশ আহ্বানে কবে, গাহিবে আনন্দ রবে,
মৌন বন বিহঙ্গেরা পুলক-পূর্ণিত!"[১৮০]

যে দেশে চোদ্দ বৎসর পরে রামচন্দ্র ফিরে এসে মা কৌশল্যাকে বন্দনা করেছে, সেদেশেই এই মহান কবির আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর জন্মের প্রেক্ষাপট বোঝাতে গিয়ে কবি বলেছেন-

"কি বলিব— ভয় দাত্রী, এসেছিল কাল রাত্রি,
শব্দময়ী ধরা ছিল দারুণ স্তম্ভিত,
মানব খোলেনি আঁখি, ডাকেনি একটি পাখি,
ঝিঁঝিঁ, ভেক সব ছিল আতঙ্কে মূর্ছিত!
সহসা দেবের বর, দেখিনু অরুণ কর!—
অমনি পূর্বাশা-শিরে রবি সমুদিত!—
অমনি আকাশ ধরা, হইল আলোক ভরা,
সঞ্জীবন মন্ত্রে যেন বিশ্ব জাগরিত!"[১৮১]

তাঁর আগমনে বাঙালির আশা জেগে উঠেছে, জড়তার অবসান কেটে জগৎ যেন জীবিত হয়ে উঠেছে। তাই কবি সম্বোধন করে বলেছেন-

"এস নিয়ে পরাক্রম, দৃপ্ত নিদাঘের সম,
রবির উজ্জ্বল আলো হোক উদ্ভাসিত;"[১৮২]

বিশ্বকবির কৃতিত্ব বাঙালির জীবনে কম নয়, কবি একথা আমাদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। বাঙালির বাঁচার প্রেরণা হয়ে উঠেছেন তিনি। কবির বন্দনা তাই কোনোভাবেই অমূলক নয়। 'স্মৃতি-পুজা' কবিতাটি মধুসূদনের সমাধির স্মৃতিউৎসব উপলক্ষে রচিত।[১৮৩] একপ্রকার স্মরণ করেই লেখা হয়েছে উক্ত কবিতাটি। কবিতাটি শেষ হয়েছে অবশ্য তাঁর প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করে-

"গাই তবে প্রাণ খুলে কাঁপায়ে গগন;
"বঙ্গের গৌরব কবি শ্রীমধুসূদন ।"[১৮৪]

সারা কবিতা জুড়ে গভীর কোনো ভাব ফুটে না উঠলেও, বঙ্গজুড়ে কবিবরের উপস্থিতি সগর্বে ঘোষিত হয়েছে। পুরো কবিতাটি প্রশ্নবোধক বাক্যে সজ্জিত হয়েছে, প্রশ্নের উত্তর মধুসুদনের প্রতি ধাবিত হয়েছে।

"কার এ সুদীর্ঘ শ্বাস উঠিছে উচ্ছ্বসি
নীরবে শোকের ভরা আকুল পবনে?"[১৮৫]

এর উত্তর শ্রীমধুসূদন। বঙ্গমাতার কোল থেকে তিনি আজ নির্বাসিত, তাই বঙ্গমাতা তাঁকে খুঁজে ফিরছে। এই সন্ধান আসলে কবির এবং এর উদ্দেশ্যমুখ হল পাঠক।

বামাবোধিনী পত্রিকার লেখিকা কুমুদিনী রায়ের শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁকে স্মরণ করে রচিত হয়েছে মানকুমারী বসুর 'আত্মঘাতিনী' কবিতাটি।[১৮৬] বামাবোধিনীতে একাধিক মহিলা[১৮৭] কবি সাহিত্য রপচনা করেছেন। পত্রিকাটি নারী সমাজের একটি সংস্কৃতি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। পারস্পরিক প্রীতি-মমতার বন্ধনে তাঁদের প্রত্যকের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। সেই ভালোবাসার প্রেক্ষাপটেই কবি তাঁকে স্মরণ করেছেন-

"কত প্রাণ তার লাগি,
আনন্দে উঠিত জাগি,
কত আঁখি তার দুখে
ঝরিত নির্জনে,"[১৮৮]

কবি আরো বলেছেন সকল কিছু ভুলে জীবনকে পায়ে দলে অনায়াসে সে চলে গেল। আজ সে শুধু স্মৃতিতেই বেঁচে আছে। এই ধারার আরো একটি কবিতা 'বিয়োগ-বিলাপ',[১৮৯] স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকে স্মরণ করে লেখা।[১৯০] মৃত্যুর পর তাঁকে স্মরণ করে কবির অভিব্যক্তি অত্যন্ত সরল ভাষায় কাব্যিক রূপ পেয়েছে আলোচ্য কবিতাটিতে।

"দেব!
মুখে মধুমাখা হাসি,
সতত মধুর-ভাষী,
মধুর স্বভাবে তব বিশ্ব মধুময়,
তথাপি তেজস্বী বীর
বরণীয় পৃথিবীর,
নির্ভীক শূরেন্দ্র তবু ক্ষমা স্নেহময়।"[১৯১]

মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীকে স্মরণ করে লেখা কবিতা 'শোকগাথা'।[১৯২] রাণী স্বর্ণময়ী দেবী প্রথম এদেশে গবর্মেন্ট থেকে 'মহারাণী' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন।[১৯৩] কবিতার প্রথম অংশে কবি মানকুমারী বসু তাঁর মাহাত্ম্য গাথা গেয়েছেন-

" "মহারাণী স্বর্ণময়ী" স্বদেশ ভূষণ—
নারী-কুলেশ্বরী,
তপোস্বিনী, তপোরতা,
সদাচারা পুণ্যব্রতা,"[১৯৪]

রাণী স্বর্ণময়ী স্বহস্তে অনেক দান করেছেন, জননীর মতো লালন করেছেন এ বঙ্গবাসীকে। তাই আজ এই বঙ্গ শূন্যপ্রায়। তাঁর মাহাত্ম্য গাথা বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না, তাই আলোচ্য কবিতায় কবি তাঁর সকল গুণের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে তাঁর কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । ভারতেশ্বরী আলেকজান্দ্রিণা ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলীতে তাঁর স্মৃতিচারণা করেছেন 'অভিষেচন'[১৯৫] শীর্ষক কবিতাটির মধ্য দিয়ে।[১৯৬] ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীর শোষণের অবসান ঘটিয়েছে বলে কবি মনে করেন। তাই কবি কিছুটা প্রথাগত ধারণা থেকেই রানী ভিক্টোরিয়াকে

স্মরণ করেছেন। তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে কবি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। কবির সেই প্রথাগত মনোভাবের অনুসন্ধান আমাদের মূল লক্ষ্য না, তাঁর স্মরণে কবির ভাবনাই আমাদের মূল বর্ণিতব্য বিষয়। রাণীর মাহাত্ম্যে মোহিত হয়ে কবির প্রশস্তি-

"ভারত-সাম্রাজ্ঞি! হও চিরজীবি,
সুখে রাজ্য কর, পা'ল মা, পৃথিবী,
তোমার সুখ্যাতি পরশিছে দিবি!"[১৯৭]

সারা কবিতা জুড়ে তাঁর মাহাত্ম্য গাথাই বর্ণিত হয়েছে, তাঁর প্রতি কবির বিগলিত প্রাণের বাণী ধ্বনিত হয়েছে কবিতার ছত্রে ছত্রে। কবিতার শেষ অংশেও তাই একই সুরের পুনরুক্তি ঘটেছে-

"ভারত-সাম্রাজ্ঞি! হও চিরজীবি,
সুখে রাজ্য কর, পা'ল মা, পৃথিবী,
বিধাতার করুণায়।"[১৯৮]

কবি মানকুমারী বসু একাধিক ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করেছেন এবং তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে প্রশস্তিও নিবেদন করেছেন। শুধু তাই নয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ভাবনাও উঠে এসেছে আলোচ্য কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। গোষ্ঠীবদ্ধ সংহতি থাকলে তবেই পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ বেঁচে থাকে। 'স্মরণমুলক' রচনা আধুনিক সাহিত্যে গুরুত্ব পেয়েছে এবং একাধিক সময় পর্বে বিচিত্র কারণে এই স্মরণধর্মী সাহিত্য গড়ে উঠতে দেখা যায়। উপরিউক্ত কবিতাগুলির আলোচনা থেকেই বোঝা যায় বিশেষ মূল্যবোধের কারণেই মানকুমারী বসু তাঁর কবিতার মধ্যে একাধিক ব্যক্তিকে 'স্মরণ' করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবোধ কবির মধ্যে সেই বিশেষ মূল্যবোধ তৈরি করেছে বলে আমাদের মনে হয়। সেই মহান ব্যক্তিদের বা তাঁদের কর্ম, সৃষ্টি প্রভৃতি স্মরণ করে বা তাঁদের প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করে আলোচ্য কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে মানকুমারী বসু ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করেছেন বলা যায়। তাই বিভিন্ন দিক থেকেই মানকুমারী বসুর এই পর্যায়ের কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি।

ঙ) আত্মভাবনামূলক কবিতা

নিছক ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে কোনো অনুভূতির প্রকাশ আধুনিক কবিতার মূল সুর। এর বিশিষ্টতা উপলব্ধি করা যায় বিংশ শতাব্দীর কবিদের বিচিত্র ব্যক্তিবাদী ভাবনাকে ঘিরে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিরা আত্মভাবনায় নিয়োজিত হননি এমনটা নয়। তবে তার স্বরূপ কিছুটা আলাদা, বিংশ শতাব্দীর জীবন জটিলতা, সংশয়, হতাশা, শূন্যতাবোধ প্রভৃতি উনিশ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। তাঁদের কবিতায় জীবনকে বিচিত্র ভাবে বোঝার বা দেখার ভাবনা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে একাধিক তত্ত্ব ও দর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনা একটা সুস্থির প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছে। তাই প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্য চেতনা প্রভৃতিকে ঘিরেই কবিদের ভাবনা প্রসারিত হয়েছে। যদিও কবি মানকুমারী বসু এই ব্যাপারে খুব স্বতন্ত্র কিছু পরিচয় রেখে যেতে পারেননি। তবু অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় তিনি জীবনের বিচিত্র অনুভূতিকে ঘিরে আত্মভাবনায় নিমগ্ন হয়েছেন এবং তাঁর কবিতায় কিছু তত্ত্ব, দর্শনও উঠে এসেছে। এখানে আমরা তাঁর সেইসব কবিতার অনুসন্ধান করেছি এবং তাঁর আত্মভাবনার যথার্থ স্বরূপ অনুসন্ধান করেছি।

জীবনটা যেন পুরোটাই দুঃখের, এই মানব জীবনে ভালো কিছুই নেই। গভীর হতাশাবোধ থেকে সৃষ্ট কবির এই চেতনা ভাষায় রূপ পেয়েছে 'সাধ'[১৯৯] শীর্ষক কবিতাটির মধ্যে। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বামাবোধিনী পত্রিকায় ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়।[২০০] কবিতার প্রথম কয়টি পঙক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো-

"মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
শৈশবের সরলতা,
যৌবনের মধুরতা,
দু'দিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের!"[২০১]

জীবনে সবই ক্ষণস্থায়ী, তাই তা কখনও মানব জীবনে সুখ আনতে পারে না। জীবনের একটা সত্যকে কবি নির্লিপ্ত ভাবে কিছু অক্ষরে বেঁধে ফেলেছেন। গভীর উপলব্ধির ফলেই এমন সহজ সত্যকে দর্শন করে তোলা যায়। কবি আরও বলেছেন-

"কে জানে কি দিয়ে প্রাণ গড়া মানবের-
জরা-মৃত্যু-স্বার্থ-ভরা,
শোকে-তাপে বেঁচে মরা,
পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের!"[২০২]

এহেন পঙক্তি তো আধুনিক কবিরাই লিখতে পারেন। হতাশা, ভোগ ও সংশয় ভরা জীবনে দুঃখই একমাত্র সত্য; সেখানে প্রত্যেকটা মানুষ বার্ধক্যে আক্রান্ত(এটা রূপকে), স্বার্থপরতায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন, শোক তাপ ছাড়া সেখানে কিছুই নাই। কবি মানকুমারী বসুর ব্যক্তিভাবনার এহেন স্পর্ধিত আত্মজিজ্ঞাসা ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবি হিসেবে প্রশংসার দাবি রাখে।

মানব অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র তার জীবন। তাই কবি বলেছেন, 'আজি এই ছোট-খাট প্রাণ/মা'র পায়ে দিব বলিদান!'[২০৩] কিন্তু ব্যক্তির অস্তিত্ব শুধু আমিতে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। ব্যক্তিমানব মহাশক্তির অংশ এবং মহাশক্তির অংশ হিসেবে সকল ব্যক্তিই এক। চারিদিকে যেন এই এক ব্যক্তির স্বরূপই ছড়িয়ে রয়েছে। মানকুমারী বসুর এই আত্মানুভূতি ছড়িয়ে রয়েছে 'নরবলি'[২০৪] কবিতায়। কবির উপলব্ধি-

"আমি শুধু "আমি" নয়,
অসীম অনন্তময়,
যে দিকে চাহিব, আহা! আমাময়-সবই!
মহাশক্তি মহামায়া,
আমি তাঁরি অণু-ছায়া,
আমারে "কীটাণু" তোরা কত দীন ক'বি?"[২০৫]

এখানে কবির অনুভূতি অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মিলে যায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ব্যক্তির আত্মা অসীম হয়ে ওঠে। কবি তাই বলেছেন-

"মরিয়া অমর হয়,
দিগন্তে অনন্তে রয়,
চির-অমরতা লভে মায়ের সন্তান!"[২০৬]

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেন মানুষের জীবনের চরম প্রাপ্তি ঘটে। কবি মানকুমারী বসুর এই আত্মউপলব্ধি তাঁর গভীর দার্শনিক ভাবনার পরিচয় বহন করে। 'ভিখারী' কবিতায় কবির অনুভূতি তিনি সকলেরই মত, তাঁদেরই একজন। মানবসমাজে উচ্চনীচ বলে কিছু নেই, আসলে সকলেই এক। এই ভাবই ফুটে উঠেছে আলোচ্য কবিতার পঙক্তিগুলিতে। উদ্ধৃতিস্বরূপ নিম্নোলিখিত পঙক্তিগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক।

"আমিও তোদেরি একজন—
আজি আমি বড় একা,
কেউ নাহি দেয় দেখা,
খুঁজিতেছি দ্বারে দ্বারে আপনার জন,"[২০৭]

প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই রয়েছে অপ্রাপ্তির ঝুলি আর তারই প্রেক্ষাপটে আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে শূন্য, ভিখারি সম। প্রত্যেকের অন্তরই নিঃসম্বল, তাই মানুষ তাঁর প্রাপ্তির ডালি পেতে সর্বদা প্রতীক্ষারত। 'অনন্ত প্রহেলিকা'[২০৮] কবিতায় রয়েছে শূন্যতা বোধ। প্রহেলিকার সীমাহীন ব্যাপ্তিই যেন সত্য। কবি প্রশ্নের আকারে বলেছেন কে তাঁকে অনন্তের কথা শোনাবে? যেখানে ফল-ফুলে ভরা প্রকৃতি, স্নেহ-মমতায় ভরা সংসার। কিন্তু এরূপ জগতের কথা বলার মতো কবি কাউকে খুঁজে পান না। কারণ এই সংসার শুধু হাহাকারে ও শোকে ভরা। সকলকেই চলে যেতে হয়, কেউ কারো অপেক্ষা করে না বা কেও কারো স্নেহে বশীভুত নয়। কবিতাটি এই ভাবনার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে-

" যায় পতি ফেলি প্রিয়া প্রিয় কণ্ঠহার!
যায় বোন ছেড়ে ভাই,

কারো মনে দয়া নাই,
জনমের মত গেল, এল নাকো আর।
রৈল শুধু শোক-অশ্রু, শুধু হাহাকার!”[২০৯]

কবি ভাবনায় জীবনের নশ্বরতার দিকটি এখানে ফুটে উঠেছে। কবি মানকুমারী বসুর আত্মভাবনার সূক্ষতা ও সরল বাস্তব সত্যের যে পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে তা কবি হিসেবে তাঁর মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের ‘ভগ্ন-হৃদয়’ কবিতাটিও কবির আত্মভাবনার পরিচয় বহন করেছে। কবিতার শুরুতেই কবির উক্তি-

“জ্বলিছে যে ক্ষুদ্র তারা আকাশের গা’য়
দূরে— এক কোণে,
সে নয় তপন, শশী,
যায় যদি যাক খসি’,
একটুকু ক্ষুদে তারা, কার পড়ে মনে?”[২১০]

এটা রূপক, এখানে কবির ভাবনা কিছুটা ভিন্ন। কবিতাতেই তার পরিচয় রয়েছে-

“তুচ্ছ এক ভাঙা হৃদি ভেঙে দিবে দাও—
পায়ে নাও দ’লে,
“উন্নত মহৎ” নয়,
তবে আর কিসে ভয়?
কার বা বাজিবে হায়! শত চীর হ’লে?”[২১১]

কবির ভাবনা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গভীর ব্যথা থেকেই কবির এহেন সংলাপ ফুটে উঠেছে, মানুষের হৃদয় অতি তুচ্ছ, তার ভাঙা গড়ায় কে খবর রাখে? সাধারণ মানুষের জীবনে এই কথার বাস্তবতা খুবই গভীর। ‘পিপাসা’[২২১] কবিতায় মানুষের আত্মচাহিদার চূড়ান্ত রূপ ফুটে উঠেছে। সকল সময় আমাদের পার্থিব কাম্য হল সুখ। কিন্তু তা আমাদের কাছে অপ্রাপ্য হিসেবেই থেকে যায়। কবি জানতে চেয়েছেন-

“বল তোরা “সুখ” কার নাম,
কোথা তার সুখময় ধাম?
কেমন মূরতি হয় কি ক’রে সে কথা কয়
আমাদের দেশে তার কার মত ঠাম?”[২১২]

সত্যই আমরা কেউই সুখকে কখনো জানতে চায়নি, শুধু তাকে ধরতেই চেয়েছি। আর তাই বিভ্রান্ত হয়েছি। এই প্রসঙ্গে দৃঢ় সত্যতা কবির লেখনীতে উঠে এসেছে।

"কত বার মনে আসে তাই,
"সুখ" বুঝি সত্য কেহ নাই;
এ মরত মরুভূমি মরিচিকা সুখ! তুমি
আকুল পিপাসী আমি ধরিতে বেড়াই!"[২১৩]

সুখ অধরা, চকিতে দেখা দিয়ে পুনরায় তার বিলুপ্তি ঘটে। কবি তাই বলেছেন সুখও কত নিষ্ঠুর তামাশা শিখেছে। কোনো দেশেই কোনো স্থানেই মানুষের এই পিপাসা তৃপ্ত নয়। 'হতাশে'[২১৪] কবিতাতে ফুটে উঠেছে কামনার প্রাপ্তিহীনতায় মানব জীবন হতাশাগ্রস্ত। মানুষ চলে যায়, শুধু তাঁর স্মৃতি থেকে যায়। মরণের এই বিভীষিকা কবিকে গ্রাস করেছে। কবির কণ্ঠেই সেই আক্ষেপের সুর স্পষ্ট।

"পলে পলে ক্ষ'য়ে যায় মানব-জীবন,
সাধিলেও একটু রহে না,
কেন রেখে যায় স্মৃতি— হতাশা-দহন,
কাঁদিলেও খুলে তা' বলে না।"[২১৫]

মানুষ তাঁর স্বপ্ন, ভাবনা, ইচ্ছে সব কিছু নিয়েই চলে যায়, থেকে যায় নাম ও কিছু স্মৃতি। মৃত্যু ভাবনার প্রেক্ষাপটে আরও একটি সংযোজন 'অন্তিম-প্রার্থনা' শীর্ষক রচনাটি, কবিতাটি কাব্যকুসুমাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। মানুষের সম্মুখে মৃত্যু প্রতীক্ষারত। মানব ধীরে ধীরে তার দিকে প্রতিনিয়তই এগিয়ে চলেছে, কিন্তু জীবনের প্রান্তে গিয়ে তাঁর মন-প্রাণ কেঁদে ওঠে। এখানে কবির ভাষা সহজ-সরল ভাবে কিছু সত্যকে তুলে ধরেছে-

"অভাগার এ মিনতি অন্তিম শয্যায়,
তোমার প্রেমের ধরা
এত শোভা-সুখে ভরা,
সহজে ছাড়িতে বিভো! কার মন চায়?"[২১৬]

অধিকাংশ কবিতায় কবির আত্মভাবনা মনের অতল গভীর থেকে উঠে এসেছে বলা যায়। এহেন মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা নিঃসন্দেহে কবির কীর্তিত্বের পরিচয় বহন করেছে। মানব সংসারের কিছু সহজ সত্যও কবি ভাবনার মিশ্রণে অসাধারণ শিল্প সমন্বিত হয়ে উঠেছে। মানুষ কিছু পেতে চেয়ে জীবনটাকে যে ভাবে সাজায় সবসময় তার যথাযথ প্রাপ্তি ঘটে না। নিয়তই তাই মানুষের প্রাপ্তির বিচ্ছেদ ঘটে, পরিবর্তন ঘটে অভিজ্ঞতার এবং ভাঙে ভুল।

"মানব-জীবনে সই! কেন এত ভুল?—
আদরে রপিয়া লতা
ভেবেছিনু কত কথা,
সহসা সে শুকাইল— ফুটিল না ফুল!"[২১৭]

বাস্তব সংসার প্রতিটি কবিকে আঘাত দেয়, সংসারের নিষ্ঠুরতা থেকে কেউই রেহাই পান না। 'ভুল ভাঙা' কবিতায় নিম্নলিখিত পঙক্তিগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করেছে।

"জীবনের সাধ আশা,
মরমের ভালবাসা
সংসারের পদতলে ঢালিনু বিপুল!
নিঠুর সংসার তবু
চেয়ে দেখিল না কভু,
সে উপেক্ষা অবহেলা, বুকে বাজে শূল!
শিখিনু এবার বড় হ'য়ে গেছে ভুল!"[২১৮]

সংসারের অবহেলা কবি মানকুমারী বসুর চেতনায় গভীর ছাপ ফেলেছে। কবি অন্তর জুড়ে শুধুই শোকের ছায়া বিরাজ করেছে। তাঁর সাহিত্যেও এই ভাবনার বিস্তার ঘটেছে। কবির জীবন থেকে সবকিছুই হারিয়ে গেছে, কোন কিছুই তিনি পাননি। তিনি সেটা মেনেও নিয়েছেন, কিন্তু আবার এই বিষয়ে তিনি আক্ষেপ করেছেন ও নিজেকে তীব্র ব্যঙ্গও করেছেন। 'কি ক্ষতি আমার'[২১৯] কবিতায় কবি নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করেছেন।

" "আনন্দ-আশ্রম" মম সোণার আগার!
অকস্মাৎ মহা ঝড়ে,

সে ঘর ভাঙিয়া পড়ে!
মাটিতে মিশিল হায়! হয়ে চুরমার!
ভাঙিল কুটীর যদি, কি ক্ষতি আমার?"[২২০]

কবির আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে কি? তাতে কোন ক্ষতি নেই কবির। এই বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে জীবনের প্রতি গভীর ব্যঙ্গ। ব্যক্তিগতভাবে মানকুমারি বসু যে সংবেদনশীল একজন মানুষ, এই উদ্ধৃতি থেকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কবি আরও বলেছেন-

"কিসে কি ক্ষতি আমার?—
ভেবেছিনু, কাছে গেলে
দিবে সখী সুধা ঢেলে,
আঁচলে মুছায়ে দিবে তপ্ত অশ্রুধার;

"সে নয় দেখেনি চেয়ে, কি ক্ষতি আমার?"[২২১]

কবির মনে রয়েছে গভীর শোক, কবির স্বামী তাঁকে একা ফেলে সমস্ত কামনাকে শূন্য করে দিয়ে অকালে চলে গেছেন । তাই কবির অভিমান ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য কবিতায়। এর মধ্য দিয়ে কবি মানকুমারী বসুর অভিমানী হৃদয়ের গভীরতা মাপা যায়। মৃত্যু ভাবনায় লেখা আরও একটি কবিতা 'পতঙ্গের প্রতি'[২২২] । কবিতার শুরুতেই কবি বলেছেন-

"কেন রে জ্বলন্তানলে, অবোধ পতঙ্গ!
পড়িছ উড়িয়া?—
"রূপ" নহে ও যে কাল,
পাতিয়াছে মায়াজাল,
ছুঁইলে মরিবি পুড়ে— যা' রে যা' সরিয়া।"[২২৩]

পতঙ্গের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি কবির আর্জি, মানুষ মোহে পড়ে বা ছলনায় পড়ে জীবনটাকে জটিল করে তোলে। উজ্জ্বল আলোকের মায়ায় পড়ে পতঙ্গ আগুনের দিকে

ধাবিত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। মানুষও তেমনি না বুঝে এমন কত ছলনার স্বীকার হয়। মায়া যেন ফাঁদ পেতে রয়েছে জীবনকে গ্রাস করার জন্য।

"ক্ষুদিত শার্দ্দূল প্রায়
তোরে ও গ্রাসিবে হায়!
এ মরণে সুখ নাই— জ্বলিবি মরিয়া!"[২২৪]

আগুন পতঙ্গকে গ্রাস করে নেয়, তবুও পতঙ্গ তার দিকে ধাবিত হয়। মানুষও এমন কত ভুল করে। মোহের ছলনায় মানুষ নিয়ত নিজের জীবনকে সংকুচিত করে তুলছে। তাই কবি বলেছেন—

"মিছা তোরে দেই গালি, আমরাও হেন
কত ভুল করি—"[২২৫]

প্রতিমুহূর্তে অমৃতরূপ জীবনের স্বাদ ছেড়ে মানুষ মৃত্যু মুখে ছুটে যায়। 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের 'অনলের প্রতি পতঙ্গ' শীর্ষক কবিতাতেও এই ভাবনার সত্যতা ধরা পড়েছে। কবিতাটিতে দেখা যায় কবি পুড়ে মরতে চেয়েছেন, মর্মের বেদনা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। আবার 'প্রার্থনা' কবিতাতে দেখা যায় কবি মরণকে অস্বীকার করে জীবনকে স্বাগত জানিয়েছেন।

"আমারে জীবন দাও, মৃত্যু কাজ নাই,
চাই না এ অলস মরণ!"[২২৬]

মরণ সত্যই অলস, তা মানুষকে মহানিদ্রায় যাপিত করে। কিন্তু তা হলেও মরন মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ক্রিয়া, কবির বক্তব্যেই একথার যথার্থতা রয়েছে।

"ধনী, দীন জ্ঞানী, মূর্খ, শমনের করে
কোন কালে কে পেয়েছে ত্রাণ?"[২২৭]

কিন্তু তবু হায় এ মরণ পোড়া, মানুষ তাকে কখনোই স্বাগত জানাতে পারবে না। কবিতার শেষ অধ্যায়ে কবির লেখনি সেই চরম সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

"জীবন, মরণ, আমি কোনটিরে চাই,
তাই যদি সুধিছ এখন;

খুলে দাও মহাপাশ, খাটিবারে যাই,
কাজ নাই এ পোড়া মরণ।"[২২৮]

কবিতাটি কবির রোগশয্যায় লিখিত।[২২৯] মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়ে উপলব্ধ এই দর্শন কবিতাটিকে শাশ্বত করে তুলেছে। স্বামীকে অন্তরে উপলব্ধি করে কবির কামনাবাসনা ব্যক্ত হয়েছে 'সখী' কবিতাটিতে। স্বামীকে ঘিরেই তিনি যেমন বাঁচতে চেয়েছেন আবার তাঁর কোলে মাথা রেখেই তিনি মরতে চেয়েছেন। 'আসিবে কি ?' কবিতাটিতেও কবির আত্মভাবনা ধরা পড়েছে, জগতে সমস্ত কিছুই পুনরায় ফিরে আসে। শীতের বিদায় যেমন বসন্তের আগমন ঘটায় ঠিক আবার বসন্তের বিদায় পুনরায় শীতের আসাকে এগিয়ে দেয়। তেমনি কবি ভেবেছেন মানব জীবনেও সব কিছু কি ফিরতে পারে প্রকৃতির এই ফেরার মতন করে? কবিতায় সাজানো পঙক্তিগুলো আরও বেশি পাঠককে ভাবিয়ে তুলেছে।

"সখি রে! এ মৃতদেহে ফিরে আসিবে কি পরাণ?
আবার শীতের শেষে
বসন্ত বিনোদ-বেশে
ঢেলে দিল শ্যাম-ছটা ছেড়ে গেল ধরাখান;

"আমারো এ দেহে সখি! আসিবে কি নব প্রাণ?"[২৩০]

পৃথিবী যেমন ঘুরছে, তেমনি মানুষের জীবনও জন্ম-মৃত্যুকে ঘিরে আবর্তিত হয়। মৃত্যু অন্য আর একটি প্রাণের সূচনা ঘটায়। কিন্তু সেই প্রাণ আর ফিরে আসে না, চলে যাওয়া মানে কোনো কিছুই আর ফিরে আসে না। একটা বসন্তের পরিণতি হলে সেই বসন্ত চিরতরে চলে যায়, পুনরায় অন্য একটি বসন্ত আসে আমাদের কাছে। আলোচ্য কবিতায় কবির প্রশ্নের মধ্যে তত্ত্বের আকারে উত্তরই লুকিয়ে রয়েছে। 'নিরাকাঙ্ক্ষী' কবিতায় কবির মন ঈশ্বর মুখে ধাবিত হয়েছে। কবির মন আর কোন কিছুই চায় না, চায় শুধু ঈশ্বর প্রাপ্তি।

"চাহি না বকুল তলে
প্রজাপতি দলে দলে

সাটিন পোষাক পরি বেরাব নাচিয়া;”[২৩১]

তার বদলে কবি চেয়েছেন-

“যে ক’দিন বেঁচে থাকি,
যেন গো! তোমারে ডাকি,
যোগী যথা যোগীশেরে করে আরাধনা;”[২৩২]

সংসারের সকল কিছুর প্রতিই আজ কবি বিমুখ। ‘বিদায়-সঙ্গীত’ কবিতায় কবির অন্তরের আক্ষেপ বিষাদের সুর ছড়িয়েছে, কবির আত্মতভাবনা এখানে খুবই গভীর।

“যাহারা যেমন আছে,
তাহারা তেমনি থাক,
আমারি জীবন একা
নীরবে ফুরায়ে যাক।”[২৩৩]

‘কেন আছি’ কবিতায় কবির মনে হয়েছে তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্য।

“জগদীশ!
কেন আছি? আছি মোর তুমি আছো ব’লে,

“আমি আছি, দীনবন্ধো! তুমি মোর ব’লে।”[২৩৪]

‘কেন?’ কবিতায় কবি বলেছেন চারিদিকে সবই রয়েছে, তবু মানুষের হাহাকার কেন? মানুষ আসলে কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না। কবি তাই বলেছেন-

“দেখিয়াছি চেয়ে চেয়ে,
হাসে দিক-বালা, ছেয়ে—
সে চারু সোণার দেহ, মণি-মুকুতায়,
কেন গো! জগত তবু করে হায় হায়?”[২৩৫]

দিকবালা তাঁর অফুরন্ত সৌন্দর্যে আমাদের ভরিয়ে দিয়েছে। পিক-পাপিয়ারা তাঁদের সুকণ্ঠে অমৃতধারা বর্ষণ করছে। কিন্তু তাতেও মানবের জীবন সুখ-শান্তি হারা। কারণ মানুষ নিজেকেই সবথেকে বড় করে প্রকাশ করতে চায়। তাই কবি বলেছেন—

"দেবদেব বিশ্বরাজ
করিছেন নিত্য-কাজ,
আমরা মানব— রেণু, পরমাণু হেন,
যা' দেখি অবাক হ'য়ে তাই বলি "কেন?" "[২৩৬]

মানুষ তাঁর কর্মকে যথাযথ ভাবে পালন না করে তাঁর জীবন অতিরিক্ত সব কিছুকেই সে ধরতে চায়, জানতে চায়। অল্পতে মানব তাঁর প্রাপ্তিকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। মানুষ যত পেতে চায় ততই তাঁর মায়া বেড়ে ওঠে এবং শেষমেশ জীবনে তা ভার হয়ে ওঠে।

মানুষের অভ্যাসের ফলে কোনো বস্তুর প্রতি বা জীবনের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়। আর এই আসক্তি থেকেই মানুষের মনে ভালোবাসা বা মায়া তৈরি হয়। 'আসক্তি' শীর্ষক কবিতায় কবির এহেন ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

"হেথা যাহা রহিবে আমার,
তোমরা তা' সযতনে রেখো;
প্রিয় বস্তু যত, অভাগার,
চিরদিন প্রিয়ভাবে দেখো।"[২৩৭]

কবি তাঁর ব্যক্তিগত জিনিশের মায়া ছাড়তে পারছেন না। তাই তিনি এই সবকিছু ছেড়ে কবি যেতে চান না। স্বর্গে গিয়ে বাড়তি কিছু পাওয়ার নেই। তাই কবি ধরাধামেই তাঁর স্বর্গ অনুভব করেছেন। প্রত্যেক মানুষের মনেই এই একই ভাবনা রয়েছে বলে কবি জানিয়েছেন এবং সংসারে এটাই চিরন্তন সত্য। 'নব বর্ষ— নব জীবন' কবিতায় কবির ব্যক্তিঅনুভূতি হল পুরাতন চলে যায়, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তাকে ছেড়ে দিতে হয়। আর নূতন আসে এবং স্বভাবিক নিয়মে তাকে জায়গা করে দিতে হয়। এই সত্য, সরল দর্শনকে কবি অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য কবিতায়-

"কি হয়েছে, চলে গেছে পুরাতন প্রাণ,
শুষ্ক পত্র ঝরি যায়,
পুন নব শোভা পায়,
বসন্ত আইসে, হ'লে শীত অবসান;

পিতা পিতামহ মরে,
পুত্র পৌত্র বাস করে,
নূতনে রাখিয়া করে পুরানো প্রস্থান!”[২৩৮]

এত সত্য একটা ভাবনাকে কবি কত সরল ভাষায় অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গভীর অনুভূতির থেকেই এই উপলব্ধি উঠে আসে। এখান থেকে কবি মানকুমারী বসুর কবিত্বপ্রতিভা আমরা অনুধাবন করতে পারি।

‘বিভূতি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘সত্যলাভ’ শীর্ষক রচনাটিতে কবির স্নেহ দর্শনাকারে ধরা পড়েছে। মায়ের প্রেম মানুষের জীবনে অন্যতম সত্য কারণ পরম স্নেহময়ী মা এবং তাঁর ভালোবাসা সকল প্রাপ্তির উর্দ্ধে। কবির উপলব্ধি মায়ের প্রেম দিয়েই যেন জীবন সৃষ্টি হয়। কবিতাটিতে এই সত্য সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে-

“তুমি যে মা, সন্ন্যাসীর গুরু,”
তুমি যে মা বিশ্বের মধুরতা,
শিখিনু তোমার কাছে, সত্যি করুণা আছে,
প্রেম বিনা শূন্য সব
এই সত্য কথা।”[২৩৯]

মৃত্যুপরের জীবন নিয়ে কবির নিবিড় অনুভূতি ধরা পড়েছে ‘বিভূতি’ কাব্যের ‘জিজ্ঞাসা’ কবিতায়। কবির তাঁর ভাবনাগুলিকে জিজ্ঞাসার আকারে উত্থাপন করেছেন আলোচ্য কবিতায়। কবি জানতে চেয়েছেন আমাদের মতন দিন-রাত্রি কি পরপারে হয়? আমাদের দক্ষিণা বাতাস কি সেখানে বয়? এ দেশের বসন্ত কি সেখানে বিরাজ করে? তমাল শাখে পক্ষী কি ডাকে? বিচিত্র ফুল কি সেখানে ফোটে? কবি মনে করেন জীবনের এই সুন্দর বিচিত্র প্রাপ্তি সেখানেও ঘটে, তাই পরপারের জীবন কখনোই বেদনাময় হতে পড়ে না। কবি নিজেই এমন স্বীকারোক্তি দিয়েছেন-

“তাই যদি হয় তবে কিসের বেদন?
মাঝখানে বৈতরণী দু-পারে দু-জন!
সাতাঁরিয়া একবার,
চলি যাব পর পার

মরণের পরে পাব সোণার জীবন;”[২৪০]

আসলে কবি এখানে জীবনের প্রতি রোমান্টিক ভাবনা পোষণ করেছেন। মৃত্যু আসলে জীবনের শেষ না, জীবনের অন্য একটি পার। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি আসলে মৃত্যুর ভয়াবহতাকে এড়িয়ে গিয়ে তাকে সৌন্দর্যের আধারে প্রকাশ করেছেন। এখানে মৃত্যুকেও কবি নান্দনিক করে তুলেছেন বলা যায়। ‘বেলাশেষে’, ‘বিভূতি’ বাক্যের শেষ দিকে লেখা কবিতা। জীবনের প্রান্তে এসে কবির মনে হয়েছে বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনটা চলে যায়। জীবনের শেষ অবধি কেউই থাকে না, তাই মানুষের একমাত্র সঙ্গী হওয়া উচিত ঈশ্বর। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে জীবনের বাকি সব কিছুর অনুসন্ধান করি আমরা। আর তাতেই জীবন কখন ফুরিয়ে যায়। এই মনোদুঃখ দিয়েই আলোচ্য কবিতার সংলাপ গড়ে উঠেছে।

“এ দেশে বিফল “সেহ”
দোসর হল না কেহ,
শুধুই তোমারে ভুলি পাতিলাম খেলা;
আজি দেখিলাম সবি,
পশ্চিমে পড়িছে রবি,
অবনী জবাব দিল, “ফুরায়েছে বেলা”।”[২৪১]

এতদিন কবি বৃথায় জীবনটা পার করেছেন, কিন্তু আজ তিনি বুঝতে পেরেছেন জীবনের সার বস্তু-

“বুঝিলাম এতদিনে,
সবই মিছা তোমা বিনে,
সংসারের স্নেহদয়া সকলি অসার,
সুহৃদের বেশ ধরে,
গোপনে শত্রুতা করে,
ধন, যশঃ, প্রাণশশী, নির্মম সংসার।”[২৪২]

এখানে মানকুমারী বসুর ভাবনায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অনুভব করা যায়। ‘প্রার্থনা’ পর্যায়ে বৈষ্ণব কবিরাও এই বলেই আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। জীবনের প্রান্তে এসে

তাঁদের মনে হয়েছে পরম ঈশ্বরের সাধানায় যে জীবন উৎসর্গীকৃত করার দরকার, সেই জীবন রসে-রঙে পেরিয়ে গেল।

কবির আত্মভাবনার দীর্ঘ স্থান জুড়ে রয়েছে হতাশা ও দুঃখ বোধ। তাঁর এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে 'সাধ', 'হতাশা', অনন্ত প্রহেলিকা', 'ভগ্ন-হৃদয়' প্রভৃতি। এই কবিতাগুলির মূল সুর জীবনের দুঃখ, মৃত্যু। তবে বিভিন্ন সময়পর্বে কবির ভাবনায় বৈচিত্র এসেছে। আধুনিক কবির মতো জীবন জটিলতা না এলেও জীবনের দুঃখকে তিনি সত্য করে তুলেছেন এবং এই দুঃখ মানুষের জীবনে চিরন্তন বলে কবি মনে করেছেন। আবার মৃত্যু সম্পর্কেও কবির মনে একটা আতঙ্ক রয়েছে, মৃত্যু মানুষের কাছে কাম্য নয় যেমনটা বলে থাকেন বিংশ শতাব্দীর[২৪৩] কবিরা। গভীর জীবন বোধ থেকেই কবি মানকুমারী বসুর এই উপলব্ধি গড়ে উঠেছে একথা সত্য। তবে জীবনের কিছু সরল সত্যও তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। তাঁর কবিতার এই সকল বিষয় তাঁকে অনেকটাই আধুনিক কবিদের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। কবি মানকুমারী বসুর এই বোধ গড়ে উঠেছে মূলত নারী জীবনের অসহায়তা, দুঃখবোধ, সাংসারিক অপ্রাপ্তি, অকাল বৈধব্য প্রভৃতি বস্তুগত ঘটনার প্রেক্ষাপটে। কবির প্রগাঢ় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে কবিতাগুলি যে অসাধারণ শৈল্পিক হয়ে উঠেছে, সেকথা বলাইবাহুল্য। এই পর্যায়ের কবিতাগুলি মানকুমারী বসুর কবিত্ব প্রতিভার বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ কবির এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে সাহিত্যগুণ অন্যান্য পর্যায়ের কবিতার থেকে অনেক বেশি বলে আমরা মনে করি। বিচিত্র ভাবনাকে ঘিরে কবির অনুভূতি সাহিত্যরূপ লাভ করেছে এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে।

২) বিষয়ভিত্তিক কবিতার বিশ্লেষণ

বিষয়ভিত্তিক কবিতা বলতে আমরা এখানে 'আখ্যানকাব্য' বলতে চাইছি না। কবি মানকুমারি বসু কোনো আখ্যানকাব্য লেখেননি। তবে তাঁর অনেক কবিতায় উঠে এসেছে একাধিক বিষয় এবং সেইসব কবিতায় কবির ভাবনা বা কল্পনা মূলত বিষয়ের অনুগামী। একাধিক কবিতায় আবার খুবই সূক্ষ্ম বিষয়কে ঘিরে কবির কল্পনা দীর্ঘ

বিস্তারি হয়েছে। আমরা এখানে বিষয়ের আলাদা কোনো ভাগ না করে সামগ্রিক আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, এই পর্বের বেশ কিছু কবিতায় বস্তুগত ভাবকে ঘিরে কবির ভাবনার প্রাধান্য ঘটেছে। আমরা সেই বিশেষ কবিতাগুলিকেও এই অধ্যায়ের গণ্ডীতেই রাখব। আপাতভাবে এগুলিকে কবির আত্মভাবনামুলক কবিতা বলে মনে হলেও, নিবিড় পাঠে বোঝা যায় এখানে কবির কল্পনা নির্দিষ্ট বস্তুকে ঘিরেই বিস্তার লাভ করেছে। এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যের 'ভিখারিণী মেয়ে' কবিতাটি খুবই প্রাসঙ্গিক। একজন পথহারা ভিখারিণী মেয়ের অসহায়তা কবির ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। বিষয়টি সামাজিক হিসেবেই ধরা যায়। যদিও আবার কবিতাটিতে মনস্তাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য লক্ষ করা যায়। তবে কবিতার শেষ অংশটি মানবিক গুণে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

"চল! তোরা ওর হাত ধ'রে,
ডেকে আনি আমাদের ঘরে;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই,
কেউ হব বোন মোরা কেউ হব ভাই;
তা হ'লে ও বেদনা ভুলিবে,
তা হ'লে বা পুলকে হাসিবে!"[২৪৪]

একই কাব্যের এই ধারার পরবর্তী কবিতা 'নব-দম্পতির প্রতি প্রীতি উপহার'। কবিতাটির বিষয় নব বিবাহ, বিষয়টি খুব লঘু হলেও উপস্থাপন গুণে কবিতাটি আলোচনাযোগ্য হয়ে উঠেছে। আমরা কবিতার কয়েকটি পঙক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো।

"প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
চাহিয়া তোমার পানে
দু'জনে তরুণ প্রাণে
পশিছে সংসারে ধরি এ উহার কর,
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!"[২৪৫]

নব দম্পতির সংসার জীবন শুধুমাত্র কবির উপস্থাপনগুণে নান্দনিক হয়ে উঠেছে। বিবাহ ব্যাপারটি শুধু সামাজিক না। বিবাহের মধ্য দিয়ে আত্মারও মিলন ঘটে। এই মিলন মানব জীবনকে সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেয়। বিবাহ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে কবির বলেছেন-

"প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
করি তোমা আত্মোৎসর্গ
লভি যেন চতুর্ব্বর্গ,
প্রেম-পরিবার হ'য়ে অবনী-ভিতর,
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!"[২৪৬]

এই দম্পতির প্রেম দিয়েই কবি বিশ্বপ্রেম গড়ার কথা বলেছেন কারণ এই প্রেম সুন্দর। নব দম্পতির কথা বলতে গিয়ে বিবাহ বিষয়টিকেও কবি বর্ণনা করেছেন আলোচ্য কবিতায়। বিবাহের বর্ণনা করা অবশ্য কবির উদ্দেশ্য নয়, বিবাহের মধ্য দিয়ে দুটি মানুষের মনস্তত্ত্বকেই কবি এখানে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

কুলীন ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক অত্যাচার নিয়ে লেখা কবিতা 'কুলীন-কুমারী'। কবিতাটি 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কুলীন ব্যবস্থায় বস্তুগত কোন অত্যাচারের উল্লেখ কবিতায় না থাকলেও সার্বিক ভাবে নারী জীবনের ব্যাথা বেদনা কবির বর্ণনায় উঠে এসেছে। কবিতার শেষ অংশে সেই কথাই বর্ণিত হয়েছে। কবিতার মর্মাথ বুঝতে শেষ পঙক্তিগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। নিম্নে তার কিয়ৎঅংশ উল্লেখিত হল-

"যখন দেখিব বালা
সহিছে সতিনী জ্বালা,
তখনই নয়ন জলে বুক ভাসাইব;
সধবা বিধবা প্রায়
পরান্ন মাগিয়া খায়—
দেখিলে কান্দিয়া তার জমেরে ডাকিব,"[২৪৭]

সমাজের এই জগদ্দল প্রথার বিরুদ্ধে কবিরও কিছুই করার নেই, তাই কবি শুধুমাত্র সহমর্মিতা দেখাতে পারেন, চোখের জল ফেলতে পারেন। এই ব্যবস্থায় সধবা নারীও বিধবার দুঃখ জ্বালা নিয়ে বেঁচে থাকেন। বিবাহের নামে তাদের গলায় যেন ফাঁস পরে, মর্যাদার ছলে তাদের রক্ত শুষে নেয় সামাজিক দানবরা। পুরো কবিতা জুড়ে নারীর মর্মবেদনার একটা চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। ঐ একই কাব্যের 'মহাযাত্রা' কবিতার প্রেক্ষাপট পুরোপুরি ঐতিহাসিক। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহে বুঁদিরাজ সিপাইদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু সেই যুদ্ধের সময়ই রানীকে নিরাশ্রয় ইংরেজ রমণী ও পুরুষদের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে পালন করতে দেখা যায়। কবিতাটিতে রানীর এই স্বরূপ বর্ণনা করাই কবির মূল লক্ষ বলে মনে হয়। কবিতার পরিশিষ্ট অংশে কবিতাটির বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে তার কিছুটা উদ্ধৃত করা হলো-

> "রাণীর সহায়তায় ইউরোপীয়দিগের দিল্লী-শিবির প্রস্থানের পর বুঁদিরাজ স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করেন ও রাণী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। জনশ্রুতি— শত্রুপক্ষের প্রতি দয়া প্রকাশ করাতে ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা রাণীকে নিহত করেন। তদ্বিষয় অবলম্বন করিয়া এই পদ্যটি লিখিত হইল।"[২৪৮]

কবিতাটিতে সেই ভাবে কোনো ঐতিহাসিক বিষয় উল্লেখিত হয়নি। মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়ে রানী তাঁর মনের কথা বলে গেছেন, আর কবি সেই আত্মকথার সংলাপ রচনা করেছেন কবিতাটিতে। তবে রানীর মুখের কথাগুলি নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশ বলে মনে হয়।

""নিজ প্রাণ দিয়া সর্ব্বস্ব সঁপিয়া
বাঁচাতে শরণাগতে",
তোমার প্রসাদে শিখেছে এ দাসী
আর্য-নীতি এ জগতে।
সফল জনম সার্থক জীবন

বীরতা সাধিয়া যাই,
বীরাঙ্গনা হ'য়ে হীন সম ম'লে
সে লাজের সীমা নাই।"[২৪৯]

রানী তাঁর নিজের কথা বলতে গিয়ে এখানে সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিকে হাজির করেছেন। মানকুমারী বসুর আর একটি কবিতার নাম 'পত্র', ১২৯৭ সালে ইছামতী নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে যে বন্যা হয় সেই বিষয়টিকে ঘিরেই কবিতাটি রচিত হয়েছে।[২৫০] কবিতাটিতে বন্যার নিপুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

"প্রবল প্রবাহ বয়
মাঠ হাঠ বাড়ী ময়,
সবুজ শস্যের ক্ষেত্র ডুবেছে সকল,
চারিদিকে কুল কুল
শুনি' লাগে দিক-ভুল,
চারিদিকে হাহাকার মহা কোলাহল,"[২৫১]
অথবা

"কি লিখিব দেখি' শুনি' বুকে নাই বল,
বাগানে উঠানে স্রোত খেলিতেছে জল;
মৃদুল মৃদুল বায়
ঢেউ খেলাইয়া যায়,
ভয়েতে ভাবিনে তায় নয়ন সজল,"[২৫২]

কবির বর্ণনাগুণে বন্যার চিত্র পাঠককে মুগ্ধ করেছে। আবার অপরদিকে বন্যায় দুর্দশার নিদারুণ চিত্রও কবি নিপুণভাবে এঁকেছেন। জলের কুল কুল শব্দের স্নিগ্ধতা পাঠকের মনকে স্পর্শ করেছে, ঠিক তারপরের পঙক্তিতেই কবি দেখিয়েছেন বন্যায় চারিদিকে মানুষের মহাকোলাহল। একইপ্যারায় দুটি বিপরীত ধর্মী চিত্রকল্প কবিতাটির বিশেষত্ব। পরবর্তী প্যারাটিতে অবশ্য বন্যার ক্ষয়ক্ষতির চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে এবং বন্যা পাঠক মনে আতঙ্ক তৈরি করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়কালে একাধিক সংস্কারে নারীর জীবন বিপর্যস্ত। নারীর বিয়ে দেওয়াও ছিল একটা বড় সমস্যা। ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যসস্থায় মেয়েদের কোনো সামাজিক মূল্য লক্ষ করা না। তাই মেয়ের পিতার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সমাজে বিশেষ শ্রেণি হিসেবে 'ঘটকালী'র উদ্ভব হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়েই রচিত হয়েছে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলী' কাব্যের 'ঘটকালী' কবিতাটি। কবিতাটির শুরুতেই কবি বলেছেন-

"মেয়ের বাজার বড় সস্তা বাঙ্গালায়,
এত সুবিধার দিন ছাড়া নাহি যায়,
তাই আসা ঘটকালী তরে,
মেয়ের মা যদি "খুসী" করে।"[২৫৩]

স্বার্থের কারণে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁরা কন্যার পরিবারকে ঠকিয়েছে। ঘটকালীরা পাত্রের মিথ্যা প্রশংসা করে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে কিন্তু মেয়েদের কখনো মাতাল স্বামী জোটে, আবার কখনো তাঁদের সতীন সমস্যা নিয়ে ঘর করতে হয়। আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থার এই চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাঙালির সংস্কৃতি ও ভাবনায় দুর্গাপূজো একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। বাঙালির ভাবনায় বিভিন্ন রূপে মা দুর্গা কল্পিত হয়েছেন। বাঙালির সেই আবেগ ও ভাবনা উঠে এসেছে 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের 'দুর্গোৎসব' কবিতায়। বাঙালি সারাবছর ধরে প্রতীক্ষায় থাকেন তাই মাকে ঘরে পেয়ে যেন তাঁদের আনন্দের বাঁধ ভেঙেছে। দুর্গোৎসবকে ঘিরে সকল বাঙালি একসঙ্গে মিশে যায়, দূর হয় পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ। কবি মানকুমারী বসুর দীর্ঘ এই কবিতাটিতে পঙক্তি সংখ্যা ১৩৯ টি। বিস্তারিত এই কবিতা জুড়ে রয়েছে দূর্গা মাকে ঘিরে কবির তথা বাঙালির আবেগ ও পুজোকে ঘিরে সকলের আনন্দের কথা। 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের অন্তর্গত 'অভাগা বালক', কবিতাটি কলিকাতা সিটি কলেজে মূক ও বধির বালকদের উপলক্ষে লিখিত। কবিতাটির বিষয় খুবই হৃদয়গ্রাহী। কবি বলেছেন এই সমস্ত সন্তানরাও আমাদেরই মতো কোনো মায়ের সন্তান। তাদেরকেও মায়েরা গর্ভে ধারণ করেন, তারাও মাতৃত্বের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়

না। অথচ এদের জীবনে রয়েছে অগণ্য অপ্রাপ্তি। অবশ্য কিছু সহৃদয়বাণ মানুষ তাঁদের হিতকল্পে এগিয়ে আসেন, কবি সেইসকল মানুষদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

"তাঁরাও সহস্র ধন্য, মিলি যে ক'জন
এই সব অভাজনে
স্নেহভরে সযতনে

"বিধির আদেশ শুভ করেন পালন।
ধন্য এ উদ্যম আশা— ধন্য এ সাধন!"[২৫৪]

শারীরিক ভাবে অক্ষম শিশুদের নিয়ে লেখা এই কবিতাটির সাহিত্যিক মূল্য কম হলেও, কবিতাটির মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সামাজিক সংকল্পের বিশাল ব্যাপ্তি ঘটেছে। 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের একটি বিশেষ কবিতা 'পচম্বায়', কবিতাটির বিষয় ছোটনাগপুর বিভাগের গিরিডি মহকুমার নিকটস্থ একটি পার্ব্বত্য গ্রাম।[২৫৫] কবি অতিথি হিসেবে সেখানে গেছেন এবং সেই গ্রামে গিয়ে কবি মুগ্ধ হয়েছেন। তাই সেই গ্রামকে ঘিরে কবির আবেগভরা কিছু ভাবনা কবিতায় ধরা পড়েছে।

"অতিথি এসেছি আমি এ দেব-নগরে,
এ দেশে প্রকৃতি-রাণী,
প্রীতি ভরা হৃদিখানি,
তুষিছে এ দীনহীনে কত স্নেহভরে!
সে মমতা প্রাণ-গ'লা—
যায় না ভাষায় বলা,
শুধুই নীরবে মন অনুভব করে,
মানব এসেছি আমি দেবের নগরে!"[২৫৬]

কবি গ্রামের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যেন কোনো চারু চিত্রকর গ্রামটিকে সজ্জিত করেছেন, বনদেবী যেন তাঁর সবুজ পোষাক খুলে কানন প্রান্তরে বিছিয়ে দিয়েছেন। খাগো ও উশ্রী সেখানকার নদীবিশেষ, যাদের লহরী যেন মর্তে স্বরগের গীত বহন করে চলেছে। কবি এই গ্রামটিকে অমরপুরীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন-

"মানব এসেছি আমি অমর-নগরে,
করুণা মমতা স্নেহ—
ভরা হেথাকার গেহ,
দূরে যায় দুখ ব্যথা দেবের আদরে!"[২৫৭]

স্নেহ মমতায় সেখানকার মানুষ কবিকে স্বর্গীয় সুখ দিয়েছে। কবিতার পরিণতি অংশে কবি সেই গ্রামকে চিরদিন স্মরণে রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

বিধবার ব্যাথা ভরা জীবন নিয়ে লেখা কবিতা 'নব-বিধবা', 'বিভূতি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। মূহূর্তের তরে নারী জীবন থেকে সব কিছু হারিয়ে যায়, তাই কবি বলেছেন-

"এই যে ছিলাম হায়,
সুভগা— সম্রাজ্ঞীপ্রায়,
এই তো অবনী ছিল কত আপনার,
শাঁখা লোহা ছিল হাতে,
উজল সিন্দূর মাথে,
এই যে সে তুমি ছিলে— কেবলি আমার!"[২৫৮]

ক্ষণিকের তরে নারীর জীবন মরুভূমি হয়ে গেছে। কবি নিজেও এ বেদনা উপলব্ধি করেছেন, আর তাই কবিতায় বিষয়টিকে অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পেরেছেন। বিধবার বিবাহ হলেও তাঁর জীবনে সুখ ফিরে আসে না। তাঁর বিবাহ আবার সমাজে কাছে অধিক সমস্যার বিষয়, বিধবার প্রতি সমাজের ব্যভিচার আরো বেশি। এইসব বিষয় ফুটে উঠেছে 'বিভূতি' কাব্যের 'প্রতিশোধ' কবিতায়। বিধবার বিবাহের সামাজিক সমস্যা কবিতাটির বিষয়। কবির সরল বর্ণনায় ধরা পড়েছে সমাজের অযৌক্তিকতা, ভূয়ো সংস্কার প্রভৃতি। বিষয়টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কবির বর্ণিত দুটি স্তবকেই পুরো বিষয়টি আমদের বোধগম্য হয়েছে।

"নয় বছরের চামেলি যখন
বিধি দিলা বড় তাপ,
নিদাঘ প্রদোষে পতিকে তাহার
দংশিল ভীষণ সাপ!

"তর্কচূড়ামণি করিলা ন্যক্কার
শুনি বিয়ে বিধবার,
জাতিচ্যুত আজি চামেলির পিতা
আদেশে, শাসনে তাঁর।"[২৫৯]

বিধবা হওয়ার সঙ্গেই নারীর জীবন থেকে সুখ সাধ চলে যায় এবং বিধবার বিবাহ দিতে গিয়ে কন্যা ও তাঁর পরিবারের করুণ পরিণতি আলোচ্য পঙক্তিগুলিতে ফুটে উঠেছে। কবি বিষয়টিকে অসাধারণ ভাবে উপস্থাপিত করেছেন, আর এই পরিবেশন গুণেই কবিতার বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায় অনেক বেশি। ব্যক্তির জন্মস্থান তাঁর কাছে প্রাণের সমান, সেই বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা 'পল্লী-আহ্বান'।[২৬০]নিজের গ্রাম মাতৃতুল্য, তার প্রতি ভালোবাসা সকলের মনেই সুপ্ত থাকে। বিষয়টি কত সত্য ও চিরন্তন আবার কোনোভাবে নূতনও নয়। এই সরল বিষয়টি কবির মনকে নাড়া দিয়েছে। কবির বর্ণনায় বিষয়টি আমাদের হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

"মায়ের কুটীরখানি,
অলকা আমরা মানি,
শত তুচ্ছ তার কাছে পরের প্রাসাদ।"[২৬১]

কবি আরো বলেছেন আমরা কাঁচের আশায় মণিকে ত্যাগ করে যায়, কিন্তু তার মূল্য কিছুতেই কম নয়। তাই কবি সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন মার কোলে ফিরে আসার জন্য। সুবোধ নামে এক ছেলেকে নিয়ে লেখা কবিতা 'পরাজিত'।[২৬২] আঠাশ পঙক্তির নাতিদীর্ঘ কবিতাটির বিষয় খুবই মনোগ্রাহী এবং কবিতাটির বিষয় ও ভাব খুবই সরল। কবি ছেলেটির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে-

"ওরে অবোধ সোনার সুবোধ ফেলিসনাকো কালি,
কলম ভেঙে কাগজ ছিঁড়ে দিসনে হাতে তালি,
ওমা এমন দেখব না রে
হাসি যে তোর পীযূষ ধারে
ভুলিয়ে দিলি রাগটা আমার ঐ হাসিতে খালি,"[২৬৩]

শিশুর এই দুষ্টুমির কাছে মায়ের রাগ পরাজিত হয়েছে। কবিতাটি একটি শিশুকে ঘিরে গড়ে উঠলেও কবিতাটিতে কবির যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে তা কিন্তু চিরন্তন।

'প্রলয়' কবিতাটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩০৪ সালে আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩০৪ সালে ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার বিকেল ৫টায় যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় তাকে ঘিরেই কবিতাটি রচিত।[২৬৪] ভূমিকম্পের বিধ্বস্ত সর্বগ্রাসী ভয়ংকর রূপ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে।

"গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া
সহসা অসহ্য তাপে
অবনীর হিয়া কাঁপে,
প্রাণে প্রাণে অগ্নিপিন্ড উঠিছে জ্বলিয়া?—

"বসুধার হাড়গুলি,
হ'ল বুঝি গুঁড়া ধূলি,
হিমালয় কুমারিকা, যায় বা মিশিয়া!—"[২৬৫]

কবি মানকুমারী বসুর এই ধরণের কবিতার সংখ্যা খুবই কম, বিষয়ভিত্তিক কবিতার মধ্যেও কবির ভাবের আধিক্যই সর্বাধিক। কবি মানকুমারী বসু মূলত গীতিকবি। গীতিকবিতার ধারাতেই তিনি স্বয়ম্ভুশ ও আত্মনির্ভর। সেক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়ও অনেকক্ষেত্রে ভাবগত রূপ পেয়েছে। তবে বিষয়ের উপস্থাপনে ও ভাবনাকে সাজিয়ে কবিতায় বিষয়টিকে রূপ দেওয়ার কৃতিত্বও কিছু কম নয়। কবি মানকুমারী বসুর এই পর্যায়ের রচনাগুলি রসগুণে যে সাহিত্যসমন্বিত হয়ে উঠেছে তা বলাইবাহুল্য। তাই বলতে পারি মানকুমারী বসুর কবিত্বপ্রতিভায় এই কবিতাগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৩) পুনর্নির্মাণমূলক কবিতার বিশ্লেষণ

পুনর্নির্মাণ সাহিত্যের একটি বিশেষ ধরন। পূর্বতন সাহিত্যের কোন বিষয় বা ভাব অবলম্বনে কবি যখন তাঁর কবিতা রচনা করেন তখন সেটি পুনর্নির্মাণধর্মী কবিতা হিসেবে পরিগণিত হয়। সাহিত্যে এই ধরণের রচনার গুরুত্ব বেশ উল্লেখযোগ্য। পূর্বতন সাহিত্য পাঠকের সামনে উপস্থাপনের পাশাপাশি সেই সাহিত্য সম্পর্কে কবির ধারণা

বোঝা যায়, তাতে করে সেই বিশেষ রচনাটির গুরুত্ব ও নিত্যতা সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। পাশাপাশি প্রতিবেশী সাহিত্য বা বিশ্বসাহিত্য নিয়েও রচনার পুনর্নির্মাণ হতে পারে, সেক্ষত্রে সাহিত্য তাঁর নিজের সীমানা ছাড়িয়ে ব্যাপ্তি লাভ করে। পাঠকের বোধের বা উপলব্ধির জায়গাটাও বেশ শক্ত হয়। বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে রচিত সাহিত্যের আন্তঃসংযোগ তৈরি হয়, হয় ভাষার আদানপ্রদান। সেই সময়ের সমাজভাবনা ও কবির ভাবনা সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পূর্বতন সাহিত্যে প্রতিফলিত ভাবনার গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা জানা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্নির্মাণধর্মী সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। কবি মানকুমারী বসুর হাতেও এই ধরণের একাধিক কবিতা রচিত হয়েছে। সেই কবিতাগুলিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

এই ধারার প্রথম কবিতা হিসেবে ধরা যেতে পারে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যের অন্তর্গত 'ভ্রমর' কবিতাটি। কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের 'ভ্রমর' চরিত্র অবলম্বনে লিখিত।[২৬৬] আজীবন স্বামীর অনুগত প্রাণ এই ভ্রমর। কিন্তু রূপের মোহে পড়ে স্বামী গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সতী নারী বলতে যা বোঝায় ভ্রমর তাই, তাই কবির মনে হয়েছে এই অবহেলা ও অপমান ভ্রমরের মতন সতী নারীকে কেন সইতে হবে? বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নিবিড় পাঠের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'ভ্রমর' কবিতায় কবি মানকুমারী বসু কিছু প্রশ্ন রেখেছেন পাঠককুলের সামনে। ভ্রমর সংসারের প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচয় রেখেছেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আজ সে ধুলিলুণ্ঠিত। তাই ভ্রমরের পতিনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়ে কবি প্রশ্ন করেছেন-

"হায় অভাগী ভ্রমর!
যার পানে চেয়ে চেয়ে
অবোধ অভাগী মেয়ে!
ভুলেছিলি এ অবনী অপূর্ণ নশ্বর,
"কারে দিয়েছিলি প্রাণ অভাগী ভ্রমর!"[২৬৭]

এই প্রশ্নের উদ্দিষ্ট আসলে পাঠককুল। নারীর রূপ পুরুষকে মোহিত করে। তার হৃদয় বা ভালোবাসার মূল্য আসলে রূপের কাছে। নারীর মনের কদর, নিষ্ঠার মূল্য পুরুষ কোনোদিন দেয় না। সেই ভাবনার কথা উঠে এসেছে আলোচ্য কবিতাটিতে।

"যে পতি-চরণে সতী ঢালে নিরন্তর,
সেই কিনা "কালো" বলে,
চ'লে যায় পায় দলে,
সে খোঁজে— "কাহার রূপে আলো করে ঘর","[২৬৮]

তবু নারী ভুলতে পারে না পুরুষের প্রেম, ভোলাতে পারে না নিজের হৃদয়ের প্রাণ ভরা আবেগকে। নারীর জীবনে প্রেম অমূল্য, সেই প্রেমের জন্য নারী সোনা, হীরাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাই ভ্রমর কালো হলেও সেই কালো বুকের তলে বয়ে চলেছে প্রেমের মন্দাকিনী। সমস্ত কিছু তুচ্ছ করেও ভ্রমর জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁর স্বামীকে দেখার দীন গুনেছে। এই প্রসঙ্গে কবির তীক্ষ্ণ উক্তি-

"সে মহামরণ-তীরে
সে তো দেখিল না ফিরে,
দিল না জন্মের শোধ একটু আদর!"[২৬৯]

উপন্যাসেও ভ্রমর এই বাসনা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু উপন্যাসে ভ্রমরের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। ভ্রমরের ইচ্ছা অনুযায়ী গোবিন্দলালের শেষ সাক্ষাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় তা হয়নি। এখানে কবি যথারীতি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন।

"হায় অভাগী ভ্রমর!
তবু কি তাহার আশে
আবার রইবি কি ব'সে,
জ্বালায়ে জ্বলন্ত চিতা বুকের উপর?
স'য়ে কি এ বিষবাণ
রবে তোর দেহে প্রাণ?
এত কি অসাড় হবে রমণী-অন্তর?"[২৭০]

অপমান, লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তর দিতে হবে এটাই কবি বিশ্বাস করেন। কিন্তু উপন্যাসে ভ্রমরের এরূপ কোনো ভাবনা ফুটে ওঠেনি। সতী নারী তাঁর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমকে জীবনের শেষ অবধি বহন করে চলেছে, বঙ্কিম বাবু এরকম একটা ভাবনাই গড়ে তুলতে চেয়েছেন ভ্রমরকে ঘিরে। উপন্যাসে ভ্রমরের মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর সতীত্ব ও পতিনিষ্ঠার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এখানে কবি ভ্রমরকে ব্যক্তি নারী হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই কবি উপন্যাসের ভ্রমরকে প্রশ্ন করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন। মানকুমারী বসুর এই প্রশ্ন আসলে বঙ্কিম বাবুর প্রতি, উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থার প্রতি, সময়ের প্রতি। দুজন সাহিত্যিকের মধ্যে সময়ের পার্থক্যে একই তত্ত্বের সত্যতা পাল্টে গেছে, পুনর্নির্মাণধর্মী এই কবিতাটি তার দৃষ্টান্ত। পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা, নারীর প্রতি তাঁর অপমান, লাঞ্ছনা মেনে নিতে না পেরে কবি মানকুমারী বসু ভ্রমরের প্রতি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন-

"তাই বলি বিষ খাও ,
বিষ খেয়ে ম'রে যাও,"[২৭১]

পুরুষের শত অবহেলা সত্ত্বেও নারীর নীরব থাকার মানসিকতাকে কবি মেনে নিতে পারেননি। উপন্যাসের ভ্রমরের চরিত্রকেও কবি মেনে নিতে পারেননি। ভ্রমরের জীবন অবহেলায় শেষ হয়ে যাবে এটা কবির কাঙ্ক্ষিত নয়, কবির এই বিদ্রোহ আসলে পুরুষতন্ত্রের প্রতি। পুরুষতন্ত্রের অপমান ও অবহেলার বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য কবিতাটিতে।

রামায়ণের কাহিনি নিয়ে কবি মানকুমারী বসু লিখেছেন 'দশরথের বাণে মুনি-পুত্রের প্রাণত্যাগ' শীর্ষক কবিতাটি।[২৭২] ষোলো পঙক্তির ক্ষুদ্র কবিতাটিতে মুনি পুত্রের মৃত্যুর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রামায়ণের এই কাহিনি সর্বজনবিদিত। মৃগয়া করতে গিয়ে রাজা দশরথ ক্লান্ত অবস্থায় অন্ধকের তপোবনে বৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। এমতাবস্থায় দিব্য সরোবরে[২৭৩] মুনি পুত্র সিন্ধু[২৭৪] তাঁর কলসীতে জল পূর্ণ করার সময় জলের বকবক ধ্বনি শুনে রাজা দশরথ হরিণীর জল পানের শব্দ ভেবে সিন্ধুর বুকে তীর নিক্ষেপ করেন।[২৭৫] এই ভুলের শাস্তি হিসেবে মুনি তাঁকে যে অভিশাপ দিয়েছেন সেই

কথা রামায়ণে পাওয়া যায়।[২৭৬] কবি মানকুমারী বসু অবশ্য এইসব ঘটনার উল্লেখ করেননি। কবিতাটি শুরু হয়েছে এইভাবে-

"দশরথ নৃপবর
ছাড়ি' শব্দভেদী শর
বালক সিন্ধুর বক্ষ, মৃগ ভেবে বিঁধিয়া,
শেষে করে হাহাকার
উপায় না পায় আর,
কেমনে বাঁচাব তারে, মৃত্যু-পাশ খুলিয়া!"[২৭৭]

কিন্তু হায়! বাঁচাতে সে পারেনি, শত যন্ত্রণা নিয়ে মুনি পুত্র মৃত্যু কোলে ঢোলে পড়েছে। কিন্তু এই মৃত্যু শুধু মুনি পুত্রের একার নয়। দশরথের এই ভুলের কোনো ক্ষতিপূরণ হবে না, সেই কথা ভেবেই আত্মগ্লানিতে রাজা দশরথ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

"তার সে শোকের দায়—
অসহ্য বেদনে হায়!
জীবন্তে মরিল ভূপ— মৃত সিন্ধু হেরিয়া,
শত মৃত্যু দাঁড়াইল দশরথে ঘেরিয়া!!"[২৭৮]

কবির একথার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে আমাদের অসুবিধা হয় না। দশরথ যেন বেঁচে থেকেও মরে গেলেন, যতদিন তিনি বাঁচবেন এই মৃত্যু তাঁকে তাড়িত করে বেড়াবে। রাজা দশরথ এই ভুলের শাস্তি স্বরূপ আত্মগ্লানিতে ভুগেছেন। কবিতার শেষ পঙক্তিটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। কবির এই আবেদনেই যেন কবিতাটির সার্থকতা।

কবি মানকুমারী বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রমীলা চরিত্রটির পুনর্নির্মাণ করেছেন 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তগর্ত 'প্রমীলা' কবিতায়। কবিতাটি মূলত ভাবগত, প্রথম স্তবকটি পড়লেই একথা স্পষ্ট হয়।

"কুসুম-কাননে নব পারিজাত,
এ মর জগতে ত্রিদিব-ছবি,

কত পুণ্য-ফলে কত যোগ-বলে,
ও দেবী মুরতি গড়িলা কবি!”[২৭৯]

কবি এখানে প্রমীলাকে স্নিগ্ধ, সৌন্দর্যময়ী করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আবার তাঁকে কখনো বীরনারী করে অঙ্কন করেছেন।

“মহা বাহুবলে বীরবালাগণ,
টঙ্কারিছে ধনু ভীষণ রবে,
নাচিছে বড়বা ও পদ পরশি,
মানব, দেবতা, অবাক সবে!
অথবা

“আবার— বুঝি বা দানব নাশিতে
ডাকিনী যোগিনী সখীর সনে,
অশিবনাশিনী, কলুষহারিণী
অভয়া জননী পশিছে রণে!”[২৮০]

প্রমীলার এই ঐশ্বর্য দেখে মোহিত বানর বাহিনীও। রামের কণ্ঠেও তাঁর প্রতি প্রশস্তি ধ্বনিত হয়েছে।

“ধন্য বীরপণা! ধন্য বীরাঙ্গনা!
সাবাসি সাবাসি প্রমীলা সতি।”[২৮১]

কবি মানকুমারী বসু এই ভাবটি পেয়েছেন ‘মেঘনাদবধ কাব্য’র তৃতীয় সর্গ ‘সমাগম’ থেকে।[২৮২] প্রমীলার বীরত্বপূর্ণ ভাব দেখে সেখানে দাশরথি নত মস্তকে তাঁর পথ বিস্তীর্ণ করেছেন। প্রমীলার বর্ণনা দিতে গিয়ে মধুসূদন বলেছেন, ‘রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিলা কৌতুকে;-’।[২৮৩] এই প্রসঙ্গে বিভীষণের উক্তিও খুবই প্রাসঙ্গিক- ‘দেখ,/প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,/রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক। /না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,’।[২৮৪] স্বামীর যুদ্ধ যাত্রার সময় এই প্রমীলাই আবার রমণী রূপে স্ত্রীর ভুমিকা পালন করেছেন। স্ত্রী হিসেবেও প্রমীলার মধ্যে কোনো খামতি দেখা যায়নি, এই ঐশ্বর্যময়ী নারী আবার মৃত পতির সঙ্গে সতী হতেও পিছপা হননি। এই সতী হওয়ার

ঘটনা অবশ্যই সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে সমাজের একটি নেতিবাচক দিক। আসলে কবি মানকুমারী বসু এখানে প্রমীলার স্বামীর প্রতি প্রেমের নিষ্ঠতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কোনো নারীই এই ভাবে মৃত্যু বরণ করতে চায়না, কিন্তু প্রমীলা যেন স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করেছে। এটা শুধু সংস্কার বশে নয়, স্বামীর প্রতি প্রেমের আধিক্যের কারণেই হয়ত। কবি এমনটাই জানিয়েছেন কবিতায়-

"প্রাণ বুঝি সেথা গিয়াছে চলিয়া,
যেখানে গিয়াছে প্রাণের পতি।"[২৮৫]

প্রমীলাও সেখানে যেতে চেয়েছেন যেখানে তাঁর স্বামী চিরতরে চলে গিয়েছে। কারণ তাঁর মনপ্রাণও স্বামীর সঙ্গেইঅচলে গেছে। কবি সেই প্রমীলার প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন-

"ধন্য মেঘনাদ ! যার কণ্ঠহার,
দেবের দুর্লভ এ মণিমালা;
ধন্য কবিবর! তপোবলে যার,
মরতে দেখিনু স্বরগ-বালা!"[২৮৬]

মধুসূদনের অনুসরণেই কবি প্রমীলাকে একটি পূর্ণ নারী রূপে দেখাতে চেয়েছেন। মধুসূদন দত্ত নারীর স্বাধীন রূপ নির্মাণ করেছেন প্রমীলার মধ্য দিয়ে। কবি মানকুমারী বসুও সেই চরিত্রটিকেই পুনর্নির্মাণ করলেন তাঁর 'প্রমীলা' শীর্ষক রচনাটিতে। মানকুমারী বসু প্রমীলার সহমরণকে উজ্জ্বল করে দেখিয়ে তাঁর স্বামীর প্রতি প্রেমের ভাবকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। মহাভারতের কাহিনি নিয়ে কবি মানকুমারী বসু রচনা করেছেন 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের 'বীরবালক' শীর্ষক কবিতাটি। এই কবিতাটি পুনমুদ্রিত হয়েছে তার মহাকাব্য 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের প্রথম সর্গে। মহাকাব্যের প্রথম সর্গের দ্বিতীয় প্যারা থেকে তেরো পৃষ্ঠার শেষ অংশ অবধি সংকলিত হয়েছে 'বীরবালক' শীর্ষক কবিতায়।[২৮৭] অংশটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা পরের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। 'কনকাঞ্জলি' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে, তার অনেক পরে ১৯০৪ সালে 'বীরকুমার-বধ কাব্য'টি মুদ্রিত হয়েছে। তাই ধারণা করা যায় যে উক্ত অংশটি কবিতাকারে লিখিত হবার পর

মহাকাব্যে মুদ্রিত হয়েছে। 'বীরবালক' শীর্ষক কবিতায় বীর বালক হলেন অর্জুন পুত্র অভিমন্যু। পান্ডব বীরেরা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় কৌরব পক্ষে সেনাপতি হয়েছেন গুরু দ্রোণাচার্য। সেই কারণে পান্ডব শিবির চিন্তিত। পান্ডব শিবিরের পরামর্শ সভায় সভাপতিত্ব করেছেন কৃষ্ণ এবং অভিমন্যু এমতাবস্থায় পান্ডব কুলের সেনাপতির পদ অলংকৃত করতে এগিয়ে এসেছেন। এই বীরবালকের মাহাত্ম্য পাঠকদের অভিভূত করেছে। পুরাণ ও মহাভারতের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ থেকেই এই অংশটি পুনমুদ্রিত হয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তী মহাকাব্যের অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য। মধ্যযুগের এক আকর্ষণীয় চরিত্র 'রাধা'কে নিয়ে কবির অনুভূতিশীল হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের 'রাধিকা' শীর্ষক কবিতায়। কার্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ প্রেমিকা রাধাকে ছেড়ে মথুরা গমন করেছেন। এমতাবস্থায় বিরহিণী ও একাকী রাধার প্রতি কবির অনুভূতিশীল মনের সহমর্মিতা নিবেদিত হয়েছে। রাধাকে ছেড়ে গিয়ে কৃষ্ণ মথুরার রাজা হয়েছে শুনে রাধার উক্তি-

"কি বলিলি— প্রাণসই! সে কি রাজা মথুরার?-
ত্যজিয়া এ বৃন্দাবন,
মাঠে মাঠে গোচারণ,
সে কি আজ রাজপাটে, পাইয়া রাজত্ব-ভার?
বল তোরা ফিরে বল— শ্যাম সে তো রাধিকার!"[২৮৮]

কৃষ্ণের চলে যাওয়াটা রাধা মেনে নিতে পারেনি। কবির হৃদয়ের গভীরতা থেকেই এমন সংলাপ উঠে এসেছে বলা যায়। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কথা, বন্ধুবর শ্রীদাম-সুদামের সঙ্গে খেলার দিনগুলি, ননী চুরি করে খাওয়ার স্মৃতি কিন্তুই আজ কৃষ্ণের আজ মনে পড়ে না। বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণের মাথুর গমন নিয়ে 'মাথুর' বা 'বিরহ' পর্যায়ের পদ লিখেছেন, কিন্তু সেখানে তাঁরা শুধুমাত্র রাধার মনোদুঃখ কেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বাল্যের কথা তুলে এমন আবেগ ভরা অভিমানের অনুভূতি আমরা সেখানেও পাই না।

"খুলিয়া মোহন চূড়া,
খুলিয়া সে পীত ধড়া,
পড়েছে কি রাজবেশ মণিময় অলঙ্কার?—

আজি সে রাখালরাজে
সত্যকার রাজ-সাজে
বল দেখি প্রাণসখি! হইয়াছে কি বাহার?"[২৮৯]

আজ কৃষ্ণ সমস্তটাই বিস্মৃত, এই অভিমানে রাধা বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। তবু সে শুনতে চেয়েছে শ্যাম আসলে তারই। ভালোবাসার এহেন গভীর ভাব আমাদের বৈষ্ণব পদের রসাস্বাদন দেয়। রাধার কাছে এটা বিশ্বাসের অতীত যে কৃষ্ণ আজ রাধাকে ভুলে মথুরার রাজা হয়েছে। তাই রাধা বলেছেন- 'রাধা তো শ্যামের আধা,/পরাণে পরাণ বাঁধা,'।[২৯০] কিন্তু রাধা কোনো ভাবেই প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে ওঠেনি, কৃষ্ণ অদর্শনে গভীর দুঃখের মাঝেও রাধার অভীপ্সা—

"বল— সুখে আছে রাজা হ'য়ে মথুরার।"[২৯১]

প্রেমের এই উদারতাকে কবি রাধার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এই রাধা চিরকালের চিরজয়ী প্রেমিকা হয়ে পাঠকের মধ্যে বিরাজ করবে— কবি এই সফলতার অধিকারী।

কবি মানকুমারী বসুর পুনির্মাণ শুধু বাংলা সাহিত্য ঘিরেই তৈরি হয়নি, সংস্কৃত সাহিত্য থেকেও তিনি বিষয় নিয়ে তাঁর সাহিত্যে পুনর্নির্মাণ করেছেন। তাঁর 'তাপসী উমা'[২৯২] কবিতাটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের উমাকে নিয়ে লেখা।[২৯৩] 'কুমারসম্ভব' কাব্যের পঞ্চম সর্গ অবলম্বনে উমার তপস্যার দ্বারা মহেশ্বরকে প্রাপ্তির কথা আলোচ্য কবিতায় বর্ণিত হয়েছে । অতি নির্জন নিবিড় বনে উমা মহেশ্বরের জন্য তপস্যা করেছেন। প্রকৃতির মনোময় পরিবেশ উমার তপস্যার পবিত্রতা করেছে যেন। কবি উমার প্রসঙ্গে বলেছেন—

"সে যে—
মেনকা-মায়ের সরবস্ব ধন,
স্বরগ-জ্যোছনা বালিকা বেশে;
যোগে রত সদা কনকের লতা,
নব কোকনদ সে মরু দেশে।"[২৯৪]

কালিদাসের ভাব অনুযায়ী উমার সাধনার কঠোরতা লেখিকা এখানেও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মা বাপের নয়নের মণি উমা আজ যেন দীনহীন। কবি বলেছেন শত সহচরী প্রতিনিয়ত যাঁর সেবায় রত, যাঁর তনু কুসুমের ন্যায় সুকুমার, তাঁর অস্থি, চর্ম আজ অত্যন্ত ক্লিষ্ট। সে শরীরের হেম আবরণ খুলে ফেলেছে, তপস্যার নিবিড়তা বালিকার মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। সে এখন মাণিক রতন চায় না। পতি প্রাপ্তির এই নিষ্ঠা ভারতীয় নারীকে সভ্যতার শীর্ষে স্থান দিয়েছে। কবিও নারীর এমন ভাবনাকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই উমার ত্যাগের মহিমাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"নবীন অধর ও রাঙা অধর
ধূসর হয়েছে কাহারে ডেকে?
দিবা বিভাবরী কার ধ্যান করি
সোণা গায়ে গেছে কালিমা মেখে?"[২৯৫]

নারীর পতি প্রেমের সাধনায় কৃচ্ছতা সাধন এক প্রাচ্যসংস্কৃতি হিসেবে কালিদাসের উমার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজে চিরন্তন হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে কালিদাসের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। কালিদাসের উমা তাঁর পিতার কাছে গিয়ে ফলপ্রাপ্তি না হওয়া অবধি সাধনার ভাবনা ব্যক্ত করে বলেছেন—

"কদাচিদাসন্নসখীমুখেন সা, মনোরথজ্ঞং পিতরং মনস্বিনী।
অযাচতারণ্যনিবাসমাত্মনঃ, ফলোদয়ান্তায় তপঃসমাধয়ে।।"[২৯৬]

অর্থাৎ একদিন মনস্বিনী (স্থিরচিত্তা) উমা বিশ্বস্ত সখী দ্বারা অভিলাষাভিজ্ঞ পিতার হিমাদ্রির কাছে প্রার্থনা করলেন যে অভীষ্টফলপ্রাপ্তি না ঘটা অবধি তপশ্চরণার্থ অরণ্য বাস করবেন।[২৯৭]

কবি মানকুমারী বসুও এখানে সে ভাবনাকেই পুনর্নির্মিত করতে চেয়েছেন। নারীর কাছে পতির গৃহই স্বর্গ বা স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হওয়াতেই তাঁর স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। উমাও এর ব্যতিক্রম নয়। কবিও উমার এই স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"ও রাঙা চরণে চির-দাসী হ'য়ে
পড়ি রবে বালা জনম-তরে;

ইহাই সাধনা, ইহাই কামনা,
এই স্বর্গ লোভে তপস্যা করে।”[২৯৮]

উমার তপস্যার মাধ্যমে ত্যাগ ও কষ্টের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার মধ্য দিয়ে কবি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি মানকুমারী বসু শিক্ষায় অধ্যাত্মবাদ, পুরাণ ও ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর প্রভাব রয়েছে। কবির বর্ণিত তাপসী উমাকে ঘিরে পাঠকগণ প্রাচ্যের একটা সংস্কৃতিকে অনুভব করেছেন। এখানেই কবিতাটির শিল্পগত সার্থকতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসের বিশেষ চরিত্র প্রতাপকে কবি পুনর্নির্মিত করেছেন ‘প্রতাপ’ কবিতায়।[২৯৯] ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপকে আর্দশের প্রতিমূর্তি করে গড়ে তুলেছেন, কবি মানকুমারী বসু সেই ভাবনাটাকেই আলোচ্য কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতার শুরুতেই কবি বলেছেন।

“আমি জানি ধরাতলে পুরুষ দেবতা—
অধর্ম্মী যে দূরে যা’ক,
ভস্মেতে মিশিয়া থাক,
পুরুষই এ জগতে পিতা, পতি, ভ্রাতা;”[৩০০]

কবির এই উক্তি সম্পূর্ণত প্রতাপের অভিমুখে নিবিষ্ট। প্রতাপ তাঁর বাল্য প্রেম হারিয়েও কখনো প্রেমিকার প্রতি কোনো ঈপ্সিত বাসনা ব্যক্ত করেনি। শৈবালিনীর চরম আকাঙ্খা কে সে নীরবে এড়িয়ে গেছে। শৈবালিনী চন্দ্রশেখরের স্ত্রী, তাই পরস্ত্রীর প্রতি যথাযথ সম্ভ্রম বোধ সে রক্ষা করেছে। এছাড়াও সে পরোপকারী, দয়ালু, বীর এবং সর্বোপরি নিষ্ঠাবান। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শেষ অংশে প্রতাপের উদ্দেশ্যে রমানন্দ স্বামীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

“এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভন্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই।”[৩০১]

ঔপন্যাসিকের এই উক্তির মাহাত্ম্য আলোচ্য কবিতায় কেন্দ্রীভূত বিষয় হয়ে উঠেছে। কবির কণ্ঠেও এই একই বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে— 'পুন বলি, নরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ দেবতা!'[৩০২] কবি আরো বলেছেন—

"যে মহাত্মা আত্মত্যাগী,
পরহিতে দুঃখভাগী,
বিশ্বহিতে আপনারে ত্যজে অনায়াসে,"[৩০৩]

এই মহারত্নকে শৈবালিনী কখনো পাবে না ভেবে কবি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শৈবালিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর প্রতাপের অনেক সহায়তা করেছে। এই কারণে প্রতাপ চন্দ্রশেখরের কাছে ঋণী। তাঁর সঙ্গে কোনো রূপ বিশ্বাসঘাতকতা প্রতাপের সইবে না। প্রতাপ নিজের প্রাণের মায়া না করে শৈবালিনীকে উদ্ধার করেছে, কিন্তু তাঁকে পাওয়ার বিন্দুমাত্র মনস্কামনা প্রতাপের মধ্যে উদয় হয়নি। কবি তাই প্রতাপের জয়গান গেয়েছেন। প্রতাপ চরিত্রের নিষ্ঠা বাঙালীর কাছে গর্বের, তাই কবিতার শেষ অংশে কবির বাণী—

"কবির অমর কীর্ত্তি থা'ক এ ধরায়!
প্রতাপ! প্রতাপরূপে জাগ বাঙ্গালায়।"[৩০৪]

প্রতাপের মত একটি চরিত্রের পুনর্নির্মাণ সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। কবিও অসাধারণ দক্ষতায় চরিত্রটির মহত্ত্ব ফুটিয়ে তলেছেন।

মধ্যযুগের আরও একটি কাহিনির পুনর্নির্মাণ করেছেন কবি মানকুমারী বসু, কবিতাটি 'কারাবাসে শ্রীমন্ত' শীর্ষক নামে সংকলিত হয়েছে 'বিভূতি' কাব্যগ্রন্থে।[৩০৫] কবিতাটি প্রথমে প্রকাশিত হয় নব্যভারত পত্রিকায়।[৩০৬] মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অংশত কাহিনি নিয়ে কবি আলোচ্য কবিতাটি লিখেছেন। মাতা খুল্লনার কাছে পিতার সংবাদ জানতে পেরে শ্রীমন্ত পিতা ধনপতিকে উদ্ধার করার জন্য বাণিজ্যের পসরা সাজিয়ে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। পথমধ্যে ভাগ্যের পরিহাসে শ্রীমন্ত চন্ডীর ছলনায় তাঁর কমলেকামিনী রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং সিংহলে পৌঁছে রাজাকে সেই দৃশ্য দেখানোর প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু সেই দৃশ্য দেখাতে না পেরে শ্রীমন্ত

বন্দী হয় এবং দক্ষিণ মশানে তাঁর হত্যার শাস্তি ঘোষিত হয়। বিদেশে বিভূঁয়ে এইভাবে জীবনের শেষ হয়ে যাওয়াটা শ্রীমন্ত কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এইভাবে যদি মনুষ্য প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে যায় তাহলে এই সুন্দর পৃথিবীতে তাঁর আগমনের কোনো মূল্যই নেই। আধুনিক যুগের হত্যালীলায় মানুষের জীবন অনেক বেশি অস্থায়ী হয়ে উঠেছে, কিন্তু মানুষের প্রাণ অমূল্য। মধ্যযুগের কাহিনিকে কবি এখানে মানবিক ভাবনা দিয়ে নির্মাণ করেছেন। নিয়তির পরিহাসেই আজ শ্রীমন্তের এমন দশা। সে চোর বা দস্যু নয়, কিন্তু তবুও বিদেশে স্বজনহারা শ্রীমন্ত মৃত্যুর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। এমন অবস্থায় শ্রীমন্তের স্বরণে এসেছে মাতৃস্নেহ। পরিণতির সময়ে সন্তানের এই মাতৃস্মরণ বাঙালির বাৎসল্য ভাবনার পরিচয় দেয়। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের শ্রীমন্তের কাহিনির মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজের এই ভাবনাকেই কবি নতুনভাবে রূপ দিতে চেয়েছেন আলোচ্য কবিতার মধ্য দিয়ে। অধ্যাপক মোহিনী মোহন সরদার এই কবিতার বিশ্লেষণে শ্রীমন্তের মাতৃস্নেহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> "...শুভ-অশুভ, সিদ্ধিলাভ, ঋদ্ধি প্রাপ্তি, পবিত্র ধর্মের আচরণ, দেবতার মহিমা প্রভৃতি পার্থিব জগতের এই সব মূল্যবান বস্তুর থেকেও বেশি দামি মাতৃস্নেহ, মাতৃকোল। তাই আজ এইরূপ নির্জনে কারাগারে বসে শ্রীমন্তের মনে হয়েছে মাতৃকোল মানে অমৃতমাখা ঠাঁই।"[৩০৭]

আলোচ্য কবিতায় শ্রীমন্তের মাতৃস্মরণের এমন মনোরম ব্যাখ্যা দুর্লভ। শ্রীমন্ত আজন্মকাল পালিত সেই মাতৃভবনকে স্মরণ করেছেন। কবির ভাষায় তাঁর অসাধারণ চিত্র কবিতায় লক্ষ করা যায়।

"কোথা চির পরিচিত স্নেহের ভবন—
যে প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাবেলা
খেলিতাম শিশু-খেলা
সোনার শৈশবে সেই মিলি সখীগণ"[৩০৮]

মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্তের এই নস্টালজিয়া বাঙালির চিরন্তন স্নেহের রোমান্টিকতাকে শিল্পসমন্বিত করে তুলেছে। কবিতায় শ্রীমন্তের মৃত্যু চেতনা অপেক্ষা স্নেহের গভিরতা অধিক হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কাহিনির পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে

কবি মানকুমারি বসু কাহিনি পরিকল্পনায় মৌলিকতার পরিচয় রেখেছেন। আলোচ্য কবিতার কাহিনিটি সম্পূর্ণত মৌলিক। কারাবাসে বসে এই আক্ষেপের কোনো কাহিনি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে পাওয়া যায় না। তবে ভাবনা বা কাহিনির প্রেক্ষাপট পুরোপুরি মুকুন্দ চক্রবর্তীর থেকে নেওয়া। কাব্যের কাহিনি বা সামগ্রিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পুনরায় সমালোচক মোহিনী মোহন সরদারের বক্তব্যকে স্মরণ করা যায়। আমাদের বক্তব্যের সাপেক্ষে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাখ্যা মিলে যায়। তিনি বলেছেন—

> "...কারাগারে শ্রীমন্তের কল্পনা, যেটি এই কবিতার মূল বিষয় তা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকাহিনিতে পাওয়া যায় না, এখানে কবির মৌলিক চিন্তাধারারই পরিচয় আছে।"[৩০৯]

উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি কবিতাটির গুরুত্বকে শতগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই। এই ব্যাখ্যা কবিতাটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করায়। বাংলার সমাজচিত্রকেও কবি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন, শান্ত ও স্নিগ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে শ্রীমন্তের স্মৃতি চারণের মধ্য দিয়ে বাংলার ইতিহাসও কবিতাটিতে উঠে এসেছে। কবিতাটির কাহিনির মধ্যে তৎকালীন রাজনৈতিকতার পরিচয় উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক মোহিনী বাবু বলেছেন-

> "...পিতৃ অন্বেষণে গিয়ে কুহক না বুঝে শ্রীমন্তের শিশুমন যে ফাঁপরে পড়েছে তা আসলে একনায়কতন্ত্রের ক্রিয়াকর্মের চরম প্রকাশ; .....সমগ্র কবিতাটিতে তাই সরল শিশুমনের সঙ্গে জটিল রাজনীতির অঙ্কটিকে সার্থকভাবে বুনে দিয়েছেন কবি।"[৩১]

বাৎসল্য রস, বাংলার ইতিহাস বর্ণনা, রাজনৈতিক ভাবনা প্রভৃতি একাধিক তত্ত্বের কারণে কবিতাটি মানকুমারী বসুর সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কবির কিছু অগ্রন্থিত কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'ভরত'[৩১১] নামে কবিতাটি রামায়ণের কাহিনি নিয়ে লেখা। কৈকেয়ীর কারণে রাম বনবাসে গেলে ভরত অযোধ্যার রাজা হয়েছেন। কিন্তু ভরত রাজ সিংহাসন ও রাজবৈভব উপেক্ষা করে নির্মোহ ভাবে প্রজাপালন করতে থাকেন। কারণ অযোধ্যার রাজসিংহাসনের একমাত্র

উত্তরসূরি হলেন দশরথের অগ্রজ সন্তান রাম। তাই ভরত সিংহাসনে অগ্রজের পাদুকা রেখে রাজ্য পালন করেছেন। কবি মানকুমারী বসু এই কাহিনিকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্নির্মিত করেছেন। কবিতার বর্ণনায় মূল কাব্যের পাঠ ধরা পড়েছে।

"দু-খানি পাদুকা রাখি চন্দনচর্চিত;
নিম্নতলে মৃগাজিনে বসি যোগাসনে,
করিছেন রাজকার্য শান্ত-সুবিনীত।"[৩১২]

ভরতের মাহাত্ম্য গাথাকে কবি মহৎ করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। রামায়ণে এই অংশের প্রকাশ লক্ষণীয়, কিন্তু কবির দৃষ্টিভঙ্গি কতকটা আলাদা। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সাধকে ত্যাগ করে ভরত এহেন কর্মের মধ্য দিয়ে মাতা কৈকেয়ীর পাপস্খলন করেছেন। ভরতের মহত্ত্বেই কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা মুছে গেছে বলা যায়। মধ্যযুগীয় কাহিনির মোড়কে কবি মানকুমারী বসু আধুনিক ভাবনার নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন।

"সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-সাধ দলিয়া চরণে,
মাতৃপাপ-প্রায়শ্চিত্ত করিছে ধীমান,

"ধন্য হে ভরত!— তব মহা-তপস্যায়,
জননীর কোটি পাপ ভস্ম হয়ে যায়।"[৩১৩]

কবিতাটি প্রথমে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পড়ে 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য কবিতায় কবি ভরতকে নতুন ভাবে দেখিয়েছেন। উক্ত উদ্ধৃতির শেষ পঙক্তিটির বক্তব্যে ভরতের মাহাত্ম্য শতগুনে বেড়ে গেছে এবং এই ভাবনাটি কবি মানকুমারী বসু নতুন ভাবে নির্মাণ করলেন আলোচ্য কবিতায়।

কবি মানকুমারি বসুর পুনর্নির্মাণধর্মী প্রত্যেকটি কবিতায় শুধু কাহিনির পুনর্নির্মাণই হয়নি, নতুন কোনো ভাবনার আলোকে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি কাহিনি আধুনিক ভাবনার আলোকে নির্মিত হয়েছে। কখনো মূল পাঠকে অবিকৃত রেখে, আবার কখনো বা মূল কাহিনির পরিবর্তে মৌলিক কাহিনির অবতারণা করে মানকুমারী বসু কবিতার অবয়ব গঠন করেছেন। কবির মৌলিক ভাবনার কারণে কবিতাগুলির

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং সেই ভাবনার আলোকে কবিতাগুলি আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যেও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছে। আধুনিক ভাবনার কারণেই কবিতাগুলিকে আমরা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

৪। শিশু-কিশোর পাঠ্য কবিতার বিশ্লেষণ

শিশুসাহিত্য রচনায় বাংলা সাহিত্যের জুড়ি মেলা ভার। শিশু সাহিত্য রচনা করা সবথেকে কঠিন কাজ, কবির মনকে সেই ভাবনায় নামিয়ে তাঁর মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। বাংলা সাহিত্যে একাধিক ব্যক্তি শিশুসাহিত্য রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন। উনিশ শতকে সেই একাধিক ব্যক্তির[৩১৪] সঙ্গে কবি মানকুমারি বসুর নামও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি। যদিও মানকুমারী বসুকে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে ধরা যায় না। কিন্তু মানকুমারী বসু এই ধরনের একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। কবি তাঁর এই ধরনের কবিতাগুলিকে অত্যন্ত মনোজ্ঞ, সরস ও প্রাঞ্জল করে রচনা করেছেন। 'পরাজিত'[৩১৫] কবিতায় কবি একটি শিশুর কথা বলেছেন। কবিতাটি অন্তমিল দিয়ে রচিত হয়েছে, আর তাই কবিতাটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

"সুবোধ!
একটুখানি ক্ষুদে ছেলে বড্ড ভালোবাসি
বড্ড ভালো লাগে যে তার সোনামুখে হাসি
দোল দোল দোল হাতের তালি,
নীরবে তাই দেখছি খালি,"[৩১৬]

কবি মানকুমারী বসুর হৃদয় ছিল মাতৃ স্নেহে ভরপুর। সেই ভাবনার আলোকেই কবি শিশুর সরল জীবনের ছবি এঁকেছেন আলোচ্য কবিতায়। শিশু মুখ দেখে কবির প্রাণ ভরে উঠেছে, সমস্ত রাগ, বিষাদ, অন্তবেদনা ঘুচে গেছে। তাই কবিতার শেষে কবি প্রার্থনা জানিয়েছেন এইভাবেই যেন তারা মায়ের প্রাণকে স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেয়। কোন বক্তব্য বা দর্শন কবিতাটির ভার বাড়ায়নি, সরসতা ও প্রাঞ্জলতাই কবিতাটির প্রাণ।

তাঁর 'সোনার সাথী' কাব্যের 'ভাইবোন' কবিতাটি গড়ে উঠেছে ছড়ার ছন্দে। কবি এই কবিতাটিকে ঘুমপাড়ানির গান বলে উল্লেখ করেছেন।[৩১৭] শিশুসুলভ ছড়ার

রীতিতে রচিত কবিতাটি রসবোধে পাঠকগণের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। শিশুকে ঘুম পারাতে বাস্তবিক এই ছড়াটির মাধুর্য শিশুমনকে নাড়া দিয়ে যায়—

"ঘুম যাও ভাই সোনার গোপাল ঘুম যাও মোর বুকে,
মা আসিয়ে চুপে-চুপে চুমো দেবেন মুখে;
যখন হবে সকালবেলা
দু-ভাই বোনে করব খেলা
এখন আমার লক্ষ্মী ছেলে এই কথাটি শোন
ঘুমাও আমার রতন মানিক ঘর উজলা ধন।"[৩১৮]

কবিতাটি পাঠ করলেই বাঙালি মায়ের নিগূঢ় হৃদয়ের ভালোবাসার মাধুর্য পাঠককে মোহিত করে। এই বিমূর্ত অনুভূতি ব্যাখ্যার অতীত; এখানেই কবিতাটির শ্রেষ্ঠত্ব। 'এগুলিকে যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না। বিষয়ের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এগুলির মধ্যেও লুকিয়ে আছে চির নতুনত্ব।'[৩১৯] কবিতাটির পঙক্তিগুলির গঠনও(structure) লক্ষণীয়। পড়ার মধ্যে যেমন একটি সুর অনুভব হয়, ঠিক তেমনি কবিতাটি দেখলেও শিশুমনে একটা আকর্ষণ তৈরি হয়। 'চাঁদ ডাকা'[৩২০] কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ষোলো পঙক্তির এই অসাধারণ সরস কবিতাটি খুবই সুখপাঠ্য। চাঁদ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একাধিক মজার মৌখিক ছড়া প্রচলিত আছে। এই কবিতাটিও কতকটা সেইরকমই, রসবোধে ক্ষুদ্র এই কবিতাটি শিশুমনে অনায়াসেই জায়গা করে নিতে পারে।

"চাঁদ! আয়রে চাঁদ আয়রে!
আমার বাড়ি আয়,
মাথায় দিব ফুলের তেল,
আতর দিব গায়।
খেতে দিব ন্যাংড়া আম
ঘন দুধের বাটি;
বসতে দিব সোনার খাট
শুতে শীতল পাটি।"[৩২১]

এমন মনোজ্ঞ শিশু কবিতা বাংলা শিশু সাহিত্যকে যে সমৃদ্ধ করেছে তা বলাইবাহুল্য। ন্যাংড়া আম, দুধের বাটি, সোনার খাট প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস দিয়ে চাঁদকে ধরতে গিয়ে চিরন্তন মাতৃস্নেহের রূপটি ফুটে উঠেছে।

'সোনার সাথী' কাব্যগ্রন্থের আরও একটি কবিতা 'চোরের শাস্তি'[৩২২]। এই কবিতাটি কতকটা ভিন্ন ধরণের। নিছক মজা ছাড়াও কবিতাটির মধ্যে রয়েছে কিছু নীতিশিক্ষা। কবি শিশুদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা, ভালো-খারাপের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে হালকা ভাবের সহজ ছন্দে আলোচ্য কবিতাটি রচনা করেছেন। কবিতাটির শুরুতে মজার বিষয় দিয়ে কবি উক্ত ভাবনার অবতারণা করেছেন।

"এক বাটি দুধ রেখে ভাঙা ঢাকা তলে,
"ঘোষ পিসী" গিয়াছে কোথায়,
"সুসময়" বুঝি পুষি চুপে-চুপে চলে
উপনীত হইল তথায়।"[৩২৩]

এহেন অবতারণায় একটা মজার বিষয় ছাড়া আর কোনো কিছুই প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিড়াল সুযোগ বুঝে ভাঙা ঢাকায় রাখা দুধ খেয়ে নিতে চেয়েছে। কিন্তু চুরি করে খাওয়ায় পাপীর কপালে তা সহ্য হয়নি। তাঁর অসততা অচিরেই ধরা পড়ে যায়। কবি সেকথাও মজার বিষয়ের মোড়কে ছড়ার রীতিতে প্রকাশ করেছেন।

"চারু সে "দুরন্ত ছেলে" জল খেতে এসে,
দেখিল সকল পাতি আড়ি,
কোণে ছিল ছোট লাঠি তাই নিয়ে শেষে,
পুষিরে মারিল এক বাড়ি।"[৩২৪]

চুরি করলে কি হয় তা কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন। কবি বিষয়টিকে সুন্দরভাবে অবতারণা করেছেন। আবার শিশুর মনে রসানুভূতি সঞ্চারে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না। কবিতায় আরো বক্তব্য রয়েছে কিন্তু পুরোটাই ছড়ার রীতিতে, তাই শিশু কবিতা হয়ে উঠতে তা বাধা সৃষ্টি করেনি। কবিতাটির মধ্যে কবির ব্যক্তিগত নীতি-নৈতিকতার প্রকাশও লক্ষ করা যায়। কিন্তু তিনি সচেতনভাবে কবিতার বিষয়কে শিশুসুলভ করে গড়ে তুলেছেন,

নিজের ব্যক্তিদর্শন দিয়ে কবিতার ভার বাড়াননি। কবি তাঁর ভাবনাকে হাস্যরসের মাধ্যমে সরলীকৃত করেছেন। কবি বলেছেন—

"চারু বলে "চোর পুষি! একি রীতি তোর,
এত দিই তবু তোর চুরি?
আরো এক বাড়ি মেরে ঘুচাইব জোর,
চোরে আমি বড় ঘৃণা করি!"[৩২৫]

কবিতাটির পাঠের আকর্ষণকে কবি সচেতনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তার মধ্য দিয়েই কবি তাঁর বক্তব্যটিকে পেশ করেছেন। কবিতার শেষ পঙক্তিতে কবি সকল পাঠকের মধ্যেই একটা কৌতুহল তৈরি করেছেন। কবি যখন বলেন 'আমার মনের কথা চুপে চুপে কও,/পাঠক পাঠিকে ভাই! তোমরা তো নও?'[৩২৬] তখন পাঠকের ভাবনাতেও দ্বন্দ্বের উদয় হয়েছে। শেষ পঙক্তিটি কবির এই বক্তব্যে শ্লেষাত্মক এবং মজার হয়ে উঠেছে। এই ধরণের একাধিক মজার কবিতা পাওয়া যায়, যেগুলি বিষয় গুণে খুবই সামান্য। কিন্তু কবিতাগুলি ছড়ার রসে বাঙালি পাঠক-পাঠিকার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠতে পেরেছে। শিশুধর্মী কবিতার ক্ষেত্রেও মানকুমারী বসুর কবিত্ব প্রতিভা প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে।

মানকুমারী বসুর একাধিক পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে কোনো পর্যায়ের কবিতাগুলি যেমন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে, আবার বাকী পর্যায়ের কবিতাগুলি সাহিত্যগুণে গুরুত্ব লাভ করেছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐতিহাসিকগুরুত্ব সমন্বিত কবিতাগুলি থেকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আর সাহিত্যগুণে যে কবিতাগুলি মহীয়ান সেগুলি থেকে কবি মানকুমারী বসুর কবিত্বগুণ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই আলোচনা থেকে বাংলা সাহিত্যে মানকুমারী বসুর কীর্তিত্ব সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা তৈরি হয়।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য-

১. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১০০।

২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০০।

৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০১।

৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০১।

৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৬।

৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮।

৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১১।

১০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যের বিজ্ঞাপন অংশ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১।

১১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র।

১২. দ্রষ্টব্য: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'গীতিকাব্য' 'বিবিধ প্রবন্ধ', এস.ঘোষ (সম্পা.), ঊষা পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৩৯।

১৩. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১১৪।

১৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ঈশ্বর', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২।

১৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র পৃ. ৩।

১৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র পৃ. ৪।

১৭. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১১৪।

১৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ঈশ্বর', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২।

১৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'শিবপূজা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৫।

২০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭।

২১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭।

২২. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩,পৃ. ১১৫।

২৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভাঙিও না ভুল', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৭।

২৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ৮।

২৫. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩,পৃ. ১১৬।

২৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভাঙিও না ভুল', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৯।

২৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১০।

২৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১০।

২৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১০।

৩০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'তুমি তো আমার', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৯২।

৩১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৩।

৩২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৪।

৩৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৪।

৩৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৪।

৩৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'নরবলি', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৮৯।

৩৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮৯।

৩৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৯১।

৩৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ধাঁধা', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ৯।

৩৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০।

৪০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভিক্ষা', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ১০৭।

৪১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮।

৪২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিদায় সঙ্গীত', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ১৪৯।

৪৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫০।

৪৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কেন আছি', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, পৃ. ১৫৯।

৪৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬১।

৪৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কি চাই', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, পৃ. ১৬২।

৪৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৩।

৪৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৩।

৪৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বাণী-বন্দনা' (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা',বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১০৮।

৫০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বাণী-বন্দনা' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' ,বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১০৮।

৫১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পাষাণী' (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা',বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১২৯।

৫২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২৯।

৫৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৩০।

৫৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৩০।

৫৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'মা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১১।

৫৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১।

৫৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২।

৫৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'মায়ের কুটীর', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৬।

৫৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬।

৬০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮।

৬১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'একা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৩৭।

৬২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৮।

৬৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৯।

৬৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রিয়বালা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৪১।

৬৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'শোকোচ্ছ্বাস' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৭৭।

৬৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'শোকোচ্ছ্বাস', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৭৭।

৬৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭৮।

৬৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮১।

৬৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'শোকাতুরা মা' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৩৩।

৭০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'শোকাতুরা মা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৩৪।

৭১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৩৭।

৭২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৩৮।

৭৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিসর্জন', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৪০।

৭৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৪০।

৭৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'তিনদিনের কথা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৯৭।

৭৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পূর্ব্ব-স্মৃতি', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১০৪।

৭৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

৭৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সাধের মেয়ে', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৫৩।

৭৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৪।

৮০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৫।

৮১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৫।

৮২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৬।

৮৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৬।

৮৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সহযোগিনী', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৫৭।

৮৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৮।

৮৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৯।

৮৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অভাগিনী' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৬৪।

৮৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অভাগিনী', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৬৬।

৮৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৬।

৯০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৬।

৯১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৭।

৯২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৭।

৯৩. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু',অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১০৪।

৯৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অভাগিনী', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৬৯।

৯৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অভিমানে', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৯৭।

৯৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সাতক্ষীরা' কবিতার শিরোনাম, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৫২।

৯৭. 'ত্রয়োদশ বর্ষে সেই-/ অভাগা এসেছে এই', দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সাতক্ষীরা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৫২।

৯৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সাতক্ষীরা' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৫২।

৯৯. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', অলোক রায় (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১০৭।

১০০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৭।

১০১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সাতক্ষীরা' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৫২।

১০২. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১০৭।

১০৩. 'দেখ দেবতা আমার/ তোমার স্নেহের মেয়ে,/সাগ্রহে রয়েছে চেয়ে,/ সে যেন দেখিতে পাবে শ্রীচরণ কার!', দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সাতক্ষীরা' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৫৪।

১০৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র পৃ. ২৫৬।

১০৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সুখী', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ৪৯।

১০৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৫০।

১০৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ফটো বিচার', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ১১৫।

১০৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'দেবশিশু', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ২১৭।

১০৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২১৮।

১১০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'মাতৃহারা'(বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা',বা রিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১১৫।

১১১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১৫।

১১২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ব্যথিতা'(বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা',বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৩১।

১১৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, বিভূতি কাব্যগ্রন্থ, 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা',বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৪৯।

১১৪. 'আয় রে বিমল! যাদুমণি!/ দেখি তোর অই চাঁদ মুখ,/ স্বরগের অমিয় সমীর/ জুড়ায়ে দে চির তপ্ত বুক।' দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিমলা'(বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৪৯।

১১৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'শেষ' (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৫১।

১১৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫১।

১১৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কবির শ্মশানে'(বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ(সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৭০।

১১৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭২ ।

১১৯. মানকুমারী বসু বিরচিত 'বিষাদ' কবিতাটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ১৩০৩ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায়।দ্রষ্টব্য: উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, পৃ. ২৯৪।

১২০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিষাদ' উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০৩ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায়, পৃ. ২৯৪।

১২১. মানকুমারী বসু বিরচিত 'বিষাদ' কবিতাটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ১৩০২ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায়।দ্রষ্টব্য: উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, পৃ. ৩০১।

১২২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অতিথি' উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০২ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায়, পৃ. ৩০১।

১২৩. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু', দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১১১।

১২৪. দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, নবন মুদ্রণ মাঘ ১৪১৮,পৃ. ২৩৪।

১২৫. দ্রষ্টব্য: বিকাশ রায়, 'মানকুমারী বসুর কবিতায় স্বাদেশিকতাবোধ', তথ্যসূত্র পত্রিকা 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৪০।

১২৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'মলয়-বাতাস', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২১।

১২৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৩।

১২৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বর্ষা-সুন্দরী', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৪৮।

১২৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৮।

১৩০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৯।

১৩১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৫০।

১৩২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৫১।

১৩৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অন্ধকার নিশি', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৫৭।

১৩৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ঊষা-সমাগম', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৮৬।

১৩৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮৭।

১৩৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮৭।

১৩৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রভাতি-চাতক', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১০৯।

১৩৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১০।

১৩৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আমাদের দেশ', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৭৯।

১৪০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বসন্ত-সুহৃদ', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২২৬।

১৪১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২২৭।

১৪২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২২৯।

১৪৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রভাতী', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ১।

১৪৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১।

১৪৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩।

১৪৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আমাদের দেশ', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৭৮।

১৪৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৭।

১৪৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৯।

১৪৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮০।

১৫০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮৪।

১৫১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'মায়ের সাধ', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৪৯।

১৫২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫২।

১৫৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আমরা কারা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৬২।

১৫৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৬৪।

১৫৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৬৫।

১৫৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৬৬।

১৫৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আকাঙ্ক্ষা', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ১৯।

১৫৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২০।

১৫৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'শোকোচ্ছ্বাস' কবিতার শেষ অংশ, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ৭৭।

১৬০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭৮।

১৬১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮২।

১৬২. দ্রষ্টব্য: সুমিতা চক্রবর্তী, 'বাংলা কবিতায় আধুনিকতা বোধের বিবর্তন', 'আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ২০০৬, পৃ. ২৫।

১৬৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পূর্ব্ব-স্মৃতি', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১০৩।

১৬৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৫।

১৬৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সাতক্ষীরা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৫২।

১৬৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'উচ্ছ্বাস' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১২৭।

১৬৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'উচ্ছ্বাস', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১২৮।

১৬৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৩২।

১৬৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২৮।

১৭০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কবির শ্মশানে' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ৩৩।

১৭১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৫।

১৭২. কামিনী রায়ের জন্ম ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। এছাড়াও তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থ 'নির্মাল্য' (১৮৯১), 'পৌরাণিকী' (১৮৯৬) প্রভৃতি গুলি যথাক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রকাশিত হয়। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, নবন মুদ্রণ মাঘ ১৪১৮,পৃ. ৪২৩-৪২৫।

১৭৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অভিনন্দন', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ২২৩।

১৭৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২২৪।

১৭৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'রাজেন্দ্রনাথ' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৩২।

১৭৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'রাজেন্দ্রনাথ', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ(সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৩৩।

১৭৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৩৩ ।

১৭৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৩৫।

১৭৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'স্বাগত', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৬৬।

১৮০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৬।

১৮১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৭।

১৮২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৭।

১৮৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'স্মৃতি-পূজা' কবিতার সূচনা অংশ,(বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৭২।

১৮৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'স্মৃতি-পূজা',(বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৭৩।

১৮৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭২।

১৮৬. দ্রষ্টব্য: উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০৪ মাঘ সংখ্যা, পৃ. ৩৭১।

১৮৭. নিস্তারিণী দেবী, শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র, শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়, শ্রীমতী স্বর্ণময়ী বসু, শ্রীমতী প্রতিভা কুমারী প্রমুখগণ উক্ত সময়ে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় লিখতেন।

১৮৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আত্মঘাতিনী', উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০৪, মাঘ সংখ্যা, পৃ. ৩৭২।

১৮৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিয়োগবিলাপ', উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, পৌষ সংখ্যা।

১৯০. গুরুদাস মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পরে কবিতাটি রচিত। দ্রষ্টব্য: উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, পৌষ সংখ্যা।

১৯১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিয়োগবিলাপ', উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, পৌষ সংখ্যা।

১৯২. দ্রষ্টব্য: উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.),'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০৪ ভাদ্র সংখ্যা, পৃ. ১৭৯।

১৯৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৯।

১৯৪. কবিতাটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯৫. দ্রষ্টব্য: উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০৪ জৈষ্ঠ্য সংখ্যা, পৃ. ৪৩।

১৯৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অভিষেচন', উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, জৈষ্ঠ্য সংখ্যা, পৃ. ৪৪।

১৯৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৪।

১৯৮. 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তগর্ত কবিতা।

১৯৯. দ্রষ্টব্য: উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ. ৩৫২।

২০০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সাধ', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১০০।

২০১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০১।

২০২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'নরবলি', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৮৯।

২০৩. দ্রষ্টব্য: 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তগর্ত কবিতা পৃ. ১৮৯ ।

২০৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'নরবলি', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৯১।

২০৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৯২।

২০৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভিখারী', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১৯৪-১৯৫।

২০৭. দ্রষ্টব্য: 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তগর্ত কবিতা পৃ. ২০১।

২০৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অনন্ত প্রহেলিকা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১,, পৃ. ২০৩।

২০৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভগ্ন-হৃদয়', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৩১।

২১০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৩২।

২১১. 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৩৪।

২১২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পিপাসা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৩৬।

২১৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৩৬।

২১৪. 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৩৯।

২১৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'হতাশে', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৩৯।

২১৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অন্তিম প্রার্থনা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৪১।

২১৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভুলভাঙা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৪৫।

২১৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৪৬।

২১৯. 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ৪৪।

২২০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কি ক্ষতি আমার', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ৪৬।

২২১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৬।

২২২. 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ৫৪।

২২৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পতঙ্গের প্রতি', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ৫৪।

২২৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৫৬।

২২৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৫৭।

২২৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রার্থনা', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ৬২।

২২৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৬৩।

২২৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৬৫।

২২৯. 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের 'প্রার্থনা' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ৬২।

২৩০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আসিবে কি?', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ১০৬।

২৩১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'নিরাকাঙ্ক্ষী', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ১৩৬।

২৩২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৩৭।

২৩৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিদায়-সঙ্গীত', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ১৫০।

২৩৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কেন আছি?', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ১৫৮।

২৩৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কেন?', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ২২০।

২৩৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২২৩।

২৩৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আসক্ত', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ২৩০।

২৩৮. দ্রষ্টব্য:মানকুমারী বসু, 'নববর্ষ-নবজীবন', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ২৫৯।

২৩৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'সত্যলাভ',(বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১১১।

২৪০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'জিজ্ঞাসা', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৪৩।

২৪১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বেলাশেষে', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৭৩।

২৪২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৪।

২৪৩. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় দুঃখ ও মৃত্যু নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে। দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন,'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' পঞ্চম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩,পৃ. ২৮৩-২৯১।

২৪৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভিখারিণী মেয়ে', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২১।

২৪৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'নব দম্পতীর প্রতি প্রীতি উপহার', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, একাদশ সংস্করণ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৬২।

২৪৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৬৪।

২৪৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কুলীনকুমারী', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, একাদশ সংস্করণ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৭২।

২৪৮. 'মহাযাত্রা' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'মহাযাত্রা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, একাদশ সংস্করণ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১২৪।

২৪৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'মহাযাত্রা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১২৬।

২৫০. দ্রষ্টব্য: পত্র কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, মানকুমারী বসু, 'পত্র', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২১৫।

২৫১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পত্র', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২১৫।

২৫২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২১৬।

২৫৩. 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২১৮।

২৫৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'অভাগাবালক', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ১২৩।

২৫৫. 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের 'পচম্বায়' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ১৮১।

২৫৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পচম্বায়' 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ১৮১-১৮২।

২৫৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮৪।

২৫৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'নব-বিধবা', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১১১।

২৫৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রতিশোধ', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৫২-১৫৩।

২৬০. 'বিভূতি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ),'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৬০।

২৬১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পল্লী-আহ্বান', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ),'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৬১।

২৬২. 'বিভূতি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৬৮।

২৬৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পরাজিত', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৬৮।

২৬৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রলয়' উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় সংখ্যা, পৃ. ৮৯।

২৬৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮৯।

২৬৬. 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যের 'ভ্রমর' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৫।

২৬৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভ্রমর', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৬।

২৬৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৬।

২৬৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৭।

২৭০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৭।

২৭১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩০।

২৭২. 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৩০।

২৭৩. দ্রষ্টব্য: উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), কৃত্তিবাসী রামায়ণ, 'মৃগজ্ঞানে রাজা দশরথ কত্তৃক অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুবধ বিবরণ', বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, পৃ. ৩৯।

২৭৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৯।

২৭৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৯-৪০।

২৭৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪১।

২৭৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'দশরথের বাণে মুনি-পুত্রের প্রাণত্যাগ', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৩০।

২৭৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪১।

২৭৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রমীলা', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ১৫।

২৮০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬।

২৮১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬।

২৮২. দ্রষ্টব্য: মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'মেঘনাদবধ কাব্য', মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ. ২৬০-২৬৮।

২৮৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৬১।

২৮৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৬৪।

২৮৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রমীলা', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ১৭।

২৮৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮।

২৮৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, প্রথম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৩।

২৮৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'রাধিকা', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ৭২।

২৮৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭৩।

২৯০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭৬।

২৯১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭৬।

২৯২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'তাপসী উমা', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ১৬৬।

২৯৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'তাপসী উমা' কবিতার প্রচ্ছদ অংশ, 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ১৬৬।

২৯৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৬।

২৯৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৭।

২৯৬. দ্রষ্টব্য: কালিদাস প্রণীত 'কুমারসম্ভব', কালিদাস গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খন্ড, শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৩২২, পৃ. ৪৪।

২৯৭. দ্রষ্টব্য: কালিদাস প্রণীত 'কুমারসম্ভব', কালিদাসের গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খন্ড, ৬ নং শ্লোকের অনূদিত অংশ, শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৩২২, পৃ. ৪৪।

২৯৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'তাপসী উমা', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ১৬৮।

২৯৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রতাপ' কবিতার পরিশিষ্ট অংশ, 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ সাল, পৃ. ২০৯।

৩০০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রতাপ', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ২১০।

৩০১. দ্রষ্টব্য: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'চন্দ্রশেখড়', 'বঙ্কিম রচনাবলী, সমগ্র বাংলা রচনা, কামিনী প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৯১ পৃ. ৪৫২।

৩০২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রতাপ', 'কনকাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩ সাল, পৃ. ২১১।

৩০৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২১২।

৩০৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২১৫।

৩০৫. দ্রষ্টব্য: 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৩৮।

৩০৬. দ্রষ্টব্য: নব্যভারত, ২৬ খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৩১৫, পৃ. ২৫৩।

৩০৭. দ্রষ্টব্য: মোহিনীমোহন সরদার, 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পুনর্নির্মাণে মানকুমারী বসুর অবদান', তথ্যসূত্র পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৮৫।

৩০৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কারাবাসে শ্রীমন্ত', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা',বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৩৯।

৩০৯. দ্রষ্টব্য: মোহিনীমোহন সরদার, 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পুনর্নির্মাণে মানকুমারী বসুর অবদান', তথ্যসূত্র পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৮৮।

৩১০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮৮।

৩১১. দ্রষ্টব্য: 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' অগ্রন্থিত কবিতা অংশ, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৮৮।

৩১২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভরত', 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' অগ্রন্থিত কবিতা, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৮৯।

৩১৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮৯।

৩১৪. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

৩১৫. মানকুমারী বসুর পরাজিত কবিতাটি 'বিভূতি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৬৮।

৩১৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'পরাজিত', (বিভূতি কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৬৮।

৩১৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভাইবোন' কবিতার শিরোনাম অংশ, (সোনার সাথী কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৭৭।

৩১৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৮।

৩১৯. দ্রষ্টব্য: পিয়ালী ঘোষ দস্তিদার, 'জগৎপারাবারের তীরে মানকুমারী: প্রসঙ্গ শিশু কবিতা', তথ্যসূত্র পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ১২৫।

৩২০. মানকুমারী বসুর 'চাঁদ ডাকা' কবিতাটি 'সোনার সাথী' কাব্যের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য: 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৮০।

৩২১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮০-১৮১।

৩২২. দ্রষ্টব্য: 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮,পৃ. ১৮১-১৮২।

৩২৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'চোরের শাস্তি', (সোনার সাথী কাব্যগ্রন্থ), 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৮১।

৩২৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮১।

৩২৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮২।

৩২৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮২।

-----0-----

তৃতীয় অধ্যায়

মহাকাব্য রচয়িতা মানকুমারী বসু: প্রথম মহিলা মহাকবির কবিত্ব প্রতিভার অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

তৃতীয় অধ্যায়

মহাকাব্য রচয়িতা মানকুমারী বসু: প্রথম মহিলা মহাকবির কবিত্ব প্রতিভার অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

কবি মানকুমারী বসুর জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং এই শতাব্দীর শেষের দুই দশক থেকেই তাঁর কবিত্ব প্রতিভার উন্মেষ ঘটে।[১] যদিও আমাদের আলোচিত তাঁর মহাকাব্য 'বীরকুমার-বধ' রচিত হয়েছে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। কবি মানকুমারী বসুর আগে অনেকেই বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এই ধারার প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত[২], পরবর্তীকালে তাঁরই অনুসরণে এই ধারার বিকাশ ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ ধারা হয়ে উঠেছে। ডঃ সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'আলোচ্য সময়ে কবিতা-রচনা চলিয়াছিল ত্রিধারায়-১. মধুসূদনের অনুকরণে ও অনুসরণে মহাকাব্য ও খন্ডকাব্যে, ২. ঈশ্বরগুপ্তের অনুসরণে ব্যঙ্গ কবিতায়, এবং ৩. নূতন উদ্ভাবিত গীতিকাব্যে।'[৩] এই সময়ে পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি কবিদের বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করা যায়, আর সেই বিষয়কে ঘিরেই এই সময়ের কবিদের মধ্যে মহাকাব্য লেখার প্রবণতা কার্যকরী হয়ে উঠেছে। তবে এইসময়ে রচিত মহাকাব্যগুলির মধ্যে কাহিনিগ্রন্থনে, চরিত্র নির্মাণে, ভাষাগুণে, ছন্দ-অলংকার সজ্জায় যে সাহিত্যগুণের অভাব ছিল, তা অনেকাংশে সত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে রচিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের লিরিক প্রবণতা ও ভাষার অসংগতি কাব্যটির সাহিত্যগুণকে ব্যাহত করেছে। নবীনচন্দ্র সেনের মহাকব্যেও কাহিনি গ্রন্থনে দুর্বলতার ছাপ স্পষ্ট, সুকুমার সেন বলেছেন 'নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যত্রয়ীতে ছন্দোবৈচিত্র্য আনিতে যত্ন করিলেও অমিত্রাক্ষর পয়ারে তিনি উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন নাই।'[৪] কবি মানকুমারী বসুর 'বীরকুমার-বধ' কাব্যেও একাধিক ক্ষেত্রে কবি প্রতিভার দুর্বলতার ছাপ রয়েছে। 'সার্থক লিটারারি এপিকের যেসব লক্ষণ বা গুণ থাকা প্রয়োজন, 'বীরকুমার-বধ' কাব্য'র নানা দিকে যে তার কিছু কিছু অভাব রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।'[৫] মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুস্পুত্রী হওয়ার

দরুন মহাকাব্য রচনার প্রভাব ও প্রেরণা কবি মানকুমারী বসু পারিবারিক সূত্রেই লাভ করেছেন। একথা মেনে নিলেও বলা যায় মহাকাব্য রচনায় মানকুমারী বসুর প্রতিভা মধুসূদনের মতো উচ্চতা পায়নি। তাঁর মহাকাব্য সাহিত্যিক সাফল্য না পেলেও কবিত্বপ্রতিভার নানা গুণ এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, এটাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'চরিত্রনির্মাণে, কাহিনি গ্রন্থনে, ভাষাব্যবহারে ও ছন্দ প্রয়োগে, বর্ণনার বৈচিত্র্যে ও সমারোহে, উপমা নির্বাচনের চমৎকারিত্বে কবির কৃতিত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।'[৬] আমরাও এই বিশেষ সূত্রগুলি ধরেই কবি মানকুমারী বসুর কবিত্বপ্রতিভার অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা করবো।

মানকুমারী বসুর 'বীরকুমার-বধ' কাব্যটি রচিত হয়েছে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। তিনি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পিতা স্বর্গীয় আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী মহাশয়কে।[৭] গ্রন্থটির শুরুতে কবির একটি নিবেদন পত্র ও তারাকুমার শর্মার আট পাতার একটি ভূমিকা সংকলিত আছে[৮], যা গ্রন্থটির কলেবর বাড়িয়েছে। গ্রন্থটির নিবেদন অংশে কাব্যটি সম্পর্কে কবি মানকুমারী বসুর মতামত বিস্তারিত আকারে উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি জানিয়েছেন 'আমি এই গ্রন্থের একস্থলে অর্থাৎ অভিমন্যুর মৃত্যুসময়ে মেঘনাদবধের অনুসরণ করিয়াছি। জ্ঞানতঃ আর কোথাও অনুকরণ করি নাই।'[৯] 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রভাব সম্পর্কে কবি স্পষ্ট করে একথা বলেছেন। 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের বিষয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্যায় ভাবে অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যুর হত্যা। কাহিনিটির গুরুত্ব প্রসঙ্গে তারাকুমার বাবু কাব্যটির ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন 'অভিমন্যু-কথা মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। ইহা দ্বারা মর্ত্তলোকের মহোপকার সাধিত হইয়া আসিতেছে। অভিমন্যু-কথা শোকার্ত্ত মানবের সান্ত্বনাস্থল।'[১০] কাব্যটি নয় সর্গে বিভক্ত, দীর্ঘ নয় সর্গে একটি অখন্ড কাহিনি দ্বারা কাব্যটি নির্মিত হয়েছে। কাব্যের সর্গগুলি বিস্তারিত ভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হল- 'শ্রী বীরকুমার-বধ কাব্যে উপক্রমো নাম প্রথমঃ সর্গঃ' [১১], 'শ্রী বীরকুমার-বধ কাব্যে অস্ত্রপ্রাপ্তি নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ'[১২], 'শ্রী বীরকুমার-বধ কাব্যে পিতৃমাতৃবৃত্তান্তো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ'[১৩], 'শ্রী বীরকুমার-বধ কাব্যে অভিযানং নাম চতুর্থঃ সর্গ'[১৪], 'শ্রী বীরকুমার-বধ কাব্যে স্বর্গ-পাতালো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ'[১৫], 'শ্রী বীরকুমার-বধ

কাব্যে সংগ্রামো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ'[১৬], 'শ্রী বীরকুমার-বধ কাব্যে বীরকুমারবধো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ'[১৭], 'শ্রী বীরকুমার-বধ কাব্যে শত্রুনিপাতো নাম অষ্টম সর্গ'[১৮], 'শ্রী বীরকুমার-বধ কাব্যে নিবৃত্তিনাম নবমঃ সর্গঃ'[১৯]। সর্গগুলির নামকরণ সজ্জায় 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রভাব সুস্পষ্ট। দুটি মহাকব্যের নিবিড় পাঠ করলেই বোঝা যায় কাহিনি বিন্যাসের ভিন্নতার কারণেই 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের আখ্যানের সজ্জায় বদল ঘটেছে। তবে কাহিনির ক্ষীণ সূত্র ধরেই কবি মানকুমারী বসু 'মেঘনাদবধ কাব্য'র আদলে তাঁর কাব্যটিকে গড়ে তুলেছেন। প্লটের বিভিন্ন ঘটনার আন্তঃমিলও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন মেঘনাদের মৃত্যুর প্রতিশোধে উত্তপ্ত রাবণ সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে শেষকৃত্য করতে চেয়েছেন, অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞাও সমধর্মী। দুটি মহাকাব্যেই একাধিক বীরের মৃত্যুকে বড় করে দেখানো হয়েছে। সুভদ্রার সন্তান শোক চিত্রাঙ্গদার সন্তান শোকের সমতুল্য। অন্যায়সমরে মেঘনাদ ও অভিমন্যু হত্যার ঘটনাকেই উভয় মহাকাব্যের মূল বর্ণিত বিষয় করে তোলা হয়েছে। শুধু তাই নয় এই ঘটনা পরবর্তী কাহিনিকেও গতিদান করেছে। কাব্যের প্রকরণেও মিল লক্ষ করা যায়, কবি মানকুমারী বসুও কাকার অনুসরণে সর্গ বর্ণনায় কৌশল অবলম্বন করেছেন। বিশেষভাবে কৌশল করে কবিও তাঁর কাকার ন্যায় স্বর্গ-পাতাল প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটিয়ে কাহিনিকে মহাকাব্যের পূর্ণতা দিয়েছেন। একইভাবে কাব্যের সমাপ্তির আগেই নায়কের মৃত্যু দেখিয়ে পরবর্তী সর্গগুলিতে প্রতিশোধ ও তৎপরবর্তী অবস্থার বর্ণনা করে পাঠকের ভাবনাকে প্রশমিত করেছেন এবং কাহিনিকে আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত করে গড়ে তুলেছেন। 'বীরকুমার-বধ' কাব্যটি কতকটা 'মেঘনাদবধ কাব্য'র আদলেই(কাহিনি ভাবনায় ও আঙ্গিকে) গড়ে ওঠা, কবি নিজেও একথা অস্বীকার করেননি। 'এই পুস্তক পড়িয়া অনেকে বলিবেন,--আমি স্বর্গীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি। আপনি জানেন,--সেই স্বর্গীয় কবিবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আমার অধিকারও আছে; তবে তাহা আমি করিতে পারিয়াছি কিনা, সে কথা বিচারাধীন।'[২০] কবি নিজেই অনুসরণের কথা স্বীকার করেছেন, কতটা সফল হয়েছেন সেটা আলোচনা সাপেক্ষ। কিন্তু তিনি যে অনুসরণ করতে চেয়েছেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রভাব যে মানকুমারী বসুর কাব্যে পড়েছে তা আমাদের উপরিউক্ত আলোচনাতেই

প্রতিপাদ্য হয়েছে। 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য আমরা অধ্যায়টিকে তিনটি উপঅধ্যায়ে আলোচনা করেছি। নিম্নে ক্রমানুসারে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ক. কাহিনিগ্রন্থনে কৃতিত্ব সন্ধান

'বীরকুমার-বধ' কাব্যের প্রথম সর্গ শুরু হয়েছে সরস্বতী বন্দনা এবং অগ্রজ কবিদের বন্দনা করে। সকলের প্রতি কবি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

"নম দেব আদি কবি বাল্মীকি অমর।
নম আর্য্য বেদব্যাস অতুল ভূতলে
মহাভারতের কবি! নম কালিদাস
ভারতীর বরপুত্র! নম বঙ্গবাসী—
কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কীর্ত্তি ভব-ভরা!
নম নম কবিবর শ্রীমধুসূদন"[২১]

অগ্রজ কবিদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা সাহিত্যিক মহাকাব্যের একটি বিশিষ্ট রীতি, মানকুমারী বসুও তাঁর কাব্যে সেই দাবি মিটিয়েছেন। এরপরে বর্ণিত হয়েছে যুদ্ধকথা, দশদিন টানা যুদ্ধ করে পিতামহ ভীষ্ম বিশ্রামে গেছেন। পরের দিন থেকে কৌরব পক্ষে সেনাপতি স্বয়ং দ্রোণাচার্য।

"কৌরবের সেনাপতি দ্রোণগুরু এবে
অঙ্গীকৃত রণ-যজ্ঞে দিবেন আহুতি"[২২]

পান্ডবশিবিরে তাই পরিণতির আশঙ্কায় চিন্তার ছায়া নেমে এসেছে। কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্বে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছেন—

"কে আছে পান্ডব-দলে বীরচূড়ামণি,
যুঝিতে আহবে কালি ভীম পরাক্রমে,
সুরাসুর-জয়ী শূর দ্রোণাচার্য সনে?"[২৩]

পান্ডবপক্ষের বীরেরা অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত। তাই পান্ডবশিবির চিন্তিত দ্রোণাচার্যের সম্মুখে পান্ডব শিবিরের নেতৃত্ব দেবে কে? কৃষ্ণের আশ্বাস বাণী পাণ্ডবরা ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করছে তাই তাদের জয় অনিবার্য। এমতাবস্থায় বীরদর্পে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছেন অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যু ধর্ম ও ন্যায়ের রক্ষার্থে সমর ক্ষেত্রে যাওয়ার অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। বীরদর্পে তাঁর ঘোষণা—

"সপ্ত রথী একসনে মিলি' আসি যদি,
তাহে নাহি ডরে দাস ও পদ-প্রসাদে।"[২৪]

কৌরবপক্ষের সকলে একসঙ্গে এলেও অভিমন্যু ভয় করে না। তাই পরের দিনের সমরক্ষেত্রের নায়ক অভিমন্যু। এই সংবাদ শ্রবণে উতলা হয়েছে বিরাট, নন্দিনী, উত্তরা ও মাতা সুভদ্রা। উত্তরার মন সহসা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কবি মানকুমারী বসু এখানে পত্নীপ্রেমের এক বিরল দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কাহিনিগ্রন্থনে বাঙালি নারীর আত্মভাবনার এক সরল চিত্র কবির কীর্তিত্বের পরিচয় বহন করেছে। যুদ্ধে যাবার আগে অভিমন্যু মাতা সুভদ্রার কাছে বিদায় নিতে এলে সন্তানকে ঘিরে মাতা সুভদ্রার মাতৃহৃদয়ের স্নেহ জাগরিত হয়েছে। সুভদ্রা সন্তানের প্রতীক্ষায় বসে আছেন খাবারের ঝুলি সঙ্গে নিয়ে, এমনসময় অভিমন্যু এসে মায়ের পদে প্রণাম জানিয়েছে। সন্তানকে দেখে মায়ের স্নেহ বিগলিত হৃদয়ের অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন কবি।

"জননী হিয়া স্নেহে উথলিল
চাঁদেরে হেরিয়া সিন্ধু উথলে যেমতি।
সমাদরে চুম্বি শির সুভদ্রা কহিলা,--
"কেন এ বিলম্ব, বাপ, চাঁদ মুখ তব
হেরিবারে সারাদিন পথ চেয়ে থাকি;"[২৫]

সুভদ্রার এই মাতৃবাৎসল্য তাঁকে চিরজয়ী করেছে। এই অংশে সুভদ্রার মাতৃহৃদয়ের বর্ণনায় কবি অসাধারণ উপমা এনেছেন। অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি এবং সুভদ্রা ও উত্তরার ব্যাকুল হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে প্রথম সর্গের সমাপ্তি ঘটেছে।

দ্বিতীয় সর্গ অস্ত্রপ্রাপ্তির মূল কাহিনি মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে জয়দ্রথের অস্ত্রলাভ। এইপ্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে কৌরবকুলের নর-নারীর জীবন ও যুদ্ধ ভাবনা। কাহিনি শুরু হয়েছে দুর্যোধনের একাকী শয়ন গৃহে চিন্তিত বিষণ্ণদৃশ্য দিয়ে। যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে কৌরব কুলপতি উদ্বিগ্ন। বিপক্ষ পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কবি সুকৌশলে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি নিবেদন করেছেন।

"এদিকে ভীমের দর্প— বজ্রধ্বনি যেন
মহারঙ্গে, গিরিশৃঙ্গে করে প্রতিধ্বনি।
অর্জ্জুনের যশোরাশি— বায়ু যথা বহে
মন্দারের গন্ধ পশি নন্দন কাননে।
সে নকুল সহদেব আনন্দে আকুল,
কৃষ্ণের প্রভুত্ব সেই অসহ্য মরমে।"[২৬]

এই পান্ডবকুলের ধ্বংসের জন্য জয়দ্রথ শিবের আরাধনা করেছেন এবং তাঁদের মরণবাণ স্বরূপ জয়দ্রথের অস্ত্রলাভ ঘটেছে। কুরুকুলের এই অন্যায় ও পাপের জন্য মাতা গান্ধারীর কণ্ঠে আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে—

"হায় প্রভো, কত দোষে দোষী
এ দাসী বিধির পদে, তাই দিবানিশি
লেলিহান হুতভুক শতমুখ দিয়া
দহিছে আমারে, আমি কহিব কি আর।"[২৭]

গান্ধারীর অন্তর্বেদনা কাহিনির নৈতিকতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর মনোবেদনাকে সামনে রেখে কবি কৌরবকুলের পরিচয়কে স্পষ্ট করেছেন। শকুনির কুমন্ত্রণায় কুরুকুল ঘৃণিত অন্যায়ে মেতে উঠেছে। বাসুদেবকে বন্দী করার মতো ঔদ্ধত্য দেখাতে কৌরবকুল পিছপা হয়নি। তাই গান্ধারীর মনে হয়েছে এবারে বিধি কৌরবকুলের থেকে বিমুখ হয়েছে। আর তাই গান্ধারী আবেদন জানিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, আবেদন জানিয়েছেন দুর্যোধনের কাছে। একই সাথে ন্যায়ের আবেদন ও মাতৃত্বের স্নেহে কাহিনিটি বাঙালি

পাঠকের হৃদয় জয় করেছে। গান্ধারী এই অন্যায় মেনে নিতে না পেরে নির্বাসন নিতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় সর্গের এটাই সবথেকে বড় ট্রাজেডি।

তৃতীয় সর্গের নাম পিতৃমাতৃবৃত্তান্ত, এখানে অর্জ্জুন ও সুভদ্রার কাহিনি স্থান পেয়েছে। কাহিনি শুরু হয়েছে অবশ্য কৌরবকুলের লক্ষ্মীর বর্ণনা দিয়ে। কুবের পত্নী মুরজা এসেছে মর্তে যুদ্ধের সংবাদ নিতে-

"শুনিনু স্বরগে
দেবর্ষি নারদ-মুখে মরতের কথা। -
ভারতে সমর নাকি, রাজ্যধন তরে
ভাই ভাই যুঝিতেছে, সত্য কি জননি?"[২৮]

কমলা তাঁর মনের দুঃখ কথা বলে গেছেন সখি মুরজাকে। তিনি দীর্ঘদিন স্বর্গ ছেড়ে এই অশান্তির পুরে বাস করছেন। মুরজার কৌতুহল হেতু পদ্মাসনা যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। অভিমন্যুর প্রসঙ্গে তাঁর পিতা-মাতার সংবাদ দিয়েছেন-

"শুন কহি সে কাহিনী মুরজা সুন্দরি!
একদা ভ্রমিল পার্থ ব্রহ্মচারি-রূপে
বহু তীর্থ দেবালয়; গেল অবশেষে
দ্বারকায়;"[২৯]

এই দ্বারকায় বাস করতেন কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রা। একদা যাদবকুল জরাসন্ধ রাজার সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা দিল অর্জুনকে দ্বারকার রক্ষক করে। এমতাবস্থায় অর্জুন-সুভদ্রা একে অপরের প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু উভয়ের মিলনে বাধ সাধলেন বলরাম।

"বলদেব করেছেন স্থির,
দুর্য্যোধনে-করে মোরে করিতে অর্পণ!
অন্যে অনুরক্তা আমি একথা জানিলে
বিষম অনর্থ হবে— কি ঘটে না জানি!"[৩০]

কিন্তু এতদসত্ত্বেও উভয়ের প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটেনি। সুভদ্রা তাঁর একান্ত ভক্তি দিয়ে অর্জুনকে জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। উভয়ের প্রণয় বিবাহের মাধ্যমে সার্থকতা পেয়েছে—

"সলাজে মুকুতা-মালা খুলি' বিধুমুখী
ইষ্টদেবে সাক্ষী করি' দিল পার্থ-গলে।"[৩১]

কিন্তু বলভদ্র তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আটকে দিতে চাইলেন এই বিবাহ এবং যাদবকুল সজ্জিত হয়েছে অর্জুনকে হত্যা করার জন্য।

"বাহিরিল সেনাগণ হয়, হস্তী, রথে,
ধনুঃ-শর, অসি-চর্ম্ম, শেল শূল ধরি'।"[৩২]

উভয়ের দীর্ঘ যুদ্ধ চলার পর কৃষ্ণের হস্তক্ষেপে তার নিবারণ ঘটে। উপযুক্ত পাত্রে ভগিনীর সমর্পণ হয়েছে ভেবে কৃষ্ণ সকলকে সমর ক্ষেত্র থেকে নিবারণ করেছে। কৃষ্ণের কথায় বলরাম অর্জুনকে যথাযথ সম্মান অর্পণ করেছেন এবং মহাসমারোহে সুভদ্রাকে অর্জুন হস্তে সমর্পণ করেছেন। এই কাহিনি কমলা বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন-

"সেই বীর-দম্পতির শুভ সন্মিলনে
জন্মিল কুমার এক, বিধির প্রসাদে;
অভিমন্যু অভিরাম সর্ব্বগুণানিত
কুরু-যদু-কুল-পুণ্যপুঞ্জ মূর্ত্তিমান!"[৩৩]

মহাকাব্যের রীতি অনুযায়ী প্রতিটি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের সূচনা স্বরূপ কবি কমলার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন-

"কালি সেই, পার্থগুরু-দ্রোণাচার্য্য-সনে
যুঝিবে এ মহারণে হ'য়ে সেনাপতি।"[৩৪]

তৃতীয় সর্গের পুরো কাহিনিটি কবি লক্ষ্মীর মুখ দিয়েই বলিয়েছেন, তাতে মহাকাব্য হিসেবে কাব্যটির বিস্তৃতি বেড়েছে। আবার কৌশল করে পিতামাতার কথা বলে

সন্তানের যুদ্ধযাত্রার প্রসঙ্গ এনেছেন। আবার পাঠকের মনে কাহিনির উত্তেজনা বজায় রাখতে রমার উক্তি-

"যৌবন-মধ্যাহ্নে তার কি হ'বে না জানি!—"[৩৫]

এই উক্তির পর অভিমন্যুর জয়গান গেয়ে কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে। তৃতীয় সর্গের কাহিনি বর্ণনায় কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনি কোথাও তার গতি হারায়নি অথবা প্লট গঠনে অসংগতিও লক্ষ করা যায় না। কাহিনি বর্ণনাকুশলীও অসাধারণ, উপমা ব্যবহারেও কবি মানকুমারী বসুর কৃতিত্ব কিছু কম নয়। অর্জুনের সুভদ্রাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সংশয় কাটিয়ে কবি বলেছেন-

"চন্দ্রকলা বিনা
নিজ তেজে কারে ভানু সাজায় আপনি?"[৩৬]

এই উপমা পাঠক চিত্তকে আজও মোহিত করে। উপমা বর্ণনায় মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

অভিযানং নাম চতুর্থ সর্গে রয়েছে অভিমন্যুর যুদ্ধ যাত্রার কাহিনি। এই মূল কাহিনি ছাড়াও আর একাধিক কাহিনি স্থান পেয়েছে এই সর্গে। সর্গটি শুরু হয়েছে প্রকৃতি বর্ণনা দিয়ে।

"শোভিছে কাঞ্চন শাল বিশাল পাদপ,
দুলিছে সুবর্ণ পর্ণ মৃদুল সমীরে;"[৩৭]

প্রকৃতির অপূর্ব বর্ণনা মহাকাব্যের কলেবর বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। এই অপরূপ প্রকৃতির মাঝে অর্জুন ও বিরাট নন্দিনীর সহাবস্থান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যুদ্ধ যাত্রার প্রাককালে অভিমন্যু উত্তরাকে সান্ত্বনা দান করেছেন। বিচ্ছেদকাতরা উত্তরার মনের ব্যাকুলতা কবি অসাধারন ভাবে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। এই অংশের এক দীর্ঘ বর্ণনা এখানে উঠে এসেছে। এরপরের অংশে বর্ণিত হয়েছে দ্রৌপদীর দুঃস্বপ্ন—

"কেমনে কুস্বপ্ন নাথ! দেখিলাম কালি,

অকস্মাৎ দশদিক শোণিত বরণ;
গর্জ্জিয়া ছুটিছে গ্রহ রক্তিম আকাশে,
ডুবিছে সপ্তমী-চাঁদ শোণিত সাগরে;”[৩৮]

অভিমন্যুকে সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠাতে দ্রৌপদীর মন ব্যাকুল হয়েছে। অর্জুন তাই সান্ত্বনা প্রদান করে বলেছেন—

“বীরবালা, বীরপত্নী, বীর্য্যবতী তুমি,
তবে, প্রিয়ে! কুস্বপ্নে কি হেতু ডরিলে?”[৩৯]

সপত্নী পুত্রের প্রতি দ্রৌপদীর এই ব্যাকুলতা কোন অংশে কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি। বরং বলা যায় বাঙালি পরিবারের আন্তরিক ঘরানার এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে এই অংশে। মাতা সুভদ্রার সন্তান বাৎসল্য চিত্রিত করাতেও কবি কার্পণ্য করেননি। সুভদ্রার সংলাপ তাঁর কোমল মাতৃহৃদয়ের পরিচয়টিকেই যেন ফুটিয়ে তোলে—

“দয়াময় বিধি!
দাসীর সর্ব্বস্ব ধন প্রাণের কুমারে
কুশলে রক্ষিও সদা করি’ চিরজীবী।
অভাগিরে মা বলিতে কেহ নাহি আর
মনে রেখ দয়াময়! দাসীর মিনতি।
উচ্ছ্বাসে রোধিল কণ্ঠ, বহিল নয়নে
অশ্রুধারা;”[৪০]

মাতৃহৃদয়ের এমন স্নেহ বিগলিত চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে কবির জুড়ি মেলা ভার। প্রসঙ্গক্রমে দ্রৌপদীর প্রতি দুর্যোধনের আমানবিক অত্যাচারের কথাও কবি এখানে বর্ণনা করেছেন। দ্রৌপদী কৌরবকুলের প্রতি হিংসা-রাগ-ঘৃণা জ্বালাকে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করেছেন। কবি এখানে কৌশল করে দ্রৌপদীর সংলাপে পাণ্ডবদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। অভিমন্যুকে দ্রৌপদী বলেছেন যে তাঁরা নিজের রাজ্য থেকে প্রতারিত। ছল করে কৌরবরা তাঁদের বনবাসে পাঠিয়েছে। তেরো বৎসর পর যখন পান্ডবরা ফিরে

এসে ভিখারির মতো মাত্র পাঁচটি গ্রাম দাবি করেছে তখন দুর্যোধন দম্ভ ভরে বলেছে, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।'[৪১] এতকথা বলে দ্রৌপদী অভিমন্যুকে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধ যাত্রার উদ্দেশ্যে সমাদর জানিয়েছে। অভিমন্যুর যুদ্ধ যাত্রার আড়ম্বরতা লক্ষ করার মতো। তবে এখানেই কবি এই সর্গের সমাপ্তি ঘোষণা করেননি। বিপক্ষ শিবিরের সেনাপতি দ্রোণাচার্যর আত্মভাবনাকে ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে রূপ দিয়েছেন। যুদ্ধ করতে তাঁর কোন আপত্তি নেই কিন্তু অধর্মের পক্ষে এই যুদ্ধ তিনি মানসিকভাবে সইতে পারবেন না। তাই নিজের অস্ত্রশিক্ষাকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন।

"শত ধিক বলি সে বিদ্যারে
নহে যাহা ন্যায়-ধর্ম্ম-মহত্ত্বের হেতু।"[৪২]

দ্রোণের এই আত্মগ্লানিকে প্রশমিত করতে দ্বৈপায়ন বলেছেন—

"কে পারে লঙ্ঘিতে কবে, কহ বিচারিয়া।
শুভাশভ ভগবান করেন আপনি,
মানব নিমিত্তভাগী কর্ম্মসূত্রে বাঁধা"[৪৩]

এখানে ব্যাস পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম সমস্ত কিছুকে ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে বলেছেন, তিনিই এর যথাযথ বিচার করবেন বলে তাঁর বিশ্বাস। মানুষ নিমিত্ত মাত্র, কর্ম করা ছাড়া ফলের প্রাপ্তি তাঁর হাতে নেই।

পঞ্চম সর্গের কাহিনি মূল কাব্যের থেকে একটু আলাদা। 'স্বর্গ-পাতালো' নামে পঞ্চম সর্গে স্বর্গ ও পাতালের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কবি মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পূর্ণ করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছেন। শিব তাঁর দূত মণিভদ্রকে নির্দেশ দিয়েছেন পাতালে অধর্মাসুরের কাছে গিয়ে তাঁকে যেন এই যুদ্ধ থেকে নিবারণ হতে বলে। অধর্মাসুর কৌরবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। এই কাহিনি সূত্রেই কবি স্বর্গ ও পাতালের বর্ণনা দিয়েছেন। সর্গের শুরুতেই কবি বিস্তৃতভাবে স্বর্গের বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

"তরুতলে মৃগকুল জানু পাতি' সুখে,
শার্দ্দুলের কোলে শুয়ে করে রোমন্থন;
অহি-সহ খেলে ভেক, অসূয়া-ধামে
ছয়রিপু-তাপ-তপ্ত নহে কভু কেহ।"[৪৪]

স্বর্গের পরিবেশে চারিদিকে শান্তি বিরাজমান। এছাড়াও রয়েছে প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা। এই বর্ণনার ফাঁকেই কবি নারদের মুখ দিয়ে মর্তের কথা শুনিয়েছেন। নারদ এই বর্ণনা হর-গৌরির কাছে করেছে। নারদ কুরুকুলের যুদ্ধের কথা যেমন বলেছেন তেমনি জানিয়েছেন অশান্ত রমার মনোদুঃখের কথা। এতকথা বলে নারদ বিদায় নিলে ভবানী কাতর কণ্ঠে শিবের কাছে জানতে চেয়েছেন—

"করুণাময়! কহ দয়া করি,
নিভিবে সমরানল কতদিন পরে?"[৪৫]

শঙ্কর যুদ্ধের পরিণতির কথা জানিয়ে বলেছেন কর্মফল সবাইকেই ভোগ করতে হয়, অধর্মের পরাজয় অনিবার্য। শিব তারই ব্যবস্থা স্বরূপ অনুচর মণিভদ্রকে ডেকে বলেছেন—

"যাহ ভদ্র! পাতাল-প্রদেশে
যেখানে অধর্ম্মাসুর করে নিবসতি,
যাহ সেথা, শূল করে করিয়া ধারণ;
কহিও অনুজ্ঞা মম অসুর-ঈশ্বরে,
কুরুক্ষেত্র-রণক্ষেত্র ছাড়িতে সত্বর।"[৪৬]

বীর অনুচরের এবার পাতাল গমন কালে কবি পাতালের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। মণিভদ্র যথাসময়ে শিবের আদেশ অধর্মাসুরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। মণিভদ্রের সঙ্গে অধর্মাসুরের কথোপকথনেই এই সর্গের সমাপ্তি ঘটেছে।

ষষ্ঠ সর্গে আছে অভিমন্যুর সংগ্রামের কথা। সর্গের নামও 'সংগ্রামো'। সর্গের শুরুতেই কৌরব পক্ষের শিবিরের বর্ণনা দেওয়া আছে। এরপরেই আছে যুদ্ধের কথা, কৌরব পক্ষের একের পর এক বীর অভিমন্যুর হাতে নিধন হয়েছে। কিন্তু কেউই তাঁর অবস্থান ছাড়তে অনড়, মৃত্যু শ্রেয় তবু প্রত্যেকেই বীরের মতো যুদ্ধ করে গেছে। অভিমন্যুর কথার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্মণ জানিয়েছে-

"নিশার স্বপন দেখি' ত্যজিব সমর
জীবনের ডরে আমি?— ধিক সে জীবন।
রাখিব পিতার পণ,নাশির অরাতি,
না হয় মরিব সুখে সংগ্রাম-অঙ্গনে
ক্ষত্রিয়ের চির-বাঞ্ছা।"[৪৭]

সকলেই আপনপণ রক্ষার্থে অনড়। কিন্তু অভিমন্যুর সম্মুখে কৌরবপক্ষের কারোর দাঁড়াবার সামর্থ নেই। স্বয়ং দুর্যোধনও অভিমন্যুর শরে জ্ঞান হারিয়েছেন। শত শত সেনাও অভিমন্যুর কাছে পরাজিত। কবি অভিমন্যুর এই বীরত্ব গাথা অল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।

"দেখি' শত শত সেনা বেড়িল কুমারে,
কিন্তু কেবা আঁটে তারে?— দাবাগ্নি যেমতি
ভস্ম করে তরুরাজি দেখিতে দেখিতে,
তেমতি সৌভদ্র শুর পলকে পলকে—
বিনাশিলা সেনাদল নিজ ভুজবলে।"[৪৮]

এইভাবেই সংগ্রামের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে। অভিমন্যু এবার সমর ক্ষেত্রে সামনাসামনি হয়েছে দ্রোণাচার্যর সঙ্গে, একের পর এক তাঁর বাণ কেটে অভিমন্যু বীরত্বের জয়গাথা রচনা করেছেন। কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরদের সম্মুখ হতেও অভিমন্যু পিছপা হননি। এরপর তিনি সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছেন কর্ণ, কৃতবর্মা ও দ্রৌণির সঙ্গে। এখানেও তিনি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইতিহাসের পাতায় তাঁর নামকে অমর

করেছেন। একের পর এক প্রত্যেকের বাণ কেটে সকলকে নিরাশ করেছেন। কবির বর্ণনায় সেই অংশটি অখণ্ডিত ভাবে এখানে উদ্ধৃত হল—

"কাটিলা কর্ণের গুণ, দ্রৌণির কিরীট,
কৃতবর্ম্মা-সারথিরে; তিন বীর পুনঃ
শাণিত আয়ুধ-শত আঘাতিল শূরে।
তখন সৌভদ্র বলী মহা বাহুবলে,
ধাইল লইয়া গদা, গদার প্রহারে
বিচূর্ণিল কর্ণ-রথ, দ্রৌণির তুরঙ্গ;
মূর্চ্ছাগত কৃতবর্ম্মা পড়িল ভূতলে।
অপূর্ব্ব বীরত্ব হেরি' অন্তরীক্ষে রহি'
দিকপাল ধন্যবাদে সে বীর কুমারে।"[৪৯]

অতপর এসেছে লক্ষ্মণ অভিমন্যুর সঙ্গে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করতে। কিন্তু সম্মুখ সমরে লক্ষ্মণ বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি। অল্প সময়েই তাঁর অমোঘ নিয়তি তাঁকে গ্রাস করেছে।

"না ফুরাতে কথা, শর পড়িল গর্জ্জিয়া
লক্ষ্মণের বক্ষোদেশে— পড়িল কুমার
রণস্থলে; অকস্মাৎ নিষাদের শরে
পড়িল বিহঙ্গ যেন শোণিত উগারি!"[৫০]

একই সঙ্গে কৌরবপক্ষে নেমে এসেছে ভীতি, চিন্তা এবং শোকের ছায়া। লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রাণী ভানুমতির শোক অধর্মের পক্ষে হলেও পাঠকের হৃদয় বিগলিত হয়ে উঠেছে কবির বর্ণনা গুণে। সন্তানের শোক ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম মানে না তাই ভানুমতির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মাতৃত্বের বেদনা।

"পুত্রশোক-সম ব্যথা নাহি ভূমণ্ডলে।
আবার কাঁদিলা রাণী, কাঁদিলা উচ্ছ্বসি
অন্ধরাজ; শোক-অশ্রু শত আঁখি দিয়া

ঝরিল;”[৫১]

পুরো সংগ্রামের বর্ণনা এবং লক্ষ্মণের মৃত্যুতেই এই সর্গের সমাপ্তি।

‘বীরকুমার-বধ’ কাব্যের প্রধান সর্গ ‘বীরকুমারবধো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ’। এখানেই কাব্যের মূল কাহিনি নিহিত রয়েছে। অন্যায় সমরে কৌরবপক্ষ কীভাবে অভিমন্যুকে হত্যা করল তারই প্রস্তুতি ও বিস্তৃত বিবরণ কবি এই সর্গে বর্ণনা করেছেন। অভিমন্যুর কারণে একদিকে উত্তরা আকুলা আর অন্যদিকে তারই বীরত্বের কারণে চিন্তিত কৌরবপক্ষ। কৌরবপক্ষের তাই সকলে আলোচনাই বসেছেন কিভাবে অভিমন্যুকে পরাজিত করা যায়। একাধিক মতান্তরের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কৌরবপক্ষের যুদ্ধনীতি, ভাবনা এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থান সম্পর্কে পাঠক অবগত হতে পেরেছেন। তাদের কূটনীতি, ভ্রষ্ট আদর্শের পরিচয়ও এ থেকে ফুটে উঠেছে। দুঃশাসন প্রস্তাব দিয়েছেন আড়াল থেকে লুকিয়ে হত্যা করার জন্য। কিন্তু তাতে অপযশ হওয়ার সম্ভাবনায় দুর্যোধন এ প্রস্তাব নাকচ করে নতুন ভাবনার অবতারণা করেছেন।

“একাকী যুঝিয়া কেহ নারিবে জিনিতে
আর্জ্জুনিরে; এক সনে সপ্ত রথী মোরা
যুঝিব; কাটিব কেহ ধনু, কেহ তূণ,
কেহ অশ্ব, কেহ ধ্বজ, কেহ বা সারথি,
একা আর্জ্জুনেয়, সখে! যুঝিবে কেমনে
সপ্ত-মহারথী-সহ? বিপাকে ফেলিয়া
দলিব সকলে তারে;”[৫২]

কৌরবপক্ষের এই অমানবিক কূটনীতি ইতিহাস কখনোই ভুলবে না। অনেকে এই নীতিতে সম্মতি না জানালেও ন্যায়-নীতি নিয়ে কোন ভাবনা দুর্যোধনের মধ্যে দেখা যায়নি। বরং উলটো যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছেন-

“— দেব পুরন্দর
নাশিলা অসুর কত আন্যায় আচরি;
তথাপি সে অমরেশ!”[৫৩]

সকল বীরগণ রাজার প্রস্তাবে মত দিয়ে ধর্মকে বিসর্জন দিতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু গুরু দ্রোণাচার্য এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি বীর, বীরের মতন যুদ্ধ করাই তাঁর আদর্শ। তাই এ প্রস্তাব শুনে দ্রোণাচার্য রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছেন, এখানে গুরু হিসেবে উপযুক্ত মর্যাদা তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন।

"চমকিল তথা শূর দ্রোণ মহারথী,
জ্বলিল অনল-শিখা যুগল নয়নে,
কহিলা আকাশে চাহি— "ধিক বাহুবল
আমার! অধর্ম্ম যুদ্ধ আচরিব হেন!
হেন মতে বীর-হত্যা করিলে আমরা,
কি ক'রে অমর নরে দেখ চিন্তি চিতে!"[৫৪]

কিন্তু গুরুদেব দ্রোণাচার্য তাঁর এই মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা একত্রে আক্রমণ করে অভিমন্যুকে পরাজয় করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাতে অভিমন্যু ভয় পায় না। বীরত্বের সঙ্গে সে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সকলের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। তবু যুদ্ধে তিনি দুঃশাসনকে আহত করে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছয় রথী মিলে শেষমেশ অভিমন্যুকে পরাস্ত করেছে। নির্মম সেই হত্যালীলা।

"পড়িল অবনীতলে, ছয় রথী মিলি'
প্রহারিল বাহুবলে উত্তরা-রঞ্জনে।
ভগ্ন গদা ধরি শূর নিবারে প্রহার,
অবিরল লোহধারা বহিল বরাঙ্গে,
মধুমাসে রাজে যথা শিমুলের তরু
বনমাঝে!"[৫৫]

ঘটনাটি খুবই করুণ, অভিমন্যুর নির্মম অকাল মৃত্যু পাঠককুলকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে। এই অংশে অভিমন্যুর বীরত্বকে কবি নিখুঁত করে এঁকেছেন। শত আঘাতের পরেও অভিমন্যু যুদ্ধ করে গেছেন, দীর্ঘ সময় ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চরিত্রটি

কাব্যের নায়ক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে, এ নিয়ে দ্বিমত নেই। অপরপক্ষে আঘাতের পর আঘাত করে কৌরবরা তাঁদের হীন ও ভীত চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছে। সর্গের শেষ অংশে কবির বর্ণনা—

"হেনকালে দৌঃশাসনি পাপিশঠ পামর
প্রহারিল ভীম গদা আর্জ্জুনি-ললাটে!
কনক-মুকুর-সম সে ললাট চারু
বিদীর্ণ ভীষণাঘাতে! বহিল নয়নে
শেষ অশ্রু; ইষ্টদেবে করিয়া স্মরণ
মুদিলা নয়ন শূর জনমের মত!"[৫৬]

কি নির্মম এই চিত্র, এহেন অমানবিক হত্যা অভিমন্যুকে ভারতবাসীর ঘরে ঘরে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। সকলের চোখের জলে কাব্যটি মহাকাব্যের পরিধি ছাড়িয়ে কালের ইতিহাসেও জায়গা করে নিয়েছে। এই নির্মম ঘটনার পর গুরু দ্রোণাচার্য যেটা করলেন সেই প্রসঙ্গে দুটি পঙক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য।

"ধনুর্ব্বাণ দ্রোণাচার্য ফেলিলা আছাড়ি,
মহাক্ষোভে উষ্ণ অশ্রু বহিল কপোলে।"[৫৭]

এহেন আচরণেও শেষ রক্ষা হয়নি, ইতিহাস তাঁকে কখনো ক্ষমা করবে না। এই মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন কালের ইতিহাসে মূল্যহীন। শেষের এই পঙক্তিটি যেন পাঠককে চাবুক মেরে যায়। চোখের জলে অধর্মের আসনটি ভারী হয়েছে, কিন্তু তাতে অধর্মের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি একথা বলাইবাহুল্য। এখানেই এই সর্গের আসল ট্রাজেডি।

অষ্টম সর্গ শত্রু নিপাত, কাহিনি শুরু হয়েছে অরুণ দেব রাজদূত সেজে পান্ডবশিবিরে প্রবেশ করেছেন অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে।

"অভাগা কিঙ্কর দেব! কহিবে কেমনে,
ভয়ঙ্করী কথা হায়! অন্যায় সমরে
পৌরব-গৌরব বীর আর্জ্জুনি নিহত।"[৫৮]

এই সংবাদে যেন বজ্রপাত হয়েছে পান্ডবশিবিরে। রাজদূত যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন সকলের গোচরে, কারণ অভিমন্যুর বীরত্বগাথা শুনতে সকলেই শোকগ্রস্ত হয়েও অধীর চিত্তে প্রতীক্ষারত। কাহিনিটি বর্ণনায় ক্লাইম্যাক্সের সুর ধ্বনিত হয়েছে। অর্জুনের প্রতিক্রিয়া সেই ক্লাইম্যাক্সের চূড়ান্ত রূপ বলা যেতে পারে। কাব্যে এই অংশের বর্ণনাটি বিস্তারিত আকারে নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—

"সাক্ষী ক্ষত্রবীরবৃন্দ, দ্বিজ ঋষি যত,
সাক্ষী তুমি নিজে কৃষ্ণ দ্বারকাধিপতি,
সাক্ষী বিশ্ব, সাক্ষী মোর ঊর্দ্ধস্থানবাসী
দেবলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
গ্রহ, উপগ্রহ, নাগ, অসুর সকল,
ভূতপ্রেতপিশাচাদি যে আছ যেখানে,
আমার প্রতিজ্ঞা শুন! আগামী দিবসে
নাশিব সূর্য্যাস্ত -আগে দুষ্ট জয়দ্রথে
করিব পুত্রহা-রক্তে পুত্রের তর্পণ,
অন্যথা আপন মুন্ড কাটিব আপনি।"[৫৯]

কিন্তু সুভদ্রার এহেন কোন প্রতিজ্ঞা নাই কারণ তাঁর মাতৃহৃদয় হারানোর বেদনায় শূন্যতায় ভরে উঠেছে। সুভদ্রা অবনীতলে কাঁদতে কাঁদতে চেতনা হারিয়েছেন। এই মাতৃশোকের বর্ণনায় কবি কাহিনির মধ্যে কোনো ফাঁক রাখেননি। পার্থর প্রতিজ্ঞা পালনও কোনোভাবে মাতৃত্বের শোকে চাপা পড়েনি। এই অংশের যুদ্ধ বর্ণনায় কবি তাঁর ভাবনা কুশলীর পরিচয় রেখেছেন। কৌরবরা জয়দ্রথকে লুকিয়ে রেখে যুদ্ধসজ্জা করেছে কারণ জয়দ্রথকে না পেলে অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারবে না। আর এতেই অর্জুন নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে। কিন্তু কবি স্বর্গের দেবতাদের ন্যায়ের পক্ষে দাঁড় করিয়ে অর্জুনের কার্যসিদ্ধি করিয়েছেন। তাঁরাই কৌশল করে জয়দ্রথকে সমর ক্ষেত্রে আনিয়েছে এবং অর্জুনের হাতে জয়দ্রথ নিহত হয়েছে। কবি দেবতাকুলকে ন্যায়ের সমর্থনে দাঁড় করিয়ে সত্যের জয়গান গেয়েছেন। এই কাহিনি বর্ণনায় কবি মধুসূদনের

দ্বারা প্রভাবিত বলে আমাদের মনে হয়। মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য মেঘনাদের মৃত্যু দৃশ্যে সকল দেবতাদের আগমন ঘটিয়ে লক্ষ্মণের কার্যসিদ্ধি করানোর ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় । যদিও সেখানে ব্যক্তি ভাবনায় ইন্দ্রজিৎ অনেক বেশি সমুজ্জ্বল, ন্যায়কে ছাড়িয়েও আত্মগরিমায় সে মহীয়ান। এখানে ভাবনার কিছু পার্থক্য থাকলেও কাহিনির ভাবনাটি মধসূদনের কাছ থেকেই পাওয়া বলে মনে করি। কবি এই সর্গটির বিস্তার ঘটিয়েছেন অর্জুনকে বাঁচানোর জন্য।

কাব্যের অন্তিম সর্গের নাম নিবৃত্তি, 'মেঘনাদবধ কাব্য' র শেষ সর্গের প্রভাব এখানে লক্ষণীয়। নবম সর্গের কাহিনি পত্নী উত্তরার হাহাকার। 'মেঘনাদবধ কাব্য'এ ছিল পিতা রাবণ ও পত্নী প্রমীলার শোকের চিত্র। কবির সংলাপেই উত্তরার শোকের গভীরতা অনুভব করা যায়—

"কতক্ষণে ধরি' বালা দক্ষিণার কর,
কাঁদিয়া কহিল— "সখি! এ বিষম জ্বালা
কতক্ষন সব হায়, পারি না যে আর!
মূর্চ্ছাবশে পড়ে ছিনু, ভাল ছিনু তবু,
চেতনা ফিরিল কেন মৃতেরে মারিতে?"[৬০]

কবির বর্ণনা সেই উচ্চতা না পেলেও উত্তরার হাহাকার কোন ভাবেই কৃত্রিম নয়। দীর্ঘ অংশ জুড়ে এই বর্ণনা কবি করে গেলেও কোথাও কাহিনি তার গতি হারায়নি। বরং উত্তরার হাহাকার অনেক বেশি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরের অংশে 'মেঘনাদবধ কাব্য'র অনুসরণে উভয়পক্ষই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছেন।

"কুরুক্ষেত্রে দুই দলে হইল ঘোষণা
বিশ্রামি সংগ্রামে আজি, মৃতের উদ্দেশে
কৌরব পাণ্ডবগণ করিবে তর্পণ।"[৬১]

কাহিনির ইতি টানতে এই সমাপ্তি যথাযথ। উভয়পক্ষেই শোকের ছায়া বিরাজমান। কাব্যের নায়কের পতন একটা বড় বিপর্যয়, তাই তাঁর মৃত্যুতে যুদ্ধে বিরতি ঘটিয়ে

শোকপালন করাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। আর তাই কবি শেষ সর্গের আগেই নায়কের মৃত্যু ঘটিয়েছেন, কাহিনিসজ্জায় অবশ্য মধুসূদন দত্তের প্রভাব কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। নায়কের মৃত্যুতে কাব্যের সমাপ্তি পাঠককুলকে বড়ই পীড়া দিত বলে আমাদের ধারণা। আর তাই আগেই নায়কের মৃত্যু দেখিয়ে অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স দেখিয়ে তারপর কাহিনির অবনমন ঘটিয়ে কাহিনির পরিণতি টানা পাঠকের রুচির অনুকূলেই ঘটেছে। তাই পরবর্তী সর্গগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। এখানে মানকুমারী বসুও তাই করেছেন। এরপর কবি কৌরবপক্ষে পিতামহ ভীষ্ম ও ব্যাসদেবকে দিয়ে যুদ্ধ সমাপ্তির অনুরোধ করেছেন, তাঁদের দিয়ে কবি শান্তির বার্তা বহন করেছেন। এই অংশটি কবি পাঠকের হৃদয়গ্রাহ্য করে গড়ে তুলেছেন। পান্ডবকুলের চক্ষের মণির অকাল প্রয়ানে করুণরসেই গ্রন্থটির সমাপ্তি ঘটেছে।

মহাকাব্যের কাহিনিগ্রন্থনে কোথাও সেইভাবে অসংগতি লক্ষ করা যায় না। কোথাও কোথাও কাহিনি কিছুটা নিস্প্রভ হলেও পাঠকের একঘেয়েমির কারণ হয়ে ওঠেনি। বর্ণনা অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণোজ্জ্বল। ভাবের গভীরতায় কাহিনি সেরকম উচ্চতা না পেলেও কাহিনিরচনায় কবির সৃষ্টি প্রতিভার নিদর্শন অবশ্যই উল্লেখ্যনীয়।

খ. চরিত্রসৃজনে নৈপুণ্যের পরিচয় উদ্ধার

মহাকাব্যের নায়ক ধীরোদাত্ত, বীর, ওজগুণসমন্বিত হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রগুলিও কিছুটা হলেও এই আড়ম্বরতা নিয়েই গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে এবং তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যের পরিপূরক হিসেবেই চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এটা আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নয়, চরিত্রগুলি কবির সৃজনগুণে কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছে এখানে আমরা তা নিয়েই আলোচনা করবো। কাব্যের নায়ক চরিত্র সম্পর্কে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেছেন-

"অভিমন্যু চরিত্রে নায়কোচিত পৌরুষ ও বীরত্বের কোন অভাব ঘটেনি। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও দ্রোণাচার্য চরিত্র মূল মহাভারত অপেক্ষাও কোথাও কোথাও উজ্জ্বল।"[৬২]

তবে যুধিষ্ঠির চরিত্রটি কাব্যে একেবারেই উপেক্ষিত থেকেছে। সর্বসাকুল্যে দুবার তাঁর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রথম সর্গে পান্ডবশিবিরে তাঁকে একাকী চিন্তিত মনে বসে থাকতে দেখা যায়। সেখানে তাঁর একটি সংলাপ- গুরু দ্রোণাচার্য কৌরবপক্ষের সেনাপতি পদ আলোকিত করেছে, তাই এখন কৃষ্ণ পান্ডব শিবিরের ভরসা। পুনরায় তিনি কাব্যে ফিরে এসেছেন অষ্টম সর্গে। রাজদূত অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছে পান্ডবরাজের কাছে। এই খবর শুনে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কবি জানিয়েছেন—

"অকস্মাৎ বজ্র যেন পড়িল খসিয়া
শিরোপরি; পঞ্চ ভাই লুটিল ভূতলে
বাতাবহ তরুরাজ পড়ে যথা বনে।"[৬৩]

দুটি সর্গেই যুধিষ্ঠির চরিত্রের উপস্থিতি তাঁর যথাযথ অস্তিত্বকে প্রমাণিত করে না। পান্ডবকুলের রাজা হিসেবে তাঁর উজ্বল উপস্থিতি কাম্য ছিল।

অর্জুনের উপস্থিতি তদাপেক্ষা একটু আলাদা। কাব্যে সশরীরে একবারই তাঁকে উপস্থিত হতে দেখা গেছিল, প্রসঙ্গ অবশ্য একাধিকবার এসেছে। তবে তাঁর উপস্থিতি 'শত্রুপিপাত' নামে অষ্টম সর্গে অধিক লক্ষণীয়, সন্তান মৃত্যুর পর প্রতিশোধের ভাবনায় পিতা হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। অন্যায়ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সকলে মিলে অভিমন্যুকে একপ্রকার হত্যা করেছে বলা যায়। এই বার্তা পেয়ে অর্জুন সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিতে উদ্যত।

"আগামী দিবসে
নাশিব সূর্য্যাস্ত -আগে দুষ্ট জয়দ্রথে
করিব পুত্রহা-রক্তে পুত্রের তর্পণ,
অন্যথা আপন মুন্ড কাটিব আপনি।"[৬৪]

সন্তান হত্যার কারণে একদিকে তিনি যেমন অনুতপ্ত একইসঙ্গে ক্রোধান্বিত। এখানেই অর্জুন চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের 'মেঘনাদদবধ কাব্য'এ রাবণ যেমন প্রতিহিংসায় জ্বলেছেন ঠিক ততটাই আক্ষেপের সুর তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু অর্জুনের আক্ষেপের সুর বরং কম, প্রতিশোধ স্পৃহা তাঁর মধ্যে কাজ করেছে বেশি। পান্ডবপক্ষের সবথেকে বীর যোদ্ধা অর্জুন, তাই প্রতিশোধ নিয়ে তিনি তাঁর চরিত্রের স্বভাব ধর্ম বজায় রেখেছেন ঠিকই কিন্তু পিতা হিসেবে দুঃখের গভীরতা ততটা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে সুভদ্রার সাপেক্ষে পিতা অর্জুন অনেকটাই নিষ্প্রভ।

এছাড়া পান্ডবপক্ষের হোতা কৃষ্ণ, কাব্যে তিনি খুব বেশি স্থান পাননি। প্রথম সর্গেই তাঁর একমাত্র উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে। সেখানে যুদ্ধের জন্য তাঁর উৎসাহ প্রদান পান্ডব বীরদের উজ্জীবিত করেছে সন্দেহ নেই। এখানেই তাঁর গুরুত্ব। পরামর্শ সভায় কৃষ্ণের ঘোষণা—

"উচ্চারিলা উচ্চ কণ্ঠে— "ক্ষত্রিয়-কুমার!
তোমরা সকলে ত্যজি' রাজ্য, ধন, সুখ
ত্যজি' জীবনের আশা আসিয়াছ রণে;
এক মহাব্রতে ব্রতী— ধর্ম্মের উদ্ধার
অধর্ম্মের কর হ'তে— জীবন মরণ
উভয়ে সমান জ্ঞান ক্ষত্রিয়-সমাজে।

" 'ন্যায়-যুদ্ধ ধর্ম্মরক্ষা অধর্ম্ম-বিনাশ'
এই মহামন্ত্র জপি' এ মহাসমরে
কে হইবে অগ্রসর, মহা ইতিহাসে
কার নাম লেখা র'বে অক্ষয় অমরে"[৬৫]

প্রত্যেকটি কথাতেই রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা, যুক্তি এবং চরম উৎসাহের ইঙ্গিত। এইটুকু অংশেই কৃষ্ণ চরিত্রটি বহুধর্মী উচ্চতা পেয়েছে। প্রত্যেকটি বাক্য স্বতোৎসারিত, কোনোভাবেই তা কৃত্রিম মনে হয় না। তাই এই সংলাপ শুধু অভিমন্যুকেই নয়

পাঠকদেরও উজ্জীবিত করেছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'এর অনেক প্রধান চরিত্রের থেকেও এখানে কৃষ্ণ চরিত্রটি সংলাপের গুণে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছে।

কৌরবপক্ষের লক্ষ্মণ, জয়দ্রথ, দুঃশাসন প্রভৃতি একাধিক চরিত্রের অবতারণা ঘটলেও দুটি চরিত্র মূলত আলোচনাসাপেক্ষ হিসেবে উঠে এসেছে। তাঁরা হলেন কৌরবকুলপতি দুর্যোধন ও গুরু দ্রোণাচার্য। দ্বান্দিক টানাপোড়েনে একালের দৃষ্টিভঙ্গিতেও চরিত্রগুলির প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। কবি দুর্যোধনকে পুরোপুরি অধর্মাচারী করে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজ স্বার্থে সে কৌরবকুলকে বিসর্জন দিয়েছে। মাতা ও পিতার অনুরোধকে উপেক্ষা করে যথারীতি সে নিষ্ঠুরতার পরিচয় রেখেছে। শোষণের এক অন্য ইতিহাস গড়ে তুলতে দুর্যোধন চরিত্রটি পুরোপুরি অন্যায়ের পক্ষে লড়ে গেছে ধর্ম-ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে। সকলের অনুরোধকেও সে পদদলিত করেছে, অথচ বিন্দুমাত্র অনুশোচনা তাঁকে কখনো গ্রাস করেনি। এক্ষেত্রে সে তাঁর মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে বলা যায়, নিজের ঔদত্ত্ব এবং অন্যায়কে প্রতিষ্ঠা দিতে সে সিদ্ধহস্ত। দুর্যোধন চরিত্রটির কোন উত্থান পতন নেই, সকলের ন্যায়-নীতি বোধের বিপক্ষে অটল থাকতে তাঁকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। ন্যায়-ধর্মের বিরুদ্ধে এমন চূড়ান্ত অবস্থান বাংলা সাহিত্যে বিরল। রাজা হিসেবে তিনি প্রত্যেকের আবেদনের প্রত্যুত্তরও দিয়েছেন, কখনো পালিয়ে বেড়াননি। আবার তাঁর সংলাপে রয়েছে যথেষ্ট দৃঢ়তা, তাই চরিত্রটি একেবারেই কৃত্রিম তো নয়ই বরং অন্য অনেকের থেকে বেশি উজ্জ্বল। তবে দুর্যোধনের একটি সংলাপ তাঁর নিজের প্রতি সম্মানকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অদৃশ্যে থেকে অভিমন্যুকে হত্যা করার প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বলেছেন—

"রাজ্য ধন তুচ্ছ এ জগতে
যশ বিনা; যদি মম কুযশ রটিল,
জীবন রাখিব তবে কি সুখ ভুঞ্জিতে?"[৬৬]

অর্থাৎ শুধু স্বার্থ বুঝে নেবার জন্য তিনি এজগতে বিরাজমান নন, একটা ব্যক্তিত্ববোধ তাঁর রয়েছে। এখানেই দুর্যোধন চরিত্রটির সার্থকতা। গুরু দ্রোণাচার্য কবির সৃষ্টিগুণেই জাজ্বল্যমান হয়ে উঠতে পেরেছে। কৌরবপক্ষের সেনাপতি হয়ে তিনি পান্ডব শিবিরের

চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। সাহস করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর সম্মুখীন হওয়ার লোক কম। তাঁর আসল পরিচয় তাঁর নিষ্ঠা ও সততায়। অভিমন্যুর কাছে কৌরবকুল পরাজিত হয়ে সকলে মিলে তাঁকে অন্যায়ভাবে পরাস্ত করতে চাইলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

"ধিক বাহুবল
আমার! অধর্ম্ম যুদ্ধ আচরিব হেন!
হেন মতে বীর-হত্যা করিলে আমরা,
কি ক'বে অমর নরে দেখ চিন্তি চিতে!"[৬৭]

কিন্তু তাঁর এ প্রতিবাদ কৌরবরাজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কাছে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অবশেষে তিনিও এই অন্যায় যুদ্ধে সামিল হয়েছেন। দ্রোণাচার্য চরিত্রটির ট্রাজেডি এখান থেকেই শুরু হয়েছে বলা যায়। সমস্তটা জেনে বুঝেও তিনি অধর্মের সঙ্গে আপোশ করেছেন। তাঁর দ্বন্দ্বটা ধর্ম(সত্যের পক্ষে) বনাম অধর্মের (রাজার নির্দেশের) সঙ্গে। রাজার নির্দেশ অমান্য করতে না পেরে তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেছেন। এখানেই তাঁর জীবনের ট্রাজেডি। প্রতিনিয়ত তিনি এই মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে গেছেন। অভিমন্যুকে হত্যার পরে গুরু দ্রোণাচার্যর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

"ধনুর্ব্বাণ দ্রোণাচার্য ফেলিলা আছাড়ি,
মহাক্ষোভে উষ্ণ অশ্রু বহিল কপোলে।"[৬৮]

কবির এই একটি উক্তি তাঁর চরিত্রটিকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে। তিনি অন্যায়ের পক্ষ না নিয়ে অভিমন্যুর হত্যা থেকে বিরত থাকতে পারতেন, তাতে মহত্ত্বের গুণে পাঠক তাঁকে স্মরণীয় হয়ে থাতেন। কর্তব্য-অকর্তব্যের দ্বন্দ এখানে স্পষ্ট, এই টানাপোড়েনেই চরিত্রটি আধুনিক হয়ে উঠেছে। দ্রোণাচার্য চরিত্রটি কাব্যে সবথেকে বেশি সত্য হয়ে উঠেছে। দ্রোণাচার্য প্রসঙ্গে কবির শেষ উক্তিটি তাঁর সৃজন গুণকে উচ্চমর্যাদা দিয়েছে।

কাব্যের সবথেকে উজ্জ্বল চরিত্র পাণ্ডব কুলের শিরোমণি অর্জুন পুত্র অভিমন্যু। কাব্যে তাঁর উপস্থিতির আধিক্য সর্বাধিক। প্রত্যেক সর্গেই বীরত্বের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি

কম বেশি লক্ষ করা যায়। দ্রোণাচার্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে তাঁর ঘোষণা—

"দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ আদি
সপ্ত রথী একসনে মিলি' আসে যদি,
তাহে নাহি ডরে দাস ও পদ-প্রসাদে।"[৬৯]

অভিমন্যুর পরিচয় দিতে গিয়ে কবির সংলাপ অত্যন্ত চমকপ্রদ।

"বীরত্ব-বিনয়-মাখা সে মুখ-চন্দ্রমা!
সে কান্ত কিশোর-কান্তি— তরুণ যৌবন
সরায়ে কৈশোরে যেন ধীরে— অতি ধীরে
আপনার অধিকার করিছে স্থাপন।"[৭০]

একেবারে পূর্ণ ও যথাযথ করে কবি তাঁকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বীরত্বের কোন অহংকারও তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। মায়ের প্রতি পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে তিনি নিজগুণে মহীয়ান হয়ে উঠতে পেরেছেন।

"বিনীত কুমার
কহিল সস্মিত মুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে,--
"মা! তোমার শুভাশীষে সকল মঙ্গল
এ দাসের; বহুকাজে রত ছিনু আজি
তাই এ বিলম্ব মম প্রণমিতে তোমা।"[৭১]

কোনোরূপ আত্মঅহমিকা অভিমন্যু চরিত্রে দুর্লভ। স্ত্রীর প্রতিও রয়েছে তাঁর যথোচিত মর্যাদা। অভিমন্যুর জন্য পাণ্ডবরা আজ গর্বিত—

"কত পুণ্য-বলে
পেয়েছি বাছারে মোরা, অভিমন্যু-তরে
পরিতৃপ্ত কুরুকুল, পিতৃগণ আজি।"[৭২]

ষষ্ঠ সর্গে অভিমন্যুর বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্বার অভিমন্যু কৌরবদের সমস্ত চক্রব্যূহ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে। সম্মুখ সমরে সকলেই তাঁর সামনে ব্যর্থ। সম্মুখ যুদ্ধে দুঃশাসন রক্তাক্ত অবস্থায় চেতনা হারিয়েছে। শত শত সেনার সঙ্গে তিনি একা বীরের মতো লড়ে গেছেন। কবি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তা চিত্রিত করেছেন।

"দেখি' শত শত সেনা বেড়িল কুমারে,
কিন্তু কেবা আঁটে তারে?— দাবাগ্নি যেমতি
ভস্ম করে তরুরাজি দেখিতে দেখিতে,
তেমনি সৌভদ্র শূর পলকে পলকে—
বিনাশিলা সেনাদলে নিজ ভুজবলে।"[৭৩]

এই বীরত্বের গুণে অভিমন্যু চরিত্রটি কাব্যে সবথেকে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা অভিমন্যুর চরিত্রটিকে মহীয়ান করে তুলেছে।

"প্রণমিলা অভিমন্যু দ্রোণের চরণে।
অপূর্ব্ব-বীরত্ব সহ বিনয় মিলিয়া,
কষিত-কাঞ্চন-সম শোভিল দ্বিগুণ!"[৭৪]

এই অংশে গুরু দ্রোণাচার্য ও অভিমন্যুর কথোপকথন তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। দ্রোণাচার্য তাঁকে বিজিত হবার আশীর্বাদ দিলে অভিমন্যুর বিনম্র আবেদন—

"ক্ষত্রিয়ের বাহু
থাকিতে, জয়ের বর কেবা চাহে?
আশীষ দিবেন যদি করিয়া করুণা,
দি'ন তবে পিতৃ-যশ মোর তরে যেন
মলিন না হয় কভু, দাসের কামনা।"[৭৫]

এই গুণ যে নায়কোচিত তা অবশ্য স্বীকার্য। একাধিকবার তাঁর বীরত্বের পারদর্শিতা আমরা লক্ষ করেছি এবং এটা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে উজ্জ্বল করেছে বলা যায়। অন্যায়ভাবে সপ্তরথীর আক্রমণকেও অভিমন্যু প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে। বীরত্বের

সঙ্গে লড়াই করেও তাঁর শেষ রক্ষা হয়নি কারণ চারিদিক থেকে আক্রমণ করে নিরস্ত্রহীন অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। সেই অসহায় অবস্থায় দুঃশাসন গদা হস্তে তাঁকে প্রহার করেছে। এই অবস্থার বর্ণনায় কবির প্রতিভা অভিমন্যুকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্রাজিক চরিত্র হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। কবির বর্ণনা—

"হেনকালে দৌঃশাসনি পাপিষ্ঠ পামর
প্রহারিল ভীম গদা আর্জ্জুনি-ললাটে!
কনক-মুকুর-সম সে ললাট চারু
বিদীর্ণ ভীষণাঘাতে! বহিল নয়নে
শেষ অশ্রু; ইষ্টদেবে করিয়া স্মরণ
মুদিলা নয়ন শূর জনমের মত!"[৭৬]

কবির বর্ণনাগুণে এই সকরুণ চিত্র পাঠকের চোখের সামনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে এমন ট্রাজিক মৃত্যু বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই গুণেই অভিমন্যু চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে বিরল দৃষ্টান্ত এবং কবি মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বীরত্ব, পারদর্শীতা, বিনম্র ভাব, সাহসিকতা প্রভৃতি কোনো গুণেরই খামতি তাঁর মধ্যে কবি রাখেননি। স্বভাবতই নায়ক হিসেবে সে তাঁর দাবি পূর্ণ করেছে এবং 'বীরকুমার-বধ' কাব্যে আমরা অভিমন্যুকেই নায়ক হিসেবে দাবি করি। নায়কোচিত সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যেই একমাত্র বিরাজমান।

এছাড়াও আরও কিছু চরিত্র রয়েছে যেমন ভীষ্ম, ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, জয়দ্রথ, লক্ষ্মণ, এবং পান্ডব পক্ষে কৃষ্ণ, ভীম দেবতাদের মধ্যে শিব, ভবানী, লক্ষ্মী, নারদ, মণিভদ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চরিত্রগুলি নিছকই কাহিনি প্রসঙ্গে এসেছে মূল ঘটনাকে পুঞ্জীভূত করতে।

নারী চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য এ কথা একেবারেই খাটেনা। 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের নারীচরিত্রগুলি বেশ উজ্জ্বল এবং কবির সৃজনগুণে বাংলা সাহিত্যে তাঁরা

উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। আলোচিত কাব্যের নারী চরিত্রের প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের মত খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন—

> " 'বীরকুমারবধ কাব্য'র নারীচরিত্র নির্মাণে কবির সাফল্য চোখে পড়ে। উত্তরা, দ্রৌপদী, গান্ধারী, তাঁর সৃষ্টি গুণে জীবন্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। কোথাও প্রেম কোথাও মাতৃত্ব এবং সর্বোপরি নারীত্বের মহিমায় তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি উজ্জ্বল। সীমিত ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে বৃহত্তর কোন বোধ ও বিশ্বাসের প্রেরণা রয়েছে চরিত্রসৃষ্টির মূলে।"[৭৭]

বলাইবাহুল্য অমিত্রসূদন বাবু এখানে মাতা সুভদ্রাকে বাদ দিয়ে গেছেন। আমরা মনে করি সুভদ্রা চরিত্রটিও একইরকমভাবে উজ্জ্বল এবং অধ্যাপক বাবুর উল্লিখিত চরিত্রগুলির সঙ্গে একই আসনে মহীয়ান হবার যোগ্যতা রাখে। অভিমন্যু পান্ডব পক্ষে সেনাপতি হওয়ার পরেই মাতা সুভদ্রা আচমকা শিহরিত হয়ে উঠেছে। পুত্র স্নেহে আকুল সুভদ্রাকে সন্তানের পথ চেয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যে মাতৃহৃদয়ের স্নেহের গন্ধ পাওয়া যায়।

"সুখাদ্য কত রাখিছেন তুলি
স্বর্ণ-পাত্রে; প্রাণধন খাইবে বলিয়া।"[৭৮]

সুভদ্রার মাতৃস্নেহ চিত্রাঙ্গদা বা মন্দোদরীর ন্যায় ততধিক জাজ্বল্যমান না হলেও উপলব্ধির গাঢ়তায় কোন অংশে কম নয়। কাব্যে সুভদ্রার পরিচয় শুধুমাত্র পুত্র স্নেহেই, তবে তৃতীয় সর্গে অর্জুন-সুভদ্রার প্রণয় বর্ণনা অংশে সুভদ্রার প্রণয়ের একনিষ্ঠতা ও বিনম্র ভাবের কারণে চরিত্রটির ব্যক্তি মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয় তাঁদের প্রণয় বলরাম মেনে না নিয়ে আক্রমণ করলে তার প্রতিরোধ করতে গিয়ে অর্জুনের পাশাপাশি সুভদ্রাও তাঁর বীরত্বের পরিচয় রেখেছেন। কবির বর্ণনায় সে কথা উঠে আসে।

"সুভদ্রার নিপুণতা হেরিয়া কৌন্তেয়
বিস্মিত; বাখানি তারে কহিল আপনি,--
'ধন্য তুমি চন্দ্রাননে! রমণী-মন্ডলে;

ধন্য তব শিক্ষা, ধন্য শিক্ষা-দাতা তব!”[৭৯]

আবার সন্তানকে শুধু আঁচলে বেঁধে রাখবার বাসনা তাঁর ছিল না। তিনি সন্তানের বীরত্বে গর্ব প্রকাশ করে বলেছেন—

“সফল নয়ন
এত দিনে মম- আহা, বীরবেশ বিনা
সাজে কি বাছারে মোর?”[৮০]

মাতৃত্বের স্নেহেও তিনি উজ্জ্বল। অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সুভদ্রার আগমনের মুহূর্তটিকে কবি অত্যন্ত করুণ করে তুলেছেন—

“সহসা সে বীরনাদ অতলে ডুবায়ে
উছলিল শোকসিন্ধু, সুভদ্রা সুন্দরী
কাঁদিছে আকুল কণ্ঠে নব শোকোচ্ছ্বাসে,
পশিল সে ধ্বনি আসি সভাতল-মাঝে।”[৮১]

সন্তান শোকে সুভদ্রার অচেতন দেহটি অবনীতলে লুটিয়ে আছে, এই দৃশ্যটি কবির সৃষ্টিগুণে বাস্তব ও চিরন্তন হয়ে থাকবে। সুভদ্রার শোকের কারণে অভিমন্যু পাঠকের অনেক কাছের হয়ে উঠেছে। মাতৃত্বের ভাবটি অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত।

উত্তরার চরিত্রটিও কতকটা একই ধাঁচে গড়া, তবে তদাপেক্ষা অনেক বেশি জীবন্ত। স্বামীর যুদ্ধযাত্রায় বিষণ্ণমনা হলেও সে ব্যক্তিভাবনার গন্ডী ছিন্ন করতে পেরেছে, তাতেই চরিত্রটির মাহাত্ম্য স্বদেশের সীমানা অতিক্রম করেছে।

“আনন্দে করুন তিনি কার্য্য যাহা তাঁর,
সেই ভিক্ষা চাহি আমি বিধির চরণে।”[৮২]

বীরকুলে জন্ম যাঁর তিনি পত্নী সুখে মত্ত নন, এটা উত্তরার গর্বের কারণ। এখানে তাঁর উদারভাব তাঁকে যথাযথ সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়েছে। প্রমীলার ন্যায় কোন বীরত্বের পরিচয় উত্তরা রাখতে পারেননি ঠিকই, তবে ভাবনায় তিনি প্রমীলার মতনই যথাযথ

মর্যাদা রাখতে পেরেছেন। আবার একই সঙ্গে রমণীসুলভ পত্নীর প্রেমভাবনাও তাঁর মধ্যে বিরাজমান। কবি তাঁর প্রতিভাবলে এই অংশটিকেও খুবই উজ্জ্বল করে প্রতিস্থাপিত করেছেন।

"শিথিল মৃণাল-বাহু রাখি পতি-গলে
কহিল উত্তরা— "আজি বিলম্বে তোমার,
হ'তেছিল পোড়া মনে কত যে যাতনা
কি বলিব প্রিয়তম? কালি হ'তে আর
দহিও না এ দারুণ কুচিন্তা-অনলে,
দাসীর হৃদয়, নাথ!" বলিতে বলিতে
বহিল আকুল অশ্রু যুগল নয়নে।"[৮৩]

কবি অসাধারণ রোমান্টিক করে এঁকেছেন উক্ত অংশটিকে। পতি-পত্নীর যুগল প্রেমের মধ্য দিয়ে উভয়ের মধুর দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রটি পাঠককে অভিভূত করে। পত্নী হিসেবে উত্তরার স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় কোন খাদ নেই। এখানেও সে সার্থক। তবে যুদ্ধে গমন হেতু প্রতিনিয়ত উত্তরা স্বামী চিন্তায় ব্যাকুল। কিন্তু অভিমন্যুর মৃত্যুর পর শোকগ্রস্ত উত্তরার কোনো পরিচয় কাব্যে নেই। স্বামীর মৃত্যুতে সে ভূতলে চেতনহীন ভাবে লুণ্ঠিত। কবি অত্যন্ত কৌশলে এই কার্য সম্পাদন করেছেন কারণ নিখাদ প্রেমের পরিণতি হিসেবে অত্যন্ত করুণ হয়। কবি সেই সুযোগেই উত্তরাকে অচেতন রেখে নিজের সৃষ্টিগুণের এক অন্য পরিচয় দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এটা সর্বতোভাবে কবির ব্যর্থতা বলেই মনে করি। নিখাদ প্রেমের পরিণতি হিসেবে অচেতন হয়ে যাওয়াই একমাত্র পন্থা নয় বাংলা সাহিত্যে এর বিপরীত অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহাকাব্যের আধারেই এর চরম দৃষ্টান্ত প্রমীলা।

তবে এখানেই শেষ নয়। প্রাথমিক শোক কাটিয়ে উত্তরার আক্ষেপকে কবি বাস্তবোচিত করে তুলেছেন। উত্তরার আক্ষেপ কবির বর্ণনায়—

"কতক্ষণে ধরি' বালা দক্ষিণার কর,

কাঁদিয়া কহিল— "সখি! এ বিষম জ্বালা
কতক্ষন স'ব হায়, পারি না যে আর!
মূর্চ্ছাবশে পরে ছিনু, ভাল ছিনু তবু,
চেতনা ফিরিল কেন মৃতেরে মারিতে?"[৮৪]

বর্ণিত অংশে উত্তরার শোক একেবারেই কৃত্রিম নয়, পতিবিয়োগা স্ত্রীর আক্ষেপ ফুটিয়ে তুলতে মানকুমারী বসুর পারদর্শিতার কোনো অভাব নেই। পূর্বের অচেতন থাকার কারণটিরও একটি যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। গভীর শোকেই সে মূর্চ্ছা গেছে এবং চেতনা ফিরে পাওয়ার পর তাঁর মুখ দিয়েই কবি বলিয়েছেন শোকের বিরহ জ্বালা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। উত্তরা চরিত্র বর্ণনায় কবি মানকুমারী বসু বুদ্ধির পরিচয়ও রেখেছেন। আর তাই অভিমন্যুর পাশাপাশি উত্তরাও কাব্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠছে। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও শৈল্পিক এই চরিত্রটি যে মহাকাব্যোচিত হয়ে উঠতে পেরেছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

অন্যান্য নারী চরিত্রগুলির মধ্যে দুটি প্রধান চরিত্র হল পান্ডব পত্নী দ্রৌপদী ও কৌরবকুলের মাতা গান্ধারী। চরিত্র দুটির উপস্থিতি খুবই সীমিত। দ্রৌপদী কাব্যে এসেছে অভিমন্যুকে কৌরবকুলের অন্যায় ও তাঁদের অধর্ম আচরণকে স্মরণ করিয়ে দিতে। এক্ষেত্রে চরিত্রটি কাব্যে খুবই প্রাসঙ্গিক। চরিত্রটির আরও একটি গুরুত্ব সে যুদ্ধের পূর্ব কাহিনিটি এই প্রসঙ্গে জানিয়ে দিয়ে গেছেন। তবে কাব্যে দ্রৌপদী মাতৃত্বের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন। অভিমন্যুকে তিনি সন্তানের মতনই মর্যাদা দিয়েছেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর পরে মাতৃত্বের স্নেহে তিনিও ব্যাকুল হয়েছেন, যদিও সুভদ্রার সাপেক্ষে তা ম্লান। তবে মাতৃত্বের এই উদারতায় চরিত্রটির প্রাসঙ্গিকতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

গান্ধারী চরিত্রটি ন্যায়ের দাবি নিয়ে কাব্যে জাজ্জ্বল্যমান। তাঁর গৃহে অধিষ্ঠিত বসত লক্ষ্মী তাঁরই পুত্রদের অধর্মের কারণে নির্বাসণ নিয়েছে। এ নিয়ে গান্ধারী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। নিজের পুত্রদের অধর্মাচারণের কারণে তাঁদের নিন্দা করতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি।

"লোকে বলে— 'গান্ধারীর শত পুত্র বলী'
কিন্তু দেব! জানে শুধু জ্ঞানী যেই জন,
শত মহাপাপ তারা, শত ব্রহ্মশাপ
মূর্ত্তিমান, কলঙ্কিতে পুণ্য কুরুকুল!"[৮৫]

একজন মহিলা হয়েও এহেন ধৃষ্টতা প্রশংসার দাবি রাখে। নিজের পুত্রদের কেচ্ছার কাহিনি সে মা হয়েও ঢাকতে চায়নি। গান্ধারী এখানে ব্যক্তিভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে চিরন্তনতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধারীর যে বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—

> "তাঁহার হৃদয় সবার হৃদয়ের সঙ্গে একতারে বাঁধা। সে হৃদয় যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করে তাহাই তাহার কাছে ধর্ম। পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম, রাজধর্ম ইত্যাদি ধর্মখন্ডের ঊর্ধ্বে যে অখিল ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের সমব্যবহারের নামান্তর তাহাই গান্ধারীর ধর্ম।"[৮৬]

এখানেই গান্ধারীর মহত্ত্ব। মাতৃত্বের আবেদনের থেকে ন্যায়ের আবেদন তাঁর কাছে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় গান্ধারীর আবেদন—

"তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে ন্যনের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
অপরাধী প্রভু!"[৮৭]

মাতৃত্বের আবেদনকে নস্যাৎ করে গান্ধারি সেখানে ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম রক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন। এখানেও গান্ধারীর আবেদন কতকটা একই। গান্ধারী মহাভারতের একটি উজ্জ্বল চরিত্র। কবিও তাঁর স্বভাব ধর্ম বজায় রেখে বিচার বোধকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গান্ধারী চরিত্রটি কাব্যে অন্য অনেকের থেকে উজ্জ্বল। পুরো দ্বিতীয় সর্গ জুড়ে কবি তাঁর মানস ভাবনাকে বর্ণনা করেছেন। মা হিসেবে সন্তানস্নেহ তাঁর মধ্যে বিরাজমান কিন্তু

পুত্রদের অন্যায়কে মানতে তিনি নারাজ। গান্ধারীর নিজ সংলাপেই এ কথা উঠে আসে—

"সত্য বটে পুত্রশোক দারুণ ভীষণ,
কিন্তু তার সীমা আছে— নশ্বর নরের
পরমায়ু কতদিন?"[৮৮]

গান্ধারী চরিত্রটি কাব্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র হয়ে উঠেছে। কবির বর্ণনাতেও কোনো খাদ নেই। তাঁর বর্ণনা গুণেই পাঠক গান্ধারী সম্পর্কে সঠিক ভাবনা পোষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

গ. ভাষা-ছন্দ-অলংকার প্রয়োগে নৈপুণ্য সন্ধান ও কাব্যের রস বিচার

মহাকব্যের ভাষা হবে ওজস্বী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। আমাদের আলোচ্য মহাকাব্যের ভাষা প্রসঙ্গে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেছেন- "বীরকুমারবধ কাব্যে'র ভাষা ও ছন্দ মূল কাহিনির ভাব ও পরিবেশের যথেষ্ট অনুগামী। কাহিনির ভাবের গভীরতার তারতম্যের উপরে ভাষাও গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।'[৮৯] 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের ভাষা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক। কাব্যের ভাষা কাহিনির অনুগামী অর্থাৎ ভাব অনুযায়ী ভাষা গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণ যখন দ্রোণাচার্যের বিপক্ষে পাণ্ডবকুলকে জাগানোর চেষ্টা করছেন তখন তাঁর সংলাপেই বীরত্বের ভাব জেগে উঠেছে।

"উচ্চারিলা উচ্চ কণ্ঠে— "ক্ষত্রিয়-কুমার!
তোমরা সকলে ত্যজি' রাজ্য, ধন, সুখ,
ত্যজি' জীবনের আশা আসিয়াছ রনে;
এক মহাব্রতে ব্রতী— ধর্ম্মের উদ্ধার
অধর্ম্মের কর হ'তে— জীবন মরণ
উভয়ে সমান জ্ঞান ক্ষত্রিয়-সমাজে।"[৯০]

এখানে কৃষ্ণের কথাতেই পান্ডবকুলের মহত্ত্ব ধ্বনিত হয়েছে। আবার এর পাশাপাশি পত্নীর হৃদয় বর্ণনায় কবির ভাষা গাম্ভীর্যের আবরণ খুলে বেরিয়ে এসেছে।

"অকস্মাৎ চমকিয়া উত্তরা সুন্দরী
চাহিল সখীর পানে উদাস নয়নে—
অজানা আতঙ্কে দেহ উঠিল কাঁপিয়া,
ভূকম্পনে কাঁপে যথা সরসে নলিনী।"[৯১]

এই শব্দে নারীর হৃদয়ের কথা অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। শব্দ প্রক্ষেপণে কবির পরিমার্জিত চিন্তার পরিচয় এখানে ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয় নবম সর্গে অভিমন্যুর মৃত্যুতে উত্তরার আক্ষেপের ভাষা খুবই প্রাসঙ্গিক—

"কাঁদিয়া কহিল—"সখি! এ বিষম জ্বালা
কতক্ষণ স'ব হায়, পারি না যে আর!
মূর্চ্ছাবশে পড়ে ছিনু, ভাল ছিনু তবু,
চেতনা ফিরিল কেন মৃতেরে মারিতে?"[৯২]

অধ্যাপক অমিত্রসূদন বাবুও এই প্রসঙ্গে একই মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'স্বামীর মৃত্যুশোকে উত্তরার করুণ যে বিলাপোক্তি তার ভাষা বৈধব্যের ঔজ্জ্বল্যহীন শুভ্র বেশের সঙ্গেই তুলনীয়।'[৯৩] যুদ্ধের বর্ণনাকেও গম্ভীর করে তুলতে তাঁর ভাষাই একমাত্র সম্বল। যুদ্ধে লক্ষ্মণের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনাতে ভাষার ওজস্বী গুণের কারণে দৃশ্যটির আড়ম্বরতা বেড়েছে।

"অসংযত চিত্ত মম মত্ত রণমদে,
তেঁই তেয়াগিনু অস্ত্র কালবহ্নি-সম।
না ফুরাতে কথা, শর পড়িল গর্জ্জিয়া
লক্ষ্মণের বক্ষোদেশে— পড়িল কুমার
রণস্থলে; অকস্মাৎ নিষাদের শরে
পড়িল বিহঙ্গ যেন শোণিত উগারি!"[৯৪]

এই মৃত্যু অবশ্যই বীরজনোচিত— ভাষার আড়ম্বরতাতেই তা স্পষ্ট। এখানে তৎসম শব্দের আধিক্য ঘটেছে, কাহিনির প্রাসঙ্গিকতায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য কোথাও

কোথাও বাংলা তদ্ভব শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির বর্ণনা অংশেও কবির ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা প্রশংসনীয়। নিম্নে উদ্ধৃতি সহযোগে এই বক্তব্যের প্রামাণিকতা রক্ষার চেষ্টা করা হল। দ্বিতীয় সর্গের শুরুতে কবি প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মহাকাব্যের পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক।

"অস্তমিত অংশ সহ শীতাংশু সুন্দর,
ত্রিযামার মণি রত্ন— জ্বলিছে তারকা
আকাশের নীল বক্ষে, বিশুভ্র চন্দনে
সুশোভিত শ্যাম-অঙ্গ বৃন্দাবনে যথা।
দ্বিতীয় প্রহর গত, নিশাবিনোদিনী
ধরাতলে একেশ্বরী, রাজেন্দ্রাণী সম।"[৯৫]

এখানে ভাষা প্রক্ষেপণ যে মহাকাব্যজনোচিত তা অনস্বীকার্য। অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করেও কবি কাব্যের আড়ম্বরতা ও ভাষার গাম্ভীর্য যথাযথ ভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে ভাবের স্বচ্ছতা ও ভাবের বহমানতা রক্ষায় ভাষা কিছুটা দূরহতার সৃষ্টি করেছে এবং ভাবের ইঙ্গিতে শব্দ কিছুক্ষেত্রে যথাযথ হয়নি কিন্তু তাও 'বীরকুমার-বধ কাব্যে'র ভাষা অবশ্যই মহাকাব্যের সাযুজ্য আনতে পেরেছে। যুদ্ধ, আক্ষেপ, বীরত্ব ও বাৎসল্যের ভাব প্রকাশে ভাষা কাব্যের অনুগামী। ক্রিয়াপদ ব্যবহারে কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকলেও কাব্যের ভাষা কবির মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহন করেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেশি ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে ও বাক্যের সরল গঠনেও মহাকাব্যের আড়ম্বরতা বা মহাকাব্যজনোচিত গাম্ভীর্য এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। কবির ভাষা ব্যবহারে যেন এক মৌলিক ভাবনা আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। মধুসূদনের মতো ভাষার কোন উচ্চ ঘরানা তৈরি করতে না পারলেও ভাষা ব্যবহারে তাঁর স্বকীয়তায় যে রয়েছে তা বলা যায়। যদিও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বীরকুমার-বধ কব্যে'র ভাষার গুরুত্ব যতটা ঐতিহাসিক ততটা সাহিত্যগত নয়।

'বীরকুমার-বধ' কাব্যটি সম্পূর্ণত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। 'বাংলা সাহিত্যে মানকুমারী বসুই একমাত্র মহিলা কবি, যিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিশাল মহাকাব্য রচনায়

ব্রতী হয়েছিলেন।'[৯৬] মধুসূদনের পড়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আদ্যোপান্ত একটি মহাকাব্য রচনা করা অবশ্যই শ্লাঘার বিষয়। সাহিত্যের ইতিহাসেও এর গুরুত্ব কম নয়। কবি মানকুমারী বসু পরিপূর্ণভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আয়ত্তাধীন করতে পেরেছেন বলে আমরা মনে করি এবং তারই ফলস্বরূপ কাব্যে ভাবের সাবলীলতার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিঝংকারের প্রাচুর্য পাঠককে মুগ্ধ করতে পেরেছে। তারাকুমার শর্ম্মা গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন-

> "এই কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত।.....বংশ-গুণে ও সাধনার
> বলে ইনি পিতৃব্যের প্রদর্শিত সেই স্বরপ্রবাহকে আত্মস্থ করিয়াছেন;
> এইজন্যই অমিত্রাক্ষর-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন।"[৯৭]

তারাকুমার বাবুর এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত। 'বীরকুমার-বধ কাব্যে'র ছন্দের আলোচনাতেও এই ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বলা যায়। কবি মানকুমারী বসুর হাতে ছন্দের স্বরপ্রবাহ অনেকটাই সমাহিত হয়েছে ও কিছুটা হলেও স্নিগ্ধ হয়েছে। তবে ভাবের প্রবাহমানতায় ছন্দ কখনো বাধা হয়নি, বরং ভাবের সাবলীলতায় ছন্দ অনেকটাই অনুগামী হয়েছে বলা যায়। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়-

> "হেথায় সুভদ্রা দেবী আছেন বসিয়া
> পথ চাহি পুত্র-মুখ দেখিবার তরে।
> হায় রে! মায়ের হিয়া কে বোঝে জগতে
> মা বিনা? সুখাদ্য কত রাখিছেন তুলি
> স্বর্ণ-পাত্রে; প্রাণধন খাইবে বলিয়া।"[৯৮]

এখানে ভাব অনেকটাই শান্ত ও সমাহিত এবং ছন্দের লালিত্য তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। এটাই কবির কৃতিত্ব, এই পঙক্তিতে প্রকাশিত ভাব সুভদ্রার প্রাণের কথা হয়ে উঠেছে। সেখানে ছন্দের ধ্বনিঝংকারের আধিক্য এই ভাবের প্রকাশে বাধা হয়ে উঠতে পারতো কিন্তু কবির ছন্দজ্ঞানে এখানে তা পুরোপুরি ভাবের অনুগামী হয়ে মাতৃহৃদয়ের

বাস্তবতা রক্ষা করেছে। কোথাও আবার ছন্দের ধ্বনিঝংকার ভাবের উর্দ্ধে, ভাবের থেকে ধ্বনিঝংকার মাধুর্য অনেক বেশি এবং পাঠকের মধ্যে তা শ্রুতিসাম্য তৈরি করেছে।

"কহিল শঙ্কর-দাস,--'কি আর কহিব,
কালের করাল গ্রাসে স্বেচ্ছায় পড়িবে
যে মূঢ়, রক্ষিবে তারে কেবা ত্রিভুবনে?"[৯৯]

ছন্দ কাব্যে কাহিনি ও ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে ঠিকই তবে তা বিশেষ আলোচনাযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম মহিলা কবি হিসেবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকাব্য লেখার গুরুত্ব অবশ্য কম নয় এবং এটাই তাঁর বিশেষ অবদান বলে আমরাদের মনে হয়।

বীরকুমার-বধ কাব্যে' অলংকার নির্মাণ খুব উচ্চতা পায়নি। অনুপ্রাসের ধ্বনিঝংকার বিশেষভাবে অনুভব করা যায় না। তবে উপমা প্রয়োগে কবি সিদ্ধহস্ত, এ বিষয়ে তিনি মধুসূদনের মতোই কীর্তিতের পরিচয় দিয়েছেন। অমিত্রসূদন বাবুও কবির এহেন প্রতিভার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। 'কাব্যমধ্যে উপমা প্রয়োগেও মানকুমারী আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।'[১০০]

"প্রাণনাথ, কিন্তু আহা পতি-সেবা সম
রমণীর লোভনীয় কি আছে জগতে?'[১০১]
অথবা

"দশ দীন যুঝি' রণে মহা বাহুবলে,
বীর-শয্যা "শরশয্যা" লইলা আশ্রয়
কুরুপিতামহ ভীষ্ম; সাধি' নিজ কাজ
দিবাকর দিবাশেষে লভেন যেমতি
বিশ্রাম কাঞ্চনকান্তি অস্তাচল-চুড়ে।"[১০২]

সারা কাব্যজুড়ে রয়েছে উপমার বিচিত্র প্রয়োগ। তবে শুধু উপমাই নয় আরো কিছু বিশেষ অলংকারের দৃষ্টান্ত কাব্যে পাওয়া যায়। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হল।

উৎপ্রেক্ষা অলংকার- "যেন রে পাপিয়া পিক মধু ঢালি দি
মধুমাসে, রমণীয় বন উপবনে!"[১০৩]

"সুবর্ণ পালঙ্ক' পড়ে রয়েছে ঘুমায়ে
তনয় লক্ষ্মণ, যেন শিশু শশধর!"[১০৪]

ভ্রান্তিমান অলংকার-

"সুকেশীর মঞ্জুকেশ পড়েছে খুলিয়া;
গুঞ্জরিছে শিলীমুখ কোকনদ-ভ্রমে
মুখ-অরবিন্দ-পাশে;"[১০৫]

বিরোধাভাস অলংকার-

"সোণার তপনে
প্রভাতে গ্রাসিল রাহু জনমের মত!'[১০৬]

সূর্য (তপন)কে রাহু কখনো জনমের মত গ্রাস করতে পারে না। বিষয়টির মধ্যে আপাতভাবে বিরোধ রয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় এখানে অভিমন্যুর অকালে মৃত্যু প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে। জনমের মতো কালের রাহু তাঁকে গ্রাস করেছে। এই ব্যাখ্যাতেই বাহ্যিক বিরোধের অবসান ঘটেছে।

কাকু বক্রোক্তি অলংকার-

"আসেন তপন যবে, অন্ধকার-রাশি
পারে কি থাকিতে কভু বসুধার বুকে?"[১০৭]

এখানে কোন নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার না করেও কবি তাঁর বক্তব্যকে বলার ভঙ্গির মাধ্যমে অস্বীকার করেছেন। আরও কিছু অলংকার 'বীরকুমার-বধ কাব্যে'র প্রাচুর্য বাড়ালেও উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলংকার প্রয়োগে কবির দুর্বলতা অধিক লক্ষণীয়। উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলংকার নির্মাণে কবিপ্রতিভা অনেক বেশি সাবলীল এবং এই ব্যাপারে তিনি তাঁর অগ্রজ পিতৃবর মধুসূদন দত্তের অনুগামী একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

রীতি অনুযায়ী মহাকাব্যের একটি প্রধান রস থাকে এবং সেটি সাধারণত হয় বীররস তবে শান্ত বা শৃঙ্গাররসও প্রধান রস হতে পারে। এটি মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। স্বভাবতই 'বীরকুমার-বধ কাব্যে'র রস বিচার প্রসঙ্গটিও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আকারে বিচার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। 'বীরকুমার-বধ কাব্য'টি কোন রসের আধারে গড়ে উঠেছে তা মূলত আমাদের ভাবনার উপরই নির্ভরশীল কারণ কবি এ প্রসঙ্গে নীরব। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রস প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন—

"গাইব, মা বীররসে ভাসি,
মহাগীত;"[১০৮]

কিন্তু কবি মানকুমারী বসুর এমন কোন বক্তব্য কাব্য মধ্যে পাওয়া যায় না। কাব্যটি শুরু হয়েছে অভিমন্যুর বীরত্বের জয়গান করে, স্বভাবতই এখানে বীররসেরই প্রাধান্য ঘটেছে। আবার কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে তাঁর অন্তকালীন ক্রিয়া-কর্মের মধ্য দিয়ে। কাব্যের অন্তে উত্তরার পতিশোক অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি এখানে রয়েছে করুণ রসের প্রাধান্য। কাব্য মধ্যে রয়েছে এই দুটি রসের সহাবস্থান। কাব্যমধ্যে দ্বিতীয় সর্গ অস্ত্রপ্রাপ্তি, চতুর্থ সর্গ অভিযান, ষষ্ঠ সর্গ সংগ্রাম, সপ্তম সর্গ বীরকুমারবধ এবং অষ্টম সর্গ শত্রুনিপাত এই একাধিক সর্গ জুড়ে বীররসের বর্ণনাই অধিক। তন্মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে করুণরস একাধিক বার উঁকি দিয়ে গেছে। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিকও হয়ে উঠেছে, কিন্তু কাব্যটির নিবিড় পাঠে রস প্রসঙ্গে আমাদের উপলব্ধি কিছু ভিন্ন। একাধিক সর্গ জুড়ে বীররসের প্রাধান্য ঘটলেও কাব্যের মূল কাহিনি বা অভিমুখ কিন্তু বীররসের দিকে যায়নি। অভিমন্যুর বীরত্ব বা কৌরব ও পান্ডবকুলের বীরত্ব বর্ণনা করা কবির অভিপ্রায় ছিল না। কবি সাধারণ বাঙালি ঘরের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে সন্তান মৃত্যুর শোককেই প্রধান করে দেখাতে চেয়েছেন। কাব্যের প্লট মূলত গড়ে উঠেছে অভিমন্যুর মৃত্যুসজ্জাকে ঘিরেই। কাব্যের প্রথম সর্গেই কবি অভিমন্যুর বীরত্বের বর্ণনার পাশাপাশি নারীর কোমল হৃদয়ের করুণ সুরের পরিচয়ও দিয়েছেন। এখানেই কাব্যে পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত

পাওয়া গেছে। প্রথম থেকেই মাতৃত্ব ও পত্নীত্বের ব্যাকুলতার ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন। বাঙালি পাঠকের অনুভূতির কথা ভেবেই কবি এই করুণসুরের বাঁশি বাজিয়েছেন। শুধু তাই নয় অন্যায় সমরে অভিমন্যুর হত্যা পাঠককে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে। কাব্যের সমাপ্তিও ঘটেছে অভিমন্যু হত্যার দুঃখকে ঘিরে, এই ঘটনা বাঙালী ঘরানার এক নিজস্ব চিত্র। আর তাকেই কবি কাব্যের মূলভাব করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। অভিমন্যুহত্যা ঘিরে কাব্যের চরিত্রগুলি দ্বান্দ্বিক গতিবিধি পেয়েছে; চরিত্রগুলি অনেক বেশি স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর হয়েছে। পুরোকাব্য জুড়ে কবি করুণ সুরকে বহন করে নিয়ে গেছেন। অভিমন্যুর মৃত্যু দৃশ্যকে দীর্ঘায়ু করে কবি দৃশ্যটিকে বাস্তব করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই ভাবনার পিছনে কবির উপর মধুসূদনের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। তিনি পিতৃপ্রতিম মধুসূদনের প্রভাবেই কাব্যের গঠনে করুণরসের প্রাধান্য ঘটিয়েছেন। কাব্যের কাহিনির গতিমুখ অনেকটা তাই সেইরকমই। যুদ্ধের কাহিনিগুলি ছাড়া আর বিশেষভাবে বীররসের উপলব্ধি হয় না। কাব্যের মূল কাঠামোতেই করুণরসের একটা বহমানতা লক্ষ করা যায় এবং সেটাই আদি-অন্ত জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই ‘বীরকুমার-বধ কব্যে’র প্রধান রস হিসেবে করুণরসের কথাই উল্লেখ করতে হয়।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য-

১. কবির লেখা প্রথম রচনা 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় 'বনবাসিনী' উপন্যাস (১৮৮৮), এছাড়া 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩), 'কনকাঞ্জলি'(১৮৯৬) প্রভৃতি একাধিক সাহিত্য এই দশকেই রচিত হয়েছে।

২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচিত হয় ১৮৬১ সালে। বিস্তারির জানতে দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন,'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, নবন মুদ্রণ মাঘ ১৪১৮,পৃ. ৮০।

৩. দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন,'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, নবন মুদ্রণ মাঘ ১৪১৮,পৃ. ২৩৪।

৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৮৪।

৫. দ্রষ্টব্য: অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বীরকুমার বধ: এক নিঃসঙ্গ এপিক', 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী(সম্পা.), 'তথ্যসুত্র' পত্রিকা, ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯ পৃ. ৭৯।

৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭৯।

৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, প্রচ্ছদ অংশ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত।

৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, নিবেদন ও ভূমিকা অংশ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২ ও ১০।

৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, নিবেদন অংশ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২।

১০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, ভূমিকা অংশ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৩।

১১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২২।

১২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৯।

১৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮৫।

১৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯।

১৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৩২।

১৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৬।

১৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮২।

১৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২১৩।

১৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৩৫।

২০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, নিবেদন অংশ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৩।

২১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য,প্রথম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২-৩।

২২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩।

২৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৬।

২৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯।

২৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮।

২৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, দ্বিতীয় সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৬।

২৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৩।

২৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য,তৃতীয় সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৫৩-৫৪।

২৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৫৬-৫৭।

৩০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৬১।

৩১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭৮।

৩২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭৯।

৩৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮৪।

৩৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮৫।

৩৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৮৫।

৩৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৬২।

৩৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, চতুর্থ সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৮৬।

৩৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯২-৯৩।

৩৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৪।

৪০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৭।

৪১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৩।

৪২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৭।

৪৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮।

৪৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,পঞ্চম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১১১।

৪৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২০।

৪৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১২১।

৪৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,ষষ্ঠ সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৩৬।

৪৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৪৩।

৪৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫০।

৫০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৩।

৫১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৫-৫৬।

৫২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,সপ্তম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৬৯।

৫৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭১।

৫৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৪।

৫৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৮।

৫৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮২।

৫৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮২।

৫৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য, অষ্টম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৮৫।

৫৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৯১।

৬০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,নবম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২১৬।

৬১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২২৬।

৬২. দ্রষ্টব্য: অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বীরকুমার বধ: এক নিঃসঙ্গ এপিক', 'তথ্যসুত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯ পৃ. ৭৯।

৬৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য, অষ্টম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৮৫।

৬৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৯১।

৬৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,প্রথম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৬-৭।

৬৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,সপ্তম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৬৯।

৬৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৪।

৬৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮২।

৬৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য, প্রথম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৯।

৭০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৭।

৭১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৯।

৭২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য, চতুর্থ সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৯০।

৭৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য, ষষ্ঠ সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৪৫।

৭৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৪৭।

৭৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

৭৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,সপ্তম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৮২।

৭৭. দ্রষ্টব্য: অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বীরকুমার বধঃ এক নিঃসঙ্গ এপিক', 'তথ্যসুত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু', সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পা. ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯ পৃ. ৭৯।

৭৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য,প্রথম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৮।

৭৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,তৃতীয় সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৮২।

৮০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,চতুর্থ সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৯৬।

৮১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,অষ্টম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৯১-১৯২।

৮২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,প্রথম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৬।

৮৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২০।

৮৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,নবম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২১৬।

৮৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,দ্বিতীয় সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৩৩-৩৪।

৮৬. দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন,'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খন্ড, ইস্টার্ন, তৃতীয় সংস্করণ,পৃ. ১১০।

৮৭. দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গান্ধারীর আবেদন', 'কাহিনী', রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৮৭।

৮৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য, দ্বিতীয় সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৪১।

৮৯. দ্রষ্টব্য: অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বীরকুমার বধঃ এক নিঃসঙ্গ এপিক','তথ্যসুত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯ পৃ. ৭৯-৮০।

৯০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, প্রথম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৬।

৯১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬।

৯২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,নবম সর্গ, শ্রী তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২১৬।

৯৩. দ্রষ্টব্য: অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বীরকুমার বধঃ এক নিঃসঙ্গ এপিক', 'তথ্যসুত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯ পৃ. ৮০।

৯৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য, ষষ্ঠ সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৫৩।

৯৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,দ্বিতীয় সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৩।

৯৬. দ্রষ্টব্য: অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বীরকুমার বধঃ এক নিঃসঙ্গ এপিক', 'তথ্যসুত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯ পৃ. ৮১।

৯৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,ভূমিকা অংশ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৯।

৯৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,প্রথম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৮।

৯৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,দ্বিতীয় সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৯।

১০০. দ্রষ্টব্য: অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বীরকুমার বধঃ এক নিঃসঙ্গ এপিক', 'তথ্যসুত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.),, ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯ পৃ. ৮০।

১০১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,প্রথম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৬।

১০২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩।

১০৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২২।

১০৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য, দ্বিতীয় সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৪।

১০৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,তৃতীয় সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ৫৮।

১০৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু,'বীরকুমার বধ' কাব্য,সপ্তম সর্গ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৮০।

১০৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৮।

১০৮. দ্রষ্টব্য: মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'মেঘনাদবধ কাব্য' সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা)., মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনমুদ্রণ ২০১২-২০১৩, পৃ. ৮৫।

-----0-----

চতুর্থ অধ্যায়

মানকুমারী বসুর প্রাবন্ধিক সত্তার স্বরূপসন্ধান

চতুর্থ অধ্যায়

মানকুমারী বসুর প্রাবন্ধিক সত্তার স্বরূপসন্ধান

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশিয় কলকাতায় গ্রাম থেকে আসা নিম্নবর্ণের নারীদের মধ্যে তাঁদের মানসিক বিনোদনের জন্য এক বিশেষ সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এই সংস্কৃতির ধারা যে গ্রাম্য বা লৌকিক তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, যদিও কলকাতায় এসে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে তা নাগরিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল।[১] উচ্চসমাজ সেই লোকসংস্কৃতিকে অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন এবং সেই সংস্কৃতি তাঁদের মানসিক বিনোদনও দিয়েছে। অথচ উচ্চসমাজ সেই সংস্কৃতির ধারক কখনোই ছিলেন না। উচ্চসমাজে তখনও রুচিশীল মার্জিত এক ভিন্ন সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত ছিল। যদিও অন্দরমহলের অন্তঃপুরবাসিনিদের মধ্যে বাহির-ভিতর কোনো সংস্কৃতিরই বিশেষ কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামিল হতে গ্রাম থেকে আসা তথাকথিত পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মহিলারাই মূলত সেই নাগরিক লোকসংস্কৃতিকে বহন করেছিলেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ থেকেই কলকাতায় সেই সংস্কৃতির মহিলা শিল্পী বা গোষ্ঠী লক্ষ করা যায়।[২] এই মহিলাদের হাত ধরেই সেই সংস্কৃতির আঁচ উচ্চসমাজের অন্তঃপুরেও পৌঁছে গেছিল।[৩] উচ্চসমাজের নারীদের মধ্যে সেই সংস্কৃতির প্রভাব পড়ার সম্ভাবনার কথা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন—

> "নিম্নবর্গের মহিলাদের সংস্কৃতিতে অবাধ ভাবপ্রকাশ ও তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে স্বেচ্ছানুবর্তিতার দৃষ্টান্ত অন্তঃপুরের মহিলাদের সামনে তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য হবার আশঙ্কা ছিল।"[৪]

এই সংস্কৃতির প্রভাব থেকে বাঁচতে উচ্চবংশীয় নারীদের প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। এর পিছনে আরও অনেক কারণ ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তখন তাঁদের ঘরের মেয়েদের (বিশেষত বউদের) হিন্দু পরিবারে উচ্চসমাজের সংস্কৃতি ও

ভাবনার আদলে গড়ে নেওয়ার তাগিদ উক্ত সমাজের পুরুষরা অনুভব করেছিলেন। এর একটি কারণের কথা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি থেকে জানতে পারি— 'রাস্তার জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্তঃপুরবাসিনী—এই উভয় গোষ্ঠীই এর রসাস্বাদনে সমভাবে উৎসাহী ছিলেন।'[৫] এমনকি শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও এই সংস্কৃতিকে দোষারোপ করেছিলেন, 'এই লোকসংস্কৃতি ভদ্রঘরের মহিলাদের চরিত্র খারাপ করবে।'[৬] ফলত তাঁরা অন্তঃপুরে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। উপনিবেশিয় ইংরেজি শিক্ষা বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আদলে তাঁরা সেই শিক্ষাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিকল্প নিম্নধাঁচের সংস্কৃতিকে প্রতিহত করার এটাই একমাত্র উপায় হিসেবে তাঁরা মনে করতেন। ইংরেজি শিক্ষার ধাঁচে অন্তঃপুরের শিক্ষাদানের ফলও খুব দ্রত ফলেছিল—

> "নূতন নারী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহল থেকে তাঁরা উচ্ছেদ হয়েছিল।"[৭]

অন্তঃপুরের মহিলাদের প্রাথমিক ভাবে ইংরেজি শিক্ষার ধাঁচে প্রাপ্য গৃহশিক্ষা তাদের আদল বদলে দিয়েছিল। তবে সবটাই যে গৃহশিক্ষা এমনটাও নয়, প্রথাগত স্কুল শিক্ষার অবদানও ছিল নিশ্চয়। এই নতুন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাব, মানকুমারী বসু তাঁদেরই একজন। সমালোচক তাঁদের সম্পর্কে জানিয়েছেন- 'ইংরেজি ধাঁচের শিক্ষাপ্রণালীর সন্তান এঁরা।'[৮] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আবার এঁদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলেছেন—' এঁদের সাহিত্যকর্মে তদানীন্তন নারীশিক্ষার প্রভাব ও নতুন ধাঁচের 'ভদ্রমহিলা'র model-এর গুণাবলী স্পষ্ট।'[৯] উপরিউক্ত নাগরিক সংস্কৃতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই মহিলা সাহিত্যিকদের উত্থান হয়েছে সেই শিক্ষার ছাপ মানকুমারী বসুর প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যায়। তাঁর বেশিরভাগ প্রবন্ধের বিষয় নারী; নারীর জীবন, তাঁর মনন, তাঁর সামাজিক আচরণ, ইতিহাসে নারীর অবস্থান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। তিনি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীদের সমস্যাকে উপলব্ধি করেছেন এবং বাস্তবিক ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক বিষয়গুলিকে

নিয়ে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের মধ্যে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করেছেন । বলাবাহুল্য যে, তাঁর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রথম নারীর আঁতের কথা উঠে এসেছে, নারী তাঁর নিজের উপলব্ধি ও বিচার-বুদ্ধি দিয়ে নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে প্রকাশিত ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীজীবনের অনুভূতি ও ভাবনাগুলিকে এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনার করা হয়েছে।

মানকুমারী বসুর একাধিক প্রবন্ধ রয়েছে, তার বেশিরভাগই প্রবন্ধই 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিষয়বৈচিত্র্যে প্রবন্ধগুলি একাধিক ধরণের হলেও আলাদা করে বিশেষ কোনো ভাগ না করে মূলত ভাব অনুযায়ী তাঁর প্রবন্ধগুলি আলোচনা করা হয়েছে। কারণ একাধিক বিষয়বৈচিত্র্য থাকলেও প্রাবন্ধিকের মূল ভাবনা বা motive একমুখী বা প্রবন্ধগুলির ভাব একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলা যায়। তাই আলাদা বিভাগ বিভাজনের মাধ্যমে প্রাবন্ধিকের অখণ্ড সত্ত্বা বুঝে নিতে কিছুটা বিঘ্ন ঘটবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মানকুমারী বসুর প্রথম প্রবন্ধ 'বঙ্গমহিলার পত্র', 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে রচনাটির ধরণ আমাদের চমকে দিয়েছে। রচনাটি পত্রের আকারে রচিত হয়েছে। আমাদের আলোচনার শুরুতেই আমরা বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীশিক্ষার প্রেক্ষাপটে কিছু বিশেষ কারণ ছিল। সেই শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল নারীসমাজকে রক্ষণশীল সনাতন হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির বাহক করে তোলা। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপারটিকে আরও স্পষ্ট করেছেন—

> "....স্বামী ও সন্তানপালনের দায়িত্বের প্রতি আজীবন আনুগত্যই এঁদের রচনার মূল সুর হয়ে উঠেছিল।"[১০]

আলোচ্য প্রবন্ধটির মধ্যেও এই বক্তব্যের সত্যতা রয়েছে। এই প্রবন্ধের শুরুতে গ্রামের অপরূপ শোভার বর্ণনা থাকলেও তার থেকেও অধিক দৃশ্যায়িত মুগ্ধকর ঘটনা হিসেবে প্রাবন্ধিক 'কমলা' নামী এক গৃহস্থের কথা জানিয়েছেন। তিনি এক মাস্টারমশায়ের পত্নী। তাঁর গুণের কথাই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন কমলা দেবী বিশেষ কিছু ভাবের অধিকারী যেগুলি একজন পত্নীকে 'আদর্শ' নারীর আখ্যায় ভূষিত

করে এবং এটাই একজন নারীর কাম্য। কমলা দেবীর প্রথম গুণ 'ধর্ম্মভাব', এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য—

> "প্রত্যহ সর্ব্বাগ্রে স্বর্গীয় দেবের চরণ বন্দনা করিয়া সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন। ..... বোধ হয় বুঝিতেছ ইহা দ্বারা তাঁহার প্রকৃতি কত দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়াছে।"[১১]

তাঁর দ্বিতীয় গুণ 'সেবা পরায়ণতা'। এটা নারীর চিরন্তন গুণ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকযুগেও শিক্ষিত নারীরাও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই অনুভূতি বহন করে নিয়ে চলেছে। আধুনিক নারীর মনে এর অবলুপ্তি ঘটবার আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ব্যাক্তিও শঙ্কিত হয়েছেন। প্রাবন্ধিকও আলোচ্য প্রবন্ধে এই গুণকে নারীর শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠার জন্য আবশ্যক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মানকুমারী বসু আলোচ্য প্রবন্ধে দেখিয়েছেন 'কমলা' দেবী উক্ত গুণ ধারণ করে কীভাবে পতি অনুরাগী এবং শিশু পালনে ও গৃহকার্য্যে পটীয়সী হয়ে উঠেছে। নারীর এইভাবে গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল হয়ত। এই প্রসঙ্গে সুমন্ত বন্ধ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য- 'আধুনিক ধাঁচের নারীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাংস্কৃতিক রুচির পরিবর্তন ঘটছিল, নব্যশিক্ষিত স্বামীদের প্রয়োজন অনুযায়ী আদর্শ গৃহিণী রূপে তাঁরা বিবর্তিত হচ্ছিলেন।'[১২] এই বিবর্তিত নারীর স্পষ্ট ছবি মানকুমারী বসু তাঁর এই প্রবন্ধে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, 'এ গৃহিণী বয়সে অল্প হইয়াও "উত্তমা গৃহিণী" আখ্যা পাইবার যোগ্য।'[১৩] নারী সম্পর্কে নারীর এই বয়ান বিশেষ গুরুত্ব রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এসে আমরা পুরুষের চোখে নয়, নারীদের নিজেদের ভাবনায় তাঁদের কেমন হওয়া উচিত তার খতিয়ান পেলাম।

এই একই বৎসরে মানকুমারী বসুর আর একটি প্রবন্ধ 'নব্যাগৃহিণী'[১৪] প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে লেখিকা নব্যা গৃহিণীদের স্বভাবগত অভাব ও তা থেকে উন্মোচনের উপায়ের কথা জানিয়েছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলেছেন—

> "নব্যা গৃহিনীদিগের "মার্জ্জিত বুদ্ধি" "পরিষ্কৃত রুচি" এবং "শিক্ষিতা" উপাধি সত্ত্বেও উত্তমা গৃহিণী বা আদর্শ গৃহিণী হইবার অনেক ত্রুটী দেখা যায়।"[১৫]

প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধে গৃহিণীদের অভাবগুলিকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। তিনি অভাব প্রসঙ্গে বলেছেন আধুনিক নব্যাগৃহিণীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা, উদারতা, শ্রমপারগতা, ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও গৃহিণীদের আসল কর্তব্য কর্মে ঘাটতি রয়ে গেছে। নারী শিক্ষার আলোকে আসার ফলে মানকুমারী বসু নারীদের স্বভাবগত অভাবগুলিকে চিহ্নিত করেছেন এবং এটা যে কতটা সংস্কারী ভাবনার প্রেক্ষাপটে তা অবশ্য বিশ্লেষণসাপেক্ষ। তবুও বলতে পারি সংরক্ষণশীল সমাজের দেগে দেওয়া ত্রুটি থেকে তাঁদের নিজেদের অনুভবের ত্রুটি যে অনেকটাই আলাদা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে মানকুমারী বসুর এই গঠনমূলক সমালোচনা আজকের পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নারীর এই আত্মসচেতনতা এবং নিজেদের ভুলকে স্বীকার করার উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রবন্ধটিকে ঐতিহাসিক মাত্রা দিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখিকার বক্তব্য অনুযায়ী সেই দ্বন্দ্বই ফুটে উঠেছে।

> " আগেকার সেই "অশিক্ষিতা" "নিরক্ষরা" গৃহিণীরা সহিষ্ণুতার বলেই গৃহদেবীস্বরূপা ছিলেন।"[১৬]

লেখিকার কথাতেই স্পষ্ট, আগেকার সেই সহিষ্ণুতার খামতি রয়েছে আধুনিক গৃহিণীদের মধ্যে। অর্থাৎ নারীর আত্মসচেতনতা যে এসেছে উক্ত বক্তব্যের বিপরীত মর্মার্থ অনুধাবন করলে তা বোঝা যায়, তবে এটা যে দোষের সেটাও বলতে দ্বিধা করেননি। দীর্ঘদিন নারী সমাজে অবদমিত থাকার পরেও নারী লেখিকার কলমে এই কথন ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল ভূমিতে দাঁড়িয়ে এর থেকে আর বেশি কি-বা বলা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধেই লেখিকা উপরিউক্ত অভাবের অবতারণা করে সেই অভাব মোচনের উপায়ও বলে দিয়েছেন। আগেই আমরা বলেছি এই প্রবন্ধে মানকুমারী বসুর গঠনমূলক সমালোচনা লক্ষ করা যায়। তার কারণ এই যে তিনি যে কয়টি অভাবের অবতারণা করেছেন প্রত্যেকটি ধরে ধরে তা থেকে বিরত থাকার উপায়ও বলেছেন। শুধু দোষারোপ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তীক্ষ্ণ সমাজদর্শন ছাড়া এটা সম্ভব নয়। এখানে প্রাবন্ধিক সনাতন সমাজরীতির প্রসঙ্গকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বলা যায়। নারীর আধুনিক শিক্ষার ফলে তাঁদের গৃহকর্মে শ্রমপারগতার অভাব

ঘটলে লেখিকা তার উপায় বাতলেছেন অত্যন্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। এই প্রসঙ্গে তাঁর আপন সংলাপ উদ্ধৃতযোগ্য—

> "শ্রমপারগতার এক আপত্তি শুনিতে পাই, "এক্ষণকার রমণীগণ বিদ্যাভ্যাস করেন বলিয়া বাল্যকালে শ্রমাভ্যাস করিতে পারেন না, সেই জন্যই পরিশ্রম করিতে অপটু"। এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মনে করা উচিত, খনা বিদ্যোত্তমা প্রভৃতি(অসাধারণ বিদ্যাবতী) দেশীয় মহিলাগণ গৃহকর্ম্ম করিতে নিপুণা ছিলেন। বিদেশীয় রমণীর মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট,"[১৭]

উদ্ধৃতিটি বিস্তৃত হলেও একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। পরিশ্রম করতে না পারার জন্য বিদ্যাভ্যাস শুধু একটা স্বেচ্ছাচারী অজুহাত। খনার যুক্তি মেনে নিতে অসুবিধা হলেও বিদেশী রমণীর প্রসঙ্গ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। আমরা আর একটু অন্যভাবে বলতে পারি, লেখিকা হয়ত আত্মসম্মানের কারণে নিজের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন কিন্তু এ ব্যাপারে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই। তাই তাঁর যুক্তি ও অনুভূতি যে অকাট্য তা বলাইবাহুল্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়ে একজন লেখিকার কলমে নারী জীবনের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রশংসার দাবি রাখে। এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়ে অন্তঃপুরের গঠন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মানকুমারী বসুর প্রায় একইভাব সম্বলিত আর একটি প্রবন্ধ ওই একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে। স্ত্রী হিসেবে নারীর সামাজিক শিষ্টাচার কেমন হওয়া উচিত এই প্রবন্ধে তা তিনি আলোচনা করেছেন। তবে প্রবন্ধটির আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে শুধু নারী নয়, পুরুষেরও সামাজিক শিষ্টাচারের কথা আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটির নামকরণেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'স্ত্রী ও পুরুষদিগের সামাজিক শিষ্টাচার', নামে তাঁর এই প্রবন্ধটি ১২৯৫ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি দু-ধরণের শিষ্টাচারের কথা জানিয়েছেন, প্রথমটি পারিবারিক শিষ্টাচার ও দ্বিতীয়টি লৌকিক বা সামাজিক শিষ্টাচার। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রথম পারিবারিক শিষ্টাচার শেখা উচিত। পরিবারের প্রত্যেকের একে অপরের প্রতি সম্মান তার প্রথম

শর্ত। সন্তানের প্রতি মায়ের ভদ্রোচিত আচরণ যেমন কাম্য, সন্তানেরও তেমনি মাতৃসেবা চিরন্তন ধর্ম। এই আচরণ একটি উন্নত আধুনিক সমাজের ইঙ্গিত আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। নারীর বিশেষ আচরণ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বারেবারে সোচ্চার হয়েছেন, তবে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি পুরুষের চরিত্র সম্পর্কেও বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন।

> "সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে পুরুষ সর্ব্বদাই রমণীর মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন। যাহাতে স্ত্রী চরিত্র উপযুক্ত রূপে বিকশিত হয়, তাহার চেষ্টা পাইবেন।"[১৮]

এই উক্তির ভিতর অনেক বক্তব্য লুকিয়ে রয়েছে। এতদিনের চলে আসা পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এটা নারীর ভদ্র আবেদন। প্রাবন্ধিকের প্রতিবাদের ভাষা বলা যায়। পুরুষদের বিরুদ্ধে এক শান্ত নির্মোহ হুঁশিয়ার। তাই বলা যায় মানকুমারী বসুর প্রবন্ধে শুধু রমণীর রক্ষণশীল আদর্শই নয়, সভ্য সমাজের পুরুষের আচরণ ও সেই সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের মর্যাদা দানের কথাও উঠে এসেছে।

মানকুমারী বসুর প্রবন্ধের মূল কেন্দ্রীভূত বিষয় নারী। বিষয়বৈচিত্র্যে নারী জীবনের বিভিন্ন ভালো-মন্দের প্রসঙ্গই বারবার উঠে এসেছে তাঁর প্রবন্ধে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির সহজ সরল জীবন দর্শনে বিলাসিতা প্রবেশ করেছে আর তখন থেকেই গুণের বদলে রূপের কদর করা শুরু হয়েছে । নারীর রূপ চিরদিনই গুণের আগে প্রশংসিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে এটা নারীর কাছে অহংকারের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রাবন্ধিক সেই প্রসঙ্গেরই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর 'অহঙ্কারীর পরিণাম' প্রবন্ধে। 'বামাবোধিনী পত্রিকার ১২৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়টিকে প্রাবন্ধিক সরাসরি আলোচনা করেননি, রূপকের আড়ালে বিষয়টিকে ভদ্র রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গোলাপ তার রূপের গুণে অহংকারী হয়ে উঠেছে এবং বাগানের অন্যান্য ফুলের গুণ বিচারে ঔদ্ধত্ব পরায়ণ আচরণ করেছে। কিন্তু এই গোলাপ শুকিয়ে গিয়ে অর্থাৎ বয়সের অনতিক্রমে তার শেষ পরিণতি ঘটেছে নর্দমার আস্তাকুঁড়ে। অপরদিকে কদর না পাওয়া মল্লিকা ও যূথিকা ফুল দেবতার চরণে

সমর্পিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক একটি রূপক কাহিনির আড়ালে সমাজের গুণহীন অতুলনীয় সুন্দরীকন্যাদের ব্যঙ্গ করেছেন এবং ভোগের পরিণতিকে চিহ্নিত করেছেন।

এই একই সংখ্যায় প্রাবন্ধিকের আর একটি প্রবন্ধ হল 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য'[১৯]। প্রবন্ধটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১২৯৭ এর আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখিকা বিবাহের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন—'স্ত্রী-পুরুষের আধ্যাত্মিক সংমিশ্রণই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য।'[২০] সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'বিবাহপ্রসঙ্গে' গ্রন্থে বিবাহের অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'বিশেষভাবে অর্থাৎ দেহমনের সব অসুবিধে, সংকটের সময় পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করা।'[২১] প্রাবন্ধিকও তাই বোঝাতে চেয়েছেন। আধ্যাত্মিক সংমিশ্রণ ছাড়া অপরিচিত নারী-পুরুষ কিভাবে দেহমনের অসুবিধাকে অনুভব করতে পারবে। তাই প্রাবন্ধিকের ব্যাখ্যা এখানে বেশ আধুনিক। প্রবন্ধটি সাবজেক্টিভ, তাই লেখিকার বিশ্বাস বা আপন ভাবনাই প্রবন্ধটির বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন সকল স্ত্রীর ভাগ্যে ধার্মিক বা চরিত্রবান স্বামী থাকে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন বিবাহিত নারীর কর্তব্য স্বামীর মানসিক উন্নতি সাধনে রত হওয়া এবং স্বামীর সকল কার্যের খেয়াল রাখা। পতির মনের পুরোপুরি ভরণপোষণের দায়িত্ব স্ত্রীর। তাঁকে চেষ্টা করতে হবে যাতে কোনোভাবেই স্বামীর মন পাপের আস্তানা হয়ে না ওঠে। লেখিকার আরো বক্তব্য অনেকসময় স্ত্রীই, তাঁর স্বামীর বিরূপ পথে যাওয়ার কারণ হয়ে ওঠে। তিনি উদাহরণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবুর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের হৈমবতী ও দেবেন্দ্রের কথা বলেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্যের উল্লেখিত একটি ঘটনার কথা এই মন্তব্যের যথাযথ। তিনি বলেছেন—'দেবতা ও পিতৃগণের মত উচ্চ আসন সৃষ্টি হল পতির, এবং পত্নীর কামনা হল : যেন সে পতিলোকে ঠাঁই পায়। লাঝহোম (আগুনে খই দিয়ে হোম) অনুষ্ঠানে পতির দীর্ঘায়ু, শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করে বধূ, আর বলে, তার শ্বশুরবাড়ির সকলের যেন শ্রীবৃদ্ধি হয়।'[২২] সমাজে এই ভাবনা অনেকআগেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। প্রাবন্ধিক শুধু বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্যকেই স্মরণ করিয়েছেন এবং এই প্রসঙ্গে পুরুষের কর্তব্য এড়িয়ে গেছেন। সেটা জানা গেলে পুরুষের কর্তব্য বিষয়ে প্রাবন্ধিকের মনোভাব আমাদের কাছে

স্পষ্ট হয়ে উঠতো। এক সভ্য, সম্ভ্রান্ত সমাজের ভাবনা থেকেই হয়ত প্রাবন্ধিক নারীর এই স্বরূপ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু অসাম্য থেকেই বিচ্ছিন্নতা জাগে এবং অধিকার বুঝে নেওয়ার তাগিদ জন্মাতে থাকে। তবে উল্লেখ্য যে, মানকুমারী বসু তাঁর কোনো প্রবন্ধেই সমাজে পুরুষের অবস্থান বা ন্যায়-নীতি নিয়ে কোনো কথাই বলেননি। এর পিছনে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর ইংরেজি ধাঁচে গৃহশিক্ষার ধরন দায়ী থাকতে পারে। তবে শুধুমাত্র নারী প্রসঙ্গের উত্থাপনে প্রাবন্ধিকের কৃতিত্ব এক অন্য ঐতিহাসিক মাত্রা পেয়েছে।

'উদাসিনীর সংসার'[২৩] প্রবন্ধের বিষয়-ভাবনা কিছুটা ভিন্ন। জীবনের মুক্তি কোথায়?— এই দর্শনের চর্চা দীর্ঘকালের এবং তাঁর তত্ত্ব ও উপায় নিয়ে একাধিক বক্তব্য তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য কিছুটা আলাদা। তাঁর মতে জীবনের মুক্তি সংসারেই, অবশ্য এটা তিনি শুধু নারী সম্পর্কেই বলেছেন। সংসারধর্মে অনেক দোষ থাকলেও তার মধ্য দিয়েই জীবনের সাধ পূর্ণ হয়। প্রাবন্ধিকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জীবনের বিচিত্র অনুভূতিগুলিকে যেমন- ত্যাগ, ক্ষমা, স্বীকার, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সকলকিছুই সংসারে অবস্থান করে বলে তার মধ্যে দোষগুণ বর্তমান। ত্যাগের সঙ্গে সহিষ্ণুতা শেখাতে গিয়ে ত্যাগের গুণ যেমন শেখানো হয় তেমনি অপরদিকে আবার ত্যাগের দোষ বা সহিষ্ণুতার দোষ পাশাপাশি অবস্থান করে। তাই বস্তুর গুণ যেমন সংসার ধারণ করে তেমনি অপরদিকে অন্যের দোষকেও সে ধারণ করে। এখানেই সংসারের মাহাত্ম্য। জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভবে তাই সংসারের বিকল্প নেই। তাই কবি বলেছেন-

> "এই সংসার এত ভালো লাগিয়াছে যে এখন সন্ন্যাসিনী দেখিলেই তাঁহাকে সংসারাসক্তা করিতে আমার ইচ্ছা করে।"[২৪]

তবে এই সংসার শুধু পরিবারের সংসার নয়। নারীর কর্তব্য হওয়া উচিত যেখানে সে বাস করবে সেখানেই এবং সকলকে নিয়েই তাঁর সংসার গড়ে উঠবে। এখানে প্রবন্ধটি বিশ্বাত্মবোধে উন্নীত হয়েছে। প্রাবন্ধিক সংসারের মাহাত্ম্য জাগিয়ে পরে তার পরিসীমা নির্ণয় করেছেন। নারীর স্নেহই তার সবথেকে বড় সম্পদ,

সেই গুণে জগত জুড়েই মধ্যেই নারীর সংসার গড়ে ওঠে। একা কোনো মহিলা ক্ষুদ্র, কিন্তু এরম অনেক ক্ষুদ্র মিললে বৃহৎ এর রূপ নেয়। এখানে প্রাবন্ধিকের দৃষ্টি উদার ও মানবিক গুনে মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

মানকুমারী বসুর সমসাময়িক সময়ে নারীর বিভিন্ন সামাজিক ধরন নিয়ে তাঁর একাধিক প্রবন্ধে বিভিন্ন ভাবনা ধরা পড়েছে। শুধু সামাজিক ধরনই নয়, তাছাড়াও নারীর অন্যান্য বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়েও প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন। তবে এসবের বাইরেও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাঁর বেশ কিছু ধারণার বা বিশ্বাসের কথা জানা যায়। 'গুণগ্রাহিতা শক্তি' প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিকের সামাজিক বিশ্বাস সংক্রান্ত কিছু প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। প্রবন্ধটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১২৯৭ এর মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। যে শক্তি মানুষকে গুণের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তাই গুণগ্রাহিতা শক্তি। পাপ-পুণ্য বোধ লেখিকার সমসাময়িক সময়ের মানুষজনদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলা যায়। অসৎবৃত্তির প্রতি তাঁদের একটা উন্নাসিক মনোভাব কাজ করেছে। আর সৎবৃত্তি তাঁদের কাছে পরম ধর্ম হয়ে উঠেছে। প্রাবন্ধিক এই সৎবৃত্তি গুণের জয়গান গেয়েছেন এবং আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন।

> " "গুণের পূজা কর" ইহা হিন্দুর ধর্ম্মনীতি। নীতিজ্ঞ হিন্দু যেখানে গুণ দেখিয়াছেন, সেই খানে নতশির হইয়া প্রণাম করিয়াছেন।"[২৫]

তাই লেখিকা আশা করেছেন গুণগ্রাহিতা শক্তির পবিত্র আলোকে সকলের হৃদয় আলোকিত হবে। কিন্তু বর্তমানে কিয়ৎঅংশের মধ্যে গুণগ্রাহী শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে নীতি-নৈতিকতার অবমূল্যায়ন শুরু হয়েছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। প্রাবন্ধিকের বক্তব্য হল আমাদের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের গুণগ্রাহি শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। দোষের গঠনমূলক সমালোচনা অবশ্যই হবে তাতে দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু সাধারণভাবে ব্যক্তির ভুল বা সামান্য দোষের সমালোচনা না করে তাঁর গুণের আলোচনা করা উচিত। কারণ নিয়ত

দোষের সমালোচনার ফলে ব্যক্তির গুণ ঢাকা পড়ে যায়। কবি তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'গুণকে চিনিয়া গুণীর গৌরব করিও, তোমারও হৃদয় গুণের আধার হইবে।'[২৬]

প্রাচীন সাহিত্য বা পুরাণ নিয়ে মানকুমারী বসুর পুনর্নির্মাণধর্মী দু-একটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় 'আর্য্যমহিলা গান্ধারী' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মহাভারত থেকে বিষয় নিলেও প্রাবন্ধিক 'গান্ধারী' চরিত্রের পুনর্নির্মাণ ঘটিয়েছেন। গান্ধার রাজকন্যা অন্ধ স্বামীর কথা জেনেও অনিশ্চিত জীবনের দিকে এগিয়ে গেছেন। প্রাবন্ধিক গান্ধারী চরিত্রের এই দিকটি নতুন করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। স্বদেশের কল্যাণার্থে অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু বেঁচে থেকে সুখ-সাধ ত্যাগ করার কষ্ট তীব্র কঠিন। এখানেই মানকুমারী বসু গান্ধারী চরিত্রের মহত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> "জীবন ত্যাগ করা বরং সহজ, কিন্তু জীবন থাকিতে জীবনের সুখ সাধ— (বিশেষত তরুণ বয়সে) বিসর্জন দেওয়া যে কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা করিতে যে কিরূপ দেবোচিত ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক, তাহা হৃদয়বা ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।"[২৭]

শুধু এটুকুই নয়, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ এবং অনেকক্ষেত্রে অন্যায় করছে জেনেও তাঁর প্রতি পাতিব্রত ধর্মে গান্ধারীর কোনো খামতি দেখা যায় না। তিনি তাঁর স্বামীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুঝিয়েছেন, অধর্ম থেকে প্রত্যাবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ছেড়ে চলে যাননি। প্রাবন্ধিক গান্ধারীর এহেন কর্তব্যকে মহৎ জেনে সমাজের সামনে চরিত্রটিকে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। নিম্নলিখিত সংলাপটি এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

> "যদি প্রকৃত দেবীকে দেখিতে চাও, তবে আইস ভারতকন্যা গান্ধারীদেবীকে দেখ, যিনি পুত্রের বিপক্ষদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া তাহাদের জয় কামনা করেন,"।[২৮]

গান্ধারী যুদ্ধশেষে কুরুক্ষেত্রে শোকের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে অধর্মযুদ্ধ-র কথা ভেবে বেশি ব্যাথিত হয়েছেন। এই ধর্ম্মপ্রীতি, পাতিব্রতা ও মানবিক গুণে 'গান্ধারী' চরিত্রটি যেন নতুন করে গড়ে উঠেছে এবং বলা যায় এই পরিচয় যেন আধুনিক সাহিত্যে এক অন্য সংযোজন। প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণ দক্ষতা এখানে খুবই প্রশংসনীয়। শতাব্দী প্রাচীন একটি চরিত্র নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত নারীর ভাবনা ও অবস্থান আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়েছে। এই একই সময়ে পুরাণ কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে আর একটি পুনর্নির্মাণধর্মী প্রবন্ধ, 'আর্য্যমহিলা পার্ব্বতী'। ঐ একই পত্রিকায় এবং একই সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। বহুপ্রচলিত মহাদেব-পার্বতীর কাহিনি প্রবন্ধটির মূল বিষয়। মহাদেবের মত ষড়ৈশ্বর্যময় দেবতার পত্নী হওয়ার যোগ্যতা যে পার্বতী দীর্ঘ নিষ্ঠার পরে অর্জন করেছেন সেটাই প্রাবন্ধিক মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। মহাদেব ত্যাগী, উদাসীন ও ভোগ-বাসনাহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত। অপরদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ভোগের জীবনে অভ্যস্ত। কিন্তু পার্বতী চাইলেই সেইসব ভোগের উপভোক্তা হতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেসব ছেড়ে সর্ব সন্ন্যাসী মহাদেবকেই পতী হিসেবে পেতে চেয়েছেন। পার্বতীরও ভোগ বাসনায় কোনো মোহ নেই। এই পার্বতী বাঙালি নারীর আদর্শ স্বরূপা হয়ে উঠেছেন। শিবের আদর্শ পত্নী হলেন পার্বতী, স্বামীর উপযুক্তা হয়ে ওঠাই স্ত্রীর মুখ্য অভীষ্ট। পার্বতী সেটাই করেছেন, তাই তিনি আদর্শ রমণী। পূর্বেকার প্রবন্ধগুলির মধ্যে সমাজের নারীর সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের প্রসঙ্গ নিয়েই প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন। এখানে পার্বতীর প্রসঙ্গ আলোচনা করে প্রাবন্ধিক উপযুক্ত দাম্পত্য সম্পর্কে পত্নীর স্বরূপ বোঝাতে চেয়েছেন। প্রাবন্ধিক মানকুমারী বসু আধুনিক পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে পুরাণের মহিলা চরিত্রগুলির শ্রেষ্ঠত্বকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

'আর্য্যমহিলা সুমিত্রা'[২৯] প্রবন্ধেও মানকুমারী বসু দশরথ পত্নী সুমিত্রা চরিত্রটিকে নতুনভাবে দেখিয়েছেন। বাল্মীকি দশরথ পত্নীদের মধ্যে সবথেকে কম কালি খরচ করেছেন সুমিত্রার জন্য। তাই প্রাবন্ধিক তাঁর কলমে চরিত্রটিকে বিস্তৃতি দান করেছেন। সুমিত্রা পতিপরায়ণ, সহনশীল ও ধর্মপরায়ন। দশরথের তিন পত্নীর মধ্যে সুমিত্রাই সবথেকে স্বামী দ্বারা অবহেলিত হয়েছে। দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি অধিক অনুরক্ত হলেও

সুমিত্রা কখনোই তাঁকে সপত্নীর ক্রূর দৃষ্টিতে দেখেননি। রাম ও ভরত সপত্নী পুত্র হলেও কখনো তাঁদের তিনি ভিন্ন ভাবেননি। লক্ষ্মণ উদার, দয়াপরায়নতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি সকল গুণ তাঁর মায়ের থেকেই লাভ করেছেন। রামের বনবাসে বেশি দুঃখ পেয়েছেন পিতা দশরথ। কারণ তাঁর সবথেকে প্রিয় রাম, সেই রামের চলে যাওয়ার মনস্তাপে রাজা দশরথ কৌশল্যার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বামীগতপ্রাণ কৌশল্যাও পুত্রশোকে রাজা দশরথকে অভিযোগ জানাতে ছাড়েননি। কিন্তু এত কিছুর পরেও যিনি ধীর, নিষ্ঠা সহকারে দশরথের সহমর্মী হয়ে উঠেছেন তিনি সুমিত্রা। তিনি জীবনে কিছুই পাননি। তাঁর সন্তানও স্ব-ইচ্ছায় বনবাসে নির্বাসিত হয়েছে। স্বামীর একাকিত্বের ভাগীদারও তিনি হতে পারেননি, কিন্তু রাজা দশরথের প্রতি ভালোবাসার একনিষ্টতার জন্য তিনিই একমাত্র রাজার অন্তর ব্যাথাকে অনুভব করেছেন। যখন কৌশল্যা পতিপ্রাণা হয়েও পুত্রশোকে মগ্ন হয়ে তাঁকে দোষারোপ করেছেন তখন সুমিত্রা অভিযোগের ঊর্দ্ধে উঠে বলেছেন—

> "দেখ! তোমার রাম সত্যবাদী পিতার অঙ্গীকার সিদ্ধ করিবার আশয়েই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন!"[৩০]

সুমিত্রা একবারও নিজের সন্তানের প্রসঙ্গ অবতারণা করেননি। রামায়ণে উপেক্ষিত হয়েও তিনি নীরবে মহৎ গুণের অধিকারী। প্রাবন্ধিক মানকুমারী বসু তাই এই সুমিত্রাকে আধুনিক সাহিত্যের আলোকে তুলে এনেছেন। পুরাণের অবহেলিত চরিত্রকে তুলে আনায় লেখিকার আধুনিক মনের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা প্রশংসাযোগ্য। মানকুমারী বসু পুরাণের আধুনিক সাহিত্যে পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে কখনো চরিত্রের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, কখনোবা চরিত্রটিকে আদর্শ রূপে নির্মাণ করেছেন, আবার কখনো অবহেলিত উপেক্ষিত চরিত্রকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন— সকল ক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয় মানকুমারী বসুর সকল পুনর্নির্মাণধর্মী প্রবন্ধের কেন্দ্রীভূত চরিত্র নারী। আগামী সমাজ নারীর যথোচিত মর্যাদাকে স্বীকার করে নেবে—প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে তারই পথ প্রশস্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ্যনীয়। 'আর্য্য মহিলা

সীতা', 'বামাবোধিনী পত্রিকায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সীতা চরিত্রের ত্যাগ ও মহত্ত্বকেই তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

মানকুমারী বসুর এই ঘারানার ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ 'রামচন্দ্র'। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। ধীশক্তি সম্পন্ন রামচন্দ্রের চরিত্রই প্রবন্ধের মূল বিষয়। তবে আধুনিক সাহিত্যের ন্যায় প্রাবন্ধিকের ভাবনায় নতুনত্ব লক্ষণীয়। মানকুমারী বসু আলোচ্য প্রবন্ধে রামায়ণের রাম চরিত্রের জটিলতা বা অসহায়তার দিকটিকে তুলে ধরেছেন। পুরো রামায়ণে রামের মানসিক জটিলতাই অধিক, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকেই বারবার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। বাঙালি পাঠককুল সীতার পরীক্ষাকে স্মরণে রেখেছেন এবং রামের রাজকীয়তার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু দশরথ ব্যতীত আর কে রামের মতন মানসিক দ্বন্দ্ব ভোগ করেছেন? তাও দশরথ একবারই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে পরলোকে গমন করেছেন। কিন্তু রাম পুরো রামায়ণ জুড়েই মানসিক যন্ত্রণার স্বীকার। রাম তাঁর শত ভালোবাসা, বিশ্বাস উপেক্ষা করে শুধুমাত্র রাজকর্তব্য পালনে সীতাকে বনবাসে নির্বাসন দিয়েছেন। অথচ অশ্বমেধযজ্ঞে সীতার মূর্তি নির্মাণ করে তিনি যজ্ঞের ক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন—এ থেকেই সীতার প্রতি রামের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়বারেও যখন প্রজাগণের দুর্বাক্যকে থামাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামকে সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেখতে হয়েছে তখন তাঁকেও মানসিক যন্ত্রণার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। দ্বিতীয়বারে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে গিয়ে অপমানে, দুঃখে সীতা ধরিত্রী মাতার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। এই ঘটনায় সমস্ত অপমান, কলঙ্ক থেকে সীতার মুক্তি ঘটেছে, কিন্তু সীতাহারা রামের সেই অসহায় অবস্থার কথা কি পাঠক কখনো ভেবেছেন? লেখিকা সেই রামকে আধুনিক সাহিত্যে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। প্রাবন্ধিকের সংলাপেই একথা উঠে এসেছে।

> "আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রামচন্দ্রের জীবন বহু পরীক্ষার স্থল। কিন্তু এইবার সেই ভীষণ পরীক্ষা চরম সীমায় পৌঁছিল। তথাপি সে চিত্তজয়ী,

সে আত্মজয়ী বীর জীবনের অবশিষ্টকালও তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেছেন।"[৩১]

এহেন মানসিক টানাপোড়েনে রাম চরিত্রটি আধুনিক রূপ পেয়েছে। আধুনিক সাহিত্যে পুরাণের যে যথাযথ পুনর্নির্মাণ ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মানকুমারী বসু আরও বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ প্রাবন্ধিক তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন 'মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস' শীর্ষক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে বঙ্গসমাজে বিশেষ করে বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রাবন্ধিক এই শূন্যতাকে তাঁর সাহিত্যের বিষয় করেছেন। বিদ্যাসাগরের অমর কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বঙ্গসমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই। একইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রাবন্ধিক রচনা করেছেন 'শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়', এটি ১৩০১ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত তাঁর সাহিত্যকীর্তির প্রশংসা করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান আলোচনা করেছেন। মানকুমারী বসু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ১৩১১ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় 'আমাদের মহর্ষি' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গসমাজে অবদান আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মানকুমারী বসুর আরও একটি প্রবন্ধ রচনার কথা জানা যায়। উমেশচন্দ্র দত্তের স্মরণে 'শোকোচ্ছ্বাস' নামে একটি প্রবন্ধ 'বামাবোধিনী'র ১৩১৪ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী সমাজের উন্নতির পিছনে উমেশচন্দ্র দত্তের গুরুত্বপূর্ণ অবদান লক্ষ করা যায়। তাই তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গমহিলা সমাজে পিতৃহারার শোক নেমে এসেছে। প্রাবন্ধিক তাঁর সেইসব প্রভূত অবদানের কথা আমাদের জানিয়েছেন। মূল প্রবন্ধ থেকে তার কিছুটা অংশ নিম্নে উল্লাখ করা হল—

"সিটি কলেজ, স্মৃতি-সভা-সমিতি, কালা-বোবা স্কুল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠা, অনাথ বন্ধু সমিতি, সাধারণ বাহ্ম সমাজ, সঙ্গীত সমাজ, সঙ্গত সভা,

হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজ, ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড, গিরিশ বিদ্যারত্ন দাতব্য ফাণ্ড, প্রভৃতি লোকহিতকর বহুবিধ কার্য্যভার তিনিই সম্পন্ন করিয়াছেন।"[৩২]

শুধু মহিলারাই নন ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র বঙ্গসমাজ তাঁর কাছে ঋণী। স্মরণমূলক প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে প্রাবন্ধিক সমকালীন মহাত্মাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বাঙালি সমাজের ঋন শোধ করেছেন। তাঁদের আদর্শ, ভাবনা, কর্মসংস্কৃতিকে ধারাবাহিকভাবে বহন করার ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে এব্যাপারে তিনি যে জাতিগত ভাবনায় আঁটকে ছিলেন এমনটা নয়। তাঁর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় 'আমাদের মহারাণী' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ১৩০৭ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রাণী ভিক্টোরিয়াকে লেখিকা এখানে 'ভারতেশ্বরী' বলে উল্লেখ করেছেন এবং ক্ষুদ্র এই প্রবন্ধে তাঁর মহত্ত্বের জয়গান গেয়েছেন।

মানকুমারী বসুর একটু অন্য ধরণের প্রবন্ধ 'ভিখারিণীর গীতি', 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি গঠনগত দিকে থেক স্বতন্ত্র, প্রবন্ধের শুরুতেই লেখিকা ভিখারিণীর কণ্ঠে একটি গীতের অবতারণা করেছেন এবং পুরো প্রবন্ধ জুড়ে ভিখারিণীর মধ্য দিয়েই সেই গীতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। লেখিকার প্রবন্ধের মূল পাঠক হলেন বঙ্গমহিলাগণ। উক্ত প্রবন্ধে সুচতুর ভাবে তিনি নিজে সেই গীতের প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগ এনে ভিখারিণীকে দিয়ে তার যথার্থ তাৎপর্য উদ্ধার করেছেন। গীতের মাধ্যমে ভিখাড়িনী প্রশ্ন করেছেন, এই জীবনে কি সব সাধ পুরাবে? ভিখারিণী আক্ষেপ করেছেন গান্ধীজির কল্পিত 'ইউটোপিয়ান' সমাজের মতন সেই শান্তি, পারস্পরিক সৌহার্দ, সকলের প্রতি সহিষ্ণুতা সেইসব কি এই জীবনে দেখতে পাওয়া যাবে? ভিখারিণী পুনরায় নারী হিসেবেই পুনজন্ম চেয়েছেন কারণ নারীর হৃদয়ের স্নেহ, পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা, নিজেদের আত্মত্যাগ এসব একান্ত নারী জীবনের একান্ত

সম্পদ। উক্ত অনুভূতিগুলি নারীদের কাছে 'স্বর্গ' স্বরূপ। তাই তাঁদের জীবনে পরাধীনতা থাকলেও, নারী সমাজে নগণ্য রূপে বিবেচিত হলেও, এমনকি নারী অজ্ঞানতার আলোকে বড় হলেও তিনি সেই 'নারী' জন্মই চান। এই ভাবনার সঙ্গেই আধুনিক নারীবাদী ভাবনার মূল দ্বন্দ্ব বলা যায়। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর নিজের জীবন সম্পর্কে এমন আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করা যায় না। আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল নীতিধর্মী পারিবারিক শিক্ষা নারীকে তাঁর 'নারীত্ব' বিষয়ে গর্ব অনুভব করতে শিখিয়েছে। নারীর মধ্যে এই রক্ষণশীল শিক্ষার কারণে এক আধ্যাত্মিক বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। এই কারণেই নারী ধার্মিক ও সৎ পতি, নির্দোষ আমোদ, অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে কিঞ্চিৎ মর্যাদা প্রভৃতি পেলেই নিজের জীবনকে সার্থক মনে করেছে। কিন্তু সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এসব পেতে তাঁদের সংকোচবোধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের সংলাপ উদ্ধৃত করা হলো।

> "স্ত্রীস্বাধীনতার কথা শুনিলে—সমাজের সাম্য ভাবের কথা শুনিলে, কেমন যে পোড়া মন, আমার বড় লজ্জা করে! তোমরা যাই বল, আমরা কিন্তু ঘোমটা খুলিয়া রাস্তায় দাঁড়াইতে পারিব না, আমদের বড় লজ্জা করে!"[৩৩]

এই বক্তব্য থেকে আমাদের কাছে প্রাবন্ধিকের বোঝাপড়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আধুনিকতার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সংকোচ ও লজ্জাই আসলে তাঁদের জীবনে বড় বাধা বলা যায়। রাস্তায় বেরিয়ে আন্দোলন করে, চিৎকার করে আদায় করে নেওয়াতে তারা কুণ্ঠিত। তাই ভিখারিণী সভ্য সমাজের কামনা করেছেন, যেখানে এসব ভেদ থাকবে না এবং নারী লজ্জা ভেঙে সমাজে বেরিয়ে আসবে, সকল কল্যাণধর্মী কাজে অংশ নেবে। প্রাবন্ধিকের এই বক্তব্য যে যথাযথ আধুনিক তা বলাইবাহুল্য। আজকের শিক্ষিত সহানুভূতিশীল আধুনিক বাঙালি এক আদর্শবাদী সভ্য সমাজের কামনা করেন। প্রাবন্ধিক একশো বছর আগে সেই সমাজের কামনা করেছেন। এখানেই প্রাবন্ধিকের বক্তব্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে এবং একইসঙ্গে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মননের পরিচয় পাঠকের সামনে ফুটে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তখনো অবধি তাঁরা সংকোচ ভেঙে সমাজের সকল কিছুর সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। কারণ তখনও লজ্জা নারীকে ঘিরে রেখেছে। প্রাবন্ধিক অবশ্য এই লজ্জার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। লজ্জাই নারীর ভূষণ, তা তাঁর সৌন্দর্য বাড়ায়। তবে প্রাবন্ধিক নৈব্যক্তিক দৃষ্টিতে লজ্জার এক আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সকলের সাথে না মিশে নীরব, নিশ্চল মাত্রেই তাকে লজ্জা বলা যায় না। আবার বয়স্যাদিগের সঙ্গে প্রফুল্লিত চিত্তে আলাপ বা কথাবার্তা না করে মুখ বুজে থাকাকেও তিনি লজ্জা বলে মানতে চাননি। বরং এর পরিবর্তে সদ্ব্যবহার ও মিষ্টালাপেও লজ্জা রক্ষিত থাকে। 'লজ্জাশীলতা'[৩৪] প্রবন্ধে লেখিকা এই লজ্জার যথাযথ স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লজ্জার পাঁচটি উপকরণের কথা বলেছেন। সেগুলি হল- নম্রতা, সঙ্কোচিতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা।[৩৫] লজ্জা সম্পর্কে লেখিকা পুরানো ধারণাকে ভেঙে এক নতুন ধারণার প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। নম্রতা অর্থে তিনি বলতে চেয়েছেন 'বিনয়'। বিনয় থাকলে বিশেষ কারণেও ব্যক্তি কারোর উপর বিরক্ত বোধ করবেন না, অকারণে পরের অন্তরে ব্যাথা দিতে পারবেন না। এটি চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। সঙ্কোচন আসলে সংযম, প্রগলভতা এড়িয়ে যাওয়া। লেখিকা একটি সংস্কৃতির উল্লেখ করেছেন, তা হল বঙ্গবধূর 'ঘোমটা'। ঘোমটা আধুনিককালেও বহুল প্রচলিত এবং এতেই নারী স্বচ্ছন্দ বোধ করেন বলা যায়। অবশ্য তিনি আরো বলেছেন, 'সঙ্গোচিতা রক্ষা করিতে রমণী কেবল ঘরের কোণে বসিয়া দিন কাটাইবেন, ইহা অবশ্য অন্যায়।'[৩৬] লেখিকা আসলে ভদ্র ও রক্ষণশীল কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন এবং আলোচ্য প্রবন্ধে সেই বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ মাত্রা নির্ণয় করেছেন। মানকুমারী বসুর এই বক্তব্য থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণাগুলি এবং উক্ত সমাজে নারীর অবস্থান ও ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। চঞ্চলতা, লজ্জাশীলতার পরিপন্থী ; তাই স্থিরতা নারীর একান্ত কাম্য। সহিষ্ণু ব্যক্তির ধারণ ক্ষমতা অধিক হয়। নারী সংসারের সেই ধারক, তাই সহিষ্ণুতা না থাকলে রমণী আদর্শগত দিকে কাঙাল হয়ে পড়ে। আর পবিত্রতাই লজ্জাশীলতার প্রাণ।[৩৭] আত্মসংযম, সংযত ইন্দ্রিয় ও সদ্বৃত্তির অনুশীলনের ফল হল পবিত্রতা। ভারতভূমিতে পবিত্রতার অভাব নেই। সীতা,

সাবিত্রী থেকে খনা, লীলাবতী প্রভৃতি একাধিক মহাত্মার জন্মভূমি এই ভূখণ্ড। লেখিকা তাই বলেছেন—

> "ভারত-ভাণ্ডারে ধন নাই তাতে বড় দুঃখ ভাবি না, যদি ভারত কন্যার হৃদয়ে পবিত্রতা রত্ন—তাঁহাদিগের জাতীয় সম্পত্তি অক্ষুন্ন থাকে তাহা হইলে এসকল দুঃখেও সুখের বিষয় আছে।"[৩৮]

প্রাবন্ধিক তাই এই লজ্জাশীলতাকে স্ত্রী শিক্ষার বিষয় করে তুলতে চেয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পাঁচটি উপকরণকে সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বেঁধে লজ্জাশীলতার যথাযথ স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। শুধু নারীর মধ্যেই নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকলের মধ্যেই এই শিক্ষার প্রচলন ঘটলে তার ফল শুভ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং প্রাবন্ধিকের উদ্দেশ্যও সফল হবে। এরম সামান্য বিষয়কে এমন গঠনমূলক সমালোচনায় রূপ দেওয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের বলে আমরা মনে করি।

নিন্দুক ও সমালোচকের ভেদ নির্ণিত হয়েছে মানকুমারী বসুর 'নিন্দুক' প্রবন্ধে। এটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নিন্দুক সমালোচক নন, আর কঠোর কর্তব্যপরায়ণ হয়েও সমালোচকের স্থান নিন্দুকের অনেক উপরে। নিন্দুক চিরদিন মানুষের ভুল দেখিয়ে আনন্দ পায়, আর সমালোচক সকলসময় ত্রুটি দেখিয়ে সংশোধনের পথ খুলে দেন। সেই কারণে সমালোচক মানব সমাজের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু নিন্দুক কর্তব্য জ্ঞানশূন্য, নিজের হিংসা, অহংকার চরিতার্থ করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। নিন্দুক তাই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। লেখিকার বক্তব্য—'পরনিন্দায় মহাপাপ, মহানীচত্ব জন্মে।'[৩৯] একান্তই মন্ময়ধর্মী এই প্রবন্ধে লেখিকার সামাজিক মূল্যবোধের বিচারধারা আলোচিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল পরিবারে বড় হওয়ায় মানকুমারী বসুর 'মূল্যবোধ' যথাযথ আকারে বিকশিত হয়েছে। সেই মূল্যবোধকেই তিনি জনসমাজে তুলে ধরতে চেয়েছেন একাধিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। 'স্বার্থে পরার্থ' নামে একটি প্রবন্ধটি ১৩০০

বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী'র আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখিকা তাঁর মনোভাব জানিয়েছেন।

> "সত্য ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া সকল কর্ত্তব্য পালন করাই মানব জন্মের উদ্দেশ্য।"[৪০]

কিন্তু পরের হিতসাধন করতে হলে আগে নিজের আত্মোন্নতি প্রয়োজন। আত্মোন্নতির অর্থ নিজের স্বাস্থ্য, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রের মানোন্নয়ন ঘটানো। ব্যক্তি নিজের আত্মার উন্নতি ঘটাতে পারলে তবেই সে সার্বিক উন্নতির যোগ্য হয়ে ওঠে। তবে নিজের এই আত্মার উন্নতি কামনা করা 'স্বার্থপরতা' নয়, 'যে ব্যক্তি আসক্তিমূলক স্বার্থ, পূর্ণ করিতে চাহে, তাহাকে "স্বার্থপর" কহে।'[৪১] সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখিকা Social Values কে জাগাতে চেয়েছেন।

ভারতীয় হিন্দুসমাজে 'আর্য'দের নিয়ে গর্ববোধ চিরদিনের। আধুনিক সমাজে আজও সেই ভাবনার কোনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। মানকুমারী বসুও সেই সনাতন ভাবধারাকে লালন করেছেন 'পঞ্চযজ্ঞ' প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে । এটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩০০ বঙ্গাব্দে আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে তিনি আর্য জাতির প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন আজকের বাবা-মা যে উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান, সেকালে আর্য ঋষিগণ সেই উদ্দেশ্যেই 'পঞ্চযজ্ঞ' প্রবর্তন করেছেন। পঞ্চযজ্ঞ সাংসারিক মানুষের দৈনিক পাঁচ প্রকার কার্য। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ব্রহ্মযজ্ঞ। এই আচরণে ব্যক্তি অধ্যয়ন কার্যে রত থাকবেন। আর্যরা শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, সেই কারণেই আর্যগোষ্ঠী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন বলে প্রাবন্ধিকের ধারণা। দ্বিতীয় হল পিতৃযজ্ঞ। এখানে গৃহস্থকে পরলোকগত পিতৃলোকদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করার কথা বলা হয়েছে। এতে যেমন আত্মিক উন্নতি ঘটবে, অপরদিকে ইহলোকবাসী একটা পরম শান্তি লাভ করবে। আর্যগণের এই আচরণের অভ্যাসও গৃহস্থের উন্নতির সহায়ক। তৃতীয় আচরণ নৃযজ্ঞ, এর মধ্যে মূলত অতিথিসেবা পরে। পরিচিত বা অপরিচিত কোনো ব্যক্তির গৃহস্থে আগমন ঘটলে তাকে অতিথি বলা যায়। কখনো উচ্চজাতির সংসারে কোনো নীচু

জাতির লোকের আগমন ঘটলেও তাকে অতিথি জ্ঞানে সেবা করা কর্তব্য। আর্য জাতির এহেন আচরণ যে একটি মহৎ গুণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জীবনধারণে তাঁরা উচ্চমার্গীয় ধ্যানধারণার পোষণ করতেন, আর সেকারণেই এতদিন পরেও তাঁদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়নি। চতুর্থটি আরো গুরুত্বপূর্ণ, ভূতযজ্ঞ। এই আচরণ দ্বারা গৃহস্থগণ সকল প্রাণিকে আহার প্রদান করবেন। এই সকল গুণের কারণে আজও আর্য ভাবনা পূজিত হয়, মান্যতা পায়। শতাব্দীপ্রাচীন আর্যদের এহেন জীবনভাবনা জাতিভেদে সকল মানবগোষ্ঠীর উপর বর্তেছে। গুণের সাধনায় আজ আমরা সকলেই যেন আর্য হয়ে উঠতে পারি, কোথাও যেন এই ভাবনা প্রবন্ধের মধ্যে সুপ্ত হয়ে রয়েছে। পঞ্চযজ্ঞের শেষ আচরণ দেবযজ্ঞ। এখানে মূলত ইশ্বরোপাসনার কথা বলা হয়েছে তবে নির্দিষ্ট পথে। প্রাবন্ধিক শুধু আর্য ভাবনায় বিলাসী নন, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের গুণগুলি বিচার করে তবেই তিনি তাঁদের শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন। একইভাবে আর্যগণের জীবনবোধের মহত্ত্ব বিচার করে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' নামে আর একটি প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। এটি ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় আষার-শ্রাবণ সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে। আর্যদের অনেক মহৎ গুণই আজ আমরা কালানুক্রমে বহন করে চলেছি। তবে অনেক ক্ষেত্রে তা আবার বিকৃতও হয়েছে। কিন্তু আর্যগণের যেকোনো জীবনভাবনার পিছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধে শতাব্দীপ্রাচীন কিছু 'অনুষ্ঠান' এর ভিতর আর্যগণের মূল ভাবনাগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সেইরকম একটি সংস্কৃতি, যেটি মানবের মনুষত্ব্য লাভের অন্যতম প্রধান উপায়। এই কার্য ঘটানোর পিছনে আর্যগণের বিশেষ কোন মনোভাব ছিল, আলোচ্য প্রবন্ধে মানকুমারী বসু সেই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কার্যকরের পিছনে তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সদ্ভাব। ব্যক্তিগত সদ্ভাবের যথাযথ লালন না করলে পারিবারিক বা সামাজিক মনোভাবের উন্নয়ন ঘটবে না। তাই ব্যক্তিগত স্তরে সহোদর-সহোদরার স্নেহবর্ধন হেতু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পারিবারিক সদ্ভাব বৃদ্ধি করা। লেখিকার মতে হিংসা, বিদ্বেষের ঊর্দ্ধে উঠে পরকে আপন করতে হবে এবং তাতেই হিন্দুর গার্হস্থ্য ধর্ম রক্ষা পাবে। এইভাবেই সামাজিক সদ্ভাবের বৃদ্ধি ঘটবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সকলে সকলের ভাই-ভগিনী তুল্য।

ভালোবাসার মধ্য দিয়েই এই ভেদভাব দূরীভূত হবে। আসলে ভাই-বোনের সম্পর্কে দ্বিধা সংকোচের কোনো জায়গা নেই, তাই সামাজিক মানুষ সেই সম্পর্কের বন্ধনে একত্রিত হতে পারলে সামাজিক কর্তব্য অনায়াসেই সাধিত হবে। এই প্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন—

> "সামাজিক নরনারীদিগকে ভ্রাতৃ ভগ্নীর পবিত্র মূর্ত্তিতে সাজাইবার পক্ষে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া অপূর্ব্ব কৌশল।"[৪২]

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শেষ বা চতুর্থ উদ্দেশ্যটি খুব বৃহৎ এবং সেটা হল সর্ব্বজনীন সদ্ভাব। লেখিকা বলেছেন ভ্রাতৃভাব আছে বলেই একজন বাঙালির গৌরবে সমগ্র বাংলাবাসী গর্ববোধ করেন। এই সর্বজনীনবোধ ব্যক্তিকে বিশ্ববোধে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে। এখানেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মহত্ত্ব এবং তা রূপায়নের পিছনে আর্যগনের মহৎ উদ্দেশ্যের ভাবনাটা বোঝা যায়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শিক্ষাতেই নিষ্কাম ভালোবাসা জাগে, সেই ভালোবাসা ত্যাগ করতে শেখায়। এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সহোদর সহোদরার মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে পরিবারে তার লালন হয়, সমাজে তার বিস্তৃতি ঘটে এবং বিশ্বজগতে উত্তীর্ণ হয়ে তা সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রাবন্ধিক আক্ষেপ করে জানিয়েছেন আর্যগণের এই মহৎ ভাবগুলিকে অনুসরণ করতে আমরা আজ ব্যর্থ। বিশ্বজগতে কোমতের দর্শন, মিলের যুক্তি প্রভৃতি তত্ত্ব যখন ক্ষয়িষ্ণু তখন আর্যগণ এই তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। অথচ আমরা তা যথাযথ উপলব্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছি। লেখিকা তাই মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন—

> "তাই বলিতেছি সকলেই যদি সকলকে ভালবাসেন, সকলেই যদি সকলকে বিশ্বজননীর সন্তান বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এ সকল শোচনীয় ঘটনার পরিবর্তে বিশ্বজনীন সদ্ভাব সকলের আয়ত্ত হয়,"[৪৩]

প্রাবন্ধিক অবশ্য এককথায় বলতে পারতেন, জগতের সকলের মধ্যে আর্যগণের সেই 'ভ্রাতৃভাব' জাগরিত হোক। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় আজ অনেক আচার যুক্ত হয়েছে কিন্তু সেসব

কেবল পালন মাত্র, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আসল উদ্দেশ্য কেবল ভ্রাতৃভাব ও ভগ্নীভাবের নিবিড় অনুশীলন করা। প্রাবন্ধিক মানকুমারী বসু এই কথাই মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, দীর্ঘ এই প্রবন্ধের এটাই মূল উদ্দেশ্য।

'মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি' প্রাবন্ধিক মানকুমারী বসুর আর একটি নাতিদীর্ঘ মন্ময়ধর্মী প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকার মতে মাতৃভক্তি, দেবভক্তির সমান। 'যে মানব প্রকৃত মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, সে আগে মতৃভক্তি হউক;'।[৪৪] প্রাচীন আর্যভূমি ভারতবর্ষে মাতৃভক্তির কদর ছিল, কিন্তু আজকাল সন্তানরা ধন, মান, যশের জন্য মাতা-পিতাকে ভুলে যায়। কিন্তু মাতা সন্তানের সকল সময়ের সঙ্গী। মায়ের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> "ভগবান বলিয়া ডাকিলে যাহার হৃদয় শুষ্ক থাকে, 'মা' বলিয়া ডাকিলে তাহার হৃদয়ও ভিজিয়া যায়!"[৪৫]

এর থেকে ভালো আর মায়ের স্বরূপ কীভাবে বোঝানো যায়? জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার পর মায়ের স্নেহ স্মরণ করে সন্তান হৃদয়ে যদি অনুরাগ বজায় থাকে তবেই তাকে মাতৃভক্তি বলা যায়। প্রাবন্ধিক মাতৃত্বের নয়টি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি যথাক্রমে- ভালোবাসা, সমতা, সহানুভূতি ও দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, সেবাপরায়ণতা এবং নিঃস্বার্থ হিতৈষণা। এই সকল দেবভাবে মাতৃহৃদয় পূর্ণ। মায়ের এই সকল গুনের আধারে একজন সন্তান মানুষ হয়। কিন্তু সন্তানের মাতৃসেবায় খামতি থেকে যায়। লেখিকার সমকালীন সময় থেকেই এই সমস্যা সামাজিক সমস্যার আকার নিতে নিতে আজকের সমাজে তার অনেকটাই বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রাবন্ধিক তাই স্পষ্ট ভাষায় সমাজের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন—

> "ভারতবর্ষ যত কারণে অধঃপতিত হইতেছে, সন্তানের মাতৃভক্তির হীনতা তন্মধ্যে এক প্রধান কারণ।"[৪৬]

লেখিকা আলোচ্য প্রবন্ধে একটি মানবিক ঘটনার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টি হল, প্রাবন্ধিক পিতৃভক্তির কথা এড়িয়ে গিয়ে

মাতৃভক্তির প্রসঙ্গে বেশি জোড় দিয়েছেন। এর আগেও একাধিক প্রবন্ধে তিনি মহিলাদের ত্রুটি ও সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন। তাই বলা যায় মানকুমারী বসু সমকালীন নারী সমস্যা বা নারী জীবন নিয়ে ভেবেছেন অনেক বেশি। দীর্ঘদিনের অবদমনের ফলে সমাজে কুক্ষিগত হয়ে থাকা নারীদের মনকষ্টটা যেমন তিনি অনুভব করতে পেরেছেন, তেমনি আবার নারীর আদর্শগুলিকে রক্ষা করা নিয়েও তিনি চিন্তিত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়ে একজন নারীর হাতে নারী সমাজের ইতিহাস, তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হওয়া অবশ্যই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এখানেই আমাদের মানকুমারী বসুর প্রবন্ধ অনুসন্ধানের সার্থকতা।

এই প্রসঙ্গে মানকুমারী বসুর আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়, 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীগণের অবস্থা'। এটি প্রাবন্ধিকের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ও দীর্ঘতম প্রবন্ধ। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩০১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যা অবধি দীর্ঘ সময় ধরে উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এতে নারী জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দলিল বললে একে কম বলা হবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধন-সম্পত্তি, মান, যশ প্রভৃতি সবকিছু অফুরন্তভাবে থাকলেও তাকে 'সম্পূর্ণ' বলা যায় না। কারণ এখানে নারী তার আপন কর্তব্য পালনের বা অধিকার রক্ষার সুযোগ পায়নি। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে শুরু থেকেই লেখিকার কলম তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি মনে করেছেন আর্য রাজত্বে নারীর উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তৎপরবর্তী কাল থেকে মহিলাদের শুধু অবনমনই ঘটেছে। লেখিকা বিশেষভাবে সেই সময়ের উল্লেখও করেছেন। ভারতবর্ষে ধর্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব শুরু হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্মের অবসান ঘটলে সমাজে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব কমেছে এবং তার ফলে সমাজে ভোগ বাসনা বেড়ে উঠেছে। আর এই প্রেক্ষাপটেই নারীর সামাজিক অবস্থার পতন ঘটেছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। উক্ত সময়ের নারীর করুণ অবস্থার কথা জানিয়ে প্রাবন্ধিক লিখেছেন—

> "ভারতমহিলাদিগের আধ্যাত্মিক সম্মান গৌরব এতদূর বিনষ্ট হইয়াছিল যে পুরুষদিগের অনেকেই তাহাঁদিগকে খেলনা বা বিলাসের জিনিস মাত্র মনে করিতেন।"[৪৭]

আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন সমরপর্বে নারীর সামাজিক দুরাবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি থেকে মধ্যযুগে নারীর সামাজিক অবস্থা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রবন্ধের মূল বিষয় আধুনিক কালের নারী, প্রাবন্ধিক ১৮০০ সাল থেকে ১৯০০ সাল অবধি সময়কালকে ২৫ বছর করে চারটি পর্যায়ে ভাগ করে এই দীর্ঘ সময়পর্ব জুড়ে নারীর বাস্তব অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম যুগে নারীর হৃদয়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে নারীরা বিদ্যাশিক্ষা বলতে কিছুই পায়নি। সমাজে রুচিরও অবনতি ঘটেছে, যদিও এটা নারী পুরুষ ভেদে সকলকেই প্রভাবিত করেছে। রুচির প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক ভারবর্ষের মহিলাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন। তবে সকলক্ষেত্রেই রুচি নিম্নমুখী বলে তিনি মনে করেন। বঙ্গমহিলাগণ সেই সময়ে একখানি মাত্র কাপড় পরতেন বলে জানা যায়। তৎকালীন সময়ের মেয়েরা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন কপাল, নাক ও চিবুক অংশে অনেকসময় উলকি করতেন। গহনা বলতে ছিল নাকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নথ, কানে চাঁপা, কড়ি জাতীয় গহনা এবং গলায় মোহন, বড় বড় মাদুলি প্রভৃতি ব্যবহার করার কথা জানা যায়। পশ্চিম প্রদেশের রমণীগণ আবার সারাগায়ে উলকির গহনা পড়তেন বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন। তখন নারীদের শারীরিক অবস্থাও নাকি এখনকার তুলনায় অনেক ভালো ছিল। শারীরিক পরিশ্রমেও কখনো শিথিলতা দেখা যায় না। তবে পারিবারিক স্তরে মহিলাদের বহুবিবাহ, সপত্নীযন্ত্রণা, বিধবাদশা প্রভৃতি একাধিক সমস্যার কথা জানা যায়। কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তাঁদের কাছে তা অভিশাপ স্বরূপ, বলাইবাহুল্য আধুনিক সমাজেও এই ভাবনা একেবারে মুঝে যায়নি। তবে লেখিকা এর পিছনে কারণটি অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন কন্যা সন্তান থেকে বংশের কোনো উন্নতি সম্ভব নয় এবং নারী জীবনের ভবিষ্যৎ দুরাবস্থার কথা ভেবেই তাঁদের মধ্যে এই ভাবনা জেগেছে। বল্লাল সেনের আমল থেকে কৌলীন্য প্রথার সূচনা ঘটেছে বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন।

আর এর কারণেই বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার আবির্ভাব ঘটেছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। এছাড়াও শাশুড়ি, ননদ ও অনেক সময় সপত্নীর নির্যাতনও নববধূদের কাছে অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছে। রমণীগণ দাম্পত্য প্রেমেও সুখ পায়নি। স্বামীরা প্রেমের চাইতে ভক্তিকেই অধিক মান্যতা দিয়েছে, এবং স্ত্রীদের এই ভাবনাকে মেনে নিতে হয়েছে। পুরুষ সামান্য কোনো অছিলায় দ্বিতীয় বিবাহ করেছে এবং তার ফলে প্রথমা পত্নীর প্রণয়তৃষ্ণা অপরিতৃপ্ত থেকেছে । বহুবিবাহের দরুণ অনেকসময় শৈশব অবস্থাতেই মেয়েদের পঞ্চাশ বছরের ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। এর কুফল আমরা সহমরণ থেকে উপলব্ধি করতে পারি। সেই চিত্রের অমানবিকতা লেখিকার সংলাপেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

> "যে নববিধবা অগ্রে স্বীকৃতা হইয়া, পরে সহমরণে অসম্মতা হইত, সমাজ তাহাকে কখনই ছাড়িত না, তাহাকে বাঁশবাখারির লাঠির আঘাতে আধমোরা করিয়া সহমৃতা করাইত।"[৪৮]

ভারতবর্ষে দীর্ঘ সময় জুড়ে ইংরেজরা শাসন করেছে। এঁদের হাত ধরেই প্রথম নারী মুক্তির সোপান গড়ে উঠেছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। 'এদেশের স্ত্রীজাতির জীবন যেরূপ বিপদাকীর্ণ ছিল, ইংরাজ রাজত্বে তাহাও দূর হইল।'[৪৯]

শুধু নারীর সমস্যাই নয়, ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁদের সংস্কৃতির স্বরূপও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এরপর লেখিকা দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। ব্রিটিশদের দ্বারা মহিলা সমাজের অবস্থার কতটা পরিবর্তন হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাবন্ধিক আমাদের তা জানিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ১৮২৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যেও নারীর উন্নতির প্রচেষ্টা একপ্রকার ব্যর্থ হয়েছে। মানকুমারী বসুর মতে স্বদেশবাসী শাস্ত্র থেকে দেশাচারকে অধিক মান্য দিয়েছে। এইকারণে নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ যখন উঠেছে তখন সমাজের (তখন সমাজ বলতে পুরুষদেরই প্রাধান্য ছিল) দ্বারা অনেক প্রতিকূলতা তৈরি হয়েছে। একইভাবে সহমরণ বিষয়েও সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন যে সহমৃতা রমণী সহমরণের ফলে বহুকাল যাবৎ স্বামীর সঙ্গে স্বর্গভোগ করবে। তবে তারপরেও নারী মুক্তির চেষ্টা চলেছে। বাঙালি রমণীকূলের দুরাবস্থা মেটাতে

সাগরপাড় থেকে কুমারী কুক নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার আগমন ঘটেছে। নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা লক্ষা করা যায়। তিনি এসে এক বছরের মধ্যেই ৮টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ১১৪ জন বালিকাকে অধ্যয়ন করাতে সফল হয়েছেন।[৫০] কিন্তু উচ্চবংশের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গিয়ে বেশ বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তৎসময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ নারীর শিক্ষা ও সমস্যার বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন। প্রাথমিকভাবে এঁদের প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হলেও তা খুব সুদূরপ্রসারী হয়নি। এই সময়কালেও নারীর সার্বিক অগ্রগতি যে খুব একটা ঘটেনি, তা লেখিকার প্রবন্ধ ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস থেকেও জানা যায়।

এরপর তৃতীয় যুগ অর্থাৎ ১৮৫০ থেকে ১৮৭৫ সালের সময়কালে নারীদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমেই যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল নারীর শিক্ষা, সমস্ত সংকীর্ণতা ভেঙে সেই পথ অনেকটাই উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে বলা যায়। এই কাজটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলা যায় বেথুন সাহেবকে। প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ই প্রথম নিজের কন্যাদের বেথুন স্কুলে পড়াতে সম্মত হয়েছেন।[৫১] তারপর হাইকোর্টের জজ্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত নিজ কন্যাকে বেথুন স্কুলে প্রেরণ করেছেন।[৫২] এইভাবে ধীরে ধীরে নারীশিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়েছে। পণ্ডিত ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আগমন এই সময় যুগান্তকারী ঘটনা। নারী শিক্ষা বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা যথেষ্ট। শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী থাকাকালীন তিনি ৪০ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।[৫৩] শুধু শহরে নয়, নারী শিক্ষার প্রসার গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়ে নারীর পাঠ্যপুস্তকেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’, ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এবং বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিছু পাঠ্যপুস্তকের কথা লেখিকা আমাদের জানিয়েছেন।[৫৪] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহও চালু হয়েছে। এই সময়পর্বের শেষের দিকে নারী মুক্তির প্রসারে ব্রাহ্মদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজ নারীর জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার ব্যবহারে উন্নতি, পরাধীনতা থেকে মুক্তি, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন। নারী মুক্তির পথে আর

একটি ঘটনাকে লেখিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করেছেন। শিক্ষার প্রসার ঘটলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের পড়াশোনা বেশিদূর অগ্রসর হতে দেখা যায় না। বাড়ি বসেও বিদ্যাচর্চার কোনো সুযোগ তাঁদের ঘটেনি। এই প্রয়োজন মেটাতে কিছু যুবক ১২৭০ সালে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য 'বামাবোধিনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।[৫৫] এই ঘটনাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। ১২৭০ সাল মানে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মহিলাদের চর্চার জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে এবং মহিলারা সেই পত্রিকায় সাহিত্য রচনা করেছেন, এতো কাল অতিক্রমি ঘটনা। এই সময়কালের মধ্যেই নারীর অবস্থার আসল পরিবর্তন হয়েছে। লেখিকার বিবরণ সাপেক্ষে বলতে পারি, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সময়কালটা অর্থাৎ ১৮৫০ থেকে ১৮৭৫ সালটি বাঙালির ইতিহাস ও সমাজের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

চতুর্থ পর্বে পূর্বের বিভিন্ন আন্দোলন ও উদ্যোগের যথাযথ ফল ফলতে দেখা যায়। শিক্ষার প্রসারের ফলে অনেকেই খ্যাতি লাভ করেছেন। বহুবিবাহ রদ, বিধবাবিবাহের প্রচলন হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আগের তুলনায় বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছে। সামাজিক কর্তব্য পালনে, সাহিত্যচর্চায় নারীরা এগিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের আলোচিত প্রাবন্ধিক তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তবে এখনো নারী সমাজ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীলদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা লক্ষ করা যায়। তবে নারীর এই অগ্রগতী শহর অঞ্চলে কার্যকরী হলেও গ্রাম্যসমাজে নারীদের অবস্থার বিশেষ প্রিবর্তন হয়নি। প্রবন্ধের শেষ অংশে মানকুমারী বসু গ্রামের নারীর বর্ণনা দিয়েছেন। তার বক্তব্যের খণ্ডিত অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

> "আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পল্লিগ্রামে বাঙ্গালার প্রায় বারো আনা লোক বাস করেন। এই বার আনা লোকের মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি যদি এতদূর হীনাবস্থায় থাকে, তবে ভারতরমণীদিগের জাতীয় উন্নতি এখনও যে কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানই জানেন।"[৫৬]

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর সামগ্রিক অবস্থার বর্ণনা এর আগে এইভাবে উঠে আসেনি। বিভিন্ন সময়পর্বে নারীর দুরাবস্থার চিত্র এবং তাঁদের ধারাবাহিক অগ্রগতি কিভাবে ঘটেছে তার যথাযথ বর্ণনা প্রাবন্ধিক যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা একপ্রকার ঐতিহাসিকের কাজ। তথ্যের সমাহারে ও তত্ত্বের বিশ্লেষণে প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীবাদী ভাবধারা বুঝতে রচনাটির বিকল্প নেই। মানকুমারী বসুর এই লেখনী সর্বোতভাবে প্রশংসাযোগ্য এবং বলা যায় প্রবন্ধসাহিত্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হবার দাবি রাখে।

এগুলি ছাড়াও মানকুমারী বসুর আরও বেশকিছু ভিন্ন ধরণের রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৩০২ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকার পৌষ-মাঘ সংখ্যায় 'স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। স্ত্রীলোকের আমোদ রুচিশীল হওয়া প্রয়োজন। আমোদ বা বিনোদনের উপরেই একটি জাতির সংস্কৃতি নির্ভর করে। আবার উল্টোটাও সত্যি, আমোদ বা মজা অশ্লীল হলে তা সংস্কৃতিকে অনেকসময় প্রভাবিত করে। তাই নির্দোষ আমোদ জাতির উন্নতির সহায়। লেখিকা এর কতকগুলি উপায়ের কথা বলেছেন। মানুষের আমোদ দুইপ্রকারের নৈসর্গিক আর মানবসৃষ্ট। নৈসর্গিক আমোদে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মানবসৃষ্ট আমোদ নির্দিষ্ট কিছু বিষয় কেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন। লেখিকার মতে কবিতা, সঙ্গীতবিদ্যা, শিল্প, চিত্র, বিশুদ্ধ গল্প, দেশভ্রমণ ও বৈজ্ঞানিক উপায় প্রভৃতির মধ্য দিয়েই স্ত্রীলোকের নির্দোষ আমোদ লাভ করা উচিত।

১৩২১ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় মানকুমারী বসু 'বর্ষশেষ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি একান্তই মন্ময়ধর্মী। ছয় ঋতু তাদের স্বকীয়তা দিয়ে পুরো একটি বৎসরকে লালন করে, বহুদিন ধরে প্রত্যেক ঋতু তাদের নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন নান্দনিক ভাবনা দিয়ে বছরকে ভরিয়ে রাখে, তবুও তাকে আটকে রাখতে পারে না। এভাবে কত প্রিয় বছর সকলের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। বছর চলে যায়, সঙ্গে কত আপন, কত মহাত্মাগণ সে সঙ্গে বিদায় নেয়। শত চেষ্টাতেও এইসব কোনো

কিছুকেই আটকে রাখা যায় না। সৃষ্টি যেমন থেমে থাকে না, ধ্বংসও তেমনি থেমে থাকে না।

মানকুমারী বসুর প্রাবন্ধিক সত্তার আলোচনায় আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ না করলেই নয়। যে পত্রিকার প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনায় বারবার এসেছে সেই পত্রিকার জন্মদিন উপলক্ষে প্রাবন্ধিকের নিবেদন 'বামাবোধিনীর জন্মদিনে'প্রবন্ধটি। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ঐ পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

মানকুমারী বসুর 'প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' নামে একটি গ্রন্থ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে রচনাকারের কোনো নাম পাওয়া যায় না।[৫৭] গ্রন্থটি মানকুমারী বসুর স্বামী হারানোর বেদনায় তাঁর স্মৃতিকে উদ্দেশ্যে করে রচিত হয়েছে। এটি মূলত তাঁর স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ। গ্রন্থে একাধিক প্রবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রবন্ধেই দেখা যায় বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লেখিকার স্বামী হারানোর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। 'দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে দুর্গা পূজায় বাঙালির আনন্দের কথা জানিয়ে প্রাবন্ধিক তাঁর নিজের দুঃখের প্রকাশ করেছেন। লেখিকা আজ সর্বহারা, তাঁর আনন্দ, বেশভূষা, আদর কিছুই আজ আর নেই। একইভাবে এই গ্রন্থে আরও সাতটি প্রবন্ধ[৫৮] রয়েছে যথা- 'তুমি কোথায়', চিত্রপট', 'মুকুরেমুখ', পিঞ্জরে বিহগী', 'মরুভূমে মরীচিকা', 'অরণ্যে রোদন', 'একাদশী'।

মানকুমারী বসুর প্রবন্ধের আলোচনা থেকে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালির উচ্চপরিবারে নারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়েছে। মানকুমারী বসু নিজেও সেই শিক্ষার সুফল পেয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বাঙালির রক্ষণশীল ভাবনার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। লেখিকার প্রবন্ধগুলির থেকে একথাও জানা যায়। তাঁর বেশিরভাগ প্রবন্ধের মূল বিষয় নারী। সে সময়ের রমণীগণের ত্রুটি তাঁর প্রবন্ধে বেশি আলোচিত হয়েছে। মানকুমারী বসু মূলত রক্ষণশীল ভাবনাগুলিকে পোষণ করেছেন। উপরিউক্ত অংশে আমরা তা সবিস্তারে আলোচনা করেছি। তবে রক্ষণশীল ভাবনার অধিকারী হলেও তিনি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কুসংস্কারকে মেনে নেননি। তিনি ন মূলত আদর্শবাদী, নৈতিক ও ন্যায় প্রভৃতি ভাবনাকেই পোষণ করেছেন। সুন্দরী

নারীদের রূপের অহংকারকে যেমন তিনি সমালোচনা করেছেন অপরদিকে নারীর শিক্ষা, সুস্থ জীবন, অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসে সমাজ কল্যাণে অংশ নেওয়া প্রভৃতি বিষয়েও নির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। অনেক বিষয়ে আবার তিনি যথেষ্ট আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। ভাবনায় তিনি অনেকটাই 'গান্ধীপন্থী' বলা যায়। তাঁর একাধিক প্রবন্ধে আদর্শবাদী 'ইউটোপিয়ান' সমাজ ভাবনার কথা উঠে এসেছে। অর্থাৎ তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল মূল্যবোধের ঈঙ্গিত দেয়। কিন্তু তাঁকে কুসংস্কারকে বহন করতে দেখা যায় না। তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা যায় প্রাবন্ধিক হিসেবে একজন মহিলা সাহিত্যিককে আমরা পেয়েছি, যিনি তাঁর প্রবন্ধের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে মহিলাদের কথা বলেছেন।

এছাড়াও তাঁর কিছু প্রবন্ধে প্রাচীন সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রসঙ্গ এসেছে এবং তিনি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে সেই ইতিহাসের মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। যেমন 'ভাতৃদ্বিতীয়া', 'মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি', 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে প্রাচীন নারী সমাজ ও তাঁদের সংস্কৃতি এবং আর্যগণের অনেক ইতিহাস উঠে এসেছে। এই প্রবন্ধগুলি থেকে প্রাবন্ধিকের পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং একইসঙ্গে প্রবন্ধগুলির ভাষা এত সাবলীল ও প্রাঞ্জল যে তাঁর রচনা দক্ষতাও প্রশংসাযোগ্য। আরও কিছু বিভিন্ন ভাব বা বিষয়ধর্মী প্রবন্ধ রয়েছে যেগুলি থেকে তাঁর সরল জীবনদর্শন সম্পর্কে জানতে পারা যায়। যেমন 'বর্ষশেষ', 'স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধ আলোচনা করে সার্বিক পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায়, মানকুমারী বসু হলেন একজন শিক্ষিত, রুচিশীল, রক্ষণশীল, শ্রদ্ধাশীল, ইতিহাস ও সমাজ সচেতন এবং মূল্যবোধসম্পন্ন প্রবন্ধকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে প্রাবন্ধিক হিসেবে মানকুমারী বসুর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও স্মরণযোগ্য বলে মনে করি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য-

১. বিস্তারিত অংশের জন্য দ্রষ্টব্য:, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাঙালি নাগরিক সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে’, ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ.-১৫-৩৯।

২. যেমন যজ্ঞেশ্বরীর কবির লড়াই, জগন্মোহিনীর ঢপ, এছাড়াও শ্যামা, গুরুদাসী, ঠাকুরদাসী প্রভৃতি কীর্তনীর কথা জানা যায়। দ্রষ্টব্য: সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘প্রাঙ্গন-বিহারিণী-রসবতী উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী’, ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ.-১৭৯-১৮৫।

৩. দ্রষ্টব্য: সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘প্রাঙ্গন-বিহারিণী-রসবতী উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী’, ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ.-১৭৬-১৯৭।

৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৮৬।

৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৬।

৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র,পৃ. ১৮৯।

৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৯০।

৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৯৫।

৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৯৫।

১০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৯৬।

১১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, ‘বঙ্গমহিলার পত্র’, ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা, ১২৯৫ কার্তিক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২০৬।

১২. দ্রষ্টব্য: সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘প্রাঙ্গন-বিহারিণী-রসবতী উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী’, ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৯৪।

১৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, ‘বঙ্গমহিলার পত্র’, ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা, ১২৯৫ কার্তিক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২০৭।

১৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'নব্যাগৃহিণী' প্রবন্ধটি ১২৯৫ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'নব্যাগৃহিণী', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৯৫ অগ্রহায়ণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২৩০।

১৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৩১।

১৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৩৩।

১৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'স্ত্রী ও পুরুষদিগের সামাজিক শিষ্টাচার', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৫ মাঘ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৩১৮।

১৯. প্রবন্ধটি যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভা কতৃক পুরস্কৃত হয়েছিল।

২০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৭ আশ্বিন-কার্তিক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ১৬৯।

২১. দ্রষ্টব্য: সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'বিবাহ প্রসঙ্গে', ক্যাম্প, বইমেলা ১৯৯৮, পৃ. ২১।

২২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৪।

২৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু 'উদাসিনীর সংসার' 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'উদাসিনীর সংসার', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৭ অগ্রহায়ণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২২৯।

২৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'গুণগ্রাহিতা শক্তি', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৭ মাঘ-ফাল্গুন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২২৪।

২৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩২৬।

২৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আর্য্যমহিলা গান্ধারী', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৮ বোইশাখ-জৈষ্ঠ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৫।

২৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪১।

২৯. দ্রষ্টব্য: প্রবন্ধটি ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আর্য্যমহিলা সুমিত্রা', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০০ আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ১৩।

৩১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'রামচন্দ্র', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩১৭ শ্রাবণ-আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ১৬৭।

৩২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'শোকোচ্ছ্বাস', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩১৪ শ্রাবণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ১১০।

৩৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভিখারিণীর গীতি', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৮ পৌষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২৭৫।

৩৪. প্রবন্ধটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'লজ্জাশীলতা', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৮ ফাল্গুন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৩৩১-৩৩৫।

৩৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৩২।

৩৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৩৫।

৩৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

৩৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'নিন্দুক', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১২৯৯ ফাল্গুন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৩৪৪।

৪০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'স্বার্থে পরার্থে', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০০ আষাঢ়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৬৬।

৪১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৬৭।

৪২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০০ আষাড়-শ্রাবণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ১০৮।

৪৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭১।

৪৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'মাতৃভক্তি ও মাতৃউপাসনায় সন্তানের মুক্তি', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০১ মাঘ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ১৩২।

৪৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৭।

৪৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৯৪।

৪৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০১ অগ্রহায়ণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২২৮।

৪৮. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩২৮।

৪৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৩৯।

৫০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০২ বৈশাখ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২৪।

৫১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৭।

৫২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৭।

৫৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৮।

৫৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৮।

৫৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ১৩০২ বৈশাখ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৩৭।

৫৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, জৈষ্ঠ্য সংখ্যা পৃ. ১০৫।

৫৭. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়', এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত, চৈতন্য লাইব্রেরি।

৫৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়', সূচিপত্র অংশ, এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত, চৈতন্য লাইব্রেরি।

-----o-----

পঞ্চম অধ্যায়

মানকুমারী বসুর কথাসাহিত্য: অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

পঞ্চম অধ্যায়

মানকুমারী বসুর কথাসাহিত্য: অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

মানকুমারী বসু উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচনা করলেও তার সংখ্যা খুবই কম। সংখ্যায় কম হলেও মানকুমারী বসুর লেখা গল্প বা উপন্যাস বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। তাঁর একাধিক গল্প[১] কুন্তলীন পুরস্কারে[২] ভূষিত হয়েছে। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় পাঠকসমাজে তাঁর গল্প সমাদৃত হয়েছে। খুব অল্প হলেও স্বল্প পরিসরে আমরা তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পের আলোচনায় লেখিকার বিশেষ প্রবণতা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

মানকুমারী বসুর লেখা প্রথম উপন্যাস 'বনবাসিনী', 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] সম্পাদক মহাশয় রচনাটিকে উপন্যাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪] উপন্যাসটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। উপন্যাসের নায়ক যতীন্দ্র। স্ত্রী শোভাকে নিয়ে তাঁর সংসার। মানকুমারী বসু উপন্যাসে তাঁদের একটা আদর্শ দাম্পত্য জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অল্প বয়সেই যতীন্দ্র ও শোভা উভয়ের মাতা-পিতা পরলোক গমন করলে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বাকী জীবনটা দূরে বনের মধ্যে গিয়ে বসবাস করেছেন। ঘটনাক্রমে একদিন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর বালককে বনের মধ্যে নিয়ে এলে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে যতীন্দ্র আহত হয়েছে। বালকটি এক জমিদারের পুত্র। প্রসঙ্গক্রমে জমিদার তাঁর পুত্রকে যথাযথ ভাবে ফিরে পেয়েছেন এবং যতীন্দ্রের সাহসিকতা ও তাঁর সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে যতীন্দ্রের আহত হওয়ার কথা জানতে পেরে জমিদার মহাশয় ডাক্তার ও পুরস্কার স্বরূপ নগদ পাঁচ হাজার টাকা তাঁদের সাহায্যার্থে পাঠিয়েছেন। যতীন্দ্রের স্ত্রী শোভা দেবী জমিদার বাবুর পাঠানো ডাক্তার বাবুকে গ্রহণ করলেও তাঁর দেওয়া নগদ টাকা তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। শোভার এই মানবিকতাকে লেখিকা স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। শোভার উক্তি-

> "আমার স্বামী কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছেন, তাহাতে পুরস্কার গ্রহণ করা পাপ; আমাদের অবস্থা নিতান্ত, দীন নহে, আশা করি যাহারা বাস্তবিক দরিদ্র, এই অর্থ দ্বারা তাহারা পালিত হইবে।"[৫]

এই উক্তিতেই শোভা চরিত্রটির আদর্শ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমেও যতীন্দ্রের শারীরিক সুস্থতার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। উভয়ের দাম্পত্য জীবনের একটা নিটোল চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের শেষ অংশে দেখা যায় জমিদার বাবু ও ডাক্তার মহাশয় যতীন্দ্রকে দেখতে এসেছেন। রোগীকে দেখে ডাক্তার বাবু বিষণ্ণ ভাব পোষণ করেছেন। এখানেই উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে। পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যতীন্দ্রের জীবনে মৃত্যু আসন্নপ্রায়। উপন্যাসের ঘটনা বেশ চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। সমাজে দাম্পত্য জীবনের একটা আদর্শ আমরা এখানে পাই। কিন্তু সেটুকুই সব নয়, মানকুমারী বসু এখানে যতীন্দ্র-শোভার পারস্পরিক কথোপকথনের প্রসঙ্গে শোভার নারী মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গভীর অসুস্থতার মধ্যেও যতীন্দ্র শোভার জন্য কষ্ট পেয়েছে। দিনের পর দিন শোভার অক্লান্ত পরিশ্রম যতীন্দ্রের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু যতীন্দ্র তাঁর স্ত্রী প্রতি সহানুভূতি দেখালে শোভার কাছে তা পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। শোভার নারী ভাবনা বোঝাতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন—

> "সে মধুমাখা কথা শুনিয়া শোভার চক্ষে জল আসিতেছিল। বড় দুঃখের সময়ে স্ত্রীলোক সব সহিতে পারে, আদর সহিতে পারে না, সে সময় একটু আদরের কথা শুনিলে প্রাণ জ্বলিয়া যায়। ....ইহাতেই অনেক অনভিজ্ঞ পুরুষ বলেন— "মেয়ে মানুষগুলো কেঁদেই অস্থির করে" ইত্যাদি কাঁদে যে কেন, তাহা বুঝিতেই পারেন না।"[৬]

নারী লেখিকার কলমে নারীর এরূপ ভাবনা এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। নারী মনস্তত্ত্বের এহেন বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ বলা যায়। এই প্রসঙ্গে 'বনবাসিনী' উপন্যাসের আধুনিকতা রক্ষিত হয়েছে বলতে পারি। নারীর যথাযথ গৃহবধূর চিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য রচিত হয়েছে 'গৃহলক্ষ্মী' উপন্যাসটি। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উপন্যাসটি বের হয়েছিল।[৭] উপন্যাসের মূল প্লটটি মুকুলকুমারী-শচীন্দ্র ও তাঁর মাকে নিয়ে একটি সাংসারিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে।

শচীন্দ্র শিক্ষিত, প্রেন্সিডেন্সি কলেজে বি.এ. পড়ছেন। শচীন্দ্রের সখ তাঁর স্ত্রী যেন নভেলের নায়িকাদের মতন হয়। কবি এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-

> "শচীন্দ্র কখনও ইচ্ছা করেন যে কালিদাসের শকুন্তলা, সেক্সপীয়রের মিরান্ডা বা বঙ্কিম বাবুর কপালকুন্ডলার মত সাংসারিক জীবনে অনভিজ্ঞ হউক।"[৮]

স্ত্রীর প্রতি সে অধিক সচেতন। এই স্ত্রী প্রীতি তাঁর মায়ের কাছে বিসদৃশ ঠেকেছে এবং তা নিয়ে ছেলের সঙ্গে মায়ের একটা ভুলবোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। এই ভুলবোঝাবুঝির দায় বর্তায় মুকুলের উপর। স্ত্রী মুকুল কিন্তু মায়ের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং মায়ের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মুকুল কিন্তু সংসারের প্রতি অধিক আগ্রহী। সাংসারিক কর্মে মুকুল সিদ্ধহস্ত এবং সে নিজ দায়িত্বে সংসারের সকল কাজকর্ম সামলেছে। এটা শচীন্দ্র কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। সে মনে করে এসব কিছুর জন্য মা দায়ী, তিনি ইচ্ছা করে মুকুলকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেন। কিন্তু শচীন্দ্রের এই ভুল ভাঙিয়ে দেয় মুকুল নিজেই। মায়ের প্রতি শচীন্দ্রের বিরূপ মনোভাব মুকুল মেনে নিতে পারে না। সে শচীন্দ্রকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। এই মুকুলের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি জানিয়েছেন-

> "সে পাড়াগেঁয়ে মুখচোরা পোড়ারমুখী না হইল মিরান্ডা, না হইল ক্লোটিডা! লেখাপড়া শিখিয়াও সে ভাত রান্ধিতে সন্তুষ্ট হয়। শচীন্দ্রের নিকট বিজ্ঞানের তত্ত্ব শুনিয়াও সে শাশুড়ির পদসেবা করে,"[৯]

স্বভাবতই এমন স্ত্রীকে নিয়ে শচীন্দ্রের আক্ষেপের সীমা নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময় থেকে শিক্ষিতা স্ত্রীর কদর সামাজিকভাবে বাড়তে শুরু করেছে, একথা সত্য। উপন্যাসেও শচীন্দ্রের মধ্য দিয়ে একথার প্রমাণ মেলে। আবার অপরদিকে মুকুলের শাশুড়িও মনে করেন ছেলের এহেন আচরণের জন্য দায়ী বৌমা। মুকুল অবশ্য কখনো শাশুড়ির অবাধ্য হয়নি এবং চোখের জল দিয়ে সে শচীন্দ্রকে বশ করেছে। মুকুলের অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শচীন্দ্র তাঁর মার কাছে ক্ষমা চাইতে সম্মত হয়েছে যদিও মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে শচীন্দ্রের সংকোচ বোধ হয়েছে। শেষমেশ শচীন্দ্র ক্ষমা

চাইলে তাঁর মাও তাঁকে কোলে টেনে নিয়েছে এবং পরবর্তী কালে শচীন্দ্র মাতৃভক্ত সন্তান হয়ে উঠেছে। এরপরে উপন্যাসের পরিণতি অংশে লেখিকা আমাদের আলোচ্য গল্পের ফলকথা জানিয়েছেন। আমরা কবির বক্তব্য এখানে যথাযথ আকারে তুলে দিলাম—

> "এই দিন হইতে এবাড়ীর সকল অশান্তি দূর হইল। শচীন্দ্র মাতৃভক্ত সন্তান হইয়া দিনে দিনে নিজের সংসারের উন্নতি করতে লাগিলেন, ইহার অনেকদিন পড়ে শচীন্দ্র দেশহিতৈষী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং তাঁহার সহকারিতায় দেশের অনেকগুলি মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন হইল।"[১০]

মাতৃভক্তির ফলকথা এই গল্পের মূল দর্শন। শুধু তাই নয় এর জন্য বাঙালি নারীদের কিছু কর্তব্য রয়েছে, সেটিও গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

> "সে দিন মুকুলের শাশুড়ী তাঁহার গুরুঠাকুরের নিকট একান্ত গোপনে বলিয়াছিলেন "বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, আপনার আশীর্ব্বাদে এক বৌমার জন্যেই আমার বাড়ী বৈকুণ্ঠ হইয়াছে। ।""[১১]

মাতৃভক্ত সন্তান ও নিষ্ঠাবতী স্ত্রীর চিত্র রচনা কথাকারের মূল উদ্দেশ্য। উপন্যাসটির মধ্যে বিশেষ কোনো ভাব অর্থাৎ আধুনিক কোনো জীবন জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠেনি। লেখাটিকে উপন্যাস না বলে আখ্যায়িকা বলাই ভালো। মানকুমারী বসু এখানে শচীন্দ্র ও মুকুলকুমারীর মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর জীবন পরিণতি দেখিয়ে কিছু নীতিকথার সামাজিকীকরণ করতে চেয়েছেন। এর সাহিত্যমূল্য বিশেষ কিছু নেই। তবে চরিত্রগুলি খুব উজ্জ্বল বিশেষ করে মুকুলকে লেখিকা তৎকালীন সমাজের বাস্তব গৃহবধূর মতো করেই গড়ে তুলেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সফলতা উচ্চপ্রশংসিত সন্দেহ নেই। উপন্যাসের প্লট গঠনেও কোনো ত্রুটি লক্ষ করা যায় না। সংলাপ কাহিনি বা ভাব অনুযায়ী যথাযথ হয়ে উঠতে পেরেছে।

মানকুমারী বসুর উপন্যাস পর্যায়ের আরও একটি লেখা 'মহামুহূর্ত্ত'। উপন্যাসটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল। [১২] উপন্যাসের শুরুর অংশটি বেশ চমকপ্রদ। প্রকৃতির এক অসাধারন চিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির সূচনা ঘটেছে। সেই চিত্র বর্ণনা অংশটি এখানে যথাযথভাবে তুলে ধরা হল।

> "বেত্রবতী নদী কুল কুল তানে বহিয়া যাইতেছে। দুই ধারে শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। আকাশে আনন্দময়ী ঊষার হাসিতে পৃথিবী খানি আনন্দমাখা বোধ হইতেছে; বেত্রবতী কূলে আম, জাম, অশ্বত্থ ও শিমূল গাছের উপরে পাখীরা প্রভাতি গীতি ছড়াইতেছে;"[১৩]

প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে সূচনা অংশটিকে ঔপন্যাসিক নান্দনিক রসে ভরিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের নায়িকা ক্ষমা অত্যন্ত স্নেহশীলা, পরোপকারী, দয়ালু, শিক্ষিতা ও আদর্শবান। ক্ষমার পিতা হলেন গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার। ক্ষমা তাঁর যাবতীয় শিক্ষা, আদর্শ ও নিষ্ঠা পিতার কাছ থেকেই লাভ করেছেন। উপন্যাসের নায়ক সত্যপ্রিয় রায় সরল ও ভাবপ্রবণ মানুষ।উভয়ের ভালোবাসার টানাপোড়েনে উপন্যাসের প্লট নির্মিত হয়েছে। বিচ্ছেদের ঘটনাও অত্যন্ত তীব্র। সত্যপ্রিয়ের বাবা গ্রামের মহাজন। তিনি এই সম্পর্ক মেনে নেননি। বিরহকাতর সত্যপ্রিয়ের দীর্ঘ এক বৎসর অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে কেটেছে। দীর্ঘ এক বৎসর পর সে বাড়ি ফিরে এসেছে এবং তাঁর বাবার অন্যায় ভাবনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের এক অতি দীন ব্যক্তি সনাতন সত্যপ্রিয়ের বাবার কাছে টাকা ঋণ রেখে পরলোক গমন করেছেন। মহাজনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী তিনি সনাতনের বাড়ি বিক্রি করে টাকা ফেরত পেতে চেয়েছেন।এই ঘটনায় সনাতনের বিধবা পত্নী ও সন্তানেরা গৃহহীন হয়ে পড়েছে। আর তাতেই সত্যপ্রিয়ের আপত্তি ও গ্রামে ফিরে আসা। প্রসঙ্গতউল্লেখ্য এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলার স্নিগ্ধ-শ্যামল পরিসরে সামন্ততন্ত্রের বিভীষিকার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। এমতাবস্থায় উপন্যাসের প্লট বাঁক নিয়েছে। ক্ষমাও বিবাহ না করে এতদিন অনূঢ়া হয়ে জীবনযাপন করেছে।

সত্যপ্রিয়কে না পাওয়ার কারণে হতে পারে। সত্যপ্রিয়ের গ্রামে ফিরে আসার কারণটি ক্ষমাই সমাধান করে দিয়েছে। সে তাঁর নিজের গলার মুক্তার হার বিক্রি করে সনাতনের অসহায় পত্নী ও সন্তানদের মাথা গোঁজার আশ্রয় করে দিয়েছে। এই ঘটনাটিই উপন্যাসের কাহিনিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। কাহিনিকার খুব সচেতন ভাবে ক্ষমাকে আদর্শ স্থানীয় করে সমাজে একটি নীতিমূলক বক্তব্যকে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন। মানকুমারী বসু ক্ষমার চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন এক অসাধারণ সংলাপের মাধ্যমে।

> "মা! এ জগতে তোমার পিতাই ধন্য! তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় তুমি বালিকা হইলেও এমন মহৎ জীবন লাভ করিয়াছ!...! মা! আমি বয়সে প্রাচীন হইলেও এতদিন অজ্ঞ শিশুই ছিলাম, আজি এক মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে প্রকৃত জীবন তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছ।"[১৪]

উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সংলাপের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমার মতন নারীদের সামাজিক গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন । মানকুমারী বসুর বেশিরভাগ উপন্যাসই এই নীতি-ধর্মের তত্ত্বে ভারাক্রান্ত। ক্ষমার এরূপ আচরণের ফলে সত্যপ্রিয়ের পিতা ছেলের সঙ্গে ক্ষমার বিবাহে মত দিয়েছেন। এভাবেই চরিত্রটি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। কাহিনির সূচনা অংশ থেকেই উভয়ের স্বাভাবিক সম্পর্কের সূচনা বলা যায়। পিতার অমতে সেই সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং তার ফলে নায়কের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই উভয়ের মধ্যেই এক মানসিক টানাপোড়েন ঘটেছে এবং তাঁরা তার মধ্যে দিয়েও তাঁদের ভালোবাসাকে জীবন্ত করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই পুরো ঘটনাটির দ্বারা চরিত্র দুটি যেমন আধুনিক হয়ে উঠেছে, তেমনি আবার সকল পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার কাটিয়ে তাঁদের প্রেমও আধুনিক হয়ে উঠেছে বলা যায়। নায়কের ভালোবাসা ইউক্লিডের জ্যামিতি বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় সত্য। তাই সত্যপ্রিয় ক্ষমার বিবাহ বা তাঁর সুখ দেখে সুখী হতে পারেনি। ক্ষমাকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছে। উপন্যাসে নায়কের সংলাপ-

> "যদি ক্ষমা আমার জীবনের অংশভাগিনী হইত, তবে আমার মত একজন শিক্ষিত যুবকের যাহা কর্ত্তব্য আমি দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাই

করিতাম। ক্ষমার সুখের আশায়ে সারা জীবন খাটিলেও আমার একটু শ্রান্তি হইত না;"[১৫]

এই অন্তর্দ্বন্দ এবং চরিত্রের এইরূপ উপলব্ধি আসলে লেখিকার আধুনিক মননের পরিচয় বহন করেছে। শুধু তাই নয় সত্যপ্রিয় চরিত্রটি বিচ্ছেদ ভাবনায় বিরহের আগুনে ও সম্পর্কের টানাপোড়েনে দগ্ধ হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। নায়িকা ক্ষমার পিতা আদর্শ ও নিষ্ঠাবান একটি চরিত্র, উপন্যাসে চরিত্রটির বিশেষ কোনো উত্থানপতন লক্ষ করা যায় না। তবে উপন্যাসের শেষ অংশে মানকুমারী বসুর সংলাপে রচনাটির উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"আমরা সত্য ক্ষমা মিলিত করিয়া পাঠিকা ভগিনীদিগের হস্তে দিতেছি। যে মুহূর্ত্তে বাঙালির ঘরে ঘরে সত্য ক্ষমা মিলিত হইবে, বঙ্গ জননীর সে "মহামুহূর্ত্ত" কবে আসিবে।"[১৬]

এই বক্তব্যেই কাহিনি গঠনের ভাবনাটা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সাহিত্য রচনার পিছনে লেখিকার যে একটি বিশেষ সামাজিক তাগিদ কাজ করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ধারারই আর একটি উপন্যাস 'শৈশব-সঙ্গিনী', ১৩০৪ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় আষাঢ় থেকে আশ্বিন সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৭] উপন্যাসটি ফুলির জীবনকথা নিয়ে রচিত হয়েছে। ফুলির ভালো নাম প্রফুল্লকুমারী। সে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। প্রফুল্লর বারো বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় বি. এল. উপাধিধারী সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে। সুরেশ ছাড়াও ফুলির একান্ত আপন মানুষ হলেন যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র প্রফুল্লর সহোদরা নয়, প্রফুল্লর পিতার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। তৎসত্ত্বেও প্রফুল্ল যোগেন্দ্রকে নিজ সহোদরার মত ভালোবাসে। যোগেন্দ্রও একই ভাবে প্রফুল্লকে আপন বোনের মত স্নেহ করেছে। সুরেশের কোনো অভিভাবক না থাকায় বিবাহের পরেও প্রফুল্ল বহুদিন বাপের বাড়িতেই থেকেছে। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই এই সুখের অবসান ঘটেছে। প্রফুল্লকে বাপের বাড়ির মায়া কাটিয়ে যোগেন দাদাকে ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যেতে হয়েছে। কিছুদিন পর থেকেই সুরেশ-প্রফুল্লের দাম্পত্য জীবনে যোগেন্দ্রকে ঘিরে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। প্রফুল্ল ভাইদ্বিতীয়ায় যোগেন

দাদকে ভাইফোঁটা দিতে চাইলে সুরেশ তা মেনে নেয়নি। শুধু তাই নয় যোগেনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখার প্রতিশ্রুতি সুরেশ প্রফুল্লর থেকে আদায় করে নিয়েছে। এমনকি প্রফুল্ল বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় সুরেশ তাঁকে যোগেনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার ব্যাপারে সচেতন করে দিয়েছে। কিন্তু যোগেন্দ্র পীড়ায় আক্রান্ত হলে প্রফুল্ল নিজেকে আঁটকে রাখতে পারেনি এবং প্রফুল্লের প্রতিনিয়ত সেবার দ্বারাই যোগেন্দ্র সুস্থতা লাভ করেছে। সুরেশের কানে একথা পৌঁছানো মাত্রই সুরেশ প্রফুল্লর থেকে দূরে কলকাতায় গমন করেছে। সাহিত্যিক এই মুহূর্তটিকে তুলে ধরেছেন তীক্ষ্ণ সংলাপ প্রয়োগ করে-

> "তখন সুরেশচন্দ্র— "আমাকে স্পর্শ করিস না— স্পর্শ করিস না" বলিয়া প্রফুল্লকে— পদানতা সরল-হৃদয়া পত্নীকে এক পদাঘাত করিয়া বাটীর বাহির হইলেন!"[১৮]

সুরেশের এমন আচরণ সত্যই মর্মস্পর্শী। কলকাতায় থাকাকালীন সুরেশ অসুস্থ হয়ে পড়লে যোগেন্দ্রই তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে এবং প্রতিনিয়ত শুশ্রূশা করে সারিয়ে তুলেছে। সুরেশ তাঁর পরমশত্রুর দ্বারা আরোগ্য লাভের কথা জানতে পেরে শেষমেশ অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেছে এবং যোগেন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছে। সুরেশের মানবিকতা উন্মোচনের মধ্য দিয়েই কাহিনি সার্থকতা লাভ করেছে। সুরেশের নিম্ন মানসিকতার পাশে যোগেন্দ্রের মহত্ত্বকে লেখিকা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে কোনো আধুনিক জীবন জটিলতা নেই, চরিত্রগুলিও খুব প্রথাবদ্ধ। ঔপন্যাসিক কাহিনির মধ্য দিয়ে যোগেন্দ্রের চারিত্রিক মহত্ত্ব ও ভাইবোনের সম্পর্কের একটি উচ্চ ধারণা প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। এই ধরণের সম্পর্কের মূল্যও সমাজের ক্ষেত্রে কম নয়। ব্যক্তির চারিত্রিক উদারতা ও মানবিকতা দিয়ে গড়ে ওঠা সমাজের সকল সম্পর্কই মাধুর্যময়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়কালে এই কাহিনির গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক সহনশীলতা গড়ে তুলতেই কবির এহেন প্রয়াস বলে আমাদের মনে হয়। 'বিমাতা' উপন্যাসেও লেখিকা মাতৃত্বের একটি আদর্শ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩০৪

বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায়।[১৯] কাহিনি কথক হিন্দু পরিবারে বড়ো হওয়া সতেরো বৎসরের একজন নারী। সে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সী এক ডাক্তারের সহধর্মিণী হয়েছে। তিনি ডাক্তারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী দুইটি শিশুপুত্র রেখে পরলোক গমন করলে ডাক্তার মহাশয় পুনরায় বিবাহ করেছেন। বিমাতা আসার পরে পূর্বের সন্তানদের অবস্থা কী হবে ভেবে সকলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। কিন্তু ফল হয়েছে ঠিক তার উলটো, গৃহে এসেই সে তাঁর সতীনের সন্তানদের আপন বুকে স্থান দিয়েছে। তাঁর নিজের তিনটি সন্তানের থেকে সতীনের সন্তান সুরেন ও যতীনের প্রতি তাঁর স্নেহ যেন বেশি। তাদেরও বিমাতার প্রতি ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। একটি আদর্শ সুখী পরিবারের চিত্র কেমন হওয়া উচিত লেখিকা এখানে তাই বোঝাতে চেয়েছেন এবং তা গৃহের নারী অর্থাৎ পত্নীর উপর নির্ভরশীল। আদর্শ গৃহিণীর এক প্রতিকল্প 'বিমাতা' উপন্যাসের বিমাতা। পুরো উপন্যাসটি আত্মকথন ভঙ্গিতে রচিত। ইংরাজিতে যাকে বলে Autobiographical রীতি। উপন্যাসের বিষয় খুব আকর্ষণীয় না হলেও মানুষের অস্তিত্বের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা উপন্যাসটি থেকে পাওয়া যায়। গল্পের নায়িকা বিমাতা হিসেবে ডাক্তার বাবুর সংসারে যাওয়ার পর তাঁর মনে হয়েছে ডাক্তার বাবুর প্রথমা পত্নীর স্মৃতি সংসার জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এবং তাঁর আগমনেই সেই স্মৃতির বিলুপ্তি ঘটেছে। এতদিনেই ডাক্তার বাবুর প্রথমা পত্নীর যথার্থ মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন। এই প্রসঙ্গে কাহিনি কথকের উক্তি প্রাসঙ্গিক। সেই উক্তির অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল-

> "সে যাঁহাকে জীবনের বন্ধু, সংসারের সহায়, জগতের অবলম্বন বলিয়া প্রাণের প্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল, হায়! হায়! পাপিষ্ঠা আমি, আজি তাহার সেই সর্ব্বস্ব ধনকে কাড়িয়া লইলাম! এতদিনে তাহার প্রকৃত মৃত্যু হইল—"[২০]

রবিশংকর বলের 'মৃত্যু ও ময়ূর'[২১] গল্পটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। মানুষ চলে গেলেও স্মৃতি থেকে যায়, অনেক চিহ্নের মধ্যে সেই স্মৃতি যেন রয়ে যায়। বহুদিন পরেও তাই সেই মানুষটিকে নির্দিষ্ট সেইসব চিহ্নের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। লেখিকা

আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন সেই চিহ্নের বিলোপেই ব্যক্তির আসল মৃত্যু ঘটে, দেহের অবসানে নয়। অসাধারণ একটা দার্শনিক ভাবনা এখানে ফুটে উঠেছে। কত সরল ভাবে লেখিকা একটা আধ্যাত্মিক ভাবনাকে আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাস রচনায় মানকুমারী বসু বাংলা সাহিত্যে খুব কিছু অবদান রেখে যেতে পারেননি। কাহিনি বা প্লট ছাড়া আর উপন্যাসের কোনো উপকরণই বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠেনি। প্রত্যেকটি কাহিনিই নীতিকথার মোড়কে ঢাকা। চরিত্রগুলিও একটি বিশেষ আদর্শকে বহন করেছে। সামাজিক বিষয় নিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠলেও তাতে সামাজিক বাস্তবতা বা সমাজ জটিলতা তেমনভাবে নেই। স্বভাবতই উপন্যাস হিসেবে কাহিনিগুলির গুরুত্ব খুব একটা বেশি নয়। প্রত্যেকটি উপন্যাসেই একটি সামাজিক আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে একটি করে চরিত্র বিশেষ ভাবে নির্মিত হয়েছে এবং আদর্শের পরাকাষ্ঠায় উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রগুলি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। 'বিমাতা' উপন্যাসে আদর্শ মাতার চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে প্রথম থেকেই সাহিত্যিক চরিত্রটিকে উদার, স্নেহশীল ও মহৎ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'গৃহলক্ষ্মী' বা 'মহামুহূর্ত্ত' উপন্যাসে আদর্শ গৃহবধূ বা ভালোবাসার নিষ্ঠা দেখাতে গিয়ে চরিত্রগুলি বা কাহিনিকে অতি সাবধানে গড়ে তুলতে হয়েছে। তবে এত কিছুর পরও বলা যায় চরিত্রগুলি কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। আদর্শের ভারে আক্রান্ত হলেও কোনো চরিত্র আড়ষ্ট হয়ে ওঠেনি- এটা লেখিকার পারদর্শিতা বলে আমরা মনে করি। ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যের শুরুর পর্বে মহিলা লেখিকা হিসেবে মানকুমারী বসু মূল ধারার কবি হয়েও উপন্যাস বা ছোটোগল্পের চর্চা করেছেন। মহিলা কবি হিসেবে একটা বিশেষরীতি যে গড়ে তুলতে পেরেছেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক জীবন জটিলতা বা ব্যক্তি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়ত নেই কিন্তু সামাজিক ভাবনা বা জীবনের সত্যতাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। মানকুমারী বসু গৃহেই প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের পাশাপাশি ধর্মীয় ও ন্যায়-নীতির শিক্ষাও পেয়েছেন। উপন্যাসের মধ্যে সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। জীবনকে তিনি যে ভাবে দেখতে শিখেছেন, তাঁর উপন্যাসে ঠিক সেই জীবন ভাবনার আভাসই পরিলক্ষিত হয়েছে। তৎকালীন জীবন চেতনার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা তাঁর উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে যথোপযুক্ত মর্যাদা

পায়নি। তাঁর উপন্যাসের এই বিশেষরীতির অনুসন্ধানে আমাদের গবেষণাটি যে বিশেষ কার্যোপযোগী হয়ে উঠবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উপন্যাসের মতোই মানকুমারী বসুর গল্পের সংখ্যাও খুবই সীমিত। তবে তাঁর ছোটোগল্পে সামাজিক আদর্শ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা উপন্যাসের মতো এতটা প্রখর নয়। তাঁর অনেক গল্পই খুব হালকা চালের, তাঁর গল্পগুলির মধ্যে একটা হালকা মাধুর্য উপলব্ধি করা যায়। এরকমই একটি গল্প 'দিদিমার রূপকথা'। গল্পটি 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে অঘ্রাণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২২] গল্পের কাহিনিটি প্রাচীন রূপকথার ছাঁদে লেখা। গল্পটি প্রসঙ্গে লেখিকা জানিয়েছেন-

> "শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের "ঠাকুমার এবং "ঠাকুর দাদার ঝুলি" পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।..... ইহা তাঁহাদিগের গৌরবের কথা হইলেও আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা বটে। সেই লজ্জা ঘুচাইতে আজি বামাবোধিনীতে এই দিদিমার রূপকথাকে অবতারনা।"[২৩]

রূপকথার আদলে কবি তাই এই গল্পটি গড়ে তুলেছেন। গল্পটি রূপকথার ন্যায় রাজা ও রানির গল্প। বড়রানির সন্তান না হওয়ার কারণে রাজা দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। যথাসময়ে ছোটোরানি সন্তান প্রসব করেছেন। রাজা তার নাম দিয়েছেন নীলকমল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে বিধাতাপুরুষ নির্ধারণ করেছে যে সেই সন্তানের বিবাহের সময় মরা বর ও বিধবা কন্যা প্রাপ্তি হবে। ছোটোরানির সন্তান হওয়াটা বড় রানি একেবারেই সহ্য করতে পারেননি। কিছুকাল পরে সুযোগ বুঝে বড়রানি সেই সন্তানের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সন্তান তাঁকেই আপন মা বলে জেনেছে। আর গর্ভধারিনী মাকে ছোটোমা বলতে অভ্যস্ত হয়েছে। এইভাবে কাহিনির অগ্রগমন হয়েছে এবং দাইমা তার মৃত্যুকালে বিধাতাপুরুষের দ্বারা নির্ধারিত নীলকমলের ভাগ্যের কথা ছোটোরানিমাকে জানিয়ে যায়। এখানেও চালাকি করে নীলকমলের জীবনধারণের উপায় বড়রানি জেনে নিয়েছে। জীবনধারণের ঘটনাটি হল রাজার পূজার ফুলজল ফেলার স্থানে বাস করে এক রাঘব বোয়াল। বড়রানির ভাই তাকে ধরে এক নিশ্বাসে কাটলে তাঁর উদরে একটি হীরার হার পাওয়া যাবে। সেটির ধারণ করলে নীলকমল অমর হবে

এবং অন্য কেউ ধারণ করলে রাজকুমারের মৃত্যু হবে। বড়রানি তা জানতে পেরে সেই হীরার হার নিজ কণ্ঠে ধারণ করেছেন। ফলস্বরূপ নীলকমল সারাদিন মরে থাকে আর রাতের বেলা বড়রানি তা গলা থেকে খুললে রাজকুমার বেঁচে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে অন্য আর একটি গল্প, এক রাজা রাগের মাথায় প্রতিজ্ঞা করেছেন পরদিন সকালে উঠে যাকে তিনি সর্বপ্রথম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবেন তার সঙ্গেই তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। পরদিন সকালে উঠে সর্বপ্রথমে রাজবাড়ির রোয়াকে কুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখে তার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হয়েছে এবং বিবাহ সমাপ্ত হলে কুকুরটিকে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু রাজকন্যা প্রভাবতী এটা মেনে নিতে না পেরে ঠাকুরমার সঙ্গে অজানার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েছেন। ভাগ্যক্রমে রাজকন্যা প্রভাবতী এসে পৌঁছান রাজকুমার নীলকমলের কাছে। নীলকমল তখন রাজবাড়ির অদূরে একটি প্রাসাদে একাকী নির্বাসণে রয়েছে। এখানেই দুজনের মিলন হয়েছে এবং মৃত বর ও বিধবাকন্যার বিধিলিখন পরিপূর্ণতা পেয়েছে। কাহিনির অগ্রগতীর ফলে দেখা গেছে উভয়ের মিলনে এক সন্তান জন্ম নিয়েছে ছোটোরানিমার গৃহে। তারপর নীলকমলের মুখে তাঁর ভাগ্যবৃত্তান্ত সবটা শুনে বুদ্ধিবলে রাজকুমারের পরমায়ু হীরার হার প্রভাবতী বড়রানির কাছ থেকে নিয়ে এসে নীলকমলের হাতে দিয়েছে এবং রাজকুমার অমরত্ব লাভ করেছে। রূপকথার রোমান্সের ন্যায় পাঠকের এই গল্পেও সমধিক রসাস্বাদন ঘটেছে। রূপকথার গল্পের পরিণতির ন্যায় এখানেও বড়রানি যথোপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে এবং ছোটোরানি তাঁর স্বামী, সন্তান ও পুত্রবধূ নিয়ে সুখে রাজত্ব করেছেন।

গল্পটির উদ্দেশ্যের কথা আমরা আগেই জেনেছি, নিছক প্রাচীন গল্পের রস পুনরায় ফিরিয়ে আনতেই লেখিকা এই রূপকথাধর্মী গল্পটির অবতারণা করেছেন। তাই এরমধ্যে অহেতুক তত্ত্ব খোঁজার চেষ্টা বৃথা। তবে রূপকথার রোমান্স যে পাঠক লাভ করেছে সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এটাই আমাদের আলোচ্য গল্পটির সার্থকতা।

লেখিকার অন্যান্য গল্পগুলির স্বাদ আবার একটু আলাদা। তাঁর লেখা 'ভৈরবী' গল্পে রয়েছে পতিপ্রাণা স্ত্রীর আত্মবিরহের কথা। গল্পটি ১৩১৮ বঙ্গাব্দে আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪] গল্পের কাহিনির শুরু হিন্দুদের পুন্যতীর্থ বারাণসী ধামের

বর্ণনায়। গল্পের নায়িকা ভৈরবীর একমাত্র আশ্রয়স্থল এখন বারাণসী। স্বামী বঞ্চিতা এই নারীর মুখেই তাঁর জীবনের ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পটির প্লট গড়ে উঠেছে। ভৈরবী তাঁর বাবা মায়ের একমাত্র কন্যা সন্তান, তাই তাঁর বাবা-মায়ের কাছে সে খুব স্নেহের। বিবাহের সময় ভৈরবীর পিতা শর্ত দিয়েছেন বিবাহের পর তাঁর কন্যা নিজ বাড়িতেই থাকবে এবং দুটি সন্তান জন্মালে একটি সন্তানকে বাপের বাড়ি রেখে তারপরে ভৈরবী শ্বশুর বাড়ির যাবে। যথারীতি এই শর্তে রাজি হয়েই ভৈরবীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়েছে সুললিতের সঙ্গে। দাম্পত্য সুখের মাঝে সুললিতের পিতা তাঁর ছেলেকে বিলাতে ডাক্তারি পাঠানোর মনস্থির করে ভৈরবীর পিতার নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু ভৈরবীর পিতা এই প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে জানিয়ে দেন যে সুললিত বিলাতে গমন করলে তিনি ভৈরবীকে আর কখনো ওই বাড়িতে পাঠাবেন না। কিন্তু এতে শেষ রক্ষা হয়নি। শেষে ভৈরবী অসহায় অবস্থায় পড়ে সুললিতকে পত্রপাঠ নিষেধ করলেও সুললিত নিজের স্ত্রীর অনুরোধ পিতৃত্বের দোহাই দিয়ে নাকোচ করে দিয়েছে। ঘটনাক্রমে পাঁচ বৎসর পর সুললিত ফিরলে ভৈরবী সুললিতের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর পিতা জেদের বশে কন্যাকে তাঁর স্বামীর হস্তে সমর্পণ করতে অস্বীকার করেছেন। সুলিতের পিতা যথাক্রমে সন্তানের পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন এবং একপ্রকার বাধ্য হয়েই সুললিত পুনরায় বিবাহ করতে রাজী হয়েছে। ওদিকে ভৈরবীর পিতা আর কোনো সন্তানের সম্ভাবনা না দেখে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছেন। এরপরেই ভৈরবীর আশ্রয়স্থল হয়েছে বারাণসী। সে আর কখনোই ফিরে আসেনি, ভৈরবীর মতন হিন্দু স্ত্রীদের এরম পরিণতি হতে দেখা যায় বারেবারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বামীকে ঘিরেই হিন্দুরমণীর স্বপ্ন তৈরি হয়; আবার স্বামীর অবর্তমানে নারীর স্থান হয় সমাজের বাইরে। এই সামাজিকতা আলোচিত গল্পে ফুটে উঠেছে। আবার ভৈরবী তাঁর স্বামীর জীবনে অন্য কোনো নারীকে মেনে নিতে পারেনি। গল্পের অন্তিম পর্যায়ে ভৈরবীর সংলাপেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

> "একদিন আমি যাঁহার হৃদয়ের রাজরাজেশ্বরী ছিলাম, আজি যে তাঁহার হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনীমাত্র হইয়া রহিব, এ জীবনে তাহা কখনই পারিব না।"[২৫]

লেখিকা অসাধারণ পারদর্শিতায় কাহিনি ও চরিত্রের নিপুণ বয়নে আলোচিত বক্তব্যটিকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। আধুনিক যুগে এসে নারী এই ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। গল্পের সূচনা অংশটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। গল্পটি শুরু হয়েছে-'হিন্দুর পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে দশাশ্বমেধের ঘাটে প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম'[২৬] এই বক্তব্যে। আমরা পুরোপুরিভাবে গল্পের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। গল্পের সূচনা অংশের এই বিশেষ রীতি গল্পটির স্বাভাবিক আকর্ষণবোধকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

মানকুমারীর আর একটি গল্প 'পত্নী', ১৩১৯ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২৭] এই গল্পটির বিষয় কতকটা আলাদা। গল্পটির শুরুর অংশ বেশ চমকপ্রদ। 'নবাগত রাজিব, অনাদি চরণের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল'[২৮] অংশটির মধ্য দিয়ে গল্পটি যেন হঠাৎ করে শুরু হয়েছে। ছোটোগল্পের সূচনায় একে বলে 'চমকিত সূচনা'।[২৯] পাঠক কিছু বৃত্তান্ত না জেনেই গল্পের শুরুতেই দুটি চরিত্রের সম্মুখীন হয়েছেন। কাহিনির কিয়ৎ অগ্রগমনে আমরা রাজীবের কান্নার কারণ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। রাজীবের মনে উপন্যাসের নায়িকারা পেখম মেলে বসে আছে কিন্তু রাজীবের বিয়ে হয়েছে এক মৃদুস্বভাবা হাবাগোবা মেয়ের সঙ্গে। এমন মেয়েকে বিয়ে করে তাঁর জীবন নষ্ট হয়েছে, এই দুঃখেই রাজীবের বিষণ্ণপ্রায় অবস্থা। রাজীবের অতি স্নেহের বন্ধু কমলাকান্ত। রাজীব একমাত্র তাঁকেই ভরসা করে এবং কমলাকান্তই তাঁর একামাত্র আশ্রয়স্থল। গল্পে কমলাকান্তকেও রাজীবের বন্ধুত্বের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। এই নিষ্ঠার কারণেই রাজীব কমলাকান্তের প্রতি অধিক পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। অথচ আলোচ্য গল্প অনুযায়ী আমরা জানতে পারি রাজীবের মনোমত স্ত্রী না হওয়াতে কমলাকান্ত বেশ খুশি হয়েছে। হয়ত রাজীবের উপর কমলাকান্তের অধিকার এতটাই তীব্র ছিল যে বিবাহের পরে সেই অধিকার খর্ব হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু মনোমত স্ত্রী না হওয়াতে রাজীব কমলাকান্তের প্রতি আরও বেশি নির্ভর হয়ে পড়েছে। কমলাকান্তের খুশির কারণ হয়ত তাই, না হলে এমন বন্ধুর দুঃখে খুশি হওয়ার কথা নয়। গল্পের এই মনস্তত্ত্ব বাস্তব ও আধুনিক। সম্পর্কের ভাঙাগড়ার এই মনস্তত্ত্ব গল্পকার আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। আধুনিক জীবন জটিলতায় সম্পর্কের এহেন 'ইগো' আজকের সমাজেও উপলব্ধি করা যায়। চরিত্রদুটির

আধুনিকীকরণ নিয়ে কোনো সমালোচনা চলে না। কাহিনির এমতাবস্থায় রাজীবের পিতা মারা যান এবং সংসারের ভার ও বিরাট ঋণের বোঝা রাজীবের স্কন্ধে বর্তায়। রাজীব কলকাতার পাঠ চুকিয়ে বন্ধু কমলাকান্তের আশ্বাস নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে। রাজীবের চলে আসার পর কমলাকান্তেরও পড়াশোনায় বিচ্ছেদ ঘটেছে। তাঁর মাতা নগদ চারি হাজার টাকার বিনিময়ে এক পরমা সুন্দরী কন্যার সঙ্গে কমলাকান্তের বিবাহ দিয়েছে এবং কমলাকান্ত সেই নগদ টাকায় পুস্তকের ব্যবসা করে বেশ অর্থোপার্জন করেছে। অল্পদিনেই তাঁর নিজের বাড়ী হয়েছে এবং সে বড়লোক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। অপরদিকে হতভাগ্য রাজীব সংসারের ভারে গ্রামের স্কুলে হেডমাস্টারের চাকরি নিয়েছে, কিন্তু তাতে সংসার সংকুলান হলেও ঋণের দায় মেটানো সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে কমলাকান্তের সঙ্গে রাজীবের বন্ধুত্ব শিথিল হয়েছে, কিন্তু রাজীব তাঁর বন্ধুর উন্নতির খবর পেয়ে আনন্দ পেয়েছে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর রাজীব ঋণের পাওনা মেটানোর জন্য বন্ধুত্বের অধিকার নিয়ে কমলাকান্তের শরণাপন্ন হয়েছে। রাজীবের সমস্ত অবস্থা শুনে কমলাকান্ত আজ আর সহানুভূতি বা স্নেহবশে বন্ধুর দুঃখে সামিল হয়নি। বরং অত্যন্ত কটূ ভাষায় সে রাজীবকে তিরস্কার করেছে। বন্ধুর এই তিরস্কারের কথা রাজীব তাঁর মাকে বলেছে এবং সেই ফাঁকেই তাঁর গ্রাম্য, অশিক্ষিতা বধূ শ্যামা ঘুমের ঘোরে সবটা শুনে ফেলে। রাজীব যখন বন্ধুর অপমানে বিমর্ষ তখন তাঁর স্ত্রী শ্যামা আপন যৌতুকের সত্তর হাজার টাকা এবং দুটি অলংকার স্বামীর হাতে দিয়ে রাজীবের সমস্যার সমাধান করেছে। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজীবের সফলতা আসে। এখন তাঁর প্রচুর টাকা এবং গোলা ভর্তি ধান হয়েছে। এই সমস্ত কিছুই হয়েছে তাঁর বালিকা, অশিক্ষিতা স্ত্রীর কারণে। গল্পটি শেষ হয়েছে লেখিকার দেওয়া একটি তথ্যের মধ্য দিয়ে।

> "আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, এখন রাজীব বন্ধু কমলাকান্তের অনেক উপরে তাহার পত্নীর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।"[৩০]

সম্পর্কের এক জটিল তত্ত্ব আলোচ্য গল্পটি থেকে উঠে এসেছে। আমাদের আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসায় গল্পটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গল্পে প্রত্যেকটা চরিত্রের মধ্যেই স্বতন্ত্রতা আছে। প্লট গঠনেও লেখিকার কোনো ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। গল্পটির বিষয় নির্বাচনেও আধুনিকতা ও অভিনবত্ব লক্ষণীয়।

রমণী জীবনের অদৃষ্টের পরিহাস ও তার অসহায়তা ফুটে উঠেছে 'অদৃষ্ট-লিপি' গল্পে। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র, কার্তিক ও অঘ্রাণ সংখ্যা জুড়ে উক্ত গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল।[৩১] ভুবনেশ্বরী কলকাতার নাম করা ব্যক্তি রমাকান্তের ভার্যা। অর্থে যশে রমাকান্ত কলকাতার সমভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। এখন কাহিনির পরম্পরাক্রমে এবং সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্রটি পালটে গেছে। ঘটনাচক্রে পরম ঐশ্বর্যে থাকা ভুবনেশ্বরী সন্তান সুধীরের জীবন ধারণের তাগিদে আজ বিষ্ণুপুরের জমিদার ইন্দুভূষণ বসুর গৃহে পাচিকা বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। ইন্দু বাবুর স্ত্রী করুণাময়ী দেবী অবশ্য তাঁকে বোনের মতো করে গ্রহণ করে যথাযথ সম্মান দিয়েছেন। ভাগ্যের পরিহাসে মনুষ্য জীবনের ট্রাজেডি এবং সমকালীন সমাজে পারস্পরিক সহনশীলতার চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে। বিংশ শতাব্দীতে গৃহ জীবনের এই চিত্রটা পালটে গেছে। সমকালীন সমাজে অসহায় অবস্থাতে মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধ বজায় থাকতে দেখা যায়। আত্মঅহমিকার কারণে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার রীতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায় না। এটাই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। 'শোভা'[৩২] গল্পের বিষয়ও বেশ আকর্ষণীয়। গল্পের কাহিনি দুটি পরিবারকে নিয়ে। শচীন্দ্র বাবুর একমাত্র বোন শোভা বাল্যকাল থেকেই নিখোঁজ। গল্পটি অবশ্য শুরু হয়েছে তাঁর সন্ধান প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। শোভা এখন কালিকাপুরের জমিদার আশুতোষ রায় বাহাদুরের গৃহে আশ্রিতা। পত্রযোগে শচীন্দ্র বাবু তা জানতে পেরে একমাত্র বোনের সন্ধানে গেছেন। বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে গল্পকার পূর্ব কাহিনি বর্ণনা করেছেন। শোভা তাঁর বিমাতার অত্যাচারের কারণে গৃহ ছাড়তে বাধ্য হয় তারপর থেকে সে এই কালিকাপুরে আশ্রয় পেয়েছে। শোভা জমিদার পরিবারে তাঁদের আপন সন্তানের ন্যায় পালিত হয়েছে। জমিদারের মাতার একান্ত ইচ্ছায় এবং শচীন্দ্র বাবুর অনুমতিক্রমে আশুতোষ বাবুর সঙ্গে শোভার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। নিছক কাহিনির আকর্ষণ ছাড়া গল্পে আর বিশেষ কিছু ফুটে ওঠেনি। মানকুমারী বসুর রচিত 'রাজলক্ষ্মী'[৩৩] গল্পটির সঙ্গে এর বেশ মিল লক্ষ করা যায়। গল্পের নায়িকা প্রফুল্লকে ভালোবাসে পূর্ণচন্দ্র, কিন্তু কাহিনির অগ্রগমনের ফলে দেখা যায় প্রফুল্লের শারীরিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণচন্দ্রের ভালোবাসারও পরিণতি ঘটেছে। ঘটনাক্রমে ভূপতিনাথ প্রফুল্লকে বিবাহ

করতে সম্মত হয়েছে। গল্পটির মধ্যেও কোনো উচ্চ ভাব নেই, কাহিনিও খুব একটা জমেনি। তবু নারী জীবনের কিছু ভাবনা এখানে উঠে এসেছে। সায়ন্তন মজুমদার এই গল্পের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-

> "গল্পটিতে 'নারীর কলমে নারীর কথা' দারুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। ...সেই সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থানটিও তিনি ভালোভাবে তুলে ধরেছেন।
>
> "তবে শুধুমাত্র নারীর কলমে নারীর কথাই নয়, নারীর অন্তরলোকের কথাও মানকুমারীর সুদক্ষ লেখনী দ্বারা সুচারুরূপে বর্ণিত হয়েছে।"[৩৪]

নারী জীবনের অন্তরলোকের কথা আধুনিক কালেই এসে শুরু হয়েছে। তাই তা প্রকাশের মানকুমারী বসুর গল্পও আধুনিকের পরিচয়বাহী। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মহিলা কবির পক্ষে এই আধুনিক ভাবনার আলোকে জীবনকে দেখা বা বিচার করার প্রয়াস অবশ্যই কীর্তিত্বের কথা। মানকুমারী বসুর যে গল্প আধুনিতার সবচেয়ে কাছাকাছি তা হল 'অদৃষ্ট-চক্র'[৩৫]। এই গল্পে আমরা আত্মহত্যার কথা পাই। এর আগে 'ভ্রমর'[৩৬] কবিতায় ভ্রমরের উদ্দেশ্যে লেখিকাকে আত্মহত্যার পরামর্শ দিতে দেখা যায়। কিন্তু চরিত্রের আত্মদ্বন্দ্ব থেকে তা উঠে আসেনি। এখানে চরিত্র নিজে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যক্তির আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত অবশ্যই আধুনিক কারণ আত্মহত্যা করার আগে আপন সত্তার উপলব্ধি জরুরি। আর এই আপন সত্তাকে চিনে নেবার প্রয়াসটাই আধুনিক কালে দেখা যায়। গল্পের নায়িকা সুকুমারী আপন স্বাতন্ত্রে পরিচিতি পেয়েছে। সেটাই তাঁর জীবনের মূল বাণী স্বরূপ, সেটা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁর জীবন ভাবনায় এসেছে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা। শুধুমাত্র তাই নয় সুকুমারীর সংলাপে লেখিকা গল্পের নায়ক যতীশের রূপের বর্ণনা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে সায়ন্তন মজুমদার জানিয়েছেন-

> "সুকুমারীর মুখে যতীশের রূপবর্ণনা যেভাবে লেখিকার কলমনিঃসৃত হয়েছে, পুরুষের প্রতি নারীর রূপমুগ্ধতা নারীর কলমে অন্যত্র উঠে এসেছে কিনা সন্দেহ।"[২৭]

গল্পটি ১৮৯৬ সালের দিকে লেখা হয়। সেই সময়পর্বে দাঁড়িয়ে নারীর এই পরিচয় বাংলা সাহিত্যে বিরল। নায়িকা সুকুমারীর সঙ্গে যতীশের বিবাহে বাধা তৈরি হলে সকুমারী তা মেনে না নিয়ে যথারীতি তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়পর্বে দাঁড়িয়ে একথা ভাবাই যায় না। গল্পের অন্তিম অংশের ঘটনাও প্রচলিত ধ্যান-ধারনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এক মিশাল বলা যেতে পারে। শ্রীশবাবুর সঙ্গে সুকুমারীর বিবাহ আঁটকে শ্রীশবাবু ও সুকুমারীর পিতাকে বুঝিয়ে যতীশ নিজের ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। উভয়ের বিবাহের মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। সমকালীন সময়ে মেয়ের পিতাকে প্রেমে রাজি করানো একপ্রকার সামাজিক জয় বলা যেতে পারে। গল্পটি প্রসঙ্গে সায়ন্তন মজুমদার আরও একটি নতুন কথা জানিয়েছেন-

> "গল্পটিতে বিবাহে জাতপাত বিচারের 'জাতের নামে বজ্জাতি' ঘটনাটিও বেশ রয়েছে।"[৩৮]

একাধিক আধুনিক বিষয় ও অভিনবত্বের অবতারণায় গল্পটি বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একাধিক ছোটো ছোটো ভাবনা গল্পটির মধ্যে উঠে এসেছে। আর এই সমস্ত কিছুর জন্য গল্পটির পরিধিও বেড়েছে। তাই আলোচ্য গল্পটিকে আমরা মানকুমারী বসুর সবথেকে উল্লেখযোগ্য গল্প হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

মানকুমারী বসুর লেখা ছোটোগল্পগুলি প্রধানত নায়িকাপ্রধান। তাঁর 'ভৈরবী', 'পত্নী', 'অদৃষ্ট-লিপি', 'শোভা', 'রাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি প্রত্যেকটি গল্পেই মানকুমারী বসু নারীর একাধিক মননকে দেখাতে চেয়েছেন। নারী চরিত্র সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে অর্থাৎ নারীর স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পের প্লট রচনায় দেখা যায় গল্পের সূচনা অংশটি চমকপ্রদ কোনো ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এটা ছোটোগল্পকারের সংযত ভাবনার পরিচয় বলা যায়। কোনোরকম অতিরিক্ত বিষয় বা কাহিনি গল্পগুলির স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধকে নষ্ট করতে পারেনি। তাঁর ছোটোগল্পের সংলাপ সরল ও স্বাভাবিক। চরিত্রের ভাবনা অনুযায়ী সংলাপ মার্জিত ও রুচিশীল। উপন্যাসের মতো গল্পগুলিতে নীতিকথা শোনানোর তাগিদ লক্ষ করা যায় না। তাই গল্পগুলি খুবই সরস ও প্রাণোজ্জ্বল। প্রত্যেকটি গল্পের বিষয় নির্বাচনে মানকুমারী বসুর

ভাবনার যে অভিনবত্ব রয়েছে, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। মানকুমারী বসুর ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে অজ্ঞাত প্রায় হয়ে আছে। সেই সময়য়কালে দাঁড়িয়ে ছোটোগল্প রচনায় মানকুমারী বসুর একটা নিজস্বতা তৈরি হয়েছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক ছোটোগল্প রচনা করে মানকুমারী বসু কিছুটা স্বাতন্ত্রের অধিকারী তো বটেই, আর এটা তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বও বটে।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য-

১. ‘রাজলক্ষ্মী’ ও ‘শোভা’ গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

২. কুন্তলীন হল এক স্বদেশি তেল। হেমেন্দ্রমোহন বসু তাঁর তৈরি দ্রব্যের প্রচারের জন্য ১৩০৩ বঙ্গাব্দ থেকে বাংলা গল্পে বিশেষ পুরস্কার হিসেবে কুন্তলীন পুরস্কার চালু করেন। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন,’বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, পঞ্চম খন্ড, আনন্দ প্রকাশনী, সপ্তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৪৬।

৩. দ্রষ্টব্য: ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, পৃ. ১৪৩-১৫০।

৪. দ্রষ্টব্য: ‘বনবাসিনী’ ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকা, সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.) পরিশিষ্ট অংশ, পৃ.-২০৬।

৫. দ্রষ্টব্য:মানকুমারী বসু ‘বনবাসিনী’ ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকা, সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯/২০১২ পৃ. ২০৫।

৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২০৫।

৭. দ্রষ্টব্য: ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য সংখ্যা, পৃ.-২০-২৪, ৪৪-৪৯।

৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু ‘গৃহলক্ষ্মী’, ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, ১২৯৯ বৈশাখ সংখ্যা, পৃ. ২৩।

৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ২৪।

১০. দ্রষ্টব্য:প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৮-৪৯।

১১. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৪৯।

১২. দ্রষ্টব্য: ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা, পৃ.-১০৮-১১১, ১৩৩-১৩৭, ১৬৫-১৭২।

১৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু ‘মহামুহূর্ত্ত’, ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, ১২৯৯ শ্রাবণ সংখ্যা, পৃ. ১০৮।

১৪. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু ‘গৃহলক্ষ্মী’, ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, ১২৯৯ আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ১৭০-১৭১।

১৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৬৭।

১৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১৭২।

১৭. দ্রষ্টব্য: 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ৯৬-৯৯, ১২৭-১৩২, ১৭০-১৭২, ২২৫-২২৭।

১৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু 'শৈশব-সঙ্গিনী', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩০৪ আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ১৭২।

১৯. দ্রষ্টব্য: 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, মাঘ, পৃ.- ৩৭৭-৩৮৪।

২০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু 'বিমাতা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩০৪ মাঘ সংখ্যা, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।

২১. দ্রষ্টব্য: রবিশংকর বল, 'মৃত্যু ও ময়ূর', 'দশটি গল্প', পরশপাথর প্রকাশন, পৌষ ১৪১৮, পৃ. ১৫-২২।

২২. দ্রষ্টব্য: 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা, পৃ.- ২৪৬-২৪৯, ২৭৯-২৮১, ৩০৩-৩০৪।

২৩. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু 'দিদিমার রূপকথা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, পৃ. ২৪৬।

২৪. দ্রষ্টব্য: 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা, পৃ- ১১-১৪, ৮২-৮৬।

২৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভৈরবী', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১৮ শ্রাবণ সংখ্যা, পৃ. ৮৬।

২৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভৈরবী', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১৮ আষাঢ় সংখ্যা, পৃ. ১১।

২৭. দ্রষ্টব্য: 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১৯ শ্রাবণ সংখ্যা, পৃ. ১১২।

২৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু 'পত্নী', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১৯ শ্রাবণ সংখ্যা, পৃ. ১১২।

২৯. দ্রষ্টব্য: হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য প্রকরণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রথযাত্রা ১৪১৬, পৃ. ২৬৪।

৩০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু 'পত্নী', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১৯ শ্রাবণ সংখ্যা, পৃ. ১১৮।

৩১. দ্রষ্টব্য: 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, পৃ.- ১৭৪-১৭৬, ২৫২-২৫৩, ২৮২-২৮৪।

৩২. গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কারে সন্মানিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু 'শোভা', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯/২০১২ পৃ. ২১৯।

৩৩. দ্রষ্টব্য: সায়ন্তন মজুমদার 'ছোটোগল্পকার মানকুমারি বসু', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯/২০১২ পৃ. ৫৬।

৩৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৫৭।

৩৫. গল্পটি ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায় না। আমরা লেখিকার ছোটোগল্পের সমালোচনা অংশ থেকে গল্পটি উদ্ধার করেছি। দ্রষ্টব্য: সায়ন্তন মজুমদার 'ছোটোগল্পকার মানকুমারি বসু', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯/২০১২ পৃ. ৫৮-৫৯।

৩৬. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভ্রমর', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য,স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, একাদশ সংস্করণ আশ্বিন ১৩৪১, পৃ. ২৫।

৩৭. দ্রষ্টব্য: সায়ন্তন মজুমদার 'ছোটোগল্পকার মানকুমারি বসু', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯/২০১২ পৃ. ৫৯।

৩৮. দ্রষ্টব্য: সায়ন্তন মজুমদার 'ছোটোগল্পকার মানকুমারি বসু', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯/২০১২ পৃ. ৫৯-৬০।

-----0-----

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমকালীনতা ও মানকুমারী বসু: প্রতিভার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমকালীনতা ও মানকুমারী বসু: প্রতিভার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ

মানকুমারী বসুর প্রথম রচনা 'প্রিয় প্রসঙ্গ' র প্রকাশকাল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। এরপর থেকে ধারাবাহিক ক্রমে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। মানকুমারী বসুর সমসাময়িক সময়ে আরও অনেক মহিলা কবি সাহিত্যচর্চা করেছেন। প্রসঙ্গতউল্লেখ্য এই সময়ে কিছু অপ্রধান পুরুষ কবিদেরও লক্ষ করা যায়। এনারা সকলেই মূলত গীতিকবিতা রচনা করেছেন। এছাড়া মহাকাব্য রচনার কথাও জানা যায়। তবে মূলত গীতিকবিতা ও ক্ষুদ্রকাব্য এবং একটু বড় কাহিনি সম্বলিত কবিতা বা খণ্ড্যকাব্য রচনার প্রবণতাই অধিক লক্ষ করা যায়।[১] মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের সময় পেরিয়ে গীতিকবিতাই এই সময়কে প্রভাবিত করেছে। সুকুমার সেন জানিয়েছেন-

> " আলোচ্য সময়ে কবিতা-রচনা চলিয়াছিল ত্রিধারায়-(১) মধুসূদনের অনুকরণে ও অনুসরণে মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যে, (২) ঈশ্বর গুপ্তের অনুসরণে ব্যঙ্গ কবিতায়, এবং (৩) নূতন উদ্ভাবিত গীতিকাব্যে।"[২]

এখানে মূলত তিন নাম্বার ধারাটি মানকুমারী বসু বা সমসাময়িক মহিলা কবিদের প্রভাবিত করেছে। তবে তাঁরা খণ্ডকাব্যও চর্চা করেছেন। এই সময়কালে গীতিকবিতা রচনায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব অনুভব করা যায়, যদিও সেই প্রভাব মহিলা কবিদের থেকে সমকালীন পুরুষ কবিদের মধ্যে অধিক লক্ষ করা যায়। বলাইবাহুল্য মানকুমারী বসু বা সমসাময়িক মহিলা কবিরা পূর্ববর্তী কোনো কবিকে অনুসরণ করলেও তাঁরা নিজেদের একটা স্বতন্ত্র ঘরানা গড়ে তুলতে পেরেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই মহিলা কবিদের কবিতার বিশেষত্ব ও ভাব সমসাময়িক অন্যান্য পুরুষ কবি বা সমকালীন সাহিত্যের ভাবের থেকে আলাদা। এই কারণেই তাঁরা বিশেষিত হন 'মহিলা' কবি হিসেবে। আমাদের প্রচলিত ধারণা তাঁদের সাহিত্যের গুণগত মানের কারণে তাঁরা 'মহিলা কবি' হিসেবে বিশেষিত হন। কিন্তু আমরা বলব

সাগিত্যগুণে উচ্চপ্রশংসিত না হলেও তাঁদের রচনার ভাব কিছুটা স্বতন্ত্র এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জীবন ও জগৎ এর বৃহৎ প্রেক্ষাপট সাহিত্যে প্রভাব ফেলে। কিন্তু এই সময়ের মহিলাদের জীবন, শিক্ষা, তাঁর বেঁচে থাকার পরিধি সব কিছুই ছিল সীমাবদ্ধ। স্বভাবতই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, কল্পনাশক্তি, চিন্তা-ভাবনার সীমিত ক্ষেত্র দিয়েই তাঁদের সাহিত্য তৈরি হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সময়কালে অবশ্য আলাদা করে মহিলা কবি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা যায় না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়কালে একঝাঁক আধুনিক মহিলা কবির আবির্ভাব আমাদের বিস্মিত করেছে। আর 'মহিলা কবি' হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্যে তাঁর পরিচয়ের পরিসর সংকীর্ণ হয় না। আমাদের মনে হয় এই নামে তাঁদের বিশেষভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাঁদের আবির্ভাবকে ও সাহিত্যচর্চাকে বিশেষভাবে মর্যাদা দান করা হয়েছে। সমালোচকরা বলেছেন এই সময়ে মহিলাদের লেখার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতা রয়েছে। সামাজিক প্রতিকূলতা ছাড়াও ছিল মানসিক ও শিক্ষার প্রতিকূলতা। গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী বলেছেন-

> " 'পাঠক মহোদয়গণ! অদ্যাপি আমাদিগের ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গকামিনী আমরা কেহই বিদ্যাতে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই যে সামান্য রচনা করিয়া আপনাদের সমীপবর্তিনী হই।'"[৩]

তাঁরা শিক্ষায় যেমন পিছিয়ে রয়েছেন তেমনি মানসিক ভাবেও অনেকটা পিছিয়ে আছেন। অলোক রায় বলেছেন-'...উনিশ শতকে, এমনকি বিশ শতকের সূচনায় বঙ্গনারীর সামাজিক অবস্থান সাহিত্যচর্চার অনুকূল ছিল না।'[৪] এই সকল কিছু অতিক্রম করে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যে একটা বিশেষ ভাবধারা গড়ে তুলতে পেরেছেন। আর সেই পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও প্রয়াসকে বিশেষিত করতে এবং সময়কে গুরুত্ব দিয়ে চিহ্নিত করতে আমরা তাঁদের 'মহিলা কবি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে আগ্রহী।

মানকুমারী বসুর (১৮৬৩-১৯৪৩) সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কামিনী রায়(১৮৬৪-১৯৩৩)। প্রত্যেকের জন্মসাল দেখলেই বোঝা যায় মানকুমারী বসুর কিছুসময় আগেপরেই তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

আমরা মানকুমারী বসুর সমকালীন এই সকল মহিলা কবিদের প্রতিভার অনুসন্ধান করে মানকুমারী বসুর সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যরচনায় সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করবো। সমালোচকগণ মানকুমারী বসু এবং উপরে উল্লিখিত এই সময়ের মহিলা কবিদের কাব্যপ্রতিভার সমালোচনা প্রসঙ্গে সাধারণ কিছু ভাবের উল্লেখ করেছেন যেমন স্নেহ, শোক বা বিষাদ, পতীপ্রেম, ঈশ্বরচেতনা ও প্রকৃতিপ্রেম প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-

> "গত শতকের মহিলা রচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইয়াছে
> কোনো শোকবিধুর সান্ধ্য উপত্যকা হইতে।"[৫]

এই বক্তব্যের সত্যতা থাকলেও এই সময়ের সকল মহিলা কবিদের সম্পর্কে সাধারণ কোনো ধারণা করে নেওয়া ঠিক হবে না। কিছু ক্ষেত্রে হয়ত তাঁদের কবিতায় একই ভাবের প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু তারপরেও এই সময়ের প্রত্যেক মহিলা কবির কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। ঠাকুর পরিবারে জন্ম নেওয়ার সুবাদে স্বর্ণকুমারী দেবী পারিবারিক শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করেছেন। এছাড়াও আমরা জানি ঠাকুর পরিবারে সাহিত্যচর্চা ও একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ রয়েছে। এই সময়ের মহিলা কবিদের কাব্যপ্রতিভার পিছনে তাঁদের শিক্ষা অনেকখানি ভূমিকা রয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই প্রাপ্য শিক্ষার ধরণ অনুযায়ী তাঁদের কাব্যের ভাব গড়ে উঠেছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহ হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে। এছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবী দীর্ঘদিন ধরে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এগুলি তাঁর সাহিত্যরচনার প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিপুল সাহিত্যভাণ্ডারে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তার মধ্যে তিনি আবার গান রচনা করেছেন। তাঁর অন্যতম প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা ও গান'এ (১৮৯৫) সংগীতের সংখ্যাই অধিক। আর কবিতাগুলিতে কবির বিভিন্ন ভাবনা ধরা পড়েছে। তার মধ্যে প্রকৃতিচেতনা, বাৎসল্য রস, পুরাণ প্রসঙ্গ, আক্ষেপ, বঙ্গ রমণীর মহত্ত্ব প্রভৃতি একাধিক ভাব তাঁর কবিতাকে প্রাণস্পর্শী করে তুলেছে। কিন্তু এসবের মধ্যে প্রকৃতির রোম্যান্টিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতির

রহস্য তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর। তাঁর ভাবনার বৈচিত্র্যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ একাধিক কবিতার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। এই ধরণের কবিতার মধ্যে 'অপরাহ্ণে', 'সন্ধ্যা', 'সন্ধ্যার স্মৃতি', 'বাল্যসখী', 'বর্ষায়', 'শারদ-জ্যোৎস্নায়', 'বসন্ত জ্যোৎস্নায়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলিতে প্রকৃতির নির্দিষ্ট রূপের বস্তুগত বর্ণনা কবি দেননি, কবির অনুভূতির দ্বারা প্রকৃতির সৌন্দর্য উঠে এসেছে। যেমন 'অপরাহ্ণে' কবিতায় কবি কল্পনার দ্বারা প্রকৃতির সৌন্দর্য রচনা করেছেন-

"এ কি অপরূপ ঘটা!
পূরবে চাঁদের আলো পশ্চিমে অরুণচ্ছটা;
রঙের তুফান ওঠে,
পদ্মা, কুলু কুলু ছোটে,
বিকালে উষার লালে রঞ্জিত বটের জটা।"[৬]

স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতায় অনুভূতির গভীরতাই মূল কথা। প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভবে স্বর্ণকুমারী দেবীর জুড়ি মেলা ভার। প্রত্যেকটি কবিতায় তাঁর অনুভূতির প্রগাঢ়তায় পাঠক ভেসে যায়। 'জ্যোৎস্নায় নদীকূলে' কবিতায় কবির বর্ণনা সেকথার প্রমাণ দেয়-

"শাদা মেঘ ভেসে যায়, চাঁদখানি হেসে চায়,
ঢল ঢল মধুর স্বপনে!
সমুখে তটিনী বয়, উপকূল বালুময়,
চারিদিকে রজত-তুফান;
"বনান্তে বিরহী পাখি কুহু কুহু উঠে ডাকি,
স্তব্ধ নিশা সংগীত আকুল;"[৭]

পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে যে কবিতাগুলিতে, সেখানেও কোনো বিষয় বর্ণনা নেই, শুধু পুরাণের বিষয় বা ভাবকে আত্মস্থ করে কবির মনের কল্পনার প্রকাশ ঘটেছে। ' "চুপ চুপ" ' কবিতায় কচের প্রতি দেবযানীর আকুতিকে কবি ভাষা দিয়েছেন এইভাবে-

"প্রভু হে, নীরব যদি করিলে রসনা,
এক ভিক্ষা মাগি, নাথ পূর্ণ কর তাহা—

দাও বর, অভিশাপ, দাও আজ্ঞা দাও,
এ হৃদয় রসনাও স্তব্ধ হয়ে যাক;”[৮]

কবি তাঁর অনুভবে দেবযানীকে আপন করে নিতে পেরেছেন। আর একটি ভিন্ন ধরণের কবিতায় তাঁর অনুভূতির গভীরতা উল্লেখযোগ্য।

“সখি, নব শ্রাবণ মাস!
জলদ-ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ!
ঝিমিক ঝম্ ঝম্, নিনাদ মনোরম,
মূহুর্মূহু দামিনী-আভাস!”[৯]

ভাবের গভীরতায় তাঁর কবিতাগুলি কাব্যসৌন্দর্য লাভ করেছে। তাঁর কোনো কবিতাতেই বিষয়ের ভার নেই, আছে ভাবের গভীরতা। স্বর্ণকুমারী দেবী বিভিন্ন ধরনের কবিতা লিখেছেন, কিন্তু কোনো ধরনেই বিষয় প্রাধান্য পায়নি। ভাবের উচ্চতায় কোনো কোনো কবিতা পাঠকের কাছে সম্পদ হয়ে থাকবে। ‘কি দোষ তোমার’ কবিতায় অর্জুনের প্রতি জলকুমারী উলুনির বাণী শিল্পগুণে মহীয়ান হয়ে উঠেছে শুধু কবির কল্পনা গুণে-

“চরণ সরায়ে নিয়ে তুলিতে একটি
প্রফুল্ল পাপড়ি শত মুহূর্তে দলিত
ভালোবেসে লও যারে হৃদয়ে তুলিয়া
সরমে মরমে ঢাকি সভয়ে সংকোচে
সেও চাহে খসিবারে শতধা হইয়া,
প্রতিক্ষণে অনুভবি হীনতা আপন।
এইরূপ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে যারা,
তুমি কি করিবে দেব করুণা করিয়া!”[১০]

এখানে কবির বক্তব্য অসাধারণ, পাঠকের মন এক অন্য ভাললাগায় ভরে উঠেছে। আরও বলা যায় রোম্যান্টিক দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ তাঁর কাব্যের একাধিক

কবিতার মূল প্রেরণা হয়ে থেকেছে এবং সেগুলি শিল্পগুণে যথাযথ মর্যাদাও লাভ করেছে। তাঁর 'গাথা' বলে একটি খণ্ডকাব্য বা আখ্যানকাব্য পাওয়া যায় ১৮৮০ সালে প্রকাশিত। সেখানে মূলত কাহিনিমূলক কিছু দীর্ঘ কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন-'প্রত্যেকটি কাহিনি বিয়োগান্ত।'[১১] স্বামীকে স্বরণ করে দুঃখ ও প্রেম এখানে স্থান পেয়েছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর অনুকরণ রয়েছে বলে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে করেন। কবিতার কিছুটা অংশ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা হল-

"কে ও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা,
সুধার সুরেতে ছাড়িছে তান,
আকাশ পাতাল, মোহিয়া কে ওই,
আপনার মনে গাহিছে গান?"[১২]

কবিতার উপস্থাপনে বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব যে রয়েছে তা উপরিউক্ত পঙক্তিগুলি থেকেই বোঝা যায়। আসলে স্বর্ণকুমারী দেবী রোম্যান্টিক কবি ছিলেন, তাই স্বভাবতই তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্বামীর প্রতি স্মরণ করে লিখেছেন-

"না, না, নাথ, সুখে থেক,
মনে রাখ নাই রাখ
তোমারই স্মরণে জেনো রাখিনু জীবন,
তোমারি তোমারি ধ্যানে রব অনুক্ষণ।"[১৩]

প্রিয়জনের শোকে কবিতা রচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তবে অবশ্যই তার প্রকাশে ভিন্নতা রয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্যে সৌন্দর্য ভাবনা গভীর অনুভূতি নিয়ে ধরা দিয়েছে, অন্য ভাবনা সেখানে কিছুটা ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। তাঁর শোকের ভাবনা অতটা গভীর নয়, শোকমূলক কবিতাগুলি কবির স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসার প্রকাশ।

প্রসন্নময়ী দেবীও এই সময়কালেই আবির্ভূত হয়েছেন। প্রসন্নময়ী দেবী পারিবারিক শিক্ষা লাভ পেয়েছেন বলে জানা যায় এবং তাঁর পরিবারে সকল মেয়েদের মধ্যেই শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। তাঁর দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়েছে, কিন্তু সংসার জীবন তাঁকে বেশিদিন করতে হয়নি। বিবাহের দুই বছর পর তাঁর স্বামী উন্মাদ হয়ে গেলে তিনি পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। অল্প বয়সে তাঁর জীবনের এই বিপর্যয় প্রসন্নময়ী দেবীর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। বাঙালি নারীর বাল্যবিবাহ, বৈধব্যদশা, এছাড়াও সামাজিক অনাচারের ফলে যে দুরাবস্থা, সেই কষ্ট তিনি তাঁর নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থ হল- 'বনলতা'(১৮৮০), 'নীহারিকা (১ম ও ২য় ভাগ, ১৮৮৪, ১৮৯৬)। এছাড়াও অল্প বয়সে রচিত তাঁর 'আধ-আধ-ভাষিণী' (১৮৭০) নামে একটি কবিতাপুস্তক আছে। সেখানে কিছু কবিতায় প্রকৃতির অসাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায়। 'বসন্ত বর্ণন' কবিতাটিতে তাঁর দক্ষ হাতের ছাপ স্পষ্ট-

"প্রকৃতি প্রকৃত বেশ ধরিল এখন।
হেরিয়ে প্রফুল্ল হলো ভাবুকের মন।।
কোকিল আইল দেখ বসন্তের সাথে।
ভূলোক পুলক হলো সুখের আশাতে।।"[১৪]

এছাড়াও তিনি কিছু হাসির কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। কিন্তু এগুলি তাঁর কবিতার গৌণ সুর। শোক বা বেদনা, তৎকালীন সামাজিক অনাচার ও নারীর দুরাবস্থার চিত্র প্রসন্নময়ী দেবীর কবিতার মূল সুর হয়ে উঠেছে। 'নীহারিকা' কাব্যগ্রন্থের দুটি ভাগ জুড়ে বেশিরভাগ কবিতায় কবির মনের বিষাদ ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন-' 'নীহারিকা' প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয় ভাগের কবিতাগুলির মধ্যেই কবির হৃদয় বেদনা প্রকাশিত, একটা বিষাদ-রাগিণীর করুণ সুর প্রবাহিত।'[১৫] সমাজের প্রতিও প্রসন্নময়ী দেবীর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষিত হয়েছে। সামাজিক আচারের চাপে নারী জীবনের দুরাবস্থার কথা জানিয়ে 'জন্মভূমি' কবিতায় তিনি লিখেছেন-

"দুহিতার দুঃখ, না চিন্তিল হায়!

স্নেহ বিসর্জ্জিল দেশাচার পায়,
স্বর্গের কুসুম সঁপিল চাষায়।”[১৬]

সামাজিক অনাচারে কবি ভীত। তাই তার অবসান কামনা করেছেন। তিনি মনে করেছেন ব্রাহ্মধর্মের প্রসার ঘটলে হিন্দুধর্মের সামাজিক অনাচার লুপ্ত হবে। তাই তিনি ‘প্রার্থনা’ কবিতায় লিখেছেন-

“অতিশয় ভয়ানক দেশের আচার।
কতদিনে ব্রাহ্মধর্ম্ম হবে হে প্রচার।।
যত সব ভদ্রলোক একত্রিত হয়ে।
আমোদ আহ্লাদ করে পুত্তলিকা লয়ে।।”[১৭]

এর পাশাপাশি তাঁর কবিতায় রয়েছে একটা বিষাদের সুর। তবে তাঁর কবিতায় অনুভূতির প্রাধান্য কম। বিষাদমূলক কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রাধান্য পেলেও সামাজিক সমস্যা বা নারীর দুরাবস্থার কথা বলতে গিয়ে তাঁর এই কবিতাগুলির অনেক বেশি বক্তব্যপ্রধান হয়ে উঠেছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসুর সমসাময়িক একজন উল্লেখযোগ্য কবি। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বাড়ির বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। ছোটো থেকেই তাঁর শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখা যায়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর পিতা কবিকে ছোটোবেলা থেকেই অনুবাদের মাধ্যমে ইংরাজি সাহিত্যের পাঠ দিয়েছেন। তাঁর কল্পনায় বা চিন্তনে-মননে এর প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী একাধিক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবিতাহার (১৮৭২)। এখানে প্রকৃতির চিত্র ও নারীর জীবন কথন বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী কাব্য ‘ভারতকুসুম’ (১৮৮২), এখানে বিভিন্ন ভাব সম্বলিত একাধিক গীতিকবিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের বিচিত্র অনুভূতি কবিতায় ধরা পড়েছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কবির রোম্যান্টিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ‘মৃত্যু’ কবিতার পঙক্তিগুলি অসাধারণ রোম্যান্টিক।

“আহা! এই সুখ-পূর্ণ অবনী-মণ্ডলে

আমি মৃত্যু না থাকিলে এই ধরাতলে
পাইত কি শান্তি-সুখ হতভাগা নর?
হত কি ধরণী হেন প্রমোদ-আকর?”[১৮]

এছাড়াও প্রাচীন জীবন, সমাজ ও কাহিনি তাঁর একাধিক কবিতায় বর্ণিত বিষয় হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে এই ভাবটি মুখ্য হয়ে রয়েছে। কবি এখানে কিছুটা অতীতচারি হয়েছেন এবং সেই প্রেক্ষাপটেই তাঁর রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। যেমন- ‘সাগর-পারে’, ‘নিশীথে বংশীধ্বনি’, ‘পতি-ভক্তি’, ‘তপোবন’ প্রভৃতি কবিতায় প্রাচীন সমাজ, মূল্যবোধ ও প্রাচীন কাহিনিমূলক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। ‘তপোবন’ কবিতায় কবি অতীতের দিনগুলি স্মরণ করেছেন-

“শাখি-শাখে বসি বিহগ বিজনে
বিভুর মহিমা কীর্তন করে,
তান, লয়, রাগে পূরিয়া কাননে
ললিত-মধুর মধুর স্বরে।”[১৯]

আবার ‘পতি-ভক্তি’ কবিতায় কবি সাবিত্রী, গান্ধারীদের স্মরণ করেছেন। এইসকল কবিতা থেকে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর রোম্যান্টিক মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী তাঁর স্বামীর মৃত্যু শোকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে ‘অশ্রুকণা’ (১৮৮৭) কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন। বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন, ‘একালের কাব্যবৈশিষ্ট্যের একটা সাধারণ সুর ছিল সম্ভবত, বিষাদ।’[২০] একালের সাধারণ সুর হলেও উক্ত ভাবকে কাব্যগুণে উন্নীত করার ব্যাপারে সকলের স্বতন্ত্র ভূমিকা লক্ষ করা যায়। প্রসন্নময়ী দেবীর কাব্যেও বিষাদের সুর আছে, কিন্তু তা কাব্যে খুব ক্ষীণ এবং পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠেনি। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ‘অশ্রুকণা’ কাব্যের প্রত্যকেটি কবিতায় বিষাদের সুর থাকলেও তা তাঁর ব্যক্তিগত শোকে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ‘আবাহন’ কবিতায় কবির শোক ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

“শুনেছি আঁধার গৃহ, হয় ক্রমে দৈত্যালয়।
বিতরি করুণা-প্রেম, কর হে আলোকময়!

এ নিদাঘ-মরু-হৃদে, তুমি সহকার হয়ে
বস; এ পথিক প্রাণ জুড়াক তোমারে পেয়ে!”[২১]

কবির ব্যক্তিগত প্রাপ্তির কথা থাকলেও এখানে বিশ্বলোকের কথা ধ্বনিত হয়েছে। স্বামী প্রসঙ্গে কবি মনের আক্ষেপ কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা সংখ্যায় অল্প। অধিকাংশ কবিতাতেই দুঃখের দর্শন রচিত হয়েছে বা বিভিন্ন ঈঙ্গিতের দ্বারা তিনি একটা করুণ রসের সুর ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘সংসার’ কবিতায় কবি জানিয়েছেন সংসারের সুখ, দুঃখ নতুন নয়। কারো অনুপস্থিতি যেমন দুঃখের, তেমনি তাঁর উপস্থিতিতেও জীবনে বেদনা থাকে। এই কারণে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে কবির বক্তব্য-

“মুছে ফেলে আঁখিজল, ত্যজ শয্যা ধরাতল,
দেখ—দেখ পূর্ব পানে চেয়ে।
সোনার বরণ ঘটা অরুণ কিরণছটা
আসিয়াছে আর্শীবাদ লয়ে!”[২২]

‘মান-ভঞ্জন’ কবিতায় শোক থেকে উত্তীর্ণের ভাবনা আছে।

“এক পাশেতে একাকিনী আপন-মনে বসে আছি,
ছোট ছোট মেয়েগুলি এগিয়ে এল কাছাকাছি।
আধ-আধ বাধ কথায়, ছাই-পাঁশ-ছাই বকে কত!
সাধতা মনে, তাদের সনে, হব মিষ্টালাপে রত!”[২৩]

এছাড়াও অনেক কবিতায় পুরানো অতীতের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সমালোচকরা এই সময়ের মহিলা কবিদের কাব্যে সাধারণ সুর হিসেবে যে বিষাদের কথা বলেছেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকে তার ব্যতিক্রম বলতে হয়। অবশ্য একজন সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেছেন-‘ সাধারণ শোকোচ্ছ্বাস ত এমন অনেক প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়টি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য! গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।’[২৪] পরবর্তীকাব্যগুলিতে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর অনুভূতি আরো গভীর এবং ভাবের প্রতি কবি গভীর সংযমী। ‘আভাষ’ কাব্যগ্রন্থে জগত ও জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন

সত্য কথনকে কবি তুলে এনেছেন। এছাড়াও সৌন্দর্যভাবনা এবং বিশেষক্ষেত্রে কবির ভাব অতীতে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। এই সকল কবিতায় কবির নিবিড় রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। 'মরণ', 'নির্মমতা', 'জানি না' প্রভৃতি কবিতায় জীবনের বাস্তব ভাবনা বা সামান্য সত্য ধরা পড়েছে। 'নির্মমতা' কবিতায় কবির সংলাপ-

"বৈরাগ্যের নামে, কভু নির্মমতা, এসো না নিকটে মোর।
ভালবেসে সুখ, কেন না বাসিব, ছিঁড়িব মমতা-ডোর?

"দিন-রাত বুঝি শুকাব পরান, কেন বা কিসের তরে?
তোমার সান্ত্বনা, তোমার মন্ত্রণা, লয়ে তুমি থাক দূরে।"[২৫]

এখানে কবির ভাবের সংযম লক্ষণীয়। বৈরাগ্যের সঙ্গে নির্মমতার একটা সম্পর্কে রয়েছে এবং কবি সেই নির্মমতাকে প্রশ্রয় দিতে চাননা। তিনি ভালোবাসা, সুখকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। এগুলি সকলের জীবনে স্বাভাবিক সত্য। আবার 'বয়ঃসন্ধি' কবিতায় মেয়েদের বয়সের পরিবর্তনে সঙ্গে ভাবনার যে বদল সেই সামান্য সত্যের পরিচয় উঠে এসেছে। কবির সংলাপ এখানে উদ্ধৃতযোগ্য-

"আজ হতে খেলতে আমি
আর যাব না, বকুল ফুল।
বিপিন বড় মুখের পানে
চেয়ে থাকে ঢুলু-ঢুল্।
কে জানে ভাই লজ্জা করে
খেলতে কেমন লুকোচুরি।
চায় যদি কেউ আমার পানে
সেথায় কেমন রইতে নারী।"[২৬]

স্বল্পদৈর্ঘের এই কবিতাটিতে জীবনের এক অমোঘ সত্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। বিপিন নামী সাধারণ চরিত্রটি কবির প্রকাশগুণে পাঠকের কাছে একটি ব্যক্তির রূপ পেয়েছে, আর

তাতেই কবিতাটির সত্যতা আরও যথাযথ হয়ে উঠেছে। 'মরণ' কবিতায় জীবনের চরম সত্যটিকে কবি সহজ করে তুলেছেন-

"মরণ নামেতে এক প্রিয়তম আছে মোর,
দিবানিশি তার লাগি ঝরিছে নয়ম লোর।

"নিত্য সে ডাকিছে মরে,
তিল-তিল ধীরে-ধীরে কাছে সরে আসিতেছে,
মোর মুখ তার বুকে সতত জাগিয়া আছে।"[২৭]

মৃত্যুই মানুষের সবথেকে আপন, কাছের। মানুষের জন্মের পরে মৃত্যুই একমাত্র, যেটা তাঁকে ছেড়ে যাবে না এবং দিনে দিনে সে ব্যক্তির আরও কাছের হয়ে উঠবে। অমোঘ সত্যকে এমন সরল করে কবিতায় রূপ দেওয়ায় কবিতাটি চিরন্তন রূপ পেয়েছে। 'নিদাঘে', 'গ্রাম্যসন্ধ্যা', 'কোজাগর নিশি', 'ভগ্ন দেবালয়', 'বিস্মৃতা শকুন্তলা' 'বর্ষা' প্রভৃতি কবিতায় কবির সৌন্দর্যভাবনা ধরা পড়েছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে কবির গভীর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং অনেক কবিতায় অতীত জীবন ভাবনা ও অতীত মূল্যবোধের মধ্যে কবির কল্পনা আশ্রয় নিয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি যে রোম্যান্টিক, তা বলাইবাহুল্য। 'শিখা' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থে কবি বাস্তবমুখী। এখানেও অবশ্য কবি জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন এবং সৌন্দর্যকে চিত্রায়িত করেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী খুব ভালো ছবি আঁকতে পারেন। তাই কবিতায় তিনি শব্দ দিয়ে ভাবকে চিত্রায়িত করেছেন। এটাও তাঁর কবিতার একটা বিশেষ রীতি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রথম দিকের কবিতায় তিনি রূপের সৌন্দর্য কল্পনা করেছেন। 'প্রকৃতি' কবিতায় কবি বলেছেন-

"নিয়ে ঐ রূপভরা, আমার গরব করা,
তোরে নিয়ে গরবিনী, মোর খ্যাতি মান!-"[২৮]

প্রথমদিকের সকল কবিতায় কবি রূপের সৌন্দর্যে মোহিত। 'সরযূতীরে' কবিতায় সৌন্দর্যকে অঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন। কবির কথায়-

"হেথা সৌন্দর্যের জালখানি বিস্তার করিয়া,

তার মাঝে বসে কোন অনন্ত সুন্দর?
লভিতে পরশ তার, সর্ব অঙ্গ দিয়া,--
আবেগে আকুলি হইয়া, উঠে নিরন্তর।"[২৯]

কবি এখানে কল্পনা করেছেন অনন্ত সুন্দরকে, সৌন্দর্যের মাঝে তিনি বসে আছেন তার স্পর্শ পাওয়ার জন্য। কবি সুন্দরের রূপকে ছুঁতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষের দিকে তাঁর কবিতায় আর রূপ প্রাধান্য পাচ্ছে না। তাই কবি বলেছেন 'তোমরা নিন্দ না তারে,/সে মম হৃদয়-মণি!'[৩০] কবি বুঝতে পেরেছেন রূপ ছেড়ে সৌন্দর্যের(বস্তু/ব্যক্তি) ভাবের সঙ্গে আত্মস্থ হতে হবে। এই সময়কালে কবি উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। তারও প্রকাশ লক্ষ করা যায় কিছু কবিতায়। 'ঈশ্বরী পাটনী' কবিতাটি এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমান করেছে। ইশ্বরী পাটনী খুবই হতদরিদ্র সামান্য একজন নারী, সামান্য নৌকা চালিয়েই সে জীবন ধারণ করে। কিন্তু তবুও ঈশ্বরী পাটনীর জীবনে কোনো সংশয় বা দ্বিধা নেই, সে গান গেয়ে প্রতিদিন একইভাবে নৌকা বেয়ে চলেছে। কিন্তু কবি উদভ্রান্ত, তিনি কোনো কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছেন না। তাই তিনি দেখতে চেয়েছেন নৌকাতে কী আছে? বা কবির মনে হয়েছে তিনি যা চান তা আসলে ওই তরীতে আছে। কবি আরও জানতে চেয়েছেন কি তপস্যা বলে সামান্য পাটনী সোণার কাঠ পেয়েছে?

"কি তপে সে পদ পেলি বল দেখি ঠিক!
কি জানি কি কর্মদোষে,
রহিলাম তীরে বসে,
তুই বেয়ে গেলি হেসে দিতে শত ধিক!—"[৩১]

কবির ঈশ্বরী পাটনীর জীবনের প্রাপ্তির কারণ জানতে চাওয়ার মধ্যেই তাঁর নিজের উদভ্রান্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর কারণ হিসেবে নিজের কর্মকে দোষ দিলেও কোন্ কর্মদোষে তাঁর এই উদভ্রান্ত অবস্থা তা তিনি জানেন না। কবি আসলে এই সময় জীবনের আসল মানে খুঁজেছেন। আর তাই জীবনের শেষে এসে কবি বস্তুগত রূপকে ছেড়ে ভাবকে আত্মস্থ করেছেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কবি সম্পূর্ণভাবে বর্তমানে থেকে কল্পনা করেছেন, জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন এবং তারই ফাঁকে সৌন্দর্যের আরাধনা

করেছেন। পরবর্তী 'অর্ঘ্য' (১৯০২) কাব্যগ্রন্থে কবি একেবারে বাস্তববাদী, যেন ধরণীর ধূলি-মাটিতে নেমে এসেছেন। এখানে কবির আরও উত্তরণ ঘটেছে। কবি দেববাদকে অস্বীকার করেছেন। হিন্দুধর্মের পুত্তলিকতা বা নির্দিষ্ট কোনো দেব-দেবীর প্রতি কবির কোনো দুর্বলতা নেই। 'মন্ত্রহীনা' কবিতায় কবি বলছেন-

"প্রকৃতি ধেয়ান-মগ্না, অবিচল শাখী।
পুরুষ-প্রকৃতি দ্বৈত-অদ্বৈত পূজক
আমি শৈব, আমি শাক্ত, আমি সে বৈষ্ণব;--
--কি মন্ত্র আমারে দেব! দেবে অভিনব!"[৩২]

বাস্তব দর্শনকে কবি আত্মীকরণ করেছে এবং তার প্রকাশ ঘটেছে একাধিক কবিতায়। এসবের মাঝেও কবি জগতের সৌন্দর্যকে ভুলতে পারেননি। 'ভিক্ষা' কবিতায় কবির প্রার্থনা-'সুন্দর এ-ধরা ফিরে-ফিরে মোরে/দিও হে জগৎ-স্বামী!'[৩৩] এই দুই ভাবনা মিলিয়েই কবির আসল পরিচয়। তবে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী যে একজন বাস্তববাদী কবি, তা তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলি থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তী কাব্য 'স্বদেশিনী'(১৯০৬)তে কবির স্বদেশপ্রেমের ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তবে এখানেও কবি সুদূর কল্পনাচারী নন, অত্যন্ত বাস্তববাদী। 'রাখীমন্ত্র' কবিতার দুটি পঙক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলো-

"অচ্ছেদ্য বন্ধনে; হিন্দু-মুসলমান ভুলি;
যে আশায়—দৃঢ়তম—অটুট রহুক"[৩৪]

এহেন বাস্তববাদী ভাবনা সমকালীন পুরুষ কবিদের মধ্যেও লক্ষ করা যায় না। 'সিন্ধুগাথা' (১৯০৭) কাব্যগ্রন্থেও কবির একটি বিশেষ ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। সমুদ্রের বিচিত্র রূপ তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন-' সমুদ্রের বিচিত্র মহিমাময় রূপ কবিচিত্তে যে তরঙ্গ-অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তারই অনুপম আলেখ্য—'সিন্ধুগাথা'।'[৩৫] অন্য কোনো মহিলা কবির কাব্যে এরম দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ করা যায় না। এটি গিরীন্দ্রমোহিনীর বিশিষ্টতা। সমুদ্রের বৃহত্তর

ব্যাপ্তি ও সৌন্দর্যকে ঘিরে কবির মন্ময় সৃষ্টি হয়ে উঠেছে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি। যেমন 'মুগ্ধা' কবিতায় কবি বলেছেন-

"শতবার শত সুন্দর রূপ
আঁকিয়ে নিয়েছি চিত্ত মাঝে;
আঁখির পিপাসা তবুও গেল না,--
তুমি সাজ কত নব-সাজে!—"[৩৬]

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, জীবনের বিচিত্র অনুভূতি, বাস্তববাদী দর্শন প্রভৃতি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতার মূল সুর। এছাড়াও আরও অনেক ভাবনা অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে তাঁর কবিতায়।

কামিনী রায়, মানকুমারী বসুর পরে জন্মালেও তাঁরা সমসাময়িক কবি। কামিনী রায় সমসাময়িক সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হিসেবে পরিচিত। কামিনী রায় তৎকালীন সময়ে প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেছেন। এছাড়াও তাঁর পিতা হলেন একজন সাহিত্যিক। এই সকল কিছুর প্রেক্ষাপটে কামিনী রায়ের আবির্ভাব। তাঁর কাব্যের সংখ্যা একাধিক। 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর উক্ত কাব্যগ্রন্থে 'আশাবাদ'এর সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই আশার সঞ্চার ঘটিয়ে কবি জীবনকে বৃহৎ পটভূমিতে দেখতে চেয়েছেন এবং জীবনের মহৎ ভাবনাগুলির জয়গান গেয়েছেন। 'সুখ' কবিতার শেষে কবি বলেছেন- 'সকলের তরে সকলে আমরা,/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'[৩৭] কামিনী রায়ের কবিতায় একটা বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি যৌবনের জয়গান গেয়েছেন, নূতনের আহ্বান জানিয়েছেন। কবির কণ্ঠে তাই শোনা যায়-

"এরা কাহার পতাকা হেরিছে সম্মুখে,
শোনে কাহার আহ্বান কানে,
তাই সারি সারি সারি চলে দ্রুত তালে,
কোনই বাধা না মানে?"[৩৮]

যৌবনের প্রতি কবির আশা আছে, তাই কবি বিশ্বাস করেছেন। কবি মনে করেন এঁরা যে কোনো কিছু পারবে।

"কথায় কাজে মিলন তোদের
তাতেই ফলে ফল,--
ওরে তোরা নব সৃষ্টির দল।"[৩৯]

তাঁর কবিতায় এই আশ্বাস শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, 'কামিনী রায়ের কবিতার মূল সুর আশা, বিশ্বাস ও আশ্বাস।'[৪০] আমরাও এটা মনে করি। এটাই কবি কামিনী রায়ের মৌলিকতা এবং সমসাময়িক অন্যান্য মহিলা কবির কাব্যে এই ভাব লক্ষ করা যায় না। 'আলোকে' কবিতায় এই আশার সুর স্পষ্ট শোনা যায়।

"অসীম এ আলোক-সাগরে
ক্ষুদ্র দীপ নিবে যদি যায়,
নিবুক না, কে বলিতে পারে
জ্বলিবে না সে যে পুনরায়?[৪১]

জীবনে কবি খুব আশাবাদী। জীবনের ভালো দিকগুলিকে, নৈতিক সত্যকে ইতিবাচক ভাবনায় দেখতে চেয়েছেন। কামিনী রায়ের ব্যক্তিজীবনে শোক এসেছে একাধিকবার। প্রথমে তাঁর একটি পুত্র সন্তানের মৃত্যু হয়, তারপর তাঁর স্বামীর অকালপ্রয়াণ এবং তার বেশ কিছুটা পরে তাঁকে আবারও সন্তানের মৃত্যু দেখতে হয়েছে। এত মৃত্যুর শোক কবি ঢেকে রাখতে পারেননি। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে শোক বা বিষাদের সুর। তাঁর পুরো 'অশোক সংগীত' (১৯১৪) কাব্য জুড়ে রয়েছে বিষাদের ছায়া। পুত্র অশোকের মৃত্যুতে মাতৃহৃদয়ের আকুলতার প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে।

"একবার ফিরে আয়, স্বপ্নের মতন,
বারেক শুনায়ে যা রে মধুমাখা স্বর,
বলে যা রে একবার, যত অনাদর,
যত কিছু দেখাইত যেন অযতন,--
ওরে কাঙালিনী মার অমূল্য রতন,"[৪২]

'গুঞ্জন' (১৩১১) কাব্যগ্রন্থেও মাতৃহৃদয়ের স্নেহ বর্ষিত হয়েছে। কামিনী রায়ের কবিতায় আরও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলি হল স্বদেশপ্রেম, নারী ভাবনা ও

প্রকৃতিপ্রেম। কবি মাতৃভূমির আরাধনা করে বলেছেন, 'মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।'[৪৩] স্বদেশবোধে কবি ভণ্ড, ঘুষখোরদের ধিক্কার দিয়ে বলেছেন দেশবাসীকে ভালোবাসার কথা। 'দেশ তো মানুষ দিয়া নহে দিয়া মাটি ।'[৪৪] কামিনী রায় বস্তুগত ভাবনার দ্বারা স্বদেশপ্রেমের বাণী উচ্চারণ করেছেন। নারী প্রসঙ্গেও কামিনী রায়ের একাধিক কবিতা রয়েছে। নারীর সামাজিক দুরাবস্থার কথা ভেবে নারীর মূল্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন 'মুগ্ধ প্রণয়'(আলো ও ছায়া), 'নারী নিগ্রহ' (দীপ ও ধূপ), 'নারীর দাবি'(দীপ ও ধূপ), 'নারী জাগরণ'(দীপ ও ধূপ) প্রভৃতি কবিতার মধ্য দিয়ে। নারী সমাজের যথাযথ মর্যাদার জন্য তিনি ভাবনা-চিন্তা করেছেন। 'মুগ্ধ প্রণয়' কবিতার শেষের পঙক্তিগুলি এ ব্যাপারে যথার্থ।

"পাষাণের প্রতিমাটি যবে
প্রাণময়ী নারীরূপ ধরে,
নারী তব পারে না কি তবে
দেবী হতে বিধাতার বরে?"[৪৫]

কবি সমাজের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন কিছুটা আশার সুরে। আমরা নারী মূর্তির পূজা করি, কিন্তু সমাজে নারী মর্যাদা পায় না। তাই কবির প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। কামিনী রায়ের প্রকৃতিপ্রেমের ধারাটা একটু আলাদা। তিনি মূলত পল্লীর সৌন্দর্য চিত্রায়িত করেছেন। সাধারণ প্রকৃতির চিত্র তাঁর কবিতায় খুব একটা পাওয়া যায় না। গ্রাম্য ভাষায় পল্লীর বর্ণনা তাঁর কবিতার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। 'নিশানা' কবিতার দু-একটি পঙক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-

"দিকে-দিকে গেছে খাল, দেখি নাই কতকাল
নিশানা যা ছিল জলে ভেসে গেছে তাও।
ধীরে-ধীরে বাও, মাঝি, ধীরে-ধীরে বাও।"[৪৬]

এছাড়াও 'গাঙ্ যে মোরে বোলায়' কামিনী রায়ের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত পল্লীজীবনের একটি অসাধারণ কবিতা।

"কালাই নদীর জলে আসছে সমুদ্দরের বান
হাজার মশাল মাথায় লৈয়া, করে কার সন্ধান?

"সেই সর্বনাশ্যা ঝড়ে, সমুদ্দুরের ঢেউ,
ধাইয়া আইল দেশে, ঘরে রৈলনা তো কেউ,"[৪৭]

পল্লীর পরিবেশের এমন অসাধারণ বর্ণনা শুধু সমসাময়িক কালেই নয়, পুরো বাংলা সাহিত্যেই বিরল। কামিনী রায় কিছু স্মরণমূলক কবিতাও লিখেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুকে কারাগারে দেখে তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি 'মুক্তবন্দী' কবিতা রচনা করেছেন। মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে স্মরণ করে 'বিদায়ের অর্ঘ্য' নামে তিনি আর একটি কবিতা লিখেছেন। এগুলি যদিও কামিনী রায়ের কবিতার মূল সুর নয়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল মহিলা কবিদের মধ্যে এগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কামিনী রায় অতীত সময় ও অতীতের স্থাপত্যর কথা স্মরণ করে মানুষের মহামূল্যবান জীবনের মূল্য নির্ধারণ করেছেন। এখানে কবি নস্ট্যালজিক ও অনুভূতিশীল। 'নির্মাল্য' কাব্যগ্রন্থে 'দিল্লি' 'স্মৃতিচিহ্ন' 'সাজাহান', প্রাচীন কীর্তি দর্শন' প্রভৃতি কবিতায় কবি মানুষের নিয়তিবাদকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মানুষের জীবনে এত আড়ম্বরতা, স্থাপত্যের অহংকার, এত স্মৃতিসৌধ সেসকল থাকলেও মানুষ আসলে মরণের দাস। 'দিল্লি' কবিতায় কবি বলেছেন-

"নরের সৃষ্টির এই প্রলয় মাঝার
উথলি উঠিছে প্রান সাগরের মতো,
রোধিতে না পারি অশ্রু, দুঃখের নিশ্বাস,
বুঝিয়াছি মানবের বৃথা অহঙ্কার,
খেলনা করিয়া তারে খেলিছে নিয়ত
মহাকাল,-- মানবের এই ইতিহাস।"[৪৮]

মানুষের জীবনে এটাই বাস্তব। তাই কামিনী রায় তাঁর পুরো কাব্যভুবন জুড়ে অনেকবেশি বাস্তবকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, বাস্তব ভাবনাকে কবিতায় তুলে এনেছেন। নতুনের জয়গান তাঁর এইভাবনার প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়। তবে তাঁর কবিতা যে অনুভূতিপ্রধান সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাব নেই। কামিনী রায়ের পুরো কাব্যভুবন জুড়ে তাঁর কবিতার

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। 'অশোক-সংগীত' তাঁর মৃত পুত্রের শোকে রচিত হলেও, একটানা বিষাদের সুর কবিতাগুলিতে ধ্বনিত হয়নি। তাঁর অনুভূতির গুণে কবিতাগুলি সজীব হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিশোকের সীমায় আটকে না থেকে কবিতাগুলি পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। এই মন্ময় গুণই কামিনী রায়ের কবিতার সার্থকতা।

মানকুমারী বসুর কাব্যপ্রতিভা বা তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আধুনিক সমালোচকদের অনেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের কাব্যের ভাবকে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ কিছু ভাব সময়ের প্রভাবে প্রত্যেক মহিলা কবির কাব্যে প্রতিফলিত হলেও, প্রত্যেকের কাব্যের যে কিছু ভিন্নতাও রয়েছে তা আমরা আলোচনা করেছি। সময়ের প্রভাবে মানকুমারী বসুর কাব্যেও সেই সাধারণ ভাবগুলি ফুটে উঠেছে। যেমন প্রকৃতিভাবনা, স্বদেশপ্রেম, শোক বা বিষাদমূলক কবিতা, নারী প্রসঙ্গ, জীবনের বিচিত্র অনুভূতি প্রভৃতি ভাবগুলির ক্ষেত্রে মানকুমারী বসু এবং সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও বলা যায় একই বিষয় সকলের মননে সমান ধারণা তৈরি করতে পারে না। মানকুমারী বসু মূলত পারিবারিক শিক্ষা লাভ করেছেন। বাড়িতে পিতার কাছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানকুমারী বসু ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা ও মুল্যবোধের শিক্ষা পেয়েছেন। তাই মানকুমারী বসুর সাহিত্যে একটা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। এছাড়াও মানকুমারী বসু আসলে বস্তুবাদী কবি। এখান থেকেই মানকুমারী বসু ও তাঁর সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়েছে। তবে তার ব্যতিক্রমও আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় মানকুমারী বসু পুরোপুরি মন্ময়। অন্যান্য কবিদের সঙ্গে সেখানে তাঁর বিশেষ পার্থক্য নেই। জীবনের বিচিত্র ভাব সম্বলিত কবিতার ক্ষেত্রেও মানকুমারী বসুর ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাধান্য ঘটেছে।

মানকুমারী বসু ও তাঁর সমসাময়িক মহিলা কবিদের কাব্যে শোক বা বিষাদ একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবী ছাড়া বাকী প্রত্যেকেই অসংখ্য শোকমূলক কবিতা লিখেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, কামিনী রায় এবং মানকুমারী বসু শোকভাবনায় পুরো গ্রন্থ রচনা করেছেন। মানকুমারী বসুর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলিতেও

অসংখ্য শোকমূলক কবিতা পাওয়া যায়। প্রত্যেকের কাব্যে শোক ব্যক্তিগত মননের পরিসর ছাড়িয়ে কাব্যরূপ লাভ করেছে। মানকুমারী বসুর কাব্যে শোক তাঁর স্বামী, সন্তানের মধ্যে আঁটকে থেকেছে। ছোটো থেকে বেশি করে ন্যায়-নীতির শিক্ষা পেয়েছেন বলে মানকুমারী বসুর মধ্যে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে। এই কারণে সমাজের কারোর দুঃখ, শোক, সমাজের বৃহৎ কোনো মানুষের মৃত্যু মানকুমারী বসুকে ব্যথিত করে তুলেছে এবং মানকুমারী বসুর কবিতায় তা শোকের রূপ নিয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির কষ্ট এবং কবির ব্যক্তিগত আঘাতে কবিতাগুলি সীমাবদ্ধ থেকেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে মানকুমারী বসু সমাজের গুণী জনদের স্মরণ করে একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য মহিলা কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় না। স্বদেশপ্রেমের কবিতায় অন্যান্য মহিলা কবিদের সঙ্গে মানকুমারী বসুর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, কিন্তু মানকুমারী বসুর এই ধরণের কবিতা সংখ্যায় অনেক বেশি।

মানকুমারী বসুর কাব্যে ঈশ্বর বিশ্বাস, দেবতাদের প্রতি ভক্তি, তাঁদের জয়গান একটা বিশেষভাব হয়ে উঠেছে বা অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। অন্যান্য মহিলা কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা তেমন দেখা যায়নি। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বরং প্রথাগত দেববাদকে অস্বীকার করে সার্বিক ধর্মে আস্থা রেখেছেন। হিন্দুধর্মের কোনো নির্দিষ্ট দেবদেবীর আরাধনা তিনি করেননি। তাই তিনি ‘মন্ত্রহীনা’ কবিতায় বলেছেন-

“পুরুষ-প্রকৃতি দ্বৈত-অদ্বৈত পূজক
আমি শৈব, আমি শাক্ত, আমি সে বৈষ্ণব;--
--কি মন্ত্র আমারে দেব! দেবে অভিনব!”[৪৯]

মানকুমারী বসু এদিক থেকে পুরোপুরি আস্তিক এবং হিন্দু ধর্মের দেবদেবীর প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তি তাঁর কবিতায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। মানকুমারী বসুর পরিবারের ধর্মীয় শিক্ষার ফলেই তিনি বোধহয় এ বিষয়ে কবিতা লিখতে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছেন। মানকুমারী বসুর সমসাময়িক মহিলা কবিরা বিশেষ করে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং কামিনী রায় অনেকসময় অতীত জীবন ও কাহিনিকে ঘিরে রোমান্টিক হয়ে

উঠেছেন। মানকুমারী বসুও অতীতচারী হয়েছেন মূলত পুরানো সাহিত্যকে নতুন করে পুনর্নির্মাণ ঘটানোর ক্ষেত্রে। পুনর্নির্মাণ সাহিত্যিকের একটি বিশিষ্ট গুণ এবং এই জায়গায় মানকুমারী বসু অন্যন্য। মানকুমারী বসু অসংখ্য সাহিত্যের পুনর্নির্মাণ ঘটিয়েছেন। সমসাময়িক কারোর কাব্যেই এই প্রবণতা নেই। এছাড়াও মানকুমারী বসু বিষয়ভিত্তিক কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে এই ধরণের তন্ময় কবিতা মানুকুমারী বসুর অন্যতম কাব্যকৃতি। মানকুমারী বসুর কবিপ্রতিভায় আরও একটি কৃতিত্ব রয়েছে এবং তা হল শিশুপাঠ্য কবিতা রচনা। মানকুমারী বসুর সমসাময়িক কেউ কেউ এই ধারায় দু-একটি কবিতা লিখলেও এটা তাঁদের কাব্যের মুল সুর হয়ে উঠতে পারেনি এবং এ ব্যাপারে তাঁরা সফলও নন। মানকুমারী বসুর এ বিষয়ক একাধিক কবিতা রয়েছে এবং তাঁর শিশুপাঠ্য কবিতাগুলি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও সুখপাঠ্য। আমরা এ বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মানকুমারী বসুর সমসাময়িক স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং কামিনী রায় এঁদের প্রত্যেকের কবিতা প্রধানত মন্ময়ধর্মী। মানকুমারী বসুর কবিতা মূলত তন্ময়ধর্মী। মানকুমারী বসু নৈতিক শিক্ষার পাঠ লাভ করার কারণে তাঁর মধ্যে একটা সামাজিক দায় তৈরি হয়েছিল এবং সেই জায়গা থেকেই তাঁর কবিতা বক্তব্যপ্রধান হয়ে উঠেছে। মানকুমারী বসু অনেকবেশি বস্তুবাদী কবি, বিষয়ভিত্তিক ও পুনর্নির্মাণধর্মী কবিতায় তাঁর সাফল্য থেকে একথা প্রমাণিত। এছাড়াও তাঁর কবিতায় একটা নৈতিকতার পাঠ অনুভব করা যায়। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য মহিলা কবিদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য, কিন্তু মানকুমারী বসুর কবিতার মতো এত তীব্র বা প্রখর নয়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ভাবের একটা ধারাবাহিক পরম্পরা লক্ষগোচর হয়। মানকুমারী বসুর কোনো কাব্যগ্রন্থে নির্দিষ্ট কোনো ভাবের প্রাধান্য ঘটেনি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাবের কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে। তবে বিষয় বা ভাবের বৈচিত্র মানকুমারী বসুর কাব্যে অনেক বেশি। কাব্য বৈশিষ্ট্যের এত ব্যাপ্তি অন্য কোন মহিলা কবির কাব্যে নেই। তাই বলা যায় মানকুমারী বসু এবং তাঁর সমসাময়িক মহিলা কবিদের কাব্যে সাধারণভাবে একই সুর ধ্বনিত হলেও বৈসাদৃশ্য কিছু কম নয়।

শিক্ষা ও জীবনের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তাঁদের প্রত্যেকের একটা স্বতন্ত্র কাব্যভুবন তৈরি হয়েছে। ভাবের সুরে মিল থাকলেও অনুভূতি ও প্রকাশভেদে তাঁদের প্রত্যেকের কবিতা একে অপরের থেকে আলাদাহয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অলোক রায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন-'প্রসন্নময়ী, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী, প্রিয়ম্বদা, সরোজকুমারী প্রত্যেকের রচনার কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।'[৫০]

মানকুমারী বসুর সমকালীন পুরুষ কবিদের মধ্যে রয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) ও অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) প্রভৃতি গণ। এঁদের বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভাবশিষ্য বলা যায়। যদিও তাঁরা ছিলেন বহির্মুখী। তবে কিছু ক্ষেত্রে যেমন স্বদেশপ্রেম ও নিসর্গচেতনা বিষয়ে মানকুমারী বসুর কাব্যের সঙ্গে তাঁদের কবিতার বিষয়গত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে মানকুমারী বসুর সঙ্গে সমকালীন পুরুষ কবিদের কাব্যের সুর সম্পূর্ণত ভিন্ন। দাম্পত্যপ্রেম, দেহসর্বস্ব নারীপ্রেম, প্রণয়ের উচ্ছ্বাস, নারীর রূপ এবং এই ভাবধারার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভগবদভক্তি তাঁদের কাব্যের মুল সুর হয়ে বলা যায়। আবেগ ও ভাবনার ব্যাকুলতায় তাঁরা হারিয়ে যেতে চেয়েছেন। নারীর রূপ, প্রেম, তাঁর সজ্জা প্রভৃতি কিছু ঘিরে দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিভাবনা জারিত হয়েছে। 'প্রিয়তমার প্রতি' কবিতায় সেই আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে-

"শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে।
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে
কাঁদে যথা সুকবিতা গুমরে গুমরে
মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ আঁধারে
তোমার ও মুখশশী কাঁদিছে কাতরে!
ছাদে চল; মুক্ত বায়ু; বহিছে তটিনী;
দ্রৌপদীর সাড়ি সম সচন্দ্র যামিনী!"[৫১]

নারীর প্রেমে কবির অনুভূতি দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে। এই অনুভূতির প্রগাঢ়তা মানকুমারী বসুর কাব্যে অনুভব করা যায় না। প্রেমকে ঘিরে বিচিত্র অনুভূতি তাঁর কাব্যে

নান্দনিক রূপ লাভ করেছে। নারীকে ঘিরেই কবির প্রেমের অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। সুকুমার সেন বলেছেন, 'নারীবন্দনা দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় বারংবার দেখা দিয়াছে। কবিও জানিতেন যে তাঁহার বীণার তার এই সুরেই বাঁধা।'[৫২]

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতাতেও প্রেম মুখ্য, তবে তাঁর প্রেমের স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রেমকে অনুভব করেছেন বিমূর্তভাবে, তাঁর কল্পনা প্রেমের কমনীয়তাকে ঘিরে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রেমেকে কল্পনা করেছেন 'দেহ'কে ঘিরে। এই গুণেই তিনি সমসাময়িকদের থেকেও স্বতন্ত্র্য হয়ে উঠেছেন। সুকুমার সেন তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে বলেছেন- ' গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্ব উৎসারিত হইয়াছিল তাঁহার যৌবনসঙ্গিনী পত্নীর প্রেমে এবং তাহা প্রবাহিত হইয়াছিল এই যৌবন প্রেমস্বপ্নের স্মৃতি-পথেই।'[৫৩] যৌবনের প্রেমে দেহ তো মুখ্য অবশ্যই। তাঁর 'আমার ভালোবাসা' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ-

"আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার— মিলন বিরহ!
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ!"[৫৪]

কবির এই সরাসরি নিপাট বক্তব্যে প্রাঞ্জলতা আছে। মানকুমারী বসুর সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দাসের কোনো অর্থেই মিল নেই। মানকুমারী বসু অশরীরি, পবিত্র, স্বর্গীয় ও আদর্শ দাম্পত্য প্রেমকে কল্পনা করেছেন। তবে গোবিন্দচন্দ্র দাস শোকমূলক কবিতা লিখেছেন, এব্যাপারে তাঁর সঙ্গে মানকুমারী বসুর মিল লক্ষ করা যায়। 'কি হল আমার' কবিতায় কবির শোক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে-

"আহা, কি হল আমার?
ছিল যে হৃদয় মম, নির্মল দর্পণ সম,

"কোনদিন এত বেগে, গর্জে নাই মেঘে মেঘে,
এত বজ্রে ভাঙে নাই এ হৃদয় আর,
আহা, কি হল আমার?"[৫৫]

অনুভূতির প্রগাঢ়তার কারণে শোকের প্রকাশ অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং শোকের প্রসঙ্গে মানকুমারী বসুর সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দাসের মিল থাকলেও শোক তাঁর কাব্যে প্রধান সুর নয়। ঠিক একইভাবে তাঁর কাব্যে রয়েছে স্বদেশপ্রেম ও নারীর সামাজিক দুরবস্থার বিরুদ্ধেও কিছু কবিতা লিখেছেন। বিষয়ের দিক থেকে মানকুমারী বসু অনেকখানি কাছাকাছি, তবে কবিত্বের স্বভাবে রয়েছে ভিন্নতা।

অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যেও প্রেম অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। তবে তার সাথে রয়েছে ভগবদভক্তি। তাঁর প্রেম পূর্বোক্ত দুই কবির থেকে আলাদা। অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতাতে অনুভূতির গভীরতা লক্ষণীয়। তিনি অন্তরে ভাবনিষ্ঠ হয়ে থাকেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রেমকে ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করতে চেয়েছেন, অক্ষয়কুমার বড়াল নারীর রূপকে কল্পনায় অনুভব করতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁদের পার্থক্য। এই প্রেমের সঙ্গে মানকুমারী বসুর প্রেমভাবনা মেলে না। তবে অক্ষয়কুমার বড়াল পত্নী শোকে একটি কাব্য লিখেছেন 'এষা'(১৩১৯) নামে। শোকমূলক কবিতা হিসেবে বিষয়গত দিক থেকে একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তার বেশি কিছু মিল নেই। অক্ষয়কুমার বড়াল 'কনকাঞ্জলি' (১২৯২) নামে একটি কাব্য লিখেছেন, যদিও মানকুমারী বসুর 'কনকাঞ্জলি'(১৮৯৬) কাব্যের সঙ্গে কোনো মিল নেই। মানকুমারী বসুর কাব্যের প্রকাশকালও অনেকটা পরে। অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে ভগবদভক্তির প্রকাশ ঘটেছে এবং তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিক ভাবনা গভীরতা লক্ষ করা যায়। মানকুমারী বসু পরম কল্যাণময় ঈশ্বরে বিশাসী কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতা নেই। তিনি মূলত দেবদেবীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

মানকুমারী বসুর সঙ্গে তাঁদের অনুভূতির কোনো মিল নেই, তাঁর কবিতায় ভাবনার উচ্ছ্বাসও লক্ষ করা যায় না। দাম্পত্যের আদর্শ প্রেমে তাঁর সীমানা। উপরিউক্ত পুরুষ কবিদের ভাবনার উচ্ছ্বাস তাঁদের কবিতার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। তবে এই সময়ের পুরুষ

কবিদের সঙ্গে বিষয়গত ক্ষেত্রে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁদের কাব্যেও শোক ও ঈশ্বর বিশ্বাস রয়েছে। মানকুমারী বসুর কাব্যে এই দুটি অন্যতম মুখ্য ভাব হয়ে উঠেছে। তবে তাঁদের অনুভূতির প্রগাঢ়তা অনেক বেশি। মানকুমারী বসু আরও একটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক কবিতা তিনি লিখেছেন এবং তা ছাড়াও তিনি একটি মহাকাব্য লিখেছেন। এগুলি অবশ্যই মানকুমারী বসুর বিশিষ্টতা এবং এই কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একটু বাড়তি গুরুত্বের দাবি রাখেন। মানকুমারী বসু এবং এই সময়ের মহিলা কবিদের সঙ্গে পুরুষ কবিদের আর একটি সামান্য সাদৃশ্য রয়েছে। প্রত্যেকে তাঁদের জীবন সঙ্গীর মৃত্যুকে ঘিরে শোকমূলক কবিতা রচনা করেছেন। এটা সমসাময়িক সময়ে একটি বিশেষ ধারা হয়ে উঠেছে। সমালোচকরা এই সময়ের মহিলা কবিদের কাব্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে শোকের কথা বলেছেন এটা আসলে শুধু মহিলা কবিদের মধ্যে নয়, সমকালীন পুরুষ কবিদের ক্ষেত্রেও সত্য। মহিলা কবিদের ক্ষেত্রে সন্তান শোক নতুন সংযোজন। মানকুমারী বসুর কাব্যে অবশ্য শোকের প্রভাব একটু বেশি বলে আমাদের মনে হয়। তিনি স্বামী, সন্তান ছাড়াও সমাজের জ্ঞানী-গুণীজনদের মৃত্যুতেও শোকগ্রস্ত হয়ে কবিতা লিখেছেন। পুরুষ কবিদের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় কবিতার ধরন ও অনুভূতির মাত্রাবোধে মানকুমারী বসুর সঙ্গে তাঁদের মূল পার্থক্য তৈরি হয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও উল্লিখিত পুরুষ কবিদের সঙ্গে মানকুমারী বসুর কবিসত্তার কোনো মিল নেই। তবে আমাদের আলোচিত সকল কবিদের মধ্যে বিষয়ের দিক থেকে যে কিছু সাদৃশ্য আছে তা বলাইবাহুল্য এবং তাঁদের কবিতার সুরে একটা সাধারণ মিল রয়েছে। প্রেম, স্বদেশভাবনা, শোক প্রভৃতি ভাবনায় তাঁদের কবি কল্পনা নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে বারেবারে। আর পার্থক্য তো অনেক। তবে সময়ের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি হিসেবে এঁদের একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য-

১. বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', 'কাব্য কবিতার সমন্বয়', ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, মাঘ ১৪১৮, পৃষ্ঠা-৪০৪।

২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৪।

৩. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', ভূমিকা অংশ , অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬।

৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭।

৫. দ্রষ্টব্য: অলোক রায়, 'উনিশ শতকে নবজাগরণঃ স্বরূপ সন্ধান', 'আধুনিক গীতিকবিতার উন্মেষ ও বিকাশ', অক্ষর প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৫২৯।

৬. দ্রষ্টব্য: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'অপরাহ্ণে' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা-৫৭।

৭. দ্রষ্টব্য: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'জ্যোৎস্নায় নদীকূলে' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা-৯৫।

৮. দ্রষ্টব্য: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ' "চুপ চুপ" ' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা-৪৮।

৯. দ্রষ্টব্য: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'শ্রাবণ' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা-১০৩।

১০. দ্রষ্টব্য: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'কি দোষ তোমার', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা-৪৭।

১১. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৫৩।

১২. দ্রষ্টব্য: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সাধের আসন', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা-২১।

১৩. দ্রষ্টব্য: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'অভাগিনী', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা-২৫।

১৪. দ্রষ্টব্য: রমেন চৌধুরী, 'বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক', 'প্রসন্নময়ী দেবী' প্রথম পর্ব, বি সেন য়্যাণ্ড কোং, দেবীপক্ষ ১৩৬১, পৃষ্ঠা-২৯।

১৫. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'প্রসন্নময়ী দেবী', অলোক রায় (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬৪।

১৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৬৩।

১৭. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সুত্র, পৃষ্ঠা- ৬২।

১৮. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'মৃত্যু' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৯।

১৯. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'তপোবন' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৫২।

২০. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভূমিকা অংশ বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৭।

২১. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'আবাহন' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৬১।

২২. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সংসার' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৬৩।

২৩. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ''মান-ভঞ্জন'' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৭১।

২৪. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৭০।

২৫. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'নির্মমতা' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৯০।

২৬. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'বয়ঃসন্ধি' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৮৭।

২৭. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'মরণ' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৮৯।

২৮. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'প্রকৃতি' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১২০।

২৯. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সরযূতীরে', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১১৯।

৩০. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সখির প্রতি ডেসডিমানো' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১২৬।

৩১. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'ঈশ্বরী পাটনী' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১২৩।

৩২. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'মন্ত্রহীনা' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১৩৩।

৩৩. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'ভিক্ষা' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১৩৮।

৩৪. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'রাখীমন্ত্র' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১৪২।

৩৫. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভূমিকা অংশ, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১০।

৩৬. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'মুগ্ধা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১৬২।

৩৭. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সুখ', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৫২।

৩৮. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'এরা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১২৪।

৩৯. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'ওরে তোরা ভবিষ্যতের দল' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১২৬।

৪০. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'কামিনী রায়', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৯৪।

৪১. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'আলোকে', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১৭।

৪২. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'অশোক সংগীত', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৯৪।

৪৩. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'মা আমার', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-২৩।

৪৪. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'বিপথ', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১২৮।

৪৫. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'মুগ্ধ প্রণয়', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৬০।

৪৬. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'নিশানা' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১৬৭।

৪৭. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'গাঙ্ যে মোরে বোলায়', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১৬৯।

৪৮. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'দিল্লি', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৭৭।

৪৯) দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'মন্ত্রহীনা', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১৩৩।

৫০) দ্রষ্টব্য: অলোক রায়, 'উনিশ শতকে নবজাগরণ: স্বরূপ সন্ধান', 'আধুনিক গীতিকবিতার উন্মেষ ও বিকাশ', অক্ষর প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৫২৯।

৫১) দ্রষ্টব্য: দেবেন্দ্রনাথ সেন, 'পারিজাতগুচ্ছ', দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', 'কাব্য কবিতার সমন্বয়', ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, মাঘ ১৪১৮, পৃষ্ঠা-৪০৬।

৫২) দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', 'কাব্য কবিতার সমন্বয়', ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, মাঘ ১৪১৮, পৃষ্ঠা-৪০৭।

৫৩) দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৪১৪।

৫৪) দ্রষ্টব্য: ‘গোবিন্দচন্দ্র দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ‘আমার ভালোবাসা’, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা-১০৪-১০৫।

৫৫) দ্রষ্টব্য: ‘গোবিন্দচন্দ্র দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ‘কি হল আমার’, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৪৫।

-----0-----

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক সমালোচনার ধারায় মানকুমারী বসু ও তাঁর সাহিত্য: একটি সমীক্ষা

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক সমালোচনার ধারায় মানকুমারী বসু ও তাঁর সাহিত্য: একটি সমীক্ষা

মানকুমারী বসু, মধুসুদন দত্তের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন মধুসুদন দত্তের ভাইঝি। মহাকাব্য রচনায় মানকুমারী বসু মধুসূদন দত্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলা যায়। আধুনিক সমালোচনার ধারাতে মধুসূদন দত্তের সূত্রে মানকুমারী বসুর পরিচয় দেওয়া হয়, যদিও মানকুমারী বসু কবি হিসেবে স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবি রাখেন। কিন্তু আধুনিক পাঠক মধুসুদন দত্তকে মনে রাখলেও তাঁর সঙ্গে মানকুমারী বসুকে মনে রাখেনি। প্রত্যেক স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিকে আসলে সময়ের কাছে পরীক্ষা দিতে হয়। সময়কে জয় করেই তাঁকে পাঠকের কাছে পৌঁছতে হয়। তবে বলাইবাহুল্য অনেক লেখক তাঁর সমকালে অবহেলিত থেকে যান। বাংলা সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মানকুমারী বসুর সাহিত্যের সমালোচনা অবশ্য তাঁর সমকালেই শুরু হয়েছিল। যদিও লেখিকা বলে উৎসাহদানের জন্য তাঁর সাহিত্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। আমাদের এই সন্দেহ দৃঢ় হয় তাঁর স্বামীর উক্তি থেকে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় চোদ্দ বছর বয়সে মানকুমারী বসুর লেখা কবিতা বেরোলে তাঁর স্বামী কবিকে বলেছেন-

> " "লোকে প্রশংসা করিতেছে বলিয়া তুমি যেন গর্ব্বিতা হইও না।..... স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়াই সকলে এতটা প্রশংসা করে।" "[১]

তবে একথা মেনে নিয়েও বলা যায় সমকালীন সময়েই তাঁর কাব্য পাঠকের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির একাধিক সংস্করণ একথার সাক্ষ্য দেয়। তাঁর শুধু 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থটির এগারোটি সংস্করণ হয়েছে, এই তথ্য তাঁর উক্ত গ্রন্থের শেষ সংস্করণের প্রচ্ছদ থেকে আমরা জানতে পারি।[২] এতগুলি সংস্করণের পিছনে কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছিল কিনা, তা বলা মুশকিল। সকল সংস্করণগুলি দেখার

সুযোগ ঘটলে বোঝা যেত নতুন কোনো কবিতার সংযোজন করে সংস্করণগুলি করা হয়েছে কিনা। তবে অষ্টম ও একাদশ সংস্করণের কবিতাগুলি একই, এমনকি পৃষ্ঠা সংখ্যার ক্ষেত্রেও কোনো তারতম্য ঘটেনি।[৩] এ থেকে কিছুটা হলেও তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। তাঁর 'কনকাঞ্জলি' কাব্যেরও একাধিক সংস্করণ হয়েছে।

মানকুমারী বসুর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনা তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বেই হয়েছে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর কবিতা 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' বেরোলে সম্পাদক মহাশয় কবির সেই কবিতাটির সমালোচনা করেছেন। মানকুমারী বসু একথা নিজেই জানিয়েছেন। সমালোচনার অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

> "আমরা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী; ইনি ইঁহার পিতৃব্য সৃষ্ট বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার গলায় আমরা প্রশংসার শত-নরী হার পরাইলাম। চর্চ্চা থাকিলে ইঁহার মধুময়ী লেখনী কালে অমৃত প্রসব করিবে।"[৪]

অতি অল্প বয়স থেকেই যে মানকুমারী বসুর কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে, এই উদ্ধৃতি থেকেই সেকথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ বেরোলে বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিদের মধ্যে অনেকেই উক্ত কাব্যের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দনাথ বসু, রাজনারায়ণ বসু এবং চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন প্রমুখ প্রথিতযশা ব্যক্তি। পত্রাকারে উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছেন যেগুলি 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকের পত্রকে সঠিক সমালোচনা বলা যায় না, সেগুলিতে কবির প্রশংসা করে স্তুতি নিবেদন করা হয়েছে। তবে আবার উক্ত পত্রের মধ্যে কিছু পত্রকে মানকুমারী বসুর কাব্যের যথার্থ সমালোচনা বলা যায়। রাজনারায়ণ বসু মানকুমারী বসুর 'আমাদের দেশ' কবিতা পড়ে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সেই কবিতার কিছু পঙক্তি তিনি মুখস্থ করে ফেলেন। রাজনারায়ণ বসুর পত্রটিকে যথার্থ

সমালোচনা বলা যেতে পারে। তিনি মানকুমারী বসুর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে বলেছেন, 'যে কবি এমন ভাব ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে উদ্রেক করিতে পারেন, তিনি সামান্য কবি নহেন।'[৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কাব্যের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে মানকুমারী বসুর কবিতার আলোচনা করেছেন। তিনি মানকুমারী বসুর কবিতাগুলি সম্পর্কে বলেছেন, 'এখনকার বাঙ্গালা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরেজি যে না জানে, সে বোধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই।'[৬] সমসাময়িক কবিতার ইতিহাসে মানকুমারী বসুর কবিতার অবস্থান সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই মতামত ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র থেকেও কবি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এই পত্রগুলি থেকে মানকুমারী বসুর কবিতা সম্পর্কে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত জানা যায়।

মানকুমারী বসুর উদ্দেশ্যে কেউ কেউ কবিতা রচনা করেছেন। নীলরতন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রীর প্রতি' নামে একটি কবিতা। কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার অন্তিমদুটি পঙক্তির মধ্যে কবির সমালোচনা নিহিত রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

" "গৌড়জন" প্রাণ ভরে পিয়ে দিবানিশি
ভুঞ্জিছে ত্রিদিবসুধা-তোমার কল্যাণে।"[৭]

বাংলার মানুষ কবির কাব্য থেকে কাব্যরস পান করেছে। অর্থাৎ মানকুমারী বসুর কাব্যে সাহিত্যরস দুর্লভ নয় বলে নীলরতন মুখোপাধ্যায় মতামত দিয়েছেন। যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য কবির মৃত্যুর পর মূলত প্রশস্তি নিবেদন করে 'কবি মানকুমারীর প্রতি' কবিতাটি লিখেছিলেন । তিনি মানকুমারী বসুর কবিতার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁর কবিতায় গার্হস্থবেদনা যেভাবে ফুটে উঠেছে তা অন্য কোনো কবির লেখায় পাওয়া যায় না।[৮] এছাড়াও মানকুমারী বসুর মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে তাঁর প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করা হয়েছে।[৯] মানকুমারী বসুর জীবিতকালেই ১৯১৩ সালে তাঁর রচিত 'শুভসাধনা' (গদ্য-পদ্য রচনা, ১৯১১) গ্রন্থটি ম্যাট্রিকুলেশনে পাঠ্য

পুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ওই একই সংখ্যায় মানকুমারী বসুর কবিত্বের প্রশংসাও করা হয়েছিল।[১০]

মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন এবং তাঁর কবিতা নিয়ে সামগ্রিক সমালোচনাও তাঁর জীবিতকালেই হয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থে মোট চুয়ান্ন জন মহিলা কবির ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে মানকুমারী বসুর আত্মজীবনীর পুরো অংশটি ছাপা হয়েছে এবং তিনি মানকুমারী বসুর কবিপ্রতিভার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে ছয়টি শ্রেণির উল্লেখ করেছেন এবং কবির কবিতা ধরে উক্ত ভাগগুলির বিশদে আলোচনা করেছেন। সেই ভাগগুলি হল-১) সামাজিক ২) প্রাকৃতিক ৩) জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতামূলক ৪) সমসাময়িক ঘটনা বিষয়ক ৫) পৌরাণিক ও ৬) শিশু কবিতা। মানকুমারী বসুর কাব্যবিষয়ক এটাই প্রথম সার্বিক সমালোচনা এবং অদ্যাবধি কাল অবধি তা প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে রয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর কাব্যে প্রথম মানকুমারী বসুর কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষন করে তাঁকে কবি হিসেবে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবির জীবনের একাধিক তথ্য অনুসন্ধান করে নিখঁতভাবে তাঁর জীবনীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' গ্রন্থে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'-৫৯ সংখ্যার বিষয় 'মানকুমারী বসু'। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত মানকুমারী বসুর জীবনী বিশ্লেষণ করেছেন কবির 'আমার অতীত জীবন'কে কেন্দ্র করে এবং রচনার শুরুতেই তিনি বলেছেন, 'তাঁহার জীবনী রচনায় ইহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য।'[১১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের একাধিক খণ্ড জুড়ে বিভিন্ন লেখকের জীবনী অনুসন্ধান করেছেন। মানকুমারী বসুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, তাঁর সাহিত্যের কোনো বিশ্লেষণ এখানে পাওয়া যায় না। তবে তিনি মানকুমারী বসুর সাহিত্যের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন এবং মোট সাতটি কবিতার নিদর্শন দিয়েছেন। সেই সাতটি কবিতা হল- 'একা', 'মৃত্যু-সুহৃৎ', ;অন্তিম-প্রার্থনা', 'অনন্ত প্রহেলিকা' 'ভাঙিও না ভুল' (কাব্যকুসুমাঞ্জলি), 'কি ক্ষতি আমার' (কনকাঞ্জলি), জাগ্রতি

(বিভূতি)।[১২] এরপর মানকুমারী বসুর মৃত্যুর পর ১৯৫৪ সাল নাগাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর উনিশ জন মহিলা সাহিত্যিকদের নিয়ে রমেন চৌধুরীর 'বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক' (প্রথম পর্ব) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩] মানকুমারী বসু তাঁর নিজ প্রতিভাগুণে সেখানেও জায়গা করে নিয়েছেন। রমেন চৌধুরী এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানকুমারী বসুর কাব্যপ্রতিভার আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবনেরও কিছু পরিচয় দিয়েছেন।

মানকুমারী বসুকে নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়নি। মানকুমারী বসু শুধু কবি নন। তিনি প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, আত্মজীবনী প্রভৃতি একাধিক প্রকরণের প্রণেতা। কিন্তু মূলত কবি হিসেবেই তিনি এযাবৎ পরিচিত হয়েছেন। মানকুমারী বসুর অন্যান্য সাহিত্যের কোনো আলোচনা আধুনিক সমালোচনার ধারায় লক্ষ করা যায় না। সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি একপ্রকার উপেক্ষিত বলা যায়। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'অপর কবি ও কবিতা' অংশে শুধু মানকুমারী বসুর নাম উল্লেখ করে তাঁর দু-একটি গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানেও মানকুমারী বসুর কাব্যগ্রন্থ বাদে অন্যান্য সাহিত্যের কোনো উল্লেখ নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য সেখানে মানকুমারী বসুর পরিচয় দিতে গিয়ে সুকুমার সেন লিখেছেন 'মাইকেল মধুসূদনের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু'।[১৪] ভূদেব চৌধুরী তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'গীতিকবিতার মুক্তি' নামক অধ্যায়ে অন্যান্য মহিলা সাহিত্যিকদের সঙ্গে মানকুমারী বসুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। মানকুমারী বসু সম্পর্কে বিশেষভাবে কোনো আলোচনা তিনি করেননি, এক পাতার অর্ধেক অংশ জুড়ে নাতিসামান্য একটা পরিচয় তুলে ধরেছেন। তবে তিনি মানকুমারী বসুর কবিসত্ত্বার একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বালবৈধব্যের হেতু এঁর মহিলা-সুলভ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে সহজ ভগবৎভক্তি ও শোকার্তির করুণায় মণ্ডিত হয়ে আছে।'[১৫] মানকুমারী বসুর কাব্যের অনেক কবিতায় এই মন্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে তাঁর কাব্যের এটাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, এটিকে এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যায়। এছাড়াও শ্রীমন্তকুমার

জানা, ক্ষেত্র গুপ্তের সাহিত্যের ইতিহাসেও মানকুমারী বসুর সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তা বিশেষভাবে কোনো আলোচনা নয়।

উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতি বা সাহিত্যিকদের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকে তাঁদের গ্রন্থে মানকুমারী বসু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেগুলিতেও মানকুমারী বসুর সামান্য পরিচয়ই পাওয়া যায়। তাঁর কবিত্ব প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা সেখানে দেখা যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' গ্রন্থে মানকুমারী বসুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় গ্রন্থকার শুধুমাত্র মানকুমারী বসুর সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন, তাঁর সাহিত্যের আলোচনা থেকে সমালোচক বিরত থেকেছেন।[১৬] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' গ্রন্থেও মানকুমারী বসুর একপাতার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।[১৭]

বারিদবরণ ঘোষ ২০০১ সালে মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে গ্রন্থের সূচনায় একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন। এই ভূমিকা অংশটিতে বারিদবরণ ঘোষ মানকুমারী বসুর কবিতার আলোচনা করেছেন। সমালোচক মানকুমারী বসুর মধ্যে পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে মতামত রেখেছেন এবং তাঁর কবিতার গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। সমালোচক ভূমিকার শেষে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন, 'মানকুমারীর কবিতা কি আর আমরা পড়ি। সম্ভবত না।'[১৮] আধুনিক সমালোচনার ধারায় মানকুমারী বসু একপ্রকার উপেক্ষিত রয়ে গেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য আধুনিক সমালোচনার ধারায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা সাহিত্যিকরা আজও উপেক্ষিত। তাঁদের রচিত সকল গ্রন্থ আজ শুধু বাজারেই নয়, লাইব্রেরিতেও দুর্লভ। একাধিক লাইব্রেরির ক্যাটালগে মানকুমারী বসুর বিভূতি', 'শুভসাধনা' গ্রন্থের উল্লেখ থাকলেও উক্ত বইয়ের কোনো হদিশ মেলে না।[১৯] সাম্প্রতিক কোনো গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোচনা প্রসঙ্গে মানকুমারী বসুর উল্লেখ থাকলেও তাঁকে নিয়ে বা তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা খুব বেশি হয়নি। অলোক রায় 'উনিশ শতকে নবজাগরণ: স্বরূপ সন্ধান' গ্রন্থে উনিশ শতকের একাধিক ব্যক্তিত্বের আলোচনা করেছেন, এমনকি কিছু মহিলা সাহিতিকদের নিয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু

মানকুমারী বসুকে নিয়ে কোনো অধ্যায় তিনি রচনা করেননি। সাম্প্রতিক কালে সমালোচকরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের কাব্য সম্পর্কে কিছু সাধারণ মত পোষণ করেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

মানকুমারী বসুর সামগ্রিক ব্যক্তিপরিচয় ও তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যের আলোচনা করে সাম্প্রতিককালে 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা বের করেছে।[২০] তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যের এহেন আলোচনা আগে হয়নি। আমাদের গবেষণায় বিভিন্ন আলোচনা ও তথ্যের ব্যাপারে আমরা উক্ত পত্রিকা থেকে সাহায্য পেয়েছি। পত্রিকাটিতে মোট কুড়িটি প্রবন্ধকে সম্পাদক মহাশয় চারটি পর্বে ভাগ করে প্রকাশ করেছেন।[২১] মানকুমারী বসুর সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচকরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন। মানকুমারী বসুর শুধু ব্যক্তিজীবন নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। সবথেকে বেশি আলোচনা হয়েছে মানকুমারী বসুর কবিতা নিয়ে। তাঁর কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে মোট নটি প্রবন্ধে সমালোচকরা তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও তাঁর পুনর্নির্মাণধর্মী সাহিত্য নিয়েও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। আর রয়েছে তাঁর গদ্য সাহিত্য নিয়ে লেখা প্রবন্ধ। মানকুমারী বসুর পুনর্নির্মাণধর্মী সাহিত্যের ও গদ্য সাহিত্যের আলোচনাই পত্রিকাটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। কারণ এযাবৎ মানকুমারী বসুর এইসকল সাহিত্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। এছাড়াও তাঁর ছোটোগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সংক্রান্ত একটি করে রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমালোচকগণ মানকুমারী বসুর সাহিত্য ও তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছেন। সমালোচক গৌতম সান্যাল 'মানকুমারী বসু: অতীতের হিমঘর থেকে' শিরোনামে একটি সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সমালোচক মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন তথ্য উদ্ধার করেছেন। আমরা আমাদের গবেষণায় পূর্বেই মানকুমারী বসুর জন্মসাল সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা করেছি। সমালোচক আলোচ্য প্রবন্ধটিতেও কবির জন্মসাল সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটাতে চেয়েছেন। তিনিও মানকুমারী বসুর জন্মসাল হিসাবে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে এই ব্যাপারে জানিয়েছেন-'আমরা ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দকেই

মানকুমারীর জন্মসাল হিসাবে গ্রহণ করে নেব।'[২২] মানকুমারী বসু একটি মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এব্যাপারে কবির পিতা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরীর ভূমিকাই মুখ্য বলা যায়। সমালোচক এব্যাপারে তাঁর প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন। তিনি মানকুমারী বসুর পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন-

> "বস্তুতপক্ষে আনন্দমোহন একজন, সৎ, শিক্ষিত, শিক্ষানুরাগী, বিষয়কর্মে উদাসীন মানুষ ছিলেন। তাঁর এই উদাসীনতার জন্য অনেক ভূসম্পত্তি তিনি হারিয়েছিলেন। এসব অপেক্ষা ধর্মালোচনা, পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা, মহিলাদের নিকট পুরাণ পাঠ, বালিকাদের সদুপদেশ দান, শিশুদের সঙ্গে খেলা এ সবেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।"[২৩]

কবির পিতা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরীর একটা পরিচয় সমালোচকের এই বক্তব্য থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরাও আমাদের গবেষণায় তাঁর চরিত্র সম্পর্কে এহেন বক্তব্যই প্রতিষ্ঠা করেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বনেদী পরিবারের সংস্কৃতির রীতি মানকুমারী বসুর পরিবারেও লক্ষ করা যায়। মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন এবং তাঁর রচিত সাহিত্য বিশ্লেষণ করে আমরাও এব্যাপারে সহমত পোষণ করি। আলোচ্য প্রবন্ধে সমালোচকের বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য অনেকক্ষেত্রেই মিলে যায়। এছাড়াও সমালোচক তাঁর প্রবন্ধে মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন ও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির তথ্য উদ্ধার করেছেন, যা আমরা আমাদের গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন নিয়ে অন্তরা চৌধুরী 'তথ্যসূত্র' পত্রিকার এই সংখ্যাতেই ' 'আমার অতীত জীবন'- এক অন্তঃপুরিকা কবির জীবন ইতিহাস' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এখানে সমালোচক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কবির জীবনকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন এবং মানকুমারী বসু রচিত 'আমার অতীত জীবন' গ্রন্থটি আত্মজীবনী হিসাবে কতটা সার্থক, সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। সমালোচক বলেছেন- 'আত্মজীবনীর মূল বিষয়বস্তু হল 'development of his personality' বা ব্যক্তিত্বের গড়ে ওঠা।'[২৪] মানকুমারী বসুর 'আমার অতীত জীবন' নামের আত্মজীবনীটিতে এই বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

বাল্যকাল থেকে ধীরে ধীরে কীভাবে মানকুমারী বসুর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে, তার পরিচয় কবির আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। মানকুমারী বসু দীর্ঘ পরিশ্রম, সংগ্রাম, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা ও সাধনার মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছিলেন। যদিও বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে কবি অস্বীকার করে উঠতে পারেননি। সমালোচক তাঁর প্রবন্ধে এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, মানকুমারী বসু একজন গুরুত্বপূর্ণ মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়তে পারেননি। কবির স্বামী যখন কর্মস্থলে মৃত্যুশয্যায়, তখনও কবি লজ্জায়, ভয়ে তাঁর কাছে যাওয়ার কথা বলতে পারেননি। সমালোচক এই বিষয়টিকে নারীবাদী দৃষ্টির আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন-

> "তিনি 'হিন্দু কুলবধূ' বলেই তাঁর পীড়িত স্বামীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার অধিকার নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের এভাবেই অবদমিত হতে হয়। ক্ষমতাবান শোষকের এরূপ অবদমনকে অ্যান্তনিয় গ্রামশ্চি dominance বলেছেন, এবং এর ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে তিনি Hegemony বলেছেন। এই অবস্থায় শোষিতরা শোষকের ভাষায় কথা বলে। মানকুমারী দেবী 'হিন্দু কুলবধূ'র Hegemony-কে রক্ষা করার জন্য তাঁর মানসিক ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন নি।"[২৫]

সমালোচকের এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, মানকুমারী বসু ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল মূল্যবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন নিয়ে এই সমালোচনাটি ভিন্ন ধরনের। মানকুমারী বসুর অধিকাংশ কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছোটোগল্প 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীদের সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে তাঁদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে এবং তাঁদের ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটাতেই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। মানকুমারী বসু তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময়পর্ব জুড়ে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনে তিনি উমেশচন্দ্র দত্তের থেকে প্রভাবিতও হয়েছেন।

মানকুমারী বসু তাঁর বিধবা জীবনের পুরোটাই 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়, একাধিক বিষয় ওবিভিন্ন প্রকরণের সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তিনি বিধবা পরবর্তী জীবনে উমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা রূপে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী তাঁর 'সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের মানসকন্যা কবি মানকুমারী বসু' প্রবন্ধে মানকুমারী বসুর জীবনের সেই দিকটির উপর আলোকপাত করেছেন। 'তথ্যসূত্র' পত্রিকার 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যায় মানকুমারী বসুর জীবনী নিয়ে তিনটি ভিন্ন সমালোচনার সন্ধান আমরা পেলাম। উপরিউক্ত তিনটি প্রবন্ধে কবির জীবন নিয়ে তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায়।

সমালোচক সুবিমল মিশ্র 'মানকুমারী বসুর প্রবন্ধ: একটি অসম্পূর্ণ আলোচনা' নামের সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধে মানকুমারি বসুর প্রবন্ধের একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা করেছেন। সমালোচক মানকুমারী বসুর প্রবন্ধগুলিকে পাঁচটি শ্রেণিতে[২৬] বিভাজন করেছেন। সেই বিভাজনগুলি হল- ১. নারী ও পরিবার সম্পর্কিত, ২. বস্তুনিষ্ঠ বিষয়ক, ৩. ব্যক্তিনিষ্ঠ বিষয়ক, ৪. নারীশিক্ষার ইতিহাস, ৫. আর্যমহিলা: প্রসঙ্গত। নারী ও পরিবার বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে তিনি আবার বিষয় অনুযায়ী ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল- ১. পরিবারে নারীর কর্তব্য ২. সুগৃহিণীর কর্তব্য, ৩. গৃহধর্ম পালনের আবশ্যকতা, ৪. গৃহধর্ম পালনের কয়েকটি নিয়ম, ৫. স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা, ৬. বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের কর্তব্য। মানকুমারী বসুর প্রবন্ধে উক্ত বিষয়গুলির সম্পর্কে আমরাও সহমত পোষণ করি। কিন্তু আমরা আমাদের গবেষণায় মানকুমারী বসুর প্রবন্ধগুলিকে এইরূপ কোনো ভাগ করিনি। কারণ তাঁর এই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের একটি বিশেষ মূল্যবোধ ফুটে ওঠে। সেই কারণে উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলিতে ভাবের একটি সমতা রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। সমালোচক মানকুমারী বসুর প্রবন্ধগুলি নিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি আলোচনা করেছেন বলা যায়। সমালোচক সইফুল্লা তাঁর প্রবন্ধে মানকুমারী বসুর গদ্য শৈলী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, এযাবৎ যা অপ্রতুল ছিল। মানকুমারী বসুর গদ্যের শৈলী নিয়ে সমালোচকের বক্তব্য যথাযথ বলে আমরা মনে করি। সমালোচক মানকুমারী বসুর

গদ্যের পনেরোটি বৈশিষ্ট্যের[২৭] উল্লেখ করেছেন এবং গদ্যকারের বিভিন্ন গদ্যের নিদর্শনসহ সেই বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হল-

১) সময়ের অনতিক্রমে ভাষার ধারাবাহিক বিবর্তন।

২) বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাসঙ্গিক সংলাপ রচনা।

৩) বর্ণনার ও কথোপথনের ভাষার আশ্চর্য সমন্বয়।

৪) ব্যক্তির সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিচয় অনুযায়ী ভাষা নির্মাণ।

৫) সাধুরীতির কাঠামোয় চলিত গদ্য নিয়ে আসা।

৬) ভাষায় বিভিন্ন ধরণের শব্দের ব্যবহার।

৭) প্রয়োজন অনুযায়ী বাক্য গঠন।

৮) খণ্ডবাক্যের ব্যবহারে বিশেষ কৌশল।

৯) ক্রিয়াপদের ব্যবহারের কৌশল।

১০) ক্রিয়াপদের বৈচিত্র- সমাপিকা, অসমাপিকা ইত্যাদি।

১১) বাক্যে অলঙ্কারের প্রাধান্য।

১২) প্রবাদ, প্রবচনের ব্যবহার।

১৩) নারীর বিশেষ ভাষারীতি নির্মাণ

১৪) গদ্য কখনো আবেগপূর্ণ ও কখনো বৌদ্ধিক।

১৫) সমসাময়িক অন্যদের থেকে সাবলীল গদ্য।

ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর সকল বৈশিষ্ট্য একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। কিছু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকলেও তাঁর গদ্যশৈলী সম্পর্কে আমাদের সার্বিক মতামত সমালোচকের মতের অনুগামী।

মানকুমারী বসুর কথাসাহিত্য নিয়ে দুটি সমালোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানকুমারী বসুর ‘বনবাসিনী’ উপন্যাস নিয়ে একটি আলোচনা করেছেন তাঁর ‘মানকুমারীর ‘বনবাসিনী’: নারীধর্মের প্রথম আলো’ শিরোনামের

সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধে। 'বনবাসিনী' উপন্যাস রচনা করার পিছনে লেখিকার একটি উদ্দেশ্যের কথা আমরা আগেই জানিয়েছি। সমালোচকও সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তাঁর আলোচনায়। তিনি উনিশ শতকে সমাজের যে ভাবধারা, তার আলোকে উপন্যাসটিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন-

> "উনিশ শতকীয় যুগলক্ষণকে মনে রেখেই এই ভাবনার বিচার করতে হবে।
>
> "ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যের এমনই নানা যুগলক্ষণে পরিপূর্ণ উপন্যাস মানকুমারী বসুর 'বনবাসিনী'।"[২৮]

লেখিকার এই উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগলক্ষণ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমালোচক উপন্যাসটির মূল বিষয় সম্পর্কে বলেছেন,

> "বাঙালি রমণীর আদর্শ গৃহধর্ম, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য কি হওয়া উচিত—সেই বার্তাই উপন্যাসের নায়িকা শোভার কার্যকলাপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন লেখিকা।"[২৯]

উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল মূল্যবোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে পুরুষদের চিন্তাভাবনাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন সমালোচক তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটিতে। এই অবসরে সমালোচকের বক্তব্যকে প্রকাশ করা যেতে পারে।

> "...এই শিক্ষিত নারী পুরুষের মতো নব্যমানবতাবাদের জয়গান গাইতে রক্ষণশীলতার বর্ম ভেঙে রাজপথে এসে দাঁড়াক, নিজের ভাগ্য নিজে জয় করুক—এমনটা আবার চায়নি সেকালের পুরুষ।"[৩০]

মানকুমারী বসু রচিত 'বনবাসিনী' উপন্যাসটি বিশ্লেষণের আলোকে সমালোচক ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশকিছু ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর সমালোচনায়। মানকুমারী বসুর ছোটোগল্প নিয়ে সায়ন্তন মজুমদার 'ছোটগল্পকার মানকুমারী বসু'

শিরোনামে একটি সমালোচনা করেছেন 'তথ্যসূত্র' পত্রিকার 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যায়। মানকুমারী বসুর 'রাজলক্ষ্মী' গল্পটি সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন-

> "তবে শুধুমাত্র নারীর কলমে নারীর কথাই নয়, নারীর অন্তরলোকের কথাও মানকুমারীর সুদক্ষ লেখনী দ্বারা সুচারুরূপে বর্ণিত হয়েছে।"[৩১]

মানকুমারী বসুর গল্পে নারী চরিত্রগুলির গুরুত্ব আমরা আমাদের গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। সমালোচকও তাঁর প্রবন্ধে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। মানকুমারী বসু রচিত 'অদৃষ্ট চক্র' গল্পে নায়িকা সুকুমারী চরিত্র নির্মাণে লেখিকার সাহসিকতা ও অভিনবত্ব প্রশংসাযোগ্য হয়ে উঠেছে। গল্পের নায়িকা সুকুমারী তার প্রেমিকের রূপবর্ণনা করেছেন। পুরুষের প্রতি নারীর এই রূপমুগ্ধতা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্য কোনো নারীর কলমে উঠে আসেনি বলে সমালোচক মনে করেন। সায়ন্তন মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে সমাজমনস্কতাকে মানকুমারী বসুর ছোটোগল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পেই সমাজমনস্কতা লক্ষ করা যায়। মানকুমারী বসুর 'রাজলক্ষ্মী' ও 'শোভা' গল্পে লেখিকা পুরাতন গৃহের একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার আধুনিক ফ্ল্যাটের জীবনযাত্রার একটি পূর্বাভাস তাঁর গল্পে পাওয়া যায়। সমালোচক ছোটোগল্পকার মানকুমারী বসুর ত্রুটিগুলিকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। মানকুমারী বসুর একাধিক গল্প 'কুন্তলীন' পুরষ্কারে সম্মানিত হয়েছিল। এই কারণে তাঁর গল্পগুলি নিতান্তই বিজ্ঞাপনমূলক হয়ে উঠেছে বলে সমালোচক মত পোষণ করেছেন। মানকুমারী বসুর গল্পে এই কুন্তলীন তেলের উল্লেখের কারণে সেই তেলের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে সমালোচক জানিয়েছেন। সায়ন্তন মজুমদার তাঁর আলোচনার শেষাংশে ছোটোগল্প রচনায় মানকুমারী বসুর কৃতিত্বের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-

> "তবে একটা কথা ঠিক যে সামান্য অপক্কতা থাকলেও নির্মল আনন্দ পরিবেশনে, সরলতায়, জীবনের ইতিবাচক মিলনান্তক চিত্রাঙ্কণে গল্পগুলি কিছুটা হলেও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।"[৩২]

সমালোচক তাঁর গল্পকে 'অপরিপক্ক' বলে মনে করছেন। যদিও তিনি মানকুমারী বসুর গল্পে নির্মল আনন্দ, সরলতা এবং জীবনের ইতিভাবাচক ভাবনাগুলির প্রশংসা করেছেন। এর বাইরেও মানকুমারী বসুর ছোটোগল্পের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে আমরা মনে করি; যা আমরা আমাদের গবেষণার নির্দিষ্ট অধ্যায়ে দৃষ্টান্তসহ উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি।

মানকুমারী বসুকে নিয়ে উক্ত পত্রিকায় আরও উল্লেখযোগ্য সমালোচনা রয়েছে। মানকুমারী বসুর 'বীরকুমার-বধ' কাব্য নিয়ে সমালোচক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য 'বীরকুমারবধ: এক নিঃসঙ্গ এপিক' নামে একটি সমালোচনা লিখেছেন। তাঁর 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের উপর এর পূর্বে কোনো সমালোচনা পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাকাব্য রচনা করার যে একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছিল, মানকুমারী বসু সেই প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মানকুমারী বসুই একমাত্র মহিলা, যিনি সেই প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়ে মহাকাব্য রচনা করার সাহস দেখিয়েছিলেন। যদিও তাঁর মহাকাব্য সেভাবে মর্যাদা লাভ করেনি। সমালোচক তাঁর মহাকাব্যের যথার্থতা সম্পর্কে বলেছেন-

> "সার্থক লিটারারি এপিকের যেসব লক্ষণ বা গুণ থাকা প্রয়োজন, 'বীরকুমারবধ' কাব্য'র নানা দিকে যে তার কিছু কিছু অভাব রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।"[৩৩]

সাহিত্যিক মহাকাব্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁর মহাকাব্যে নেই। তবুও তিনি মহাকাব্য রচনায় কীর্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন-

> " 'বীরকুমারবধ কাব্যে'র ভাষা ও ছন্দ মূল কাহিনির ভাব ও পরিবেশের যথেষ্ট অনুগামী। কাহিনির ভাবের গভীরতার তারতম্যের উপরে ভাষাও গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।"[৩৪]

ভাষা, ছন্দ ও কাহিনির সামঞ্জস্যের পাশাপাশি তাঁর কাব্যে নারী চরিত্র সৃজনেও কবি মানকুমারী বসুর কৃতিত্ব প্রশংসাযোগ্য। প্রেম, মাতৃত্ব ও নারীত্বের গুণে তাঁর সৃষ্ট নারী

চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বলে সমালোচক মনে করেন। আমরাও এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করি। সমালোচক আরও জানিয়েছেন মানকুমারী বসুর উপমা নির্বাচন আমাদের মধুসূদন দত্তের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মানকুমারী বসুর পুনর্নির্মার্ণধর্মী সাহিত্য নিয়ে তিনটি সমালোচনার সন্ধান পাওয়া যায় 'তথ্যসূত্র' পত্রিকার 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যায়। সমালোচক মোহিনীমোহন সরদার 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পুনর্নির্মাণে মানকুমারী বসুর অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধে মানকুমারী বসুর 'কারাবাসে শ্রীমন্ত' কবিতাকে ঘিরে পুনর্নির্মাণধর্মী সাহিত্যের তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন এবং মানকুমারি বসুর কৃতিত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মানকুমারী বসুর কবিতার এই ধরনের আলোচনাও এই প্রথম হয়েছে। কবিতাটি সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছেন-

> "দীর্ঘ এই কবিতাটিতে কারাবাসে শ্রীমন্তের আত্মোপলব্ধিকেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে। উন্মুক্ত স্বাধীনচেতা নবীন কিশোর শ্রীমন্ত হঠাৎ বন্দী হয়ে উপলব্ধি করছে জীবনের চরম সত্যকে। সেই উপলব্ধিরই আধুনিক কাব্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য কবিতায়।"[৩৫]

সমালোচক মানকুমারী বসুর 'কারাবাসে শ্রীমন্ত' কবিতাটির কাহিনির সঙ্গে মূল কাহিনির একটি তুলনামূলক আলোচনাও উপস্থাপন করেছেন। সেই তুলনামূলক আলোচনা করে সমালোচক মানকুমারী বসুর সৌন্দর্য সৃষ্টির দক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানকুমারী বসুর 'কারাবাসে শ্রীমন্ত' কবিতার যে মূল বিষয়, তা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় না। যদিও কবি তাঁর কবিতাটির মাধ্যমে শ্রীমন্তের মুখ দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসটিকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কবিতাটি সমকালে জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল বলে জানা যায়। রতনকুমার নন্দী বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ চরিত্রটির পুনর্নির্মার্ণে রচিত মানকুমারী বসুর 'প্রতাপ' কবিতাটির সমালোচনা করেছেন তাঁর 'প্রতাপ: বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ও মানকুমারীর কবিতা' নামের সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধটিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিকতাকেই মানকুমারী বসু 'প্রতাপ' কবিতাটির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর এই কবিতাটি সাতটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে

কবিতাটি রচিত। সমাজের প্রচলিত ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষেরা সাধারণত নিষ্ঠুর হয়, এই ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে 'প্রতাপ' কবিতাটি। কবি মানকুমারী বসু তাঁর এই কবিতাটিতে প্রতাপ চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতাপ চরিত্রটি উদার, সৎ, সহানুভূতিশীল, ন্যায় ও নিষ্ঠাবান। কবি প্রতাপ চরিত্রের এই গুণগুলির প্রতি আলোকপাত করেছেন বলে সমালোচক মত পোষণ করেছেন। প্রতাপ চরিত্রের মহত্ত্বকে কবি প্রতিষ্ঠিত করলেও, মানবিক দিকটিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর কবিতাটিতে 'পুরুষস্তুতি' অতিব্যপ্তি দোষে দুষ্ট বলে সমালোচক মনে করেন। মানকুমারী বসু বঙ্কিচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কারণ মানকুমারী বসু বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের একাধিক চরিত্রের পুনর্নির্মাণ ঘটিয়েছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের 'ভ্রমর' চরিত্রটিকে তিনি পুনর্নির্মাণ করেছেন তাঁর 'ভ্রমর' কবিতাটিতে। এই কবিতাটিকে ঘিরে রাধেশ্যাম সাহা 'মানকুমারী বসুর 'ভ্রমর': অথ সতীকথা' নামের একটি সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আলোচ্য কবিতাটি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত। কিন্তু কবিতাটিতে ভ্রমর চরিত্রটি সেভাবে ফুটে ওঠেনি, মানকুমারী বসুর আবেগের প্রাধান্য ঘটেছে বলে সমালোচক মনে করেছেন। যদিও আলোচ্য কবিতাটিতে ভ্রমরের মধ্য দিয়ে মানকুমারী বসু পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। সমালোচক বলেছেন—

> "পুরুষকে বিদ্ধ করার লক্ষ্যেই তাঁর বক্তব্য সংহত তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়েছে। এভাবেই মানকুমারী স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণের একটা প্রয়াস পেয়েছেন।"[৩৬]

মানকুমারী বসুর এই কবিতাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। মানকুমারী বসু পুরো কবিতা জুড়ে শুধু ভ্রমরের উদ্দেশ্যে প্রশ্নবান নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর সেই প্রশ্নের মধ্যে নারীর মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা আছে ঠিকই, কিন্তু পুরুষের অন্যায় বা অবহেলার জন্য তার কোনো সমালোচনা তিনি আলোচ্য কবিতায় করেননি। এবিষয়ে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি-

> "মান্যবর বঙ্কিমচন্দ্র এই কঠিন, বদ্ধ, অনড় পৌরুষের যথোপযুক্ত সমালোচনা করেছেন। মানকুমারী খুব সম্ভব সেদিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ পান নি।"[৩৭]

এই বক্তব্য থেকে 'ভ্রমর' কবিতাটি সম্পর্কে সমালোচকের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায়।

মানকুমারী বসুর কবি সত্তার আলোচনাই অধিক লক্ষগোচর হয়। এই পত্রিকাতেও তাঁর কবি প্রতিভার নানা দিক নিয়ে নয়টি সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। রমেন সর উনিশ শতকের নারী ও কবি হিসাবে মানকুমারী বসুকে দেখতে চেয়েছেন। সমালোচক জানিয়েছেন মানকুমারী বসু উনিশ শতকের নারীর যন্ত্রণাকে নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং তার প্রকাশ তাঁর রচিত কবিতায় পাওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে মানকুমারী বসুর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে সমালোচক জানিয়েছেন-

> ".....তাঁর কবিতায় স্বর্গীয় পরিমল অবশ্যই আছে কিন্তু গভীরভাবে অনুভব করলে তার ভিতর ভুবনে উনিশ শতকের এক মর্ম্মস্পর্শী নারীর বেদনা অনুভব করা সম্ভব। যে নারী বাল্য বিধবা হয়েও ভাগ্যের হাতে নিজেকে সম্পর্পণ করেন নি, নিজের বাল্যবিবাহ, অকাল বোইধব্যের জ্বালা ভুলতে সাহিত্য চর্চা করেছেন। সে যুগে কজন মেয়ে এই কাজ করতে পেরেছেন?"[৩৮]

মানকুমারী বসু প্রসঙ্গে সমালোচক রমেন সরের এই বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। মানকুমারী বসুর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলির একটি সমালোচনা পাওয়া যায় মধুমিতা চক্রবর্তী সরকারের 'মানকুমারীর কবিতায় 'প্রকৃতি'' শিরনামের প্রবন্ধে। মানকুমারী বসুর এই জাতীয় কবিতাগুলি পাঠকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম। সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্ষার যে একটা অলস, মেদুর বিরহের ভাব ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়, মানকুমারী বসুও সেই ভাবকে তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর এই জাতীয় কবিতাগুলি ক্ষুদ্র শব্দ প্রয়োগ, ভাবের গতি ও সরসতার কারণে পাঠকের কাছে

আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমালোচক তার আলোচনার উপসংহারে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানিয়েছেন—

> "মানকুমারীর কবিতায় 'প্রকৃতি' প্রসঙ্গে আলোচনার উপসংহারে বলি মানকুমারী বিশিষ্ট তাঁর বলিষ্ঠ দেশ সচেতনতায়, গভীর সমাজ মনস্কতায়। প্রকৃতির কবিতায় তিনি অবশ্যই বস্তুধর্মী, যুগ প্রবণতার বাইরে নন।"[৩৯]

মানকুমারী বসুর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি যে বর্ণনাধর্মী হয়ে উঠেছে, তা আমরা আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি এবং আমরা তার সম্ভাব্য কারণগুলিকেও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। মানকুমারী বসুর শিশু বিষয়ক কবিতাগুলিও তাঁর সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে। পিয়ালী ঘোষ দস্তিদার এবিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ সমালোচনা করেছেন। শিশু কবিতা সৃষ্টি খুবই কঠিন কাজ। এর জন্য লেখক বা লেখিকাকে শিশু মনের অধিকারী হতে হয়। মানকুমারী বসু তাঁর উপলব্ধিকে শিশুসুলভ করে তুলতে পেরেছিলেন। তিনি শিশুর চিরচঞ্চল রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন বলে সমালোচক মনে করেন। মানকুমারী বসু খুব অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে শিশুধর্মী কবিতাগুলি রচনা করলেও, শিশুদের কাছে তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আবার তারই ফাঁকে তিনি শিশুদের নৈতিকতার পাঠও দিয়েছেন এবং কবিতাগুলিতে মজার ছলে বিষয় উপস্থাপনের মধ্যে, সেই নৈতিকতা কিভাবে সরস হয়ে উঠেছে, মানকুমারী বসুর শিশু বিষয়ক কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করে তা আমরা আমাদের গবেষণায় আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের উদ্ধৃত একটি কবিতার অংশবিশেষ আমরা তাঁর সমালোচনা থেকেই উল্লেখ করলাম-

"চারু বলে "চোর পুষি! একই রীতি তোর,
এত দিই তবু তোর চুরি?
আরো এক বাড়ি মেরে ঘুচাঁইব জোর
চোরে আমি বড় ঘৃণা করি।'

"…..নিরাশচিত্তে বিড়াল বুঝিল,
পাপআশা তাই পুরিল না,
চোর বলি চারু মরে এত শাস্তি দিল
চুরি করে আর খাব না।"[৪০]

এখানে মজার ছলে লেখিকা নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। মানকুমারি বসু ছোটো থেকেই তাঁর বাবার কাছে নীতিশিক্ষা, পুরাণ শুনে বড় হয়েছেন। তাই তাঁর শিশুধর্মী কবিতাগুলিতেও কিছু না কিছু সামাজিক বার্তা রয়েছে বলে সমালোচক মনে করেন। সুকন্যা রায়চৌধুরী মানকুমারী বসুর কবিতায় দার্শনিক ভাবনার অনুসন্ধান করেছেন। মানকুমারী বসুর 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যের 'ঈশ্বর' কবিতাটির মধ্যে মীমাংসা দর্শনের রামানুজের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে বলে সমালোচক জানিয়েছেন তাঁর 'দার্শনিকের পাঠে ও ভাবনায় মানকুমারী' নামের সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধটিতে। মানকুমারী বসুর প্রতিটি কবিতার মধ্যেই দর্শনের পাঠ অনুভব করা যায়। মানকুমারী বসুর কবিতার সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের মিল পাওয়া যায়। তাঁর 'সাধ' কবিতাটির মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনের কার্যকারণ তত্ত্বের প্রসঙ্গ রয়েছে। রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও জগতের অভেদত্বের যে তত্ত্ব, তা মানকুমারী বসুর 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের 'ত্রিকাল' কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মানকুমারী বসু বলেছেন, মানবজীবন ছাই বড় বিষাদের। অর্থাৎ তিনি বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। এখানে জৈন দর্শনের প্রভাব রয়েছে বলে সমালোচক মনে করেন। মানকুমারী বসু নিজেকে ইশ্বরের সঙ্গে একাত্ম করে ভেবেছেন। তাঁর এই ভাবনার প্রকাশ একাধিক কবিতায় লক্ষ করা যায়। আমরা আমাদের গবেষণাতেও তার বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করেছি। মানকুমারী বসুর জীবন দুঃখে ভরা ছিল, তাই তাঁর একাধিক কবিতায় দুঃখবাদী দর্শনের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। রবীন্দ্রদর্শনের প্রভাবও তাঁর কবিতায় পড়েছে বলে সমালোচক মনে করেন। মানকুমারী বসুর 'পূজার সাধ' কবিতাটি রবীন্দ্রভাবনার ভাবার্থ বলা যায়। এর কারণ হিসাবে সমালোচক বলেছেন, হয়ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব পড়েছে, অথবা তাঁরা সমসাময়িক বলে দুজনের দর্শনের মিল ঘটে গেছে

স্বাভাবিক নিয়মে। আমরা তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত দর্শন সম্পর্কে আমাদের গবেষণার একাধিক উপঅধ্যায়ে বিস্তারিত আকারে বিশ্লেষণ করেছি। বিকাশ রায়ের 'মানকুমারী বসুর কবিতায় স্বাদেশিকতাবোধ' নামে একটি সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বাদেশিকতাবোধ ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ প্রবণতা। মানকুমারী বসুর কবিতায় সেই ধারা বিশেষভাবে পুষ্টি লাভ করেছে। সমালোচক মানকুমারী বসুর কিছু কবিতাকে ঘিরে তাঁর কাব্যের এই ধারাটির আলোচনা করেছেন। তাঁর 'আমরা কারা' কবিতাটি এবিষয়ে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, আমরা কারা?, যারা নিজেদের ভাষা, জাতি ভুলে সাহেবি ধারাকে গ্রহণ করছি। সমালোচক জানিয়েছেন, 'দেশ মাতৃকার চরণে আত্মসমর্পণ করে কবি সর্বনাশা অন্ধকার থেকে আলোর প্রার্থনায় নৈবেদ্য সাজান'।[৪১] সমালোচক মানকুমারী বসুর একাধিক কবিতার উদ্ধৃতি তুলে তার ব্যাখ্যাসহ মানকুমারী বসুর কাব্যে স্বদেশভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই বিষয়ক কবিতা রচনায় মানকুমারী বসুর কৃতিত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "মানকুমারী বসুদের কবিতা স্বদেশপ্রেম বিষয়ক বাংলা কবিতার ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণের দাবি জানায়।"[৪২]

সমালোচকের এই বক্তব্য মানকুমারী বসুর স্বাদেশিকতা বিষয়ক কবিতাগুলির গুরুত্বকে পাঠকদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। আমরা তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করি। শান্তি সিংহ তাঁর 'বাংলা কবিতায় মানকুমারী বসু' নামে সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মানকুমারী বসুর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমালোচক তাঁর আলোচনায় মানকুমারী বসুর বিভিন্ন ধারার কবিতাগুলিকে একসঙ্গে হাজির করে আলোচনা করেছেন। এই সমালোচনাটির গুরুত্ব এইখানে যে, মানকুমারী বসুর বিভিন্ন ভাবনা ও তাঁর কাব্যের একাধিক ধারার কবিতাগুলির বিচিত্র রসকে একটি সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধে হাজির করেছেন। সমালোচক একইসঙ্গে মানকুমারী বসুর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা, বাৎসল্য রসের কবিতা, শিশুবিষয়ক কবিতা, করুণ রসের কবিতা ও তাঁর রচিত মহাকাব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে

মানকুমারী বসুর একাধিক কবিতার বিশ্লেষণ থাকলেও, মানকুমারী বসুর কবিত্ব প্রতিভা সম্পর্কে সমালোচকের নির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য ফুটে ওঠেনি। শীতল চৌধুরী মানকুমারী বসুর কবিতায় প্রকাশিত তাঁর কল্যাণময় মানসিকতা ও তাঁর সৌন্দর্য চেতনার দিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁর সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধের শিরনাম হল 'মানকুমারী বসুর কবিতা: কল্যাণ সুন্দরে রূপশ্রী'। সমালোচক মানকুমারী বসুর কোমল, মঙ্গলময়ী হৃদয়ের অনুসন্ধান করেছেন তাঁর কবিতার মধ্যে। সমালোচক মনে করেন মানকুমারি বসু, 'শিবপূজা' কবিতাটিতে তাঁর কোমল হৃদয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং সর্বজীবের প্রতি সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। মানকুমারী বসুর কাব্য ভাবনা ও তাঁর কবিতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন—

> "....তাঁর কবিতা ও ভাব-ভাবনার জগৎ একান্তই দীর্ঘ ক্যানভাসে ত্বরান্বিত হতে পেরেছে কল্যাণ-সুন্দর-সৌন্দর্যে অলংকৃত হয়ে। মানকুমারী বসুর কবিতা তাই আজো সুন্দর, সংবেদনশীল, হৃদয়স্পর্শী, বাংলা কবিতার অঙ্গনে শিউলিফুলের গাছ। স্নিগ্ধতায় কোমলতায় উজ্জ্বল।"[৪৩]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতেই মানকুমারী বসু সম্পর্কে সমালোচকের মূল বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে। মানকুমারী বসুর কবিতায় শোক একটি গুরুত্বপুর্ণ ধারা। মানকুমারী বসুর কবিতায় প্রকাশিত শোকভাব বা তাঁর বেদনার স্বরূপ নিয়ে একটি আলোচনা করেছেন সুব্রত রায়চৌধুরী, তার 'মানকুমারী বসু: বেদনার ঊর্মিমালা' নামের সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধটিতে। কবির শোকের কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'প্রিয়প্রসঙ্গ' গ্রন্থটিতে। সমালোচকের মতে এই গ্রন্থের ভাষা নির্বাচন, শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাস আজও পাঠকদের বিস্মিত করে। কিন্তু মানকুমারী বসু তাঁর শোককে বিশ্বশোকে পৌঁছে দিতে পারেননি বলে সমালোচক মনে করেন। আমরাও এবিষয়ে সহমত পোষণ করি। আমাদের গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ে মানকুমারী বসু ও সমকালীন কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দৃষ্টান্তসহ আমরা এই মতকে প্রতিষ্ঠা করেছি। মানকুমারী বসুর কবিতায় তাঁর জীবন থেকে পিতা, স্বামী ও সন্তানের চলে

যাওয়াকে ঘিরে যেমন শোকের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি অপরদিকে এঁদের চলে যাওয়ার পর কবির জীবনে একাকীত্বের কারণে আবার শোকের উদ্ভব হয়েছে। সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "এই বিপন্নতাবোধ থেকে জেগেছে একাকীত্বের অনুভূতি। আর এখান থেকেই লক্ষ্য করা যায় মানকুমারীর বিষাদ সূচক কবিতার দ্বিতীয় স্তর। নিঃসঙ্গতা এই স্তরের মূলকথা।"[৪৪]

এই নিঃসঙ্গতা থেকে উনিশ শতকের নারীর যন্ত্রণাও উপলব্ধি করা যায়। আর এখানেই সমালোচনাটি সার্থক হয়ে ওঠে। মানকুমারী বসু মনীষীদের মৃত্যুতেও শোকগ্রস্ত হয়ে কিছু কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর এই ধরনের কবিতাগুলির একটি আলোচনা পাওয়া যায় তরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'মানকুমারী বসুর কবিতায় শোকাঞ্জলি' নামের সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধে। সমালোচকের ভাষায় এই কবিতাগুলিকে মনীষীবন্দনামূলক কবিতা বলা যায়। মানকুমারী বসুর এই কবিতাগুলিতে শোকের প্রকাশ খুব গভীর নয়। এই কবিতাগুলিকে স্মরণমূলক কবিতাও বলা যায়। আমরা আমাদের গবেষোণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি। মানকুমারী বসুর কবিতাকে বা তাঁর কবিসত্তাকে নিয়ে এই পর্যায়ে একাধিক সমালোচনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, প্রত্যেকটি সমালোচনার অভিমুখ ভিন্ন ভিন্ন। মানকুমারী বসুর কবিতা ও তাঁর কবিসত্তার বিভিন্ন ঘরানা নিয়ে সমালোচকগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের সেই মতামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা আমদের গবেষণায় উক্ত সমালোচনাগুলির মধ্য দিয়ে আধুনিক সমালোচনার ধারায় মানকুমারী বসুর অবস্থান নির্ণয় করতে চেয়েছি। 'তথ্যসূত্র' পত্রিকার 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যাই একমাত্র মানকুমারী বসুর উপর যথার্থ আধুনিক সমালোচনা বলে মনে করি। 'তথ্যসূত্র' পত্রিকার পরিশিষ্ট অংশে সম্পাদক মহাশয় মানকুমারী বসুর একাধিক অপ্রকাশিত লেখা, তাঁর সাহিত্যের বিজ্ঞাপন এবং তাঁকে নিয়ে অন্য সাহিত্যিকদের রচনা এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মানকুমারী বসুর পরিচয় বা স্তুতি নিবেদন অংশগুলি পুনমুদ্রিত করেছেন।

আধুনিক সমালোচনার ধারায় মানকুমারী বসুর আরও বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ভাবধারার প্রেক্ষাপটে মানকুমারী বসুর ভাবনা-চিন্তা ও তাঁর সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে তাঁর অবদান প্রভৃতি অনেক কিছুই আধুনিক সমালোচনায় আজও উপেক্ষিত। এই অবসরে মানকুমারী বসুর জীবন ও তাঁর সাহিত্য নিয়ে আমাদের গবেষণা আধুনিক সমালোচনার ফাঁকগুলি পূরণ করবে বলে আমরা মনে করি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য-

১. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু' অলোক রায় (সম্পা.) দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১০৬।

২. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', প্রচ্ছদ অংশ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, একাদশ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৪১। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ৮ দ্রষ্টব্য।

৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' অষ্টম সংস্করণের সূচীপত্র অংশের জন্য পরিশিষ্ট অংশের চিত্রসংখ্যা ৮, ৯, ১০, ও ১১ এবং একাদশ সংস্করণের সূচীপত্র অংশের প্রচ্ছদের জন্য পরিশিষ্ট অংশের চিত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্রষ্টব্য।

৪. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু' অলোক রায় (সম্পা.) দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১০৬।

৫. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', বিজ্ঞাপন অংশ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, অষ্টম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৪১, পৃষ্ঠা- ৬।

৬. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১।

৭. দ্রষ্টব্য: নীলরতন মুখোপাধ্যায়, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রীর প্রতি' পরিশিষ্ট-২, 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা- ২২৫।

৮. দ্রষ্টব্য: যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'কবি মানকুমারীর প্রতি', পরিশিষ্ট-২, 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা- ২২৬।

৯. কবির প্রতি প্রশস্তিগুলি 'তথ্যসূত্র' পত্রিকায় একসঙ্গে মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট-২, 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা- ২৩০।

১০. দ্রষ্টব্য: 'বামাবোধিনী' পত্রিকা ১৩২১ বঙ্গাব্দে জৈষ্ঠ্য সংখ্যা, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ', পৃষ্ঠা-৬৪। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ১৭ দ্রষ্টব্য।

১১. দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'-৫৯, 'মানকুমারী বসু', পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯, পৃষ্ঠা- ৫।

১২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ২৬-৪৮।

১৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ কাব্যের প্রচ্ছদের জন্য পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ১৮ দ্রষ্টব্য।

১৪. বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, মাঘ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৪২৯।

১৫. দ্রষ্টব্য: ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', দ্বিতীয় পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০০৯, পৃষ্ঠা-৪৭৯।

১৬. দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মাঘ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা-১৬।

১৭. দ্রষ্টব্য: অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য', দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ১৩০।

১৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভূমিকা অংশ, বারিদবরণ ঘোষ(সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা- ১১।

১৯. মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি, ক ৪১৪। মানকুমারী বসু, , 'কনকাঞ্জলি' তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি, ক ৪১৩। মানকুমারী বসু, 'বিভূতি', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ , ৮৩৪৩। মানকুমারী বসু, 'শুভসধনা', চন্দননগর লাইব্রেরি, ২১৭৬। প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ৮২৮.১ ০৯১৫ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উক্ত গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে থাকলেও, তাঁদের সংরক্ষণে গ্রন্থগুলি রক্ষিত নেই।

২০. দৃষ্টান্তস্বরূপ ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকার প্রচ্ছদের জন্য পরিশিষ্ট অংশে চিত্রসংখ্যা ১৯ দ্রষ্টব্য।

২১. দ্রষ্টব্য: ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকা, ‘কবি মানকুমারী বসু’ সংখ্যা, সূচিপত্র অংশ, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯।

২২. দ্রষ্টব্য: গৌতম সান্যাল, ‘মানকুমারী বসু: অতীতের হিমঘর থেকে’, ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকা, ‘কবি মানকুমারী বসু’ সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা- ১২।

২৩. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৩।

২৪. দ্রষ্টব্য: অন্তরা চৌধুরী, ‘আমার অতীত জীবন’- এক অন্তঃপুরিকা কবির জীবন ইতিহাস’, ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকা, ‘কবি মানকুমারী বসু’ সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা- ২৮।

২৫. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৩১।

২৬. দ্রষ্টব্য: সুবিমল মিশ্র, ‘মানকুমারী বসুর প্রবন্ধ: একটি অসম্পূর্ণ আলোচনা’, ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকা, ‘কবি মানকুমারী বসু’ সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা- ৪২।

২৭. দ্রষ্টব্য: সাইফুল্লা, প্রসঙ্গঃ মানকুমারী বসুর গদ্য-ভাষাশৈলী’, ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকা, ‘কবি মানকুমারী বসু’ সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-৬৫-৭৬।

২৮. দ্রষ্টব্য: অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মানকুমারীর ‘বনবাসিনী’: নারীধর্মের প্রথম আলো’, ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকা, ‘কবি মানকুমারী বসু’ সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-৫২।

২৯. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৫৩।

৩০. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৫৩।

৩১. দ্রষ্টব্য: সায়ন্তন মজুমদার, 'ছোটগল্পকার মানকুমারী বসু', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-৫৭।

৩২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৬২।

৩৩. দ্রষ্টব্য: অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ' 'বীরকুমার বধ': এক নিঃসঙ্গ এপিক', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-৭৯।

৩৪. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ৭৯-৮০।

৩৫. দ্রষ্টব্য: মোহিনীমোহন সরদার 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পুনর্নির্মাণে মানকুমারী বসুর অবদান' 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-৮৪।

৩৬. দ্রষ্টব্য: রাধেশ্যাম সাহা, 'মানকুমারী বসুর 'ভ্রমর': অথ সতীকথা', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-৯৮।

৩৭. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ১০২।

৩৮. রমেন সর, 'মানকুমারী: উনিশ শতকের নারী ও কবি', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-১০৮।

৩৯. মধুমিতা চক্রবর্তী সরকার, 'মানকুমারীর কবিতায় 'প্রকৃতি'', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-১২১।

৪০. পিয়ালী ঘোষ দস্তিদার, 'জগৎপারাবারের তীরে মানকুমারী: প্রসঙ্গ শিশু কবিতা', 'তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-১২৮।

৪১. বিকাশ রায়, 'মানকুমারী বসুর কবিতায় স্বাদেশিকতাবোধ', তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-১৪৪।

৪২. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ১৪৬।

৪৩. শীতল চৌধুরী, মানকুমারী বসুর কবিতা: কল্যাণ সুন্দরে রূপশ্রী', তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-১৭০।

৪৪. সুব্রত রায়চৌধুরী, মানকুমারীর কবিতা: বেদনার ঊর্মিমালা', তথ্যসূত্র' পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯, পৃষ্ঠা-১৭১।

-----0-----

অষ্টম অধ্যায়

ফলকথা: একালে মানকুমারী বসুর সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

অষ্টম অধ্যায়

ফলকথা: একালে মানকুমারী বসুর সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

সমাজ বিবর্তনশীল। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালি সমাজের আধুনিক বিবর্তন শুরু হয়। বাঙালির ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস, জীবন সংগ্রাম, জীবন প্রবাহের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত নতুন ভাবনার দ্বারা জারিত হতে থাকে। এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়, সাহিত্য ও সমাজ ইতিহাস আধুনিক বাঙালির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমাজের গুরুত্ব কেবল সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে নয়, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাবিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মানকুমারী বসুর জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর কাল, সামাজিক ইতিহাস, ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ জড়িয়ে রয়েছে। তাই মানকুমারী বসুর সাহিত্য পাঠ করলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সময় সম্পর্কে একটা নস্ট্যালজিক অনুভূতি পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর একাধিক ভাবধারা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি সেকালের সমাজ ইতিহাস ধর্মীয় চেতনা, মূল্যবোধও ফুটে ওঠে। তাই তাঁর সাহিত্য একালের পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য সমসাময়িক পুরুষ কবিদের[১] কাব্যে এই বহুমাত্রিক ভাবধারার প্রকাশ তেমন স্পষ্ট না। এদিক থেকে মানকুমারী বসুর সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বকীয়তার পৃথক গুরুত্ব রয়েছে।

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী সাতটি অধ্যায়ে এবং তার ষোলোটি উপধ্যায়ে মানকুমারী বসুর সামগ্রিক ব্যক্তি ও সাহিত্যিক সত্তার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা। প্রথম অধ্যায়ে উপঅধ্যায়সহ মানকুমারী বসুর ব্যক্তি জীবন সংক্রান্ত তথ্যের অনুসন্ধান করেছি আমরা। সেই অনুসন্ধানে মানকুমারী বসুর ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির শিক্ষা-চেতনা, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মীয়-ভাবনা, নারী সমাজের অবস্থান ও তাঁদের উন্নতিকল্পে সমাজ সংস্কারকদের সংগ্রাম ও আত্মনিবেদন যথাসম্ভব পর্যালোচনা করে তৎকালীন সমাজে কালের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত

করার চেষ্টা করেছি। সেই পর্যালোচনায় দেখেছি, হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের বিরোধের ইতিহাস। দেখেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রভাব ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যেও পড়েছিল। এবং তারই ফলে ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে প্রগতিমূলক বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলীয় বিভাজনও তৈরি হয়েছিল।[২] আসলে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেও যে সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রভাব ছিল, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। এই কারণেই সাতের দশকের পরবর্তীকালে নতুন করে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে[৩] এবং বলা যায়, এই সময়ে হিন্দু ধর্ম বৃহৎ পরিসর নিয়ে হাজির হয়েছিল, যার প্রভাব পরবর্তীকালের সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছিল। মানকুমারী বসুর ব্যক্তি জীবনে এই সময়, সমাজ ও ধর্মীয় চেতনার প্রভাব খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। মানকুমারী বসুর পরিবারের মানুষজন মূলত সনাতন হিন্দু ধর্মের ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন, সেই বিশ্বাসের প্রভাব তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও তাঁর সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মানকুমারী বসুর সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা আজকের দিনে এইখানেই যে, তাঁর সাহিত্য চর্চা করলে শুধু সাহিত্য, কাহিনি বা সাহিত্যের চরিত্র নয়, সেকালের সামাজ-ধর্ম-সামাজিক-ইতিহাস যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি লেখিকার মানস গঠনে সেই সমস্ত ঘটনার প্রভাবও আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। তিনি আসলে সেই কালের প্রতিনিধি। তাঁর সাহিত্যও কালের প্রতিনিধিত্ব করছে। মূলত এই কারণেই তিনি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও চর্চার দাবি রাখেন।

দ্বিতীয় উপঅধ্যায়ে মানকুমারী বসুর শিক্ষা সংক্রান্ত দিকগুলিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। উপনিবেশীয় ব্যবস্থায় ভারতবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদদের চিন্তাভাবনায় সীমাবদ্ধতা ছিল। স্বদেশের ভাবনাকে তাঁরা কোনো গুরুত্ব দিতে চাননি। কিন্তু এর মধ্যেও প্রাচ্যের শিক্ষাবিদদের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারী শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের মানসিকতা কিছুটা শিথিল হতে শুরু করে। মানকুমারী বসু এবং এই সময়ের একাধিক মহিলা এই ঘটনার ফল লাভ করতে পেরেছিলেন বলা যায়। এই সময়ে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের ফলেই সমাজের মধ্যে সনাতন কিছু মূল্যবোধের জাগরণ ঘটে। নারীর প্রথাগত শিক্ষা ও

পারিবারিক শিক্ষা চর্চার পিছনে উক্ত মূল্যবোধের প্রভাব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল নারী শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিনের আন্দোলন, একাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উচ্চসমাজের নারীদের মধ্যে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির প্রভাবকে আঁটকানোর চেষ্টায় বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কথা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন। আমরা সেই মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করি। এছাড়াও পুরুষদের মধ্যে উপনিবেশীয় ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবের ফলস্বরূপ তাঁদের মধ্যে শিক্ষিত স্ত্রী লাভের একটি মানসিকতাও তৈরি হয়েছিল। মানকুমারী বসুর 'গৃহলক্ষ্মী' উপন্যাসে শচীন্দ্রের মধ্যে এই মনোভাব লক্ষ করা যায়।[৪] সেকালের সমাজের এইরূপ চাহিদার সত্যতা আমরা মানকুমারী বসুর সাহিত্য থেকেই অনুধাবন করতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর শিক্ষার বিষয় হল প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, নীতিকথা প্রভৃতি গ্রন্থ। যদিও মানকুমারী বসু প্রথাগত শিক্ষার পাঠ খুব একটা পাননি। তিনি মূলত পারিবারিক আবহে শিক্ষার পাঠ সম্পূর্ণ করেছিলেন। মহিলাদের এই পারিবারিক শিক্ষা প্রাপ্তির ঘটনাটিও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। মানকুমারী বসু ওই সময়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল মূল্যবোধের প্রতি যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থার ফলে মহিলাদের মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্মের মূল্যবোধের প্রতি ও পারিবারিক সমাজের প্রতি একটি প্রত্যয়বোধ তৈরি হতে দেখা যায়। ইংরাজি ভাষা শিক্ষার প্রথাগত সুযোগ এই সময়ের নারীরা পাননি। যদিও মানকুমারী বসু তাঁর নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত, ইংরাজি ভাষা চর্চা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে মানকুমারী বসুর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও তিনি ব্যক্তিগত আগ্রহে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। সংসার সামলে প্রতিদিন রাত্রি ২-৩ টে অবধি তিনি পড়াশুনা করতেন। মানকুমারী বসুর এই নিষ্ঠা আজও আমাদের উৎসাহ দেয়। তাই একালে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য চর্চার গুরত্বকে অস্বীকার করা যায় না। মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন থেকে যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কৃতির সম্পর্কে জানা যায়, তেমনই তাঁর সাহিত্য থেকে সেকালের সমাজ ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা

সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি। এই সব প্রসঙ্গিকতা বিচার করে বলা যায়, একালে মানকুমারী বসু ও তাঁর সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব রয়েছে।

মানকুমারী বসুকে আমরা জানি মূলত কবি হিসেবে। 'প্রিয় প্রসঙ্গ', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি', 'বীরকুমার-বধ' মহাকাব্য, 'বিভূতি', 'সোনার সাথী' প্রভৃতি কাব্যগুলি জনসমাজে বিপুল প্রচারিত হলেও তাঁর একাধিক প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছোটগল্প পাঠকের অজানা নয়। তিনি

একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে একাধিক পত্রিকায় অসংখ্যা প্রবন্ধ, বেশকিছু উপন্যাস ও অনেক ছোটোগল্প রচনা করেছিলেন। তাঁর 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া', 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীগণের অবস্থা' প্রভৃতি একাধিক প্রবন্ধ যেমন 'বামাবোধিনী' পত্রিকার তরফ থেকে পুরস্কার পেয়এছিল তেমনি তাঁর 'শোভা', 'রাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি গল্পও কুন্তলীন পুরষ্কারে সম্মানিত হয়েছিল। এই সমস্ত রচনার জন্য তিনি সর্বদা আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন। তাঁর সেই প্রাসঙ্গিকতার সূত্রেই আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের বাস্তবায়ন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমাজে একাধিক ভাবনা ক্রিয়াশীল থাকলেও মানকুমারী বসুর জীবন-ভাবনায় প্রভাব ফেলেছিল তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভাবনাগুলিই, যা আমরা তাঁর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট হিসেবে উল্লেখ করতে চেয়েছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে ভাবগত বিরোধ তৈরি হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের ফলে নারীর শিক্ষা ও তার জীবনের পরিবর্তন হয়েছিল।[৫] সনাতন হিন্দু ধর্মের মূল্যবোধের প্রভাব যে সমাজে ছিল না তা নয়, তাও অনেকের বিশ্বাসে ক্রিয়াশীল ছিল।[৬] মানকুমারী বসু মূলত সেই সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েছিলেন। এই সনাতন মূল্যবোধের কারণে মানকুমারী বসু সমকালীন মহিলা সমাজের কল্যাণার্থে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সমাজের জন্য মহৎ কিছু একটা করার প্রত্যয় তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থা থেকেই লাভ করেছিলেন। 'সখা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেও মানকুমারী বসুর এইরূপ মহৎ কাজ করেছিলেন। 'বনবাসিনী' উপন্যাসের মধ্যেও তাঁর এমনই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।[৭]

মানকুমারী বসুর সাহিত্য ও ব্যক্তিজীবন থেকে আমরা তাঁর আবির্ভাবের পটভূমিসহ সমাজকল্যাণকর তাঁর মানসিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাই মানকুমারী বসুর জীবন ও সাহিত্য পর্যালোচনা করে লেখিকার জীবনের গুরুত্ব ও তাঁর সাহিত্য রচনার তাৎপর্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। মানকুমারী বসুর সাহিত্য যে একালের পাঠকের মননে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এইখানেই তাঁর সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা।

মানকুমারী বসু বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রচনা করলেও কবিতাই তিনি লিখেছেন বেশি। তাঁর রচির সেইসব কাব্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন অনেকেই। আমরা আমাদের গবেষণায় সেইসব আলোচনাসহ কবির কাব্যগ্রন্থগুলির বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে। সেইসঙ্গে মানকুমারী বসুর কবিত্ব প্রতিভার বিশ্লেষণমূলক আলোচনাগুলিকেও এখানে পুনর্মূল্যায়ন করার অভিপ্রায়ে সমালোচকদের মন্তব্যগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনায় মনোনিবেশ করে দেখেছি- যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থে মানকুমারী বসুর কবিতাগুলির শ্রেণি নির্ণয় করেছেন। তিনি তাঁর কবিতাগুলিকে সামাজিক, প্রাকৃতিক, জাতীয়তা বা স্বদেশিকতামূলক, সমসাময়িক ঘটনা বিষয়ক, পৌরাণিক ও শিশু বিষয়ক শ্রেণিতে বিভাজন করেছেন।[৮] তাঁর মতে এগুলিই হল মানকুমারী বসুর কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য। অথচ আমরা কাব্যবিশ্লেষণে দেখেছি, মানকুমারী বসুর কাব্যে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কথিত ভাগগুলির বাইরেও আরও একাধিক ভাগ আছে। মানকুমারী বসুর কবিতায় করুণ রস ও বাৎসল্য রসের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তিনি প্রশস্তি ও স্মরণমূলক কবিতা, শোককবিতা, পুনর্নির্মাণধর্মী কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাঁর একাধিক কবিতায় ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রকাশও লক্ষ করা যায়। তাই কবি হিসেবে তাঁর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলির মধ্যে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উদ্ভুত উগ্র স্বদেশপ্রেমের পরিচয় নেই। হিন্দু ধর্মের প্রেক্ষাপটে উদ্ভুত জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বারা মানকুমারী বসু প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেও

এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে তিনি একটা গর্ব অনুভব করতেন এবং তাঁর প্রকৃতি বর্ণনা বিষয়ক কবিতাগুলিতে অনুভূতির প্রাধান্য অপেক্ষা বর্ণনার আধিক্য বেশি। এই কবিতাগুলি রচনার ক্ষেত্রে কবি মনের রোমান্টিকতাই অধিক ক্রিয়াশীল ছিল বলা যায়। তবে মাঝে মাঝে সেইসব কবিতায় কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতারও পরিচয় আছে। তাঁর 'আমাদের দেশ' কবিতায় একথা বাস্তবায়িত হয়েছে স্বদেশপ্রেমের মোড়কে —

"আমাদের দেশ তারা! "সুজলা" সুফলা"
ছয় ঋতু যায় আসে,
চাঁদ ফোটে রবি হাসে,
আমাদের দেশে করে সুরধুনী খেলা;
বনে শোভে রাঙা ফুল,
গাছে গাছে পাখিকুল,
আমাদের দেশে হয় স্বভাবের মেলা;
কোথাও নগর, বন,
কোথা দেব-নিকেতন,
কোথাও শ্মশান, কোথা জলধি অতলা;"[৯]

আমরা আগেই স্বীকার করেছি মানকুমারী বসুর কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনার পাশাপাশি দেশপ্রেমের অনুভূতিও পাওয়া যায়। উপরিউক্ত কবিতাটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কবিতাতে মানকুমারী বসু ভগবান বা ঈশ্বরকে আপন বা নিজের মতো করে অনুভব করেছেন। আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচয়ও তাঁর এই কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। তবে জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে তাঁর একাধিক কবিতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কৃতির তত্ত্বকে বুঝতে মানকুমারী বসুর কবিতাগুলির গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বলাবাহুল্য যে সমসাময়িক পুরুষ কবিদের কবিতা থেকে এই পরিচয় সবসময় উঠে আসে না। তাই বলা যায় মানকুমারী বসুর কবিতাগুলির ভাবধারা আলাদা। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর লাঞ্ছনা, কৌলীন্য প্রথা, নারীর বিবাহ সমস্যা প্রভৃতি সামাজিক ঘটনার বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে

একাধিক কবিতায়। আবার অনেক কবিতায় নারীর কষ্টের কথা নারীরই কলমে আলাদা মাত্রা পেয়েছে। তাই কবিতাগুলির প্রাসঙ্গিকতা আজও সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত। আগেই বলা হয়েছে, মানকুমারী বসু পুনর্নির্মাণধর্মী বহু কবিতা রচনা করেছেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে সবসময় একটি নস্ট্যালজিক অনুভূতি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তাতে জীবনবোধ এবং সমাজবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই কবিতাগুলির বিষয় বিভিন্ন। যেমন 'ভ্রমর' কবিতায় গোবিন্দলালের থেকে প্রত্যাখ্যাত ভ্রমরের সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গিতে কবির অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে কবিতাটির ছত্রে ছত্রে-

"হায় অভাগী ভ্রমর!
তবু কি তাহার আশে
আবার রইবি কি ব'সে,
জ্বালায়ে জ্বলন্ত চিতা বুকের উপর?
স'য়ে কি এ বিষবাণ
রবে তোর দেহে প্রাণ?
এত কি অসাড় হবে রমণী-অন্তর?"[১০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবির এই সংবেদনশীল সংলাপ আমাদের মনকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। সনাতন মূল্যবোধের দ্বারা আজন্ম পালিত হয়েও মানকুমারী বসু নারীর যন্ত্রণাকে, পুরুষের স্বৈরাচারকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারেননি। কবিতার ভাষায় তিনি তথাকথিত নারীকে শক্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের 'রাধিকা' শিরনামের কবিতাটিতে মানকুমারী বসু রাধা চরিত্রের জবানিতে নারী প্রেমের একনিষ্ঠতা ও নারীর বিরহের গভীর অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছেন। এইসব কবিতা থেকে মানকুমারী বসুর কল্পনাশক্তি ও সাহিত্য পাঠের আগ্রহকে উপলব্ধি করা যায়। তাই কবিতাগুলি একালেও আলোচনার দাবি রাখে। আর সেই আলোচনা থেকেই কবি মানকুমারী বসুর চর্চার প্রাসঙ্গিকতাটি মহাকালের দরবারে মোহরাঙ্কিত হয়ে যায়। তাই একালে মানকুমারী বসুর ব্যক্তি ও স্রষতা জীবনের চর্চা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

মানকুমারী বসু 'বীরকুমার-বধ' (১৯০৪) নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় মহাকাব্য একাধিক কবি রচনা করেছিলেন। এই ব্যাপারে এঁদের পথিকৃৎ ছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মানকুমারী বসু হলেন মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাই মানকুমারী বসুর পক্ষে মহাকাব্য রচনায় তাঁর কাকা মধুসূদন দত্তের প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই প্রসঙ্গে মানকুমারী বসুর স্বীকারোক্তিও রয়েছে। তিনি বলেছিলেন-'আমি এই গ্রন্থের একস্থলে অর্থাৎ অভিমন্যুর মৃত্যুসময়ে মেঘনাদবধের অনুসরণ করিয়াছি। জ্ঞানতঃ আর কোথাও অনুকরণ করি নাই।'[১১] তবে শুধু অভিমন্যুর মৃত্যুতেই নয়, একাধিক জায়গায় তিনি তাঁর কাকা মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র অনুসরণ করেছেন বলে আমরা মনে করি। সেকথা আমরা প্রমাণ করেছি গবেষণা অভিসন্দর্ভের নির্দিষ্ট স্থানে। যদিও চরিত্রচিত্রণে, কাহিনি নির্মাণে, ভাষাব্যবহারে, ছন্দ রূপায়নে ও উপমা নির্বাচনে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। এই কথার সমর্থনে অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন, যা আমরা আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করেছি। মহাকাব্যের কাহিনি নির্মাণে তাঁর নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই বিষয়ে'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রভাব 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের উপর পড়েছে বলা যায়। মানকুমারী বসুর মহাকাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাঁর নারী চরিত্র সৃজন। মহাকাব্যের নারী চরিত্রগুলি যেমন উত্তরা, দ্রোপদী, গান্ধারী, সুভদ্রা প্রমুখ তাঁর মহাকাব্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একইসঙ্গে প্রেম, স্নেহ ও মাতৃত্বসুলভ অনুভূতি প্রকাশ করে তাঁরা মহৎ নারী চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। এই সমস্ত নারী চরিত্র সৃজনে মানকুমারী বসুর কৃতিত্ব প্রশংসারযোগ্য। 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছাড়া অন্যান্য মহাকাব্যে নারী চরিত্রের এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিরল। এছাড়া মহাকাব্যের রস, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে মানকুমারী বসু সর্বদা ওজোস্বীতাকে গ্রহণ করে তাঁর কাব্যে মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্যকে মান্যতা দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত মহাকাব্যের ধারা একটি ভিন্ন সাহিত্য ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এই ধারার একমাত্র মহিলা মহাকবি হিসাবে মানকুমারী বসুকে আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে

পারি। এই একটিমাত্র কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি চিরদিনই প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন।

প্রাবন্ধিক হিসাবেও মানকুমারী বসু সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নারীর উন্নতিকল্পে ও নারীর নৈতিক চরিত্র গঠনে তাঁর সুচিন্তিত মতামত আজও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। শুধু নারীর নৈতিক চরিত্র গঠনে নয়, নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও মানকুমারী বসু একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলিতে তাঁর যে চিন্তাভাবনা ও মননের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে তাতে বেশ বোঝা যায় তিনি কিছুটা হলেও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নারীর শিক্ষাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে গৃহবন্দী নারীকে সংস্কার ও প্রাচীন মূল্যবোধ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সমালোচক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেকথাই স্বীকার করেছেন তাঁর লেখায়। তিনি বলেছেন, "নূতন নারী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহল থেকে তাঁরা উচ্ছেদ হয়েছিল।"[১২] এই নতুন নারী শিক্ষা আসলে ইংরাজি ধাঁচে প্রাচ্যের সামাজিক শিক্ষাকে বোঝাতে চেয়েছেন সমালোচক। এই শিক্ষার ফলে নারীর মানসিক রুচির পরিবর্তন তো হলই, সেইসঙ্গে নারী কিছুটা প্রচলিত ধারণা থেকে মুক্তও হতে পারলো। কিন্তু তখনও নারীর মন থেকে সমাজের রক্ষণশীল ভাবনা সর্বার্থে মুছে যায়নি। মানকুমারী বসুর প্রবন্ধগুলিতে তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শুধু মানকুমারী বসুই নয়, এই সময়ের সকল লেখিকা যেমন কৈলাসবাসিনী দেবীও সমাজের নারীদের ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেছেন।[১৩] আরও বলা যায় মানকুমারী বসুর প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রভাব রয়েছে। তাঁর 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া', 'পঞ্চযজ্ঞ' 'আর্যমহিলা সুমিত্রা', 'আর্যমহিলা গান্ধারী' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১৪] মানকুমারী বসুর প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় অপর দিকগুলি হল তিনি নিজে নারী হয়ে নারীর প্রতি রক্ষণশীল সমাজের সংস্কার যেমন সতীত্ব, নারীর লজ্জা, নারীর সাংসারিক কর্তব্য, মেয়ে হিসেবে নারীর গুণ প্রভৃতি ভাবনাগুলিকে মান্যতা দিয়েছেন। এমনকি তিনি এমনও মত প্রকাশ করেছেন,- স্বামী বিপথগামী হলেও স্ত্রীর উচিত তাঁকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। অতীতের নারী চরিত্র তুলে এনে তিনি তাঁদের সতীত্ব,

উদারতা, পতিসেবা, সাংসারিক কর্তব্যে নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'আর্যমহিলা সুমিত্রা', 'আর্যমহিলা গান্ধারী', 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীগণের অবস্থা' প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে।[১৫] তাই মানকুমারী বসুকে আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার মধ্যে । কারণ যে মানকুমারী বসু নারীর প্রতি অবমাননার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তাঁর কবিতায়, সেই তিনিই আবার তাঁর গদ্য রচনায় একেবারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এখানে স্পষ্টতই বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যথার্থ প্রবন্ধ সাহিত্যের রচনা ও চর্চা শুরু হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। কিন্তু তাঁর পরের সব প্রাবন্ধিকই যে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন এমনটা নয়, অনেকসময় তাঁরা দুর্বল এবং দ্বান্দ্বিক মতবাদের প্রবন্ধও রচনা করেছেন। মানকুমারী বসু তেমনি একজন প্রাবন্ধিক ছিলেন। মানকুমারী বসু তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়কে তুলতে চেয়েছিলেন। তার অধিকাংশ প্রবন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাধান্যের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর সময় ও সমাজ মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই কালের একজন মহিলা প্রাবন্ধিক হিসাবে তিনি কম গুরুত্বপূর্ণ নন। একালের অনুসন্ধানে তাঁর প্রবন্ধগুলি আজও পাঠক গবেষকের আগ্রহকে উজ্জীবিত করে। তাই প্রাবন্ধিক মানকুমারী বসুর চর্চা আজও অপ্রাসঙ্গিক হয় না।

তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্প সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধের প্রভাব তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে লক্ষ করা যায়। মানকুমারী বসু কথাসাহিত্য রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে আমরা মনে করি। তাঁর সব উপন্যাসে নৈতিকতার পাঠ লক্ষ করা যায়। তাঁর 'গৃহলক্ষী' উপন্যাসে মাতৃভক্তির নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।[১৬] সততা ও আদর্শের পরাকাষ্ঠা নির্মিত হয়েছে তাঁর 'মহামুহূর্ত্ত' নামের উপন্যাসে।[১৭] তবে তাঁর ছোটোগল্পগুলির আবেদন উপন্যাসের থেকে অনেক বেশি। সেখানে নৈতিকতার ভার অনুভব করা যায় না। তাঁর 'দিদিমার রূপকথা' গল্পটি রূপকথার ধাঁচে রচিত। এই গল্পটিতে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র প্রভাব রয়েছে বলা যায়।[১৮] তাঁর প্রত্যেকটি গল্পের ভাব ও রস বিচিত্র। 'ভৈরবী', 'পত্নী' 'অদৃষ্টলিপি' নামের গল্পগুলিতে রসাস্বাদনে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মানকুমারী

বসু তাঁর গল্পে বিচিত্র ধরনের নারী চরিত্রের নির্মাণ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ভাবনাকে তিনি একটি করে নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেন ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পত্নী' গল্পে শ্যামা আদর্শ পত্নী, আবার 'ভৈরবী' গল্পে ভৈরবী সমাজের অবহেলিত নারীর প্রতিনিধি। তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্প থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কাহিনি ও চরিত্রের মাধ্যমে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধগুলিকে বুনে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আবার গল্পগুলি আস্বাদন গুণেও উপভোগ্য। মানকুমারী বসুর কথাসাহিত্য তাই চিরকালীন। কথাসাহিত্যিক মানকুমারী বসুকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এখানেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়, সমাজ-ভাবনা, মূল্যবোধ প্রভৃতি সবকিছুকে মানকুমারী বসু এতটাই আত্মস্থ করেছিলেন যে, তাঁর সাহিত্য সময়ের নিগড়ে বাঁধা হয়ে আছে। এই কারণেই মানকুমারী বসু আধুনিক পাঠকের কাছে সমাদৃত। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীকে জানতে হলে মানকুমারী বসুর সাহিত্য পাঠ জরুরি হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যের চরিত্ররা একটি বাস্তব ভিত্তি পেয়েছিলেন। সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'ঘরে বাইরে'র 'বিমলা',বা 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল এমনকি 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, নারীর স্বাধীন স্বকীয় চিন্তা, স্বামীর ঘেরাটোপ ও বন্ধন থেকে মুক্তি এমনকি তাঁর চিরকালীন সতীত্বের ধারণার আমূল পরিবর্তন আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে মুক্তি ও স্বাধীনতা ঘোষণা করার দলিল হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর নারী চরিত্ররা নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশে মূর্ত হয়েছেন সেই ভিত্তিভূমি রচয়িতাদের মধ্যে মানকুমারী বসু ছিলেন একজন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের অনেক পরিশ্রম, সংগ্রাম, ত্যাগ এবং সাধনা বিংশ শতাব্দীর নারীকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনেকটা 'অক্সিজেন' জুগিয়েছে বলা যায়। তাই মানকুমারী বসুর সাহিত্য সাধনা পরবর্তীকালের নারীর সাহিত্য চর্চাকে বেশকিছুটা এগিয়ে দিয়েছে এবং আধুনিক মহিলা

সাহিত্যিকদেরকে রচনার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে তাঁদের সৃষ্টির পথকে সুগম করেছে। এইরূপ একজন সাহিত্যিক কি একালে চর্চার দাবি রাখেন না? উত্তর, নিশ্চয়ই রাখেন। আর সেই নিরিখেই মানকুমারী বসুর ব্যক্তি জীবন ও তাঁর সৃষ্টি আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

মানকুমারী বসুর সমসাময়িক সময়ে আরও একাধিক মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের প্রত্যেকের সৃষ্ট সাহিত্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব কমবেশি পড়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই সময়কে কমবেশি আত্মস্থও করেছিলেন। সেইদিক থেকে তাঁরা আজও প্রাসঙ্গিকত। এই কারণেই মানকুমারী বসুর সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যের খুব বেশি পার্থক্য নেই। এবিষয়ে সমালোচক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, "....স্বামী ও সন্তানপালনের দায়িত্বের প্রতি আজীবন আনুগত্যই এঁদের রচনার মূল সুর হয়ে উঠেছিল।"[১৯] মূলত সেই কারণেই এই সময়পর্বের প্রত্যেক সাহিত্যইকের মধ্যে একটা সাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে অনুভূতির মাত্রাবোধের তারতম্যে তাঁদের প্রত্যেকের সাহিত্যে পার্থক্যও যে নেই তা নয়। মানকুমারী বসুর কাব্যে শোকধর্মিতা বেশি এবং তাঁর সেই শোকের প্রকাশ স্বামী, সন্তান বা সমাজের মহৎ কোনো ব্যক্তিকে ঘিরেই রচিত হয়েছে। অন্যদের কবিতায় শোকের প্রকাশ থাকলেও তা তাঁদের কাব্যে খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি এবং তাঁদের অধিকাংশেরই কাব্যে শোক ব্যক্তিভাবনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। কামিনী রায়ের কবিতায় যেমন গ্রাম্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য ধরা পড়েছে। গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী তাঁর কবিতায় শব্দ দিয়ে ছবি এঁকেছেন। প্রত্যেকের সাহিত্যেই এইসকল গুণ লক্ষ করা যায়। মানকুমারী বসুর শিশু ও কিশোর পাঠ্য কবিতা এবং পুনর্নির্মাণধর্মী কবিতাগুলি আবার অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা মানকুমারী বসু এবং সমসাময়িক একাধিক মহিলা ও পুরুষ কবিদের কবিত্ব প্রতিভার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য গুলি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়ে তাঁরা প্রত্যেকেই সাহিত্য চর্চা করেছেন এবং প্রত্যেকের সাহিত্যেই একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তুলনামূলক আলোচনা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ভাবধারাগুলি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সমসাময়িক অন্যান্য

সাহিত্যের সঙ্গে মানকুমারী বসুর রচনার বিষয়গত ও ভাবগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলি আধুনিক পাঠকের কাছে অবশ্যই বিচার্য। এই নিরিখেও মানকুমারী বসু এবং তাঁর রচিত সাহিত্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

মানকুমারী বসুর সাহিত্য থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ভাবধারা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর ব্যক্তিজীবন, কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্য থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আমরা বিশদে জানতে পারি। কিন্তু তিনি আজও অচর্চিত থেকে গেছেন। তাঁর সাহিত্যের চর্চা ও সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সাহিত্যের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাঁর সাহিত্যের আলোচনা যে আধুনিক পাঠককে মানকুমারী বসু সম্পর্কে আরও আগ্রহী করে তুলবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মানকুমারী বসুর সাহিত্য সমালোচনা থেকে তাঁর ভাবনা-চিন্তা, জীবনবোধ সম্পর্কে পাঠকগণের ধারণা আরও স্বচ্ছ হতে পারবে। যদিও বিভিন্ন গ্রন্থে মানকুমারী বসুর শুধু পরিচয়টুকু ছাড়া আর তেমন কোনো সমালোচনা পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিককালে 'তথ্যসূত্র' পত্রিকার 'কবি মানকুমারী বসু' সংখ্যায় মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে এবং মোট কুড়ি জন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন ও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই পত্রিকাটি আধুনিক সমালোচনার ধারায় মানকুমারী বসুকে নিয়ে একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য সমালোচনা বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান যে আমরা তাঁর সাহিত্য থেকে লাভ করেছি, সে বিষয়ে আধুনিক সমালোচকদের সমর্থন আমরা পাই। সমালোচনার ধারায় মানকুমারী বসুর প্রতিষ্ঠা হয়ত খুব বেশি নয়, তবে তিনি একেবারে প্রান্তিকও নন। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে যথাসম্ভব আলোকপাত করেছি এবং সমালোচকদের বক্তব্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সাহিত্যিক মানকুমারী বসুর সাহিত্য প্রতিভার মূল্যায়নও করেছি।

মানকুমারী বসুকে নিয়ে আমরা আমাদের গবেষণায় মৌলিক কিছু বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। মানকুমারী বসুর ব্যক্তি জীবন ও তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে

ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশকিছু সমাজ সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যবোধকে চিহ্নিত করেছি। সেই সংক্রান্ত বেশকিছু তত্ত্ব সৃষ্টির কারণ, উদ্ভব, বিকাশ ও তার ফলাফল নিয়ে আমাদের বক্তব্যকেও আমরা উপস্থাপন করেছি। এছাড়া মানকুমারী বসুর একাধিক অগ্রন্থিত সাহিত্যের পরিচয় উদ্ধার করেছি। মানকুমারী বসুর জীবন ও সাহিত্য যে একালে চর্চার দাবি রাখে, সেকথা আমরা বার বার স্বীকার করেছি। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনায় আমাদের সেই দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেও আমরা মনে করি। আমাদের গবেষণায় মানকুমারী বসুর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র্য পথের সন্ধান দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য:-

১. সমাময়িক পুরুষ কবি বলতে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রমুখ। এঁদের নিয়ে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

২. দ্রষ্টব্য: স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', 'ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন', পুস্তক বিপণি, অগাস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩১১-৩৪২।

৩. দ্রষ্টব্য: স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', 'হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন', পুস্তক বিপণি, অগাস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩১১-৩৪২।

৪. আমরা আমাদের গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে 'গৃহলক্ষ্মী' উপন্যাসটি আলোচনা করেছি।

৫. দ্রষ্টব্য: অলোক রায়, 'উনিশ শতকে নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান', 'ব্রাহ্মসমাজ ও সংস্কার আন্দোলন', অক্ষর, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৩৬৮-৩৭৪।

৬. দ্রষ্টব্য: স্বপন বসু, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', 'হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন', পুস্তক বিপণি, অগাস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩১১-৩৪২।

৭. আমরা এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি আমাদের গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে।

৮. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'মানকুমারী বসু' অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা- ১১৪

৯. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'আমাদের দেশ', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃষ্ঠা ১৭৯।

১০. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'ভ্রমর', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্য, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৩৪১, পৃ. ২৭।

১১. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার বধ' কাব্য, নিবেদন অংশ, তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২।

১২. দ্রষ্টব্য: সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘প্রাঙ্গন-বিহারিণী-রসবতী উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী’, ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ.-১৯০।

১৩. দ্রষ্টব্য: কৈলাসবাসিনী দেবী, ‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি’, স্বপন বসু(সম্পা.)। ‘উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা’, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৪৯-১৬৪।

১৪. এই বিষয়ে আমরা আমাদের গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

১৫. এই বিষয়ে আমরা আমাদের গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

১৬. এই বিষয়ে আমরা আমাদের গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

১৭. এই বিষয়ে আমরা আমাদের গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

১৮. দ্রষ্টব্য: মানকুমারী বসু ‘দিদিমার রূপকথা’, ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ২৪৬।

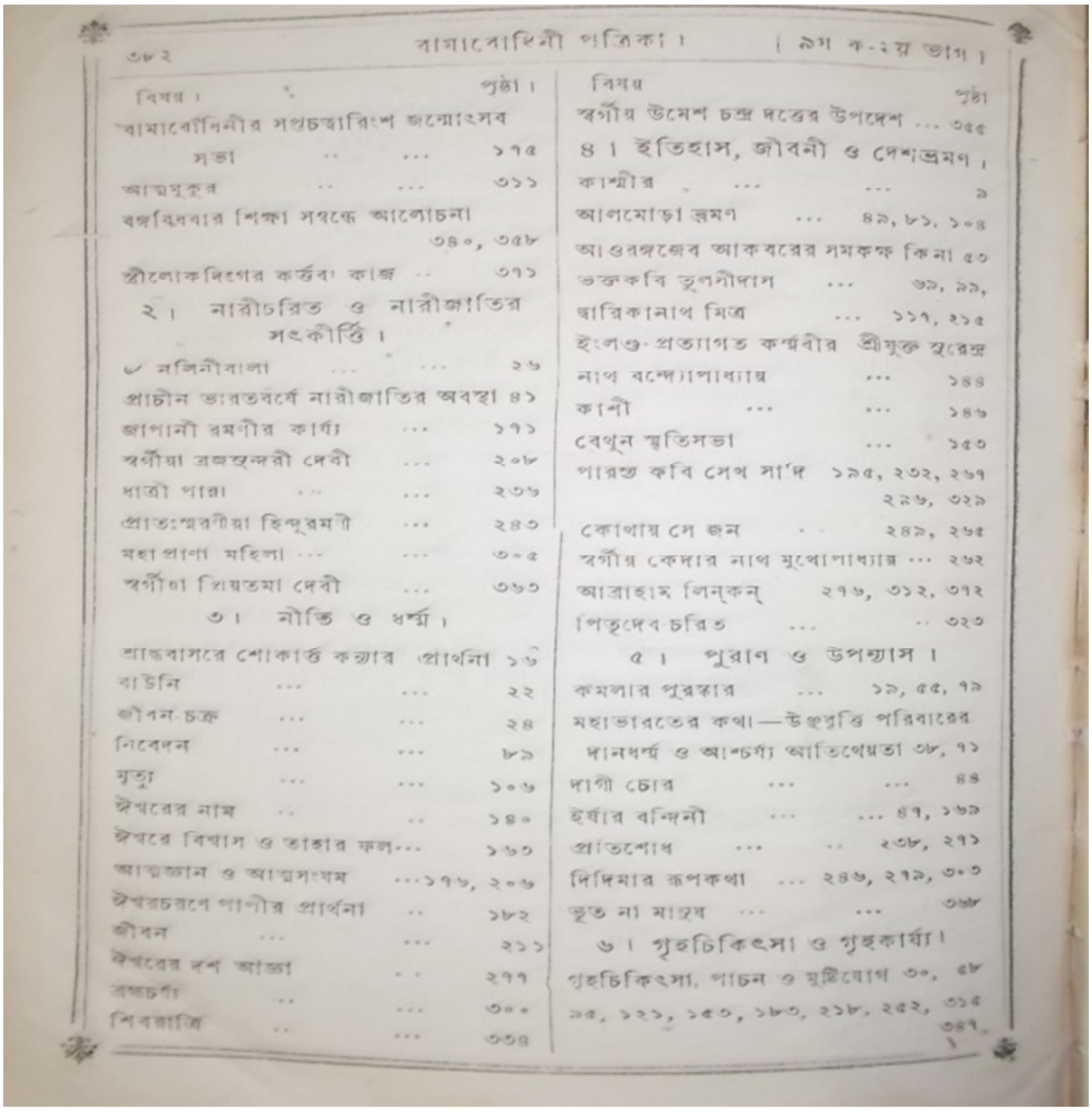
১৯. দ্রষ্টব্য: সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘প্রাঙ্গন-বিহারিণী-রসবতী উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী’, ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ.-১৯৬।

-----0-----

পরিশিষ্ট

(গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, গ্রন্থ ও দুষ্প্রাপ্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের প্রচ্ছদ পত্র, নামপত্র- ইত্যাদির ফটোকপি, প্রতিলিপি এবং মানকুমারী বসুর ব্যক্তিগত আলোকচিত্র প্রভৃতির সংগ্রহ ও সংকলন)

চিত্রসংখ্যাঃ ১



৩৮২ বামাবোধিনী পত্রিকা। [৯ম ক-২য় ভাগ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

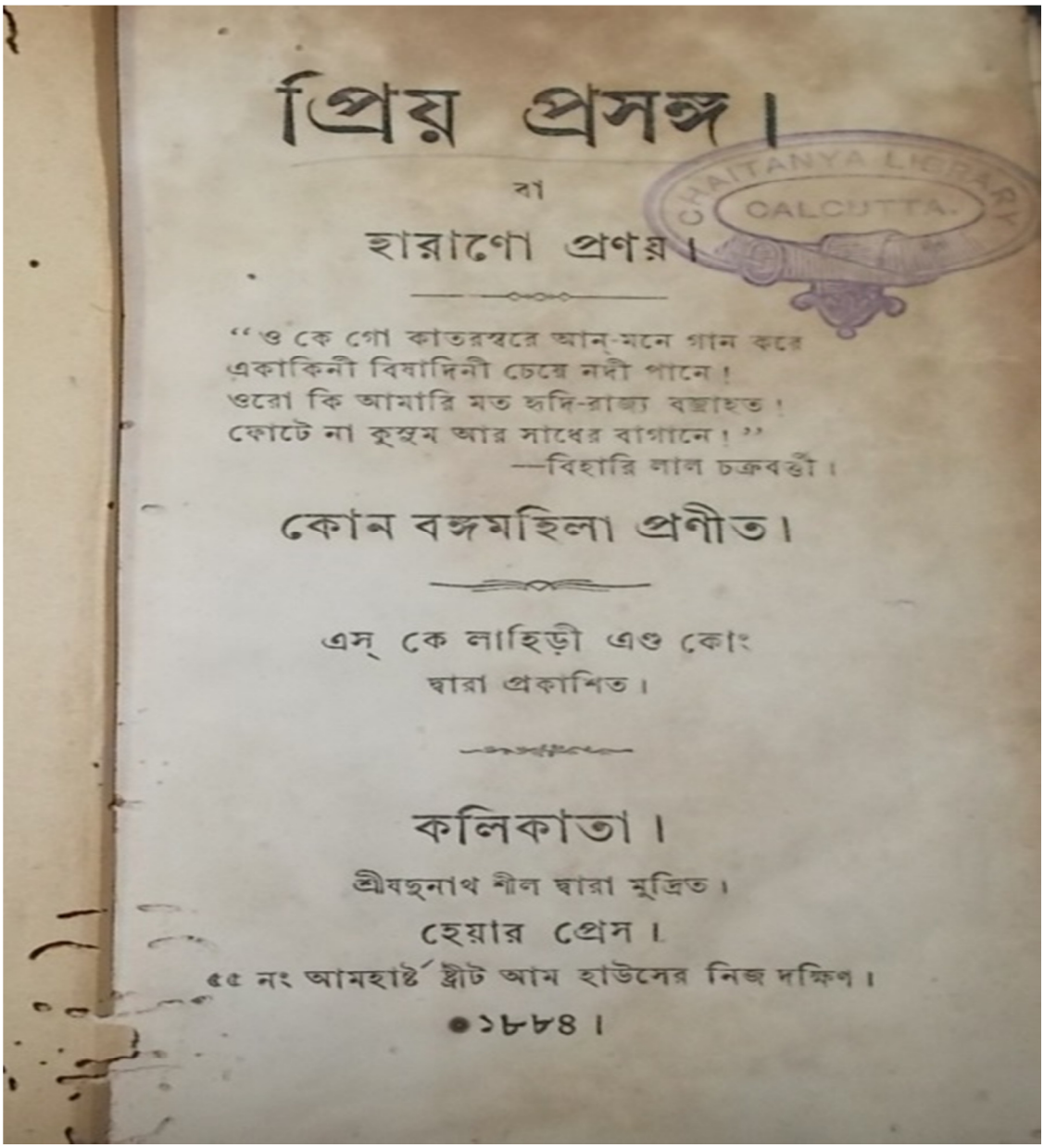
বামাবোধিনীর সপ্তচত্বারিংশ জন্মোৎসব সভা ... ১৭৫
আত্মমুকুর ... ৩১১
বঙ্গবিধবার শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ৩৪০, ৩৫৮
স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য কাজ ... ৩৭১
২। নারীচরিত ও নারীজাতির সৎকীর্ত্তি।
৺ নলিনীবালা ... ২৬
প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীজাতির অবস্থা ৪১
জাপানী রমণীর কার্য্য ... ১৭১
স্বর্গীয়া ব্রজসুন্দরী দেবী ... ২০৮
ধাত্রী পান্না ... ২৩৬
প্রাতঃস্মরণীয়া হিন্দুরমণী ... ২৪৩
মহাপ্রাণা মহিলা ... ৩০৫
স্বর্গীয়া প্রিয়তমা দেবী ... ৩৬৩
৩। নীতি ও ধর্ম্ম।
শ্রাদ্ধবাসরে শোকার্ত্ত কন্যার প্রার্থনা ১৬
বাউনি ... ২২
জীবন-চক্র ... ২৪
নিবেদন ... ৮৯
মৃত্যু ... ১০৬
ঈশ্বরের নাম ... ১৪০
ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাহার ফল ... ১৬৩
আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম ... ১৭৬, ২০৬
ঈশ্বরচরণে পাপীর প্রার্থনা ... ১৮২
জীবন ... ২১১
ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ... ২৭৭
ব্রহ্মচর্য্য ... ৩০০
শিবরাত্রি ... ৩৩৪

বিষয় পৃষ্ঠা

স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দত্তের উপদেশ ... ৩৫৫
৪। ইতিহাস, জীবনী ও দেশভ্রমণ।
কাশ্মীর ... ৯
আলমোড়া ভ্রমণ ... ৪৯, ৮১, ১০৪
আওরঙ্গজেব আকবরের সমকক্ষ কিনা ৫৩
ভক্তকবি তুলসীদাস ... ৬৯, ৯৯,
দ্বারিকানাথ মিত্র ... ১১৭, ২১৫
ইংলণ্ড-প্রত্যাগত কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৪৪
কাশী ... ১৪৬
বেথুন স্মৃতিসভা ... ১৫৩
পারস্য কবি সেখ সা'দ ১৯৫, ২৩২, ২৬৭ ২৯৬, ৩২৯
কোথায় সে জন ... ২৪৯, ২৬৫
স্বর্গীয় কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় ... ২৬২
আব্রাহাম লিন্‌কন্ ২৭৬, ৩১২, ৩৭২
পিতৃদেব চরিত ... ৩২৩
৫। পুরাণ ও উপন্যাস।
কমলার পুরস্কার ... ১৯, ৫৫, ৭৯
মহাভারতের কথা—উঞ্ছবৃত্তি পরিবারের দানধর্ম্ম ও আশ্চর্য্য আতিথেয়তা ৩৮, ৭১
দাগী চোর ... ৪৪
ইর্ষার বন্দিনী ... ৪৭, ১৬৯
প্রতিশোধ ... ২৩৮, ২৭১
দিদিমার রূপকথা ... ২৪৬, ২৭৯, ৩০৩
ভূত না মানুষ ... ৩৬৮
৬। গৃহচিকিৎসা ও গৃহকার্য্য।
গৃহচিকিৎসা, পাচন ও মুষ্টিযোগ ৩০, ৫৮ ৯৫, ১২১, ১৫৩, ১৮৩, ২১৮, ২৫২, ৩১৫ ৩৪৭

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বামাবোধিনী পত্রিকার সূচিপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ১১৫ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা: ২



প্রিয় প্রসঙ্গ।

বা

হারাণো প্রণয়।

CHAITANYA LIBRARY
CALCUTTA.

"ও কে গো কাতরস্বরে আন্-মনে গান করে
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদী পানে!
ওরো কি আমারি মত হৃদি-রাজ্য বজ্রাহত!
ফোটে না কুসুম আর সাধের বাগানে!"

—বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী।

কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত।

এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং
দ্বারা প্রকাশিত।

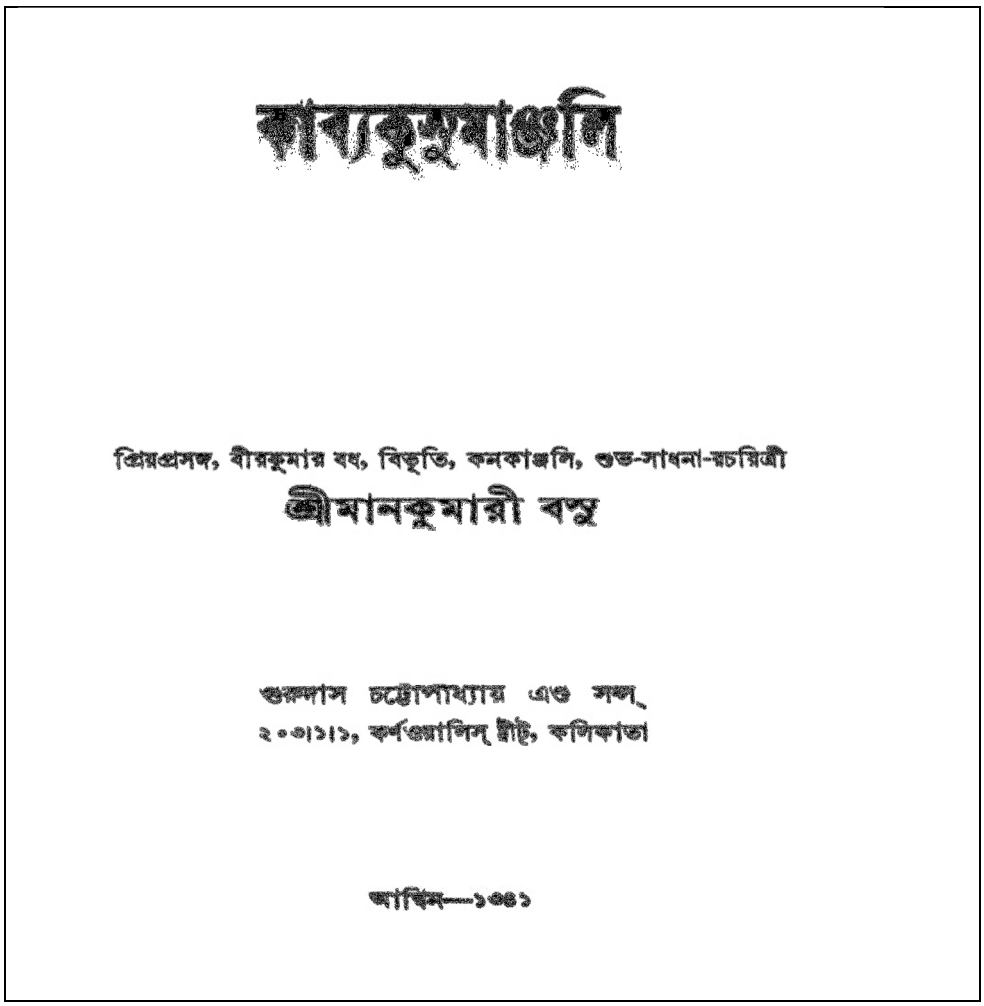
কলিকাতা।

শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত।
হেয়ার প্রেস।
৫৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট আম হাউসের নিজ দক্ষিণ।
●১৮৮৪।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারাণো প্রণয়' কাব্যের নামপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

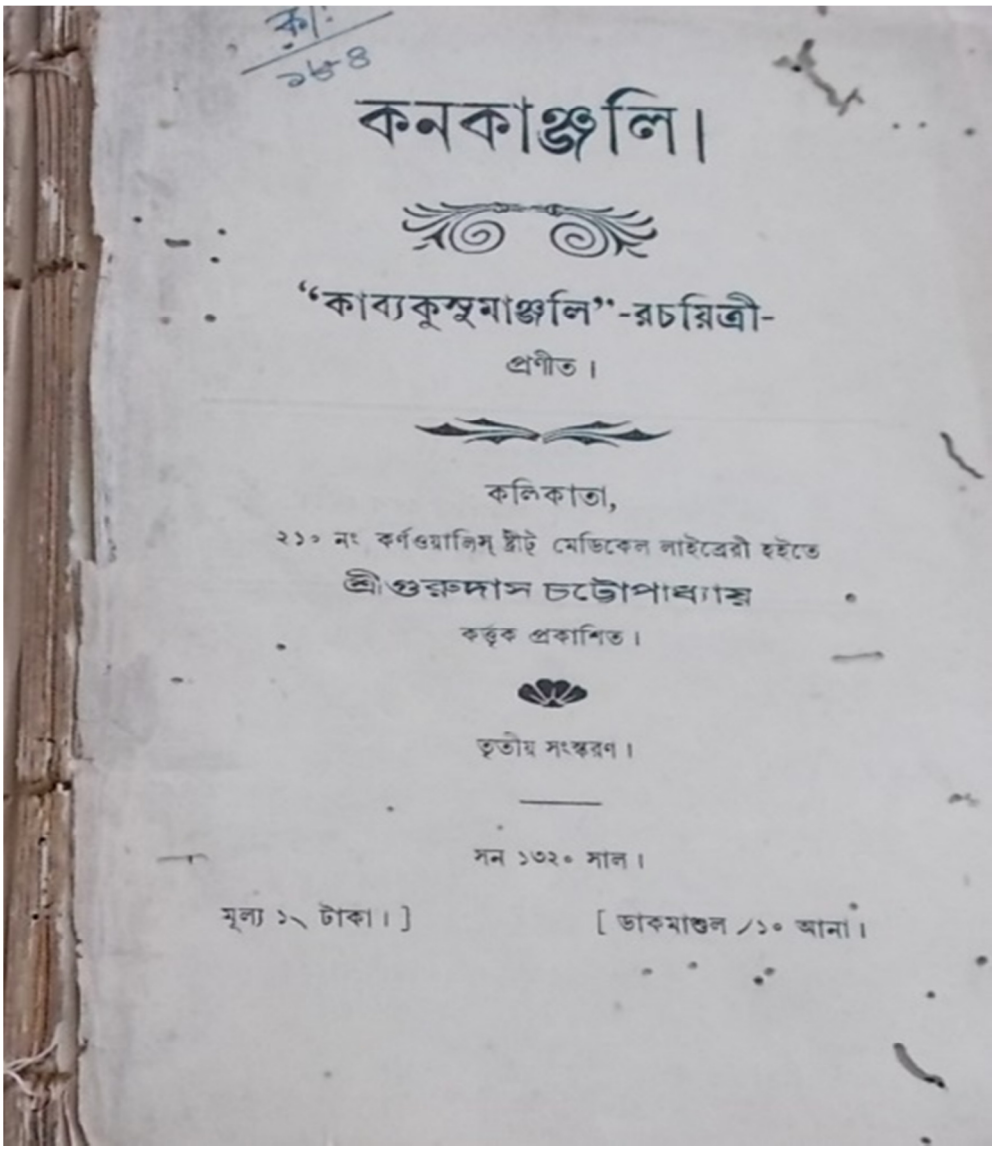
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা----, ১১৭ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা: ৩



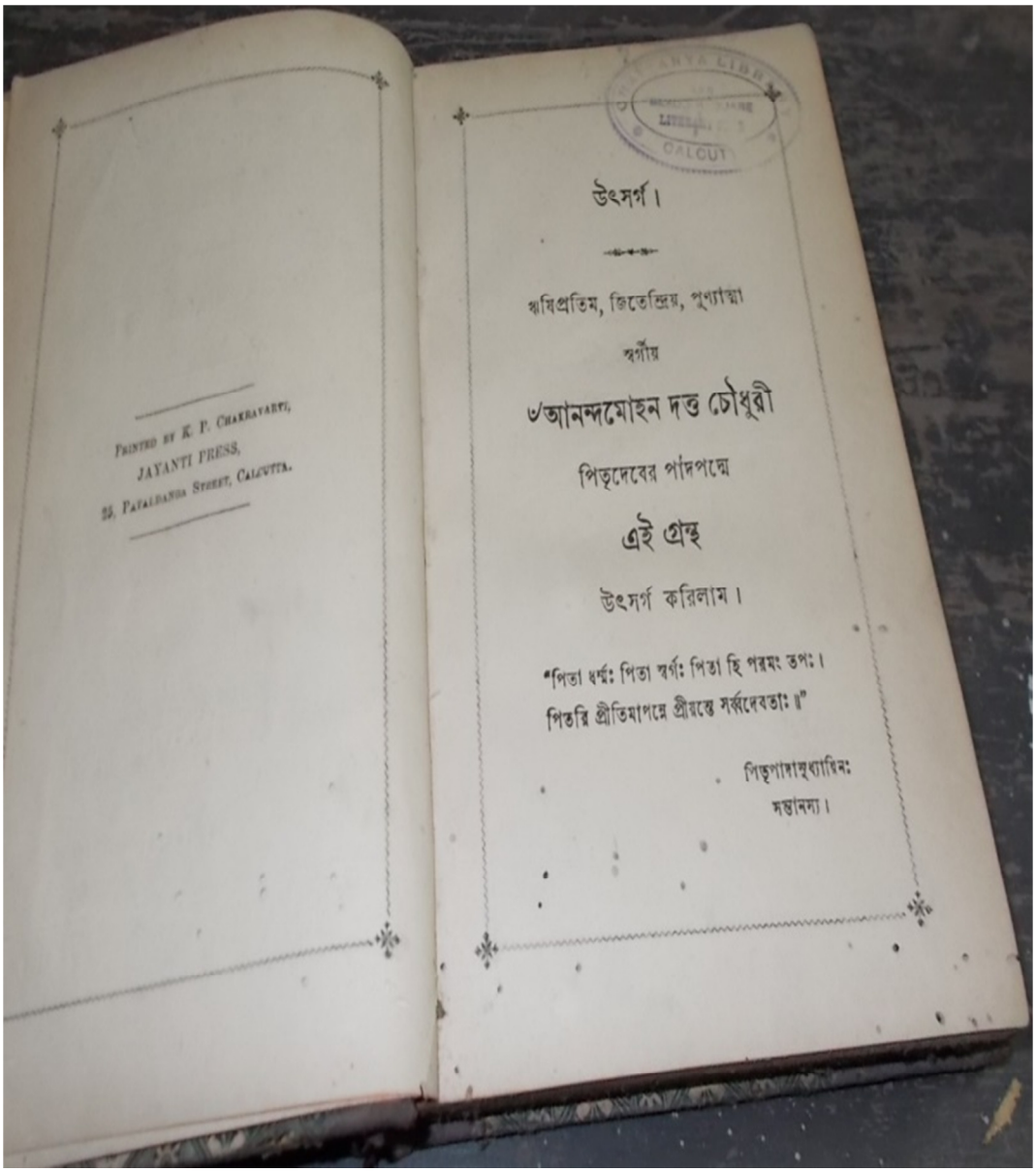
স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের নামপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ১১৮ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা: ৪



বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের নামপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, **১১৯** নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা: ৫



Printed by K. P. Chakravarti,
JAYANTI PRESS,
25, Patalbanga Street, Calcutta.

উৎসর্গ।

ঋষিপ্রতিম, জিতেন্দ্রিয়, পুণ্যাত্মা

স্বর্গীয়

৺আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী

পিতৃদেবের পাদপদ্মে

এই গ্রন্থ

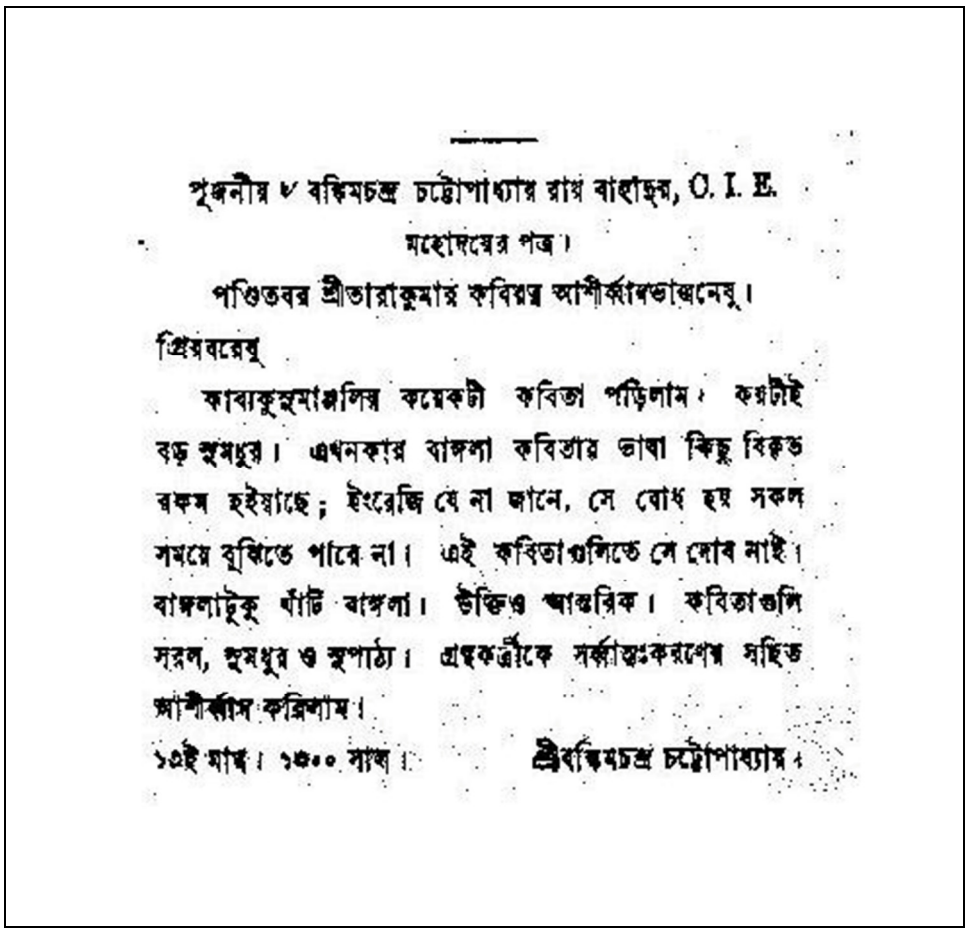
উৎসর্গ করিলাম।

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পিতৃপাদানুধ্যায়িনঃ
সন্তানস্য।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত 'বীরকুমার-বধ' নামের মহাকাব্যের উৎসর্গ পত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ১২০ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা: ৬



পূজনীয় ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, C. I. E.
মহোদয়ের পত্র।

পণ্ডিতবর শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন আশীর্ব্বাদভাজনেষু।

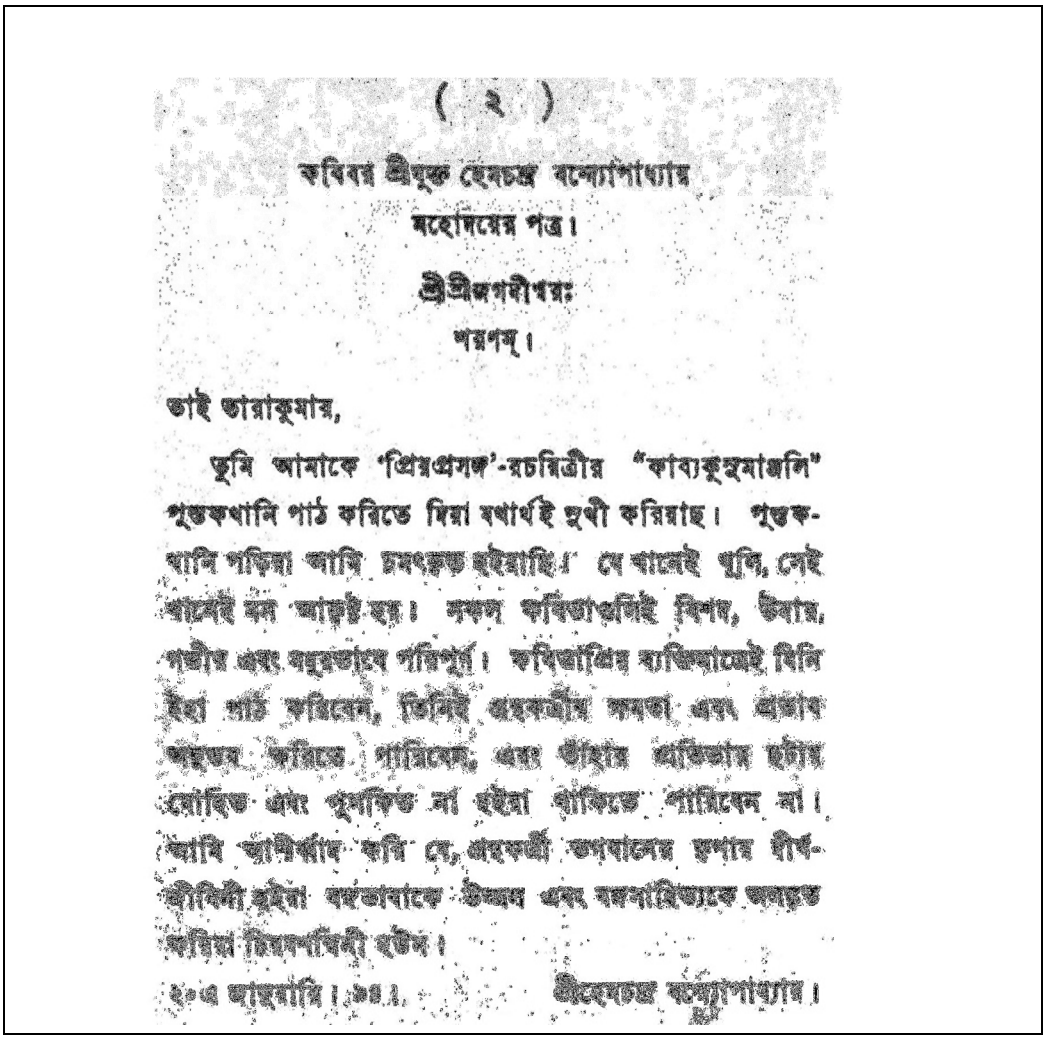
প্রিয়বরেষু

কাব্যকুসুমাঞ্জলির কয়েকটী কবিতা পড়িলাম। কয়টীই বড় সুমধুর। এখনকার বাঙ্গলা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরেজি যে না জানে, সে বোধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই। বাঙ্গলাটুকু খাঁটি বাঙ্গলা। উক্তিও আন্তরিক। কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও সুপাঠ্য। গ্রন্থকর্ত্রীকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলাম।

১৩ই মাঘ। ১৩০০ সাল। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ কাব্যের বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত প্রকাশককে দেওয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ১২৬ নং সূত্রের বিবরণী অংশ

চিত্রসংখ্যা: ৭



(২)

কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মহোদয়ের পত্র।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ
শরণম্।

ভাই তারাকুমার,

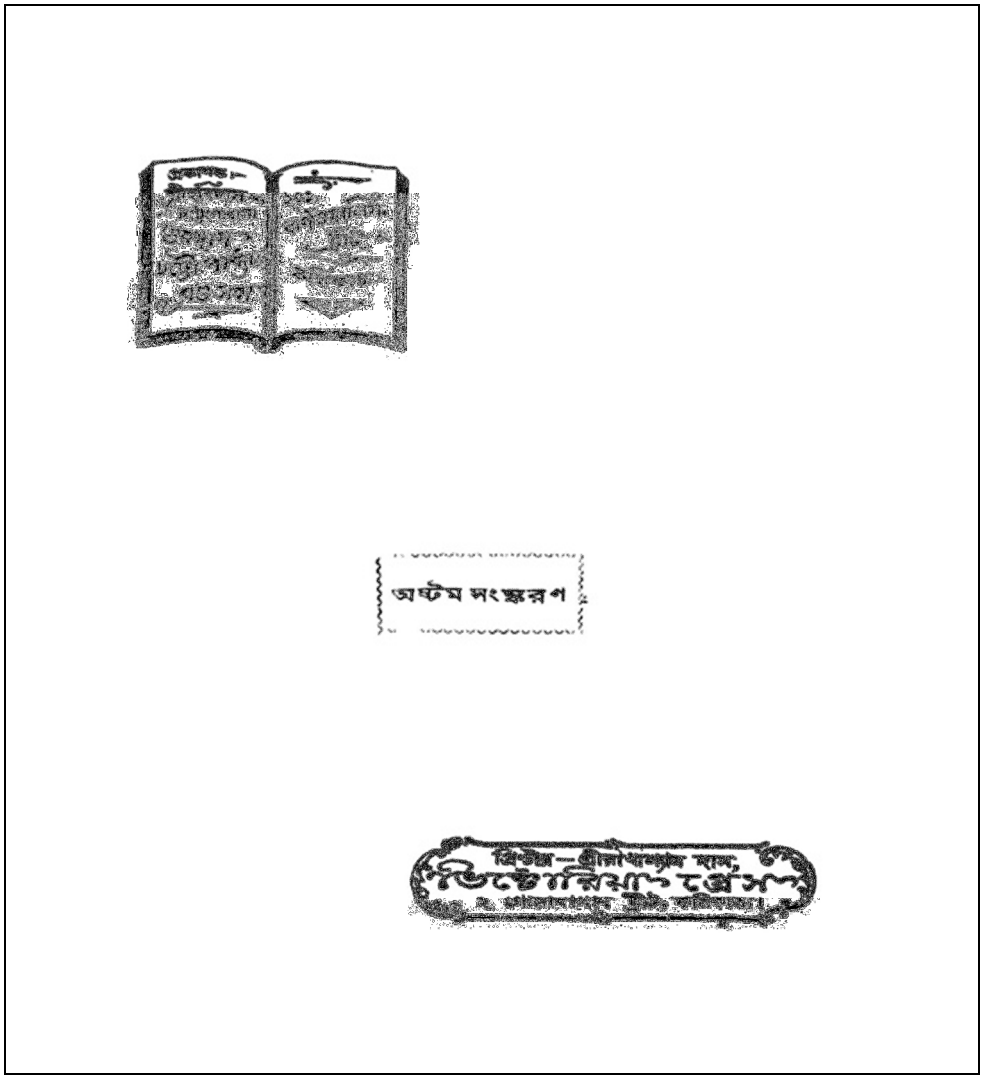
তুমি আমাকে 'প্রিয়প্রসঙ্গ'-রচয়িত্রীর "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" পুস্তকখানি পাঠ করিতে দিয়া যথার্থই সুখী করিয়াছ। পুস্তকখানি পড়িয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। যে স্থানেই খুলি, সেই স্থানেই মন আকৃষ্ট হয়। সকল কবিতাগুলিই বিশদ, উদার, গভীর এবং বহুভাবে পরিপূর্ণ। কবিতাগ্রির ব্যক্তিমাত্রেই যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকর্ত্রীর ক্ষমতা এবং প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ রোহিত এবং পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আমি আশীর্ব্বাদ করি যে, গ্রন্থকর্ত্রী ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবিনী হইয়া বহুভাবাকে উজ্জ্বল এবং বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া চিরযশস্বিনী হউন।

২০এ জানুয়ারি। ৮৪।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যে বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত প্রকাশককে দেওয়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ১২৬ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

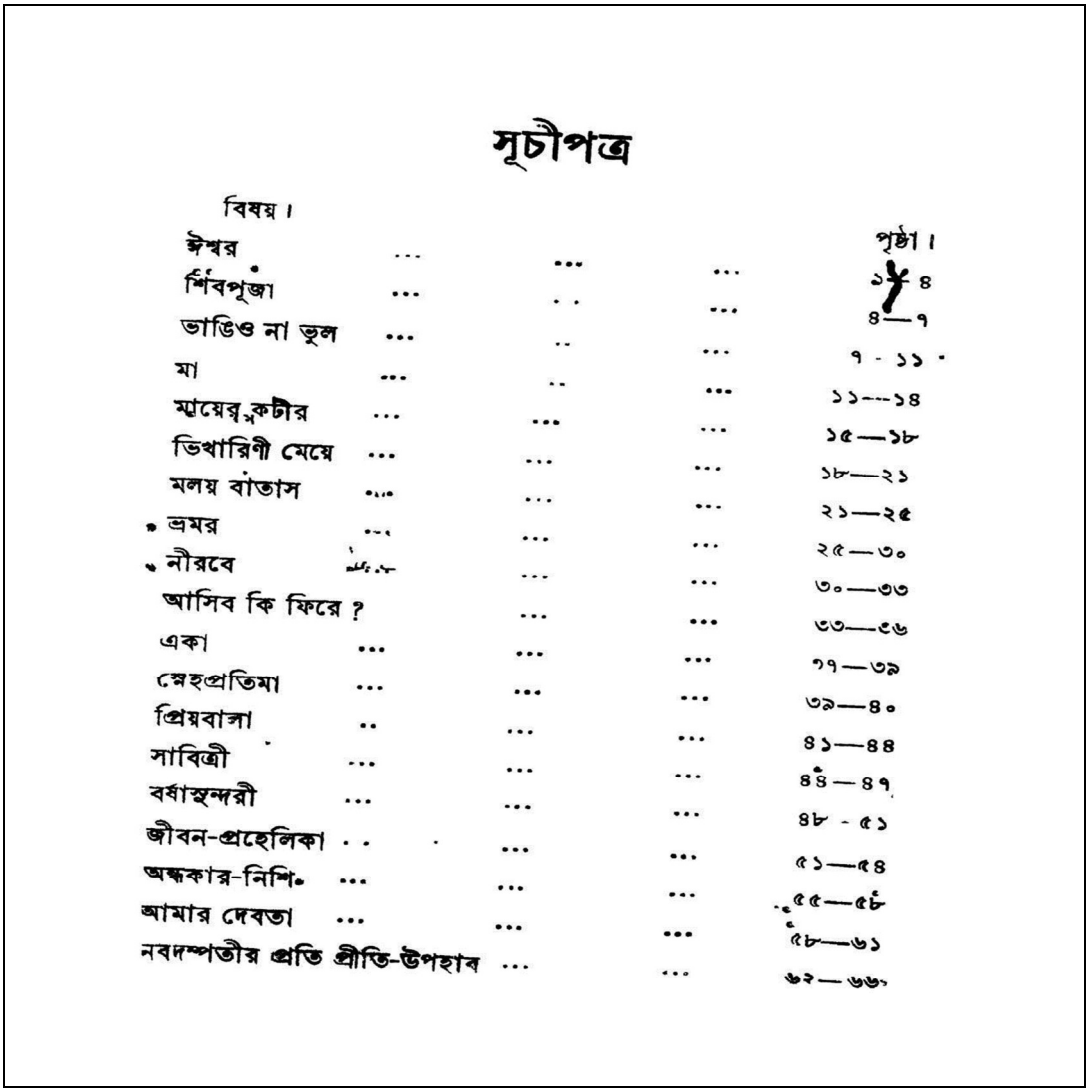
চিত্রসংখ্যা- ৮



স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণের বিজ্ঞাপন অংশ, যেখানে প্রকাশকের নাম ঠিকানাসহ মুদ্রকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ৩ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা-৯

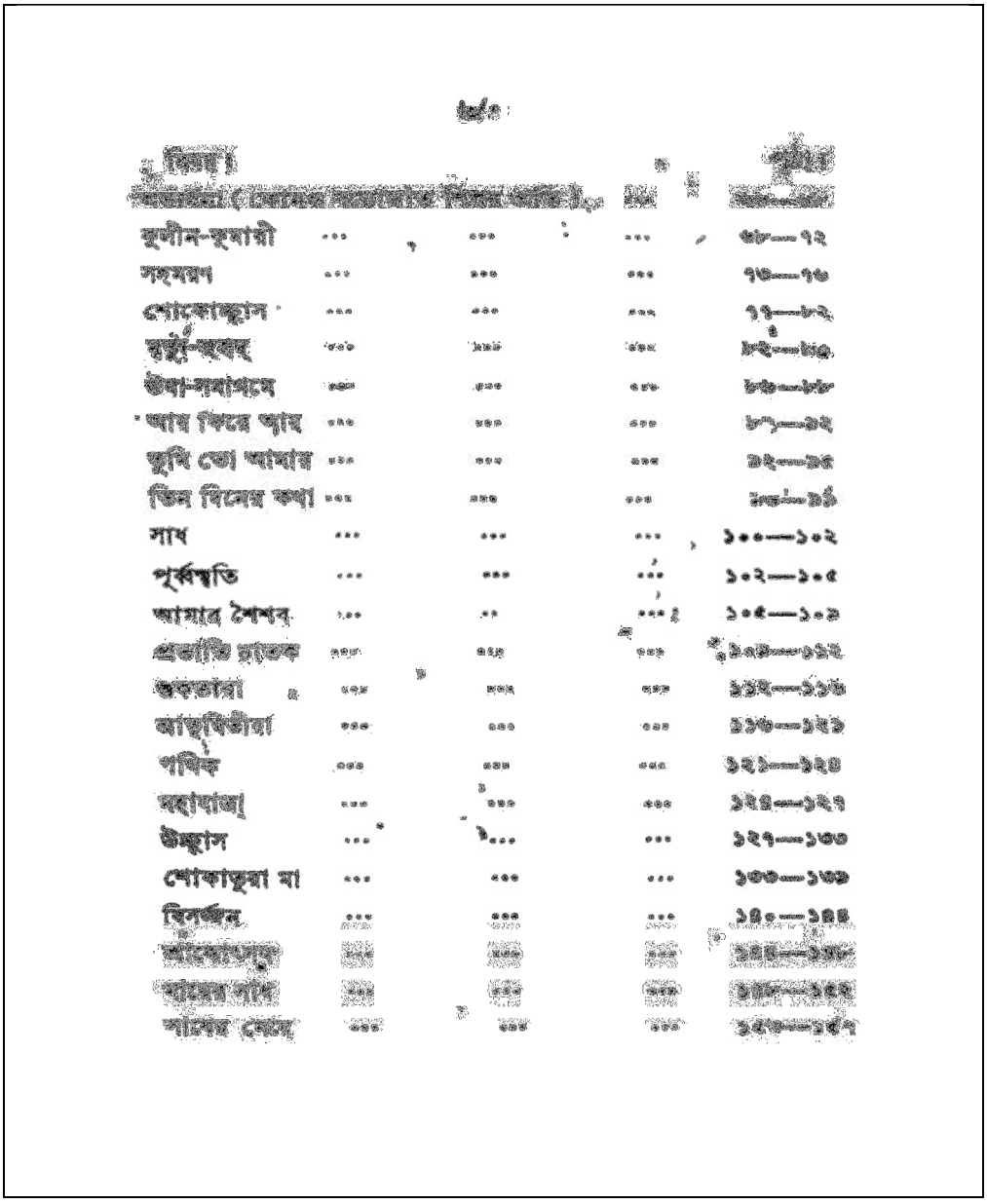


সূচীপত্র

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ঈশ্বর	১—৪
শিবপূজা	৪—৭
ভাঙিও না ভুল	৭ - ১১
মা	১১—১৪
মায়ের কটীর	১৫—১৮
ভিখারিণী মেয়ে	১৮—২১
মলয় বাতাস	২১—২৫
ভ্রমর	২৫—৩০
নীরবে	৩০—৩৩
আসিব কি ফিরে ?	৩৩—৩৬
একা	৩৭—৩৯
স্নেহপ্রতিমা	৩৯—৪০
প্রিয়বালা	৪১—৪৪
সাবিত্রী	৪৪—৪৭
বর্ষাসুন্দরী	৪৮ - ৫১
জীবন-প্রহেলিকা	৫১—৫৪
অন্ধকার-নিশি	৫৫—৫৮
আমার দেবতা	৫৮—৬১
নবদম্পতীর প্রতি প্রীতি-উপহার	৬২—৬৬

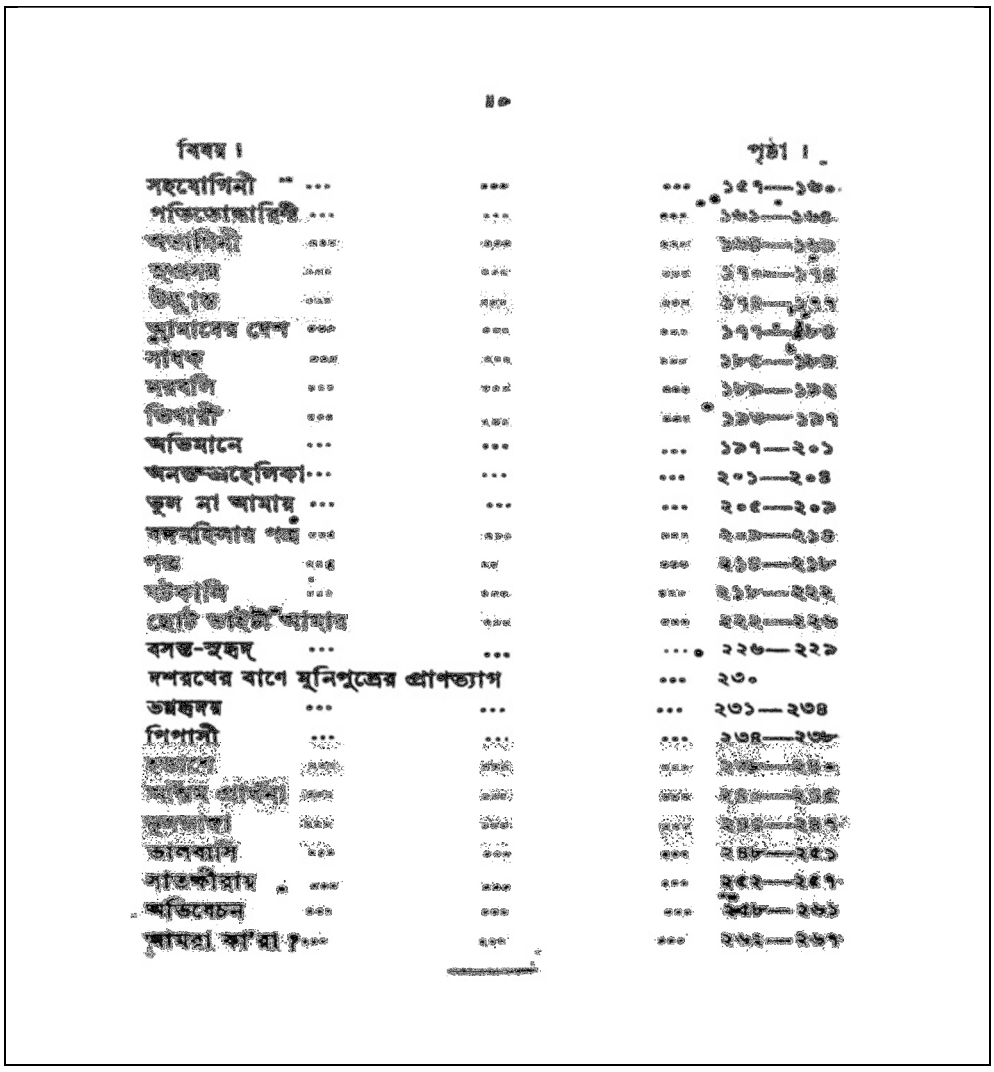
স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণের সূচিপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ৩ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা: ১০



স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণের সূচিপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ৩ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা- **১১**



বিষয়।			পৃষ্ঠা।
সহযোগিনী	...	...	১৫৭—১৬০
পতিতোদ্ধারিণী	...	...	১৬১—১৬৫
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আমাদের দেশ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সাধক	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অভিমানে	...	...	১৯৭—২০১
অনন্ত-প্রহেলিকা	...	...	২০১—২০৪
ভুল না আমার	...	...	২০৫—২০৯
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বসন্ত-সুহৃদ্	...	...	২২৬—২২৯
দশরথের বাণে মুনিপুত্রের প্রাণত্যাগ			২৩০
ভগ্নহৃদয়	...	...	২৩১—২৩৪
পিপাসী	...	...	২৩৪—২৩৮
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভালবাসি	...	...	২৪৮—২৫১
সাতকীরায়	...	...	২৫২—২৫৭
অভিষেচন	...	...	২৫৮—২৬১
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

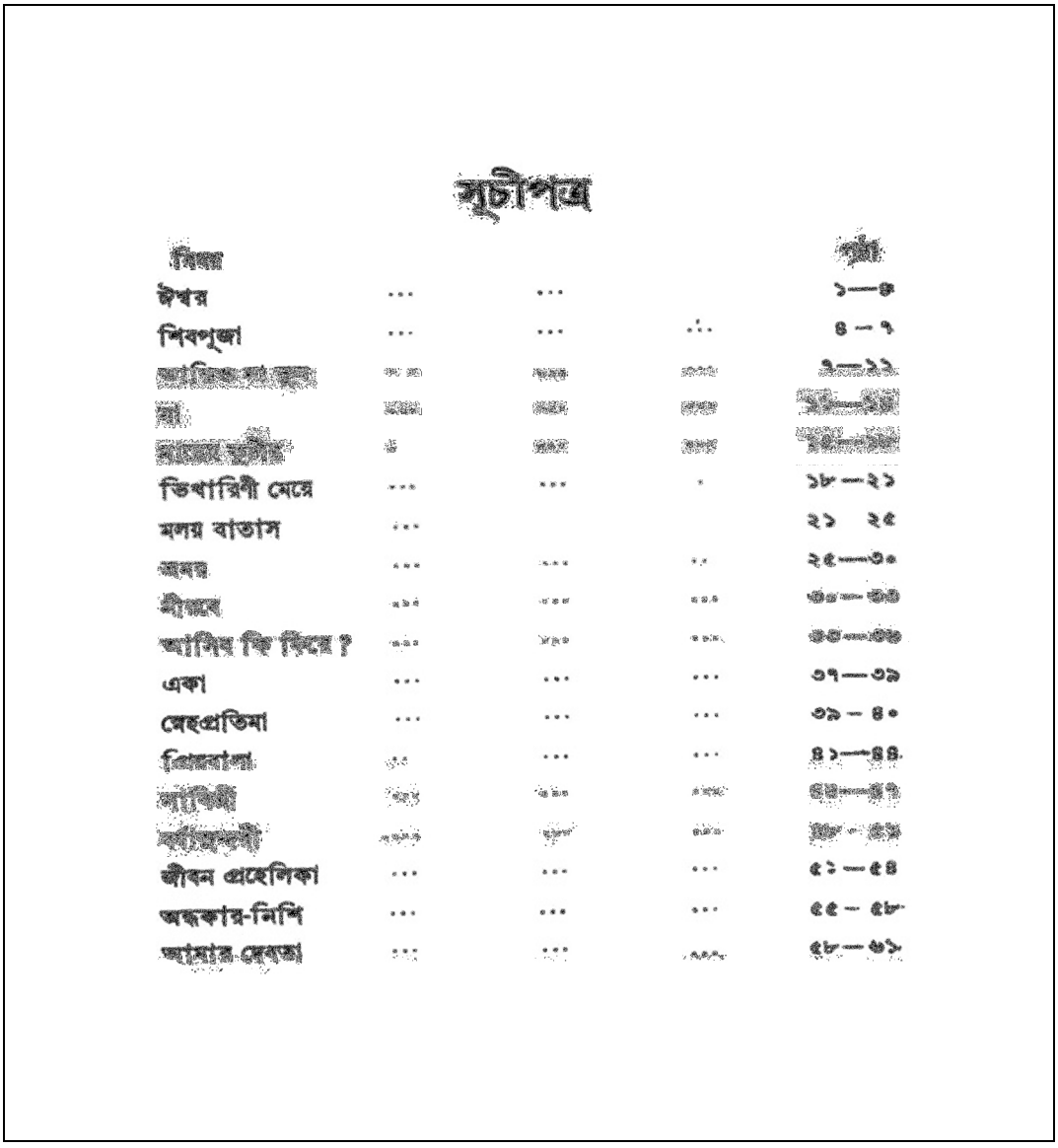
স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণের সূচিপত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ৩ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা: ১২



স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের একাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন অংশ থেকে চিত্রটি সংগৃহীত, যেখানে গ্রন্থের মূল্যসহ প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম ঠিকানার উল্লেখ আছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ২ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা- ১৩

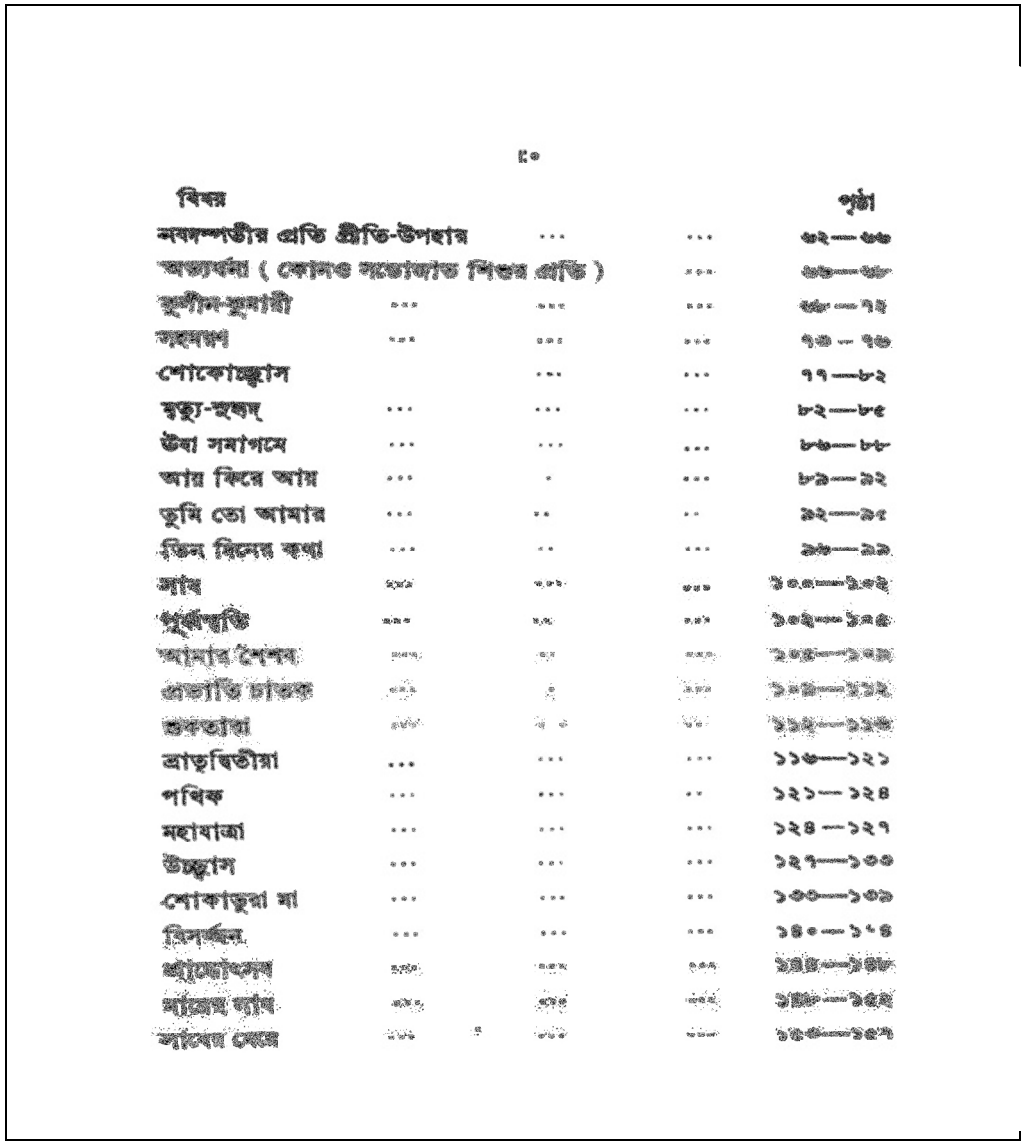


সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
ঈশ্বর	...	...		১—৩
শিবপূজা	...	...	...	৪ — ৭
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভিখারিণী মেয়ে	...	...	.	১৮—২১
মলয় বাতাস	...			২১ ২৫
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
একা	...	...	...	৩৭—৩৯
স্নেহপ্রতিমা	...	...	...	৩৯ — ৪০
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জীবন প্রহেলিকা	...	...	...	৫১—৫৪
অন্ধকার-নিশি	...	...	...	৫৫ — ৫৮
আমার দেবতা	...	...	...	৫৮—৬১

স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের একাদশ সংস্করণের সূচিপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ৩ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

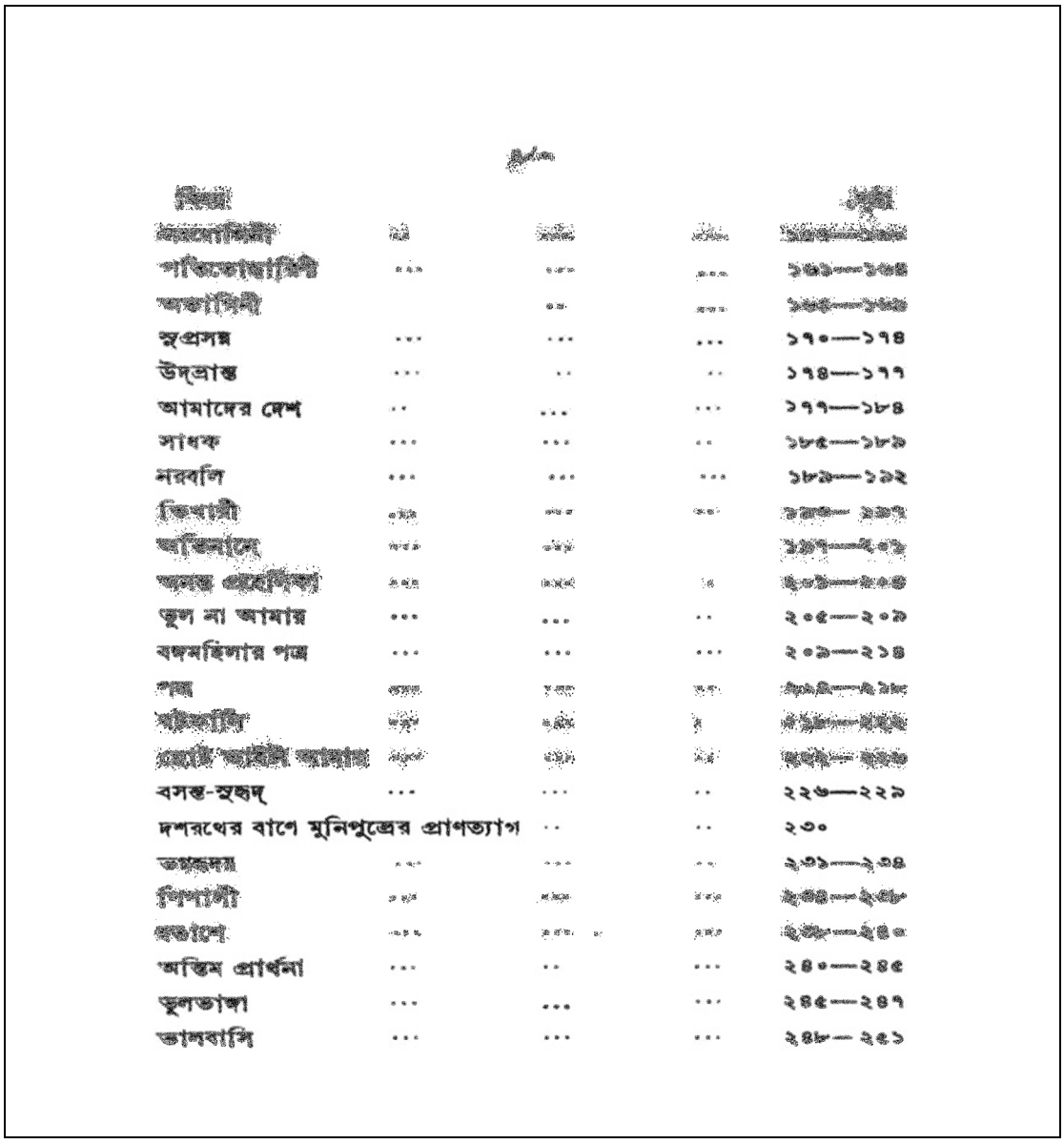
চিত্রসংখ্যা- ১৪



বিষয়				পৃষ্ঠা
নবদম্পতীর প্রতি প্রীতি-উপহার	...	...		৬২—৬৬
অভ্যর্থনা (কোনও সদ্যোজাত শিশুর প্রতি)	...	...		৬৬—৬৮
কুলীন-কুমারী	...	...	...	৬৮—৭৩
সমবেদনা	...	...	...	৭৩ — ৭৬
শোকোচ্ছ্বাস		...	...	৭৭—৮২
মৃত্যু-সুহৃদ্	...	...	...	৮২—৮৫
উষা সমাগমে	...	...	...	৮৬—৮৮
আয় ফিরে আয়	...	.	...	৮৯—৯২
তুমি তো আমার	...	..	..	৯২—৯৫
তিন দিনের কথা	...	..	...	৯৬—৯৯
সাধ	...	...	...	১০০—১০২
পূর্ব্বস্মৃতি	...	...	...	১০২—১০৫
আমার শৈশব	...	...	...	১০৫—১০৯
প্রভাতি চাতক	...	...	...	১০৯—১১২
শুকতারা	...	...	...	১১২—১১৬
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	...	...	...	১১৬—১২১
পথিক	...	...	..	১২১— ১২৪
মহাযাত্রা	...	...	...	১২৪ —১২৭
উচ্ছ্বাস	...	...	...	১২৭—১৩০
শোকাতুরা মা	...	...	...	১৩০—১৩৩
বিসর্জ্জন	...	...	...	১৪০—১৫৪
[illegible]	...	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	...	[illegible]

স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের একাদশ সংস্করণের সূচিপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ৩ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

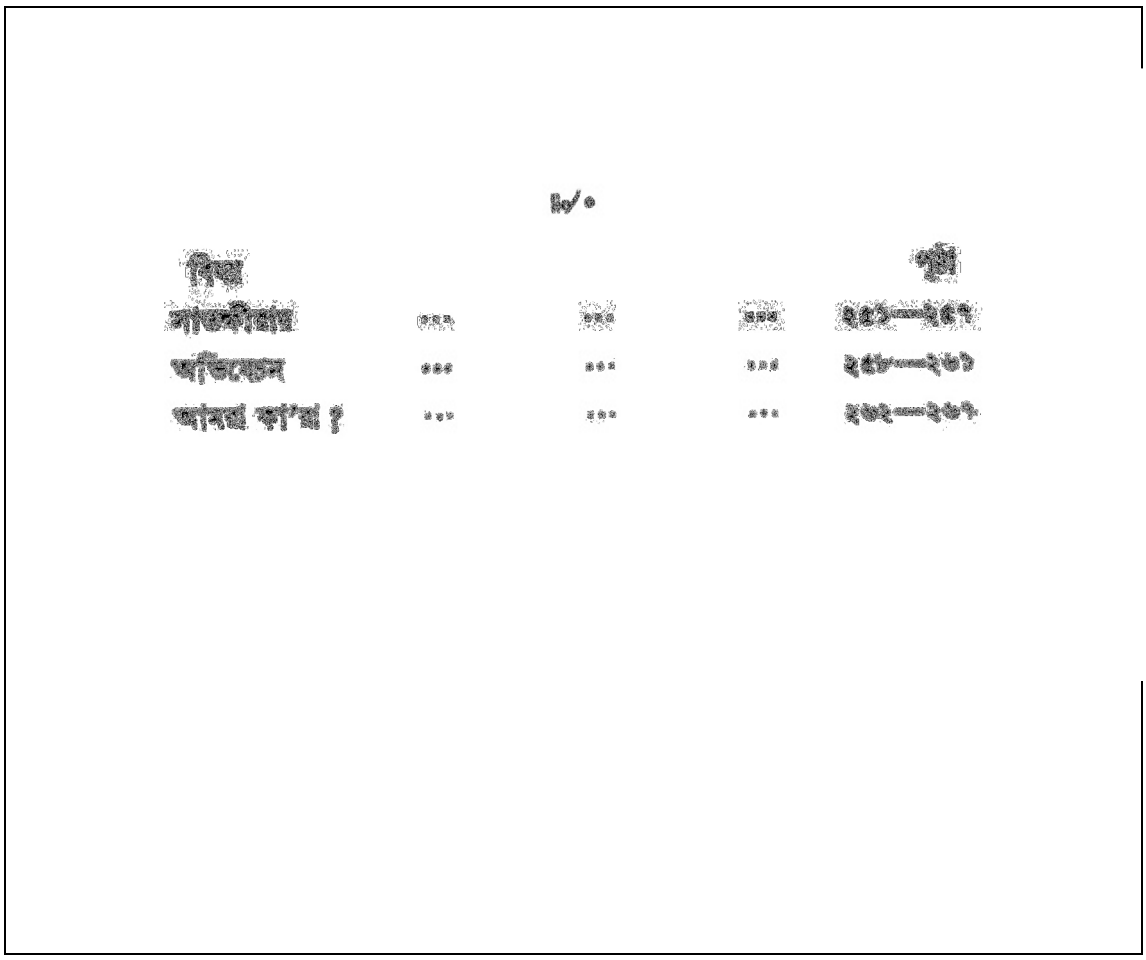
চিত্রসংখ্যা- ১৫



[illegible]				
পতিব্রতোপাখ্যান	...	...	...	১৬৯—১৭৩
অভাগিনী	...	...	...	১৭৩—১৭৬
সুপ্রসন্ন	...	...	...	১৭৬—১৭৪
উদ্‌ভ্রান্ত	...	..	..	১৭৪—১৭৭
আমাদের দেশ	..	...	...	১৭৭—১৮৪
সাধক	...	...	..	১৮৫—১৮৯
নরবলি	...	...	...	১৮৯—১৯২
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভুল না আমার	...	...	..	২০৫—২০৯
বঙ্গমহিলার পত্র	...	...	...	২০৯—২১৪
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বসন্ত-সুহৃদ্‌	...	...	..	২২৬—২২৯
দশরথের বাণে মুনিপুত্রের প্রাণত্যাগ		..	..	২৩০
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্তিম প্রার্থনা	...	..	...	২৪০—২৪৫
ভুলভাঙ্গা	...	...	...	২৪৫—২৪৭
ভালবাসি	...	...	...	২৪৮—২৫১

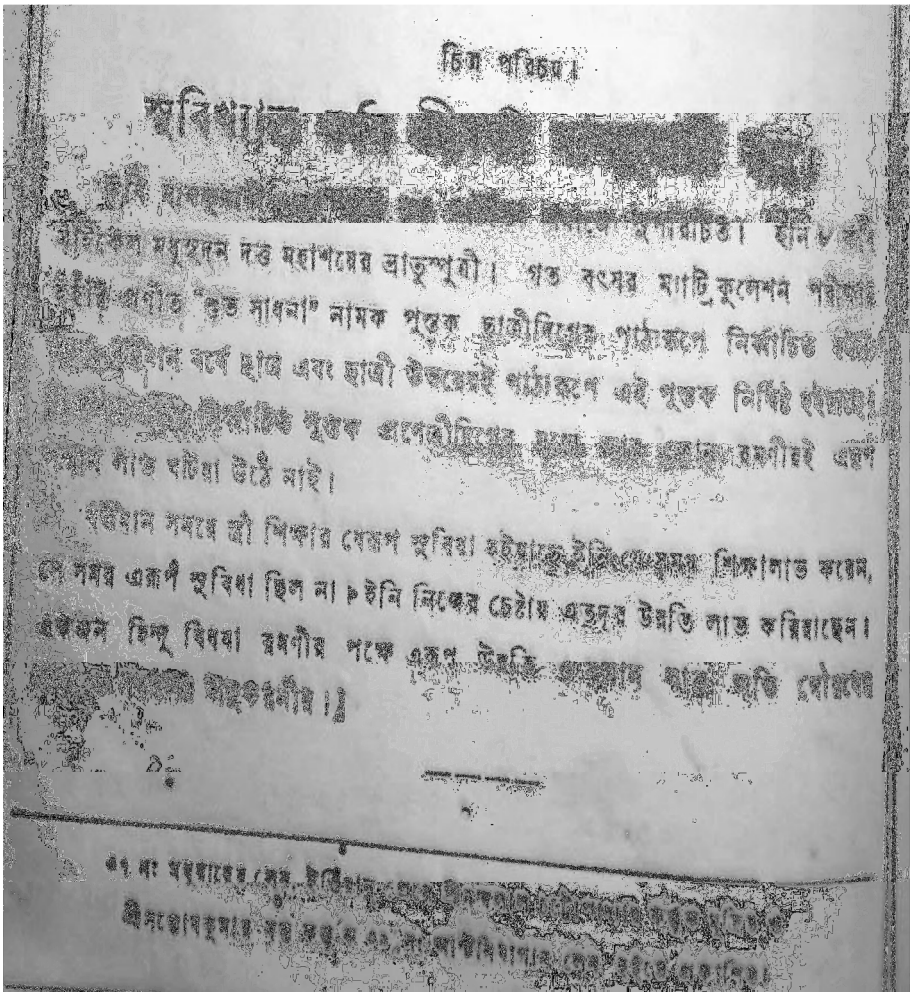
স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের একাদশ সংস্করণের সূচিপত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ৩ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা- ১৬



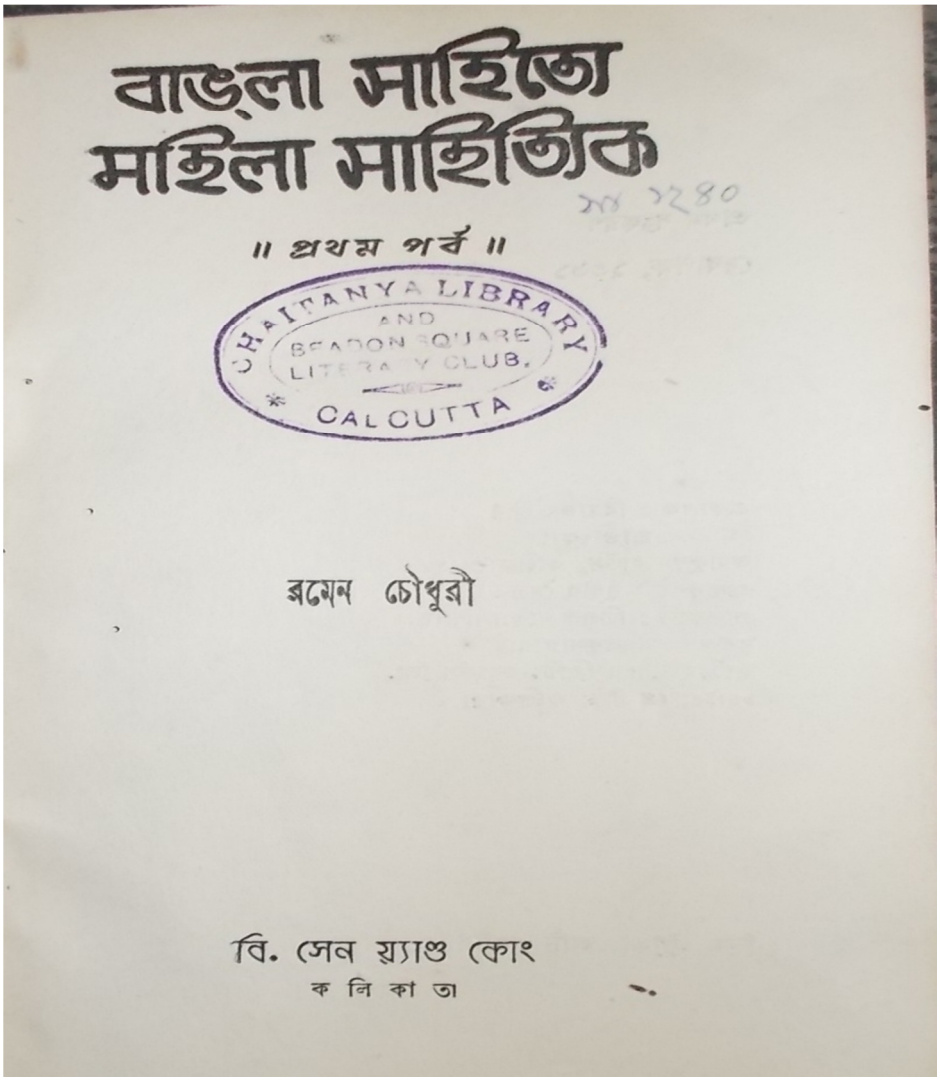
স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের একাদশ সংস্করণের সূচিপত্রের শেষ পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ৩ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা-১৭



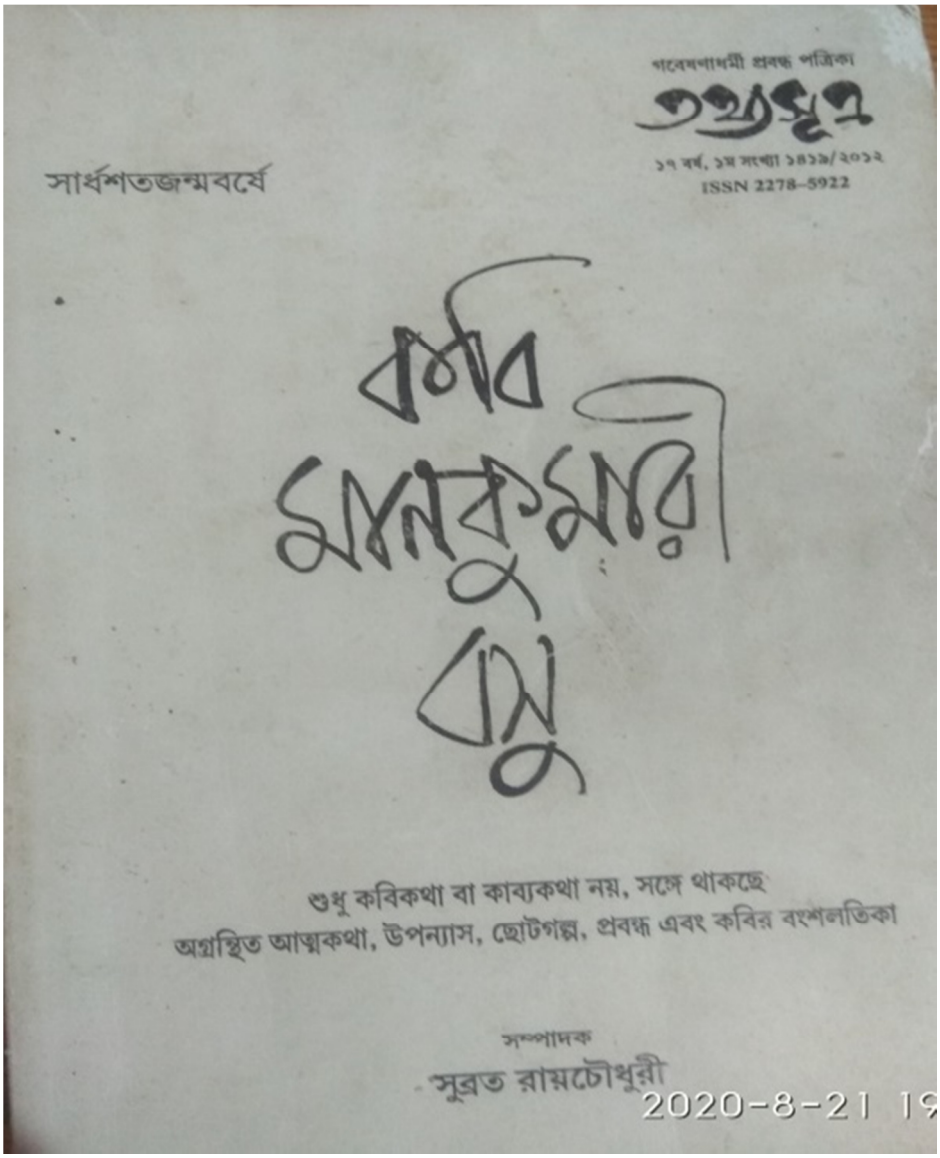
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত ১৩২১ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকার ৬৪ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মানকুমারী বসুর প্রশংসাসূচক বিজ্ঞাপন অংশ থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ১০ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা- ১৮



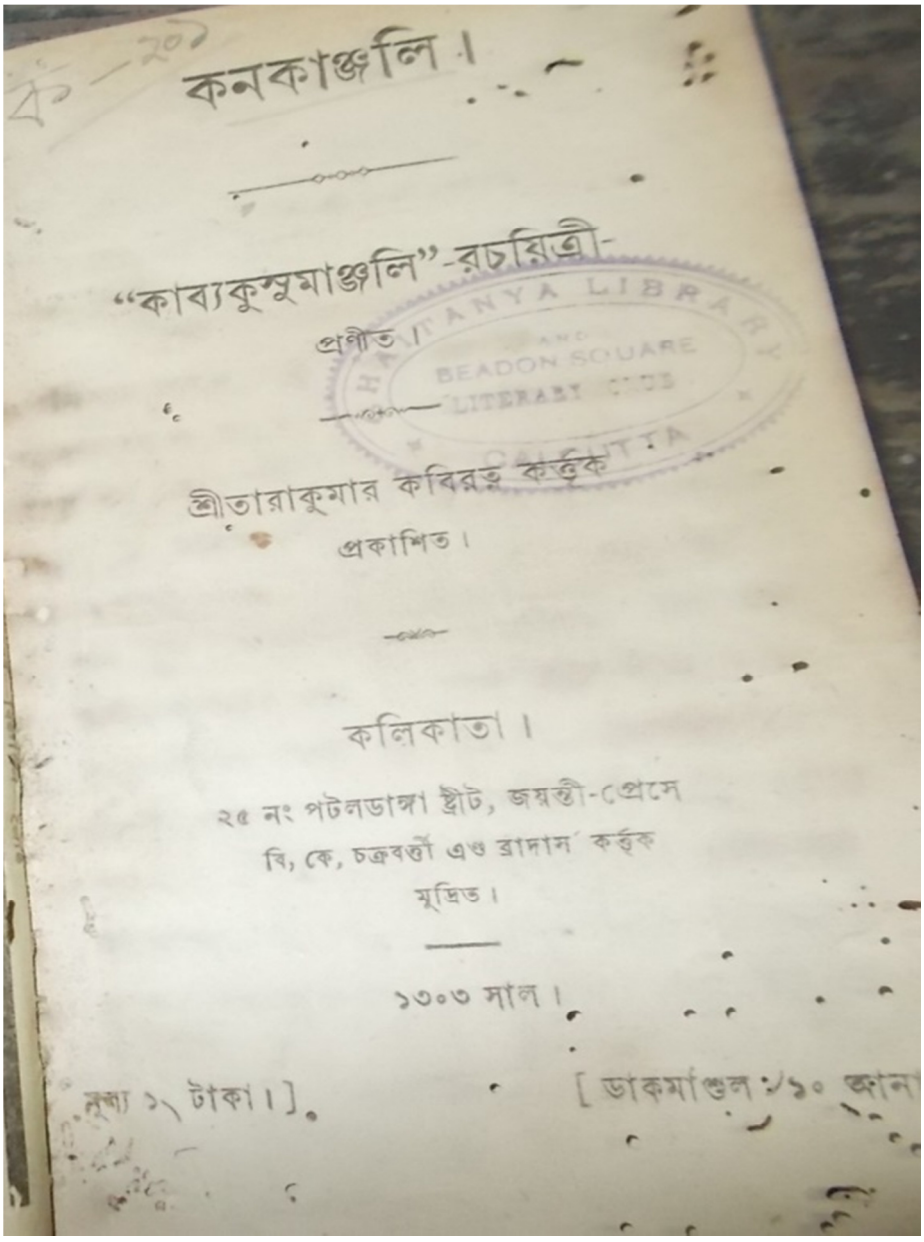
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত রমেন চৌধুরী রচিত 'বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক' গ্রন্থের নামপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ১৩ নং সূত্রের বিবরণী অংশ

চিত্রসংখ্যা- **১৯**



গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত ‘তথ্যসূত্র’ পত্রিকার কবি মানকুমারী বসু সংখ্যার প্রচ্ছদপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ----, ২০ নং সূত্রের বিবরণী অংশ।

চিত্রসংখ্যা- ২০


কনকাঞ্জলি।

"কাব্যকুসুমাঞ্জলি"-রচয়িত্রী-

প্রণীত।

CHAITANYA LIBRARY
BEADON SQUARE
LITERARY CLUB
CALCUTTA

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, জয়ন্তী-প্রেসে

বি, কে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।]

[ডাকমাশুল ৵১০ আনা

চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের প্রথম সংস্করণের নামপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ২১

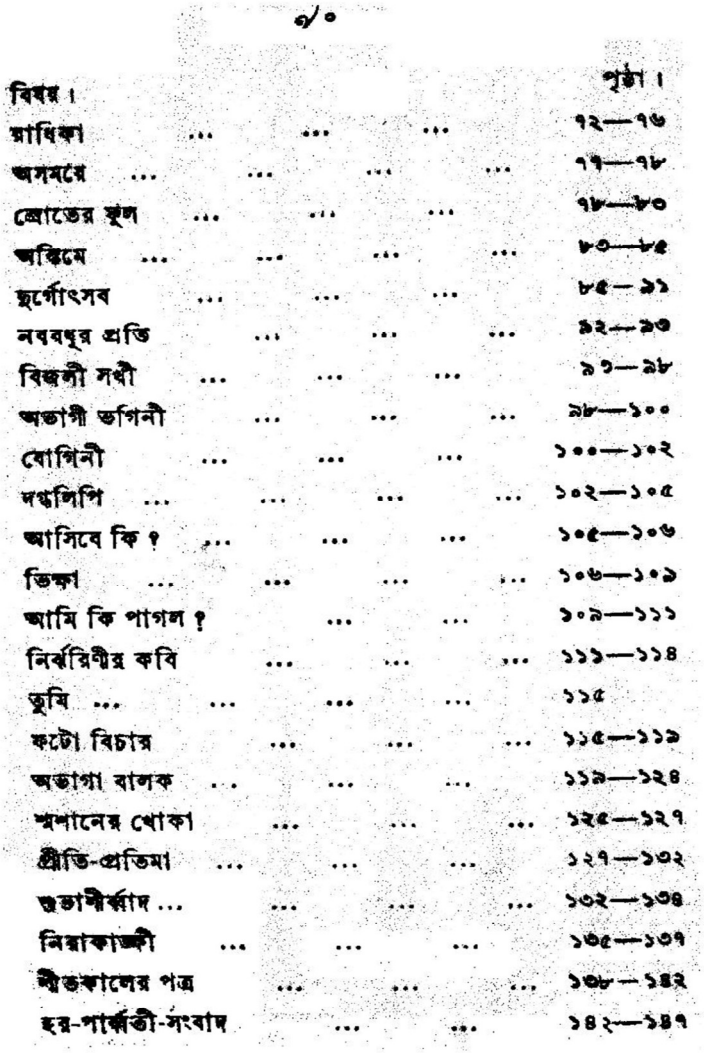


সূচিপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
প্রভাতী	১—৩
আবাহন	৪—৮
বাঁধা	৯—১০
তোমরা কারা?	১০—১৪
প্রমীলা	১৫—১৮
আকাঙ্ক্ষা	১৯—২২
মোহিনী	২২—২৩
দেবঘর	২৪—২৮
ভুল	২৯—৩২
কবির শ্মশানে	৩৩—৩৬
বীরবালক	৩৬—৪৪
কি ক্ষতি আমার?	৪৪—৪৯
সুখী	৪৯—৫৪
পতঙ্গের প্রতি	৫৪—৫৭
অনলের প্রতি পতঙ্গ	৫৮—৬২
প্রার্থনা	৬২—৬৫
বিদেশে	৬৫—৬৭
কেন এ সন্দেহ?	৬৭—৭০
সখী	৭০—৭২

স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যের প্রথম সংস্করণের সূচিপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ২২



৵০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
রাধিকা	৭২—৭৬
অসময়ে	৭৭—৭৮
স্রোতের ফুল	৭৮—৮০
অস্তিমে	৮০—৮৫
দুর্গোৎসব	৮৫—৯১
নববধূর প্রতি	৯২—৯৩
বিজলী সখী	৯৩—৯৮
অভাগী ভগিনী	৯৮—১০০
যোগিনী	১০০—১০২
দগ্ধলিপি	১০২—১০৫
আসিবে কি ?	১০৫—১০৬
ভিক্ষা	১০৬—১০৯
আমি কি পাগল ?	১০৯—১১১
নির্ঝরিণীর কবি	১১১—১১৪
তুমি	১১৫
ফটো বিচার	১১৫—১১৯
অভাগা বালক	১১৯—১২৪
শ্মশানের খোকা	১২৫—১২৭
প্রীতি-প্রতিমা	১২৭—১৩২
শুভাশীর্ব্বাদ	১৩২—১৩৪
নিরাকাঙ্ক্ষী	১৩৫—১৩৭
শীতকালের পত্র	১৩৮—১৪২
হর-পার্ব্বতী-সংবাদ	১৪২—১৪৭

স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যের প্রথম সংস্করণের সূচিপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

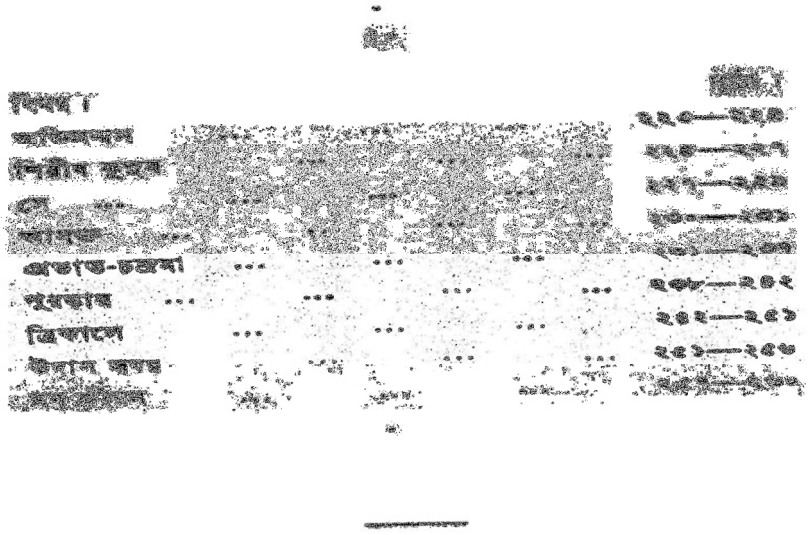
চিত্রসংখ্যা- ২৩



বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিদায়-সঙ্গীত	১৪৭—১৫০
অতিথি	১৫১—১৫২
নিরুপমা	১৫৩—১৫৭
কেন আছি?	১৫৮—১৬১
কি চাই?	১৬২—১৬৩
কবিতা রাণী	১৬৩—১৬৫
তাপসী উমা	১৬৬—১৬৯
প্রত্যাখ্যাত	১৬৯—১৭১
বিজনে	১৭১—১৭৫
দেবতা	১৭৫—১৭৭
নিষ্ঠুর সংসার	১৭৮—১৮১
পঞ্চস্বর	১৮১—১৮৫
বঙ্গবাসিনী	১৮৬—১৯০
ছায়া	১৯০—১৯১
স্নেহাশীষ	১৯২—১৯৬
চাতকী	১৯৬—২০২
কিছুই নয়	২০২—২০৪
সহগামিনী	২০৪—২০৭
প্রবাসী	২০৮—২০৯
প্রতাপ	২০৯—২১৫
হৃদয়-নদী	২১৫—২১৬
দেবশিশু	২১৭—২২০
কেন?	২২০—২২৩

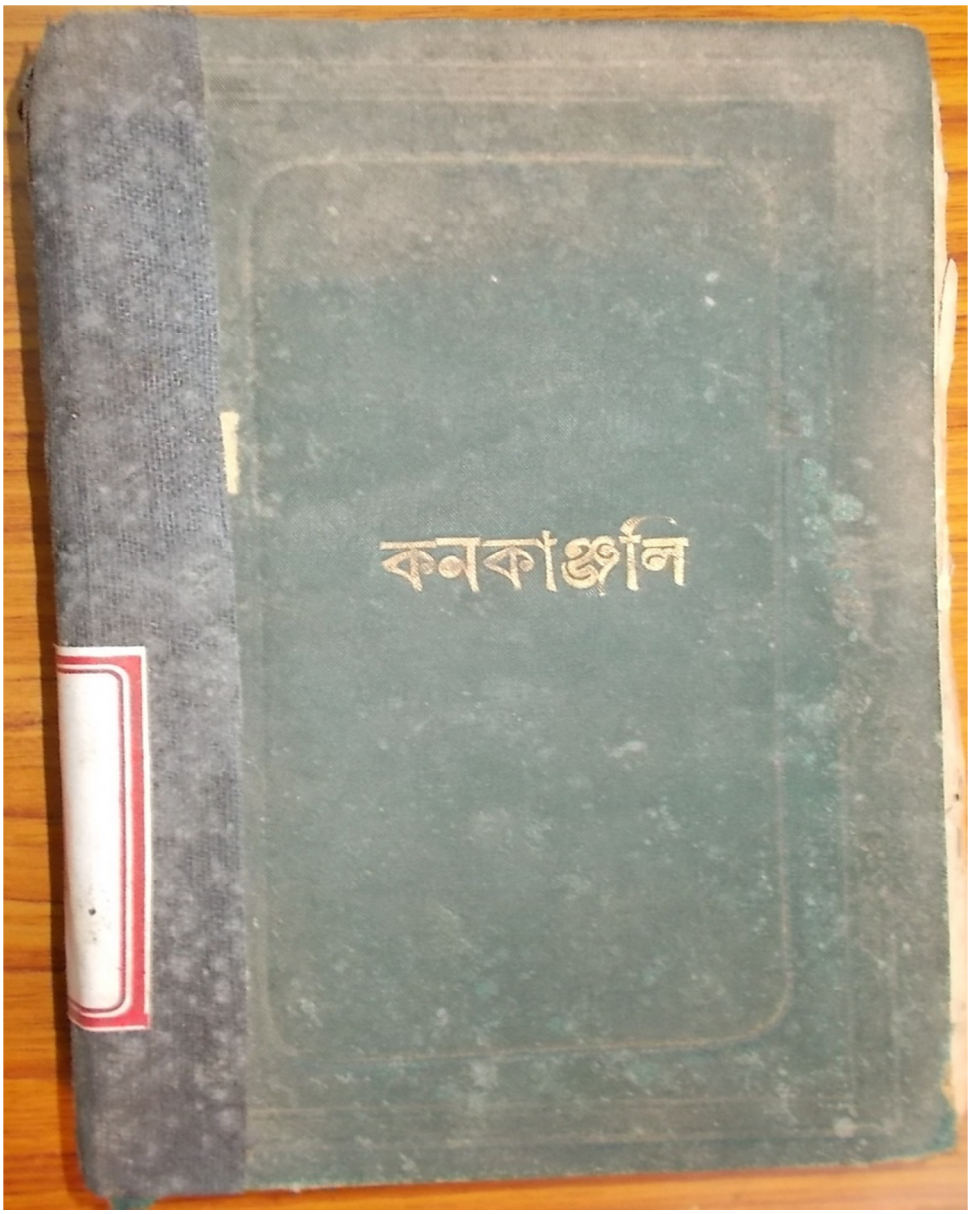
স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যের প্রথম সংস্করণের সূচিপত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ২৪



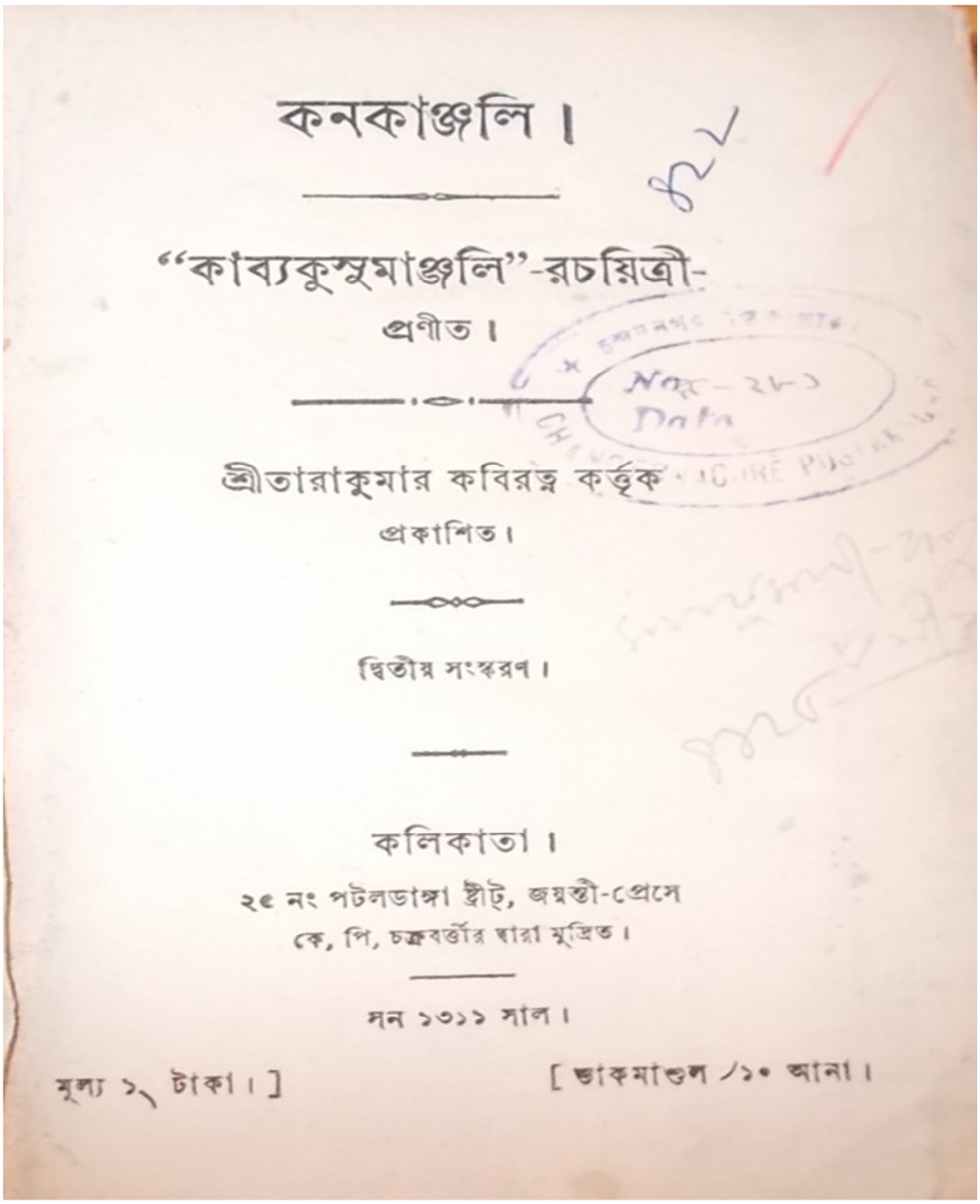
স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যের প্রথম সংস্করণের সূচিপত্রের শেষ পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ২৫



চন্দননগর লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ২৬



কনকাঞ্জলি।

"কাব্যকুসুমাঞ্জলি"-রচয়িত্রী-

প্রণীত।

No. 2-1
Date

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে

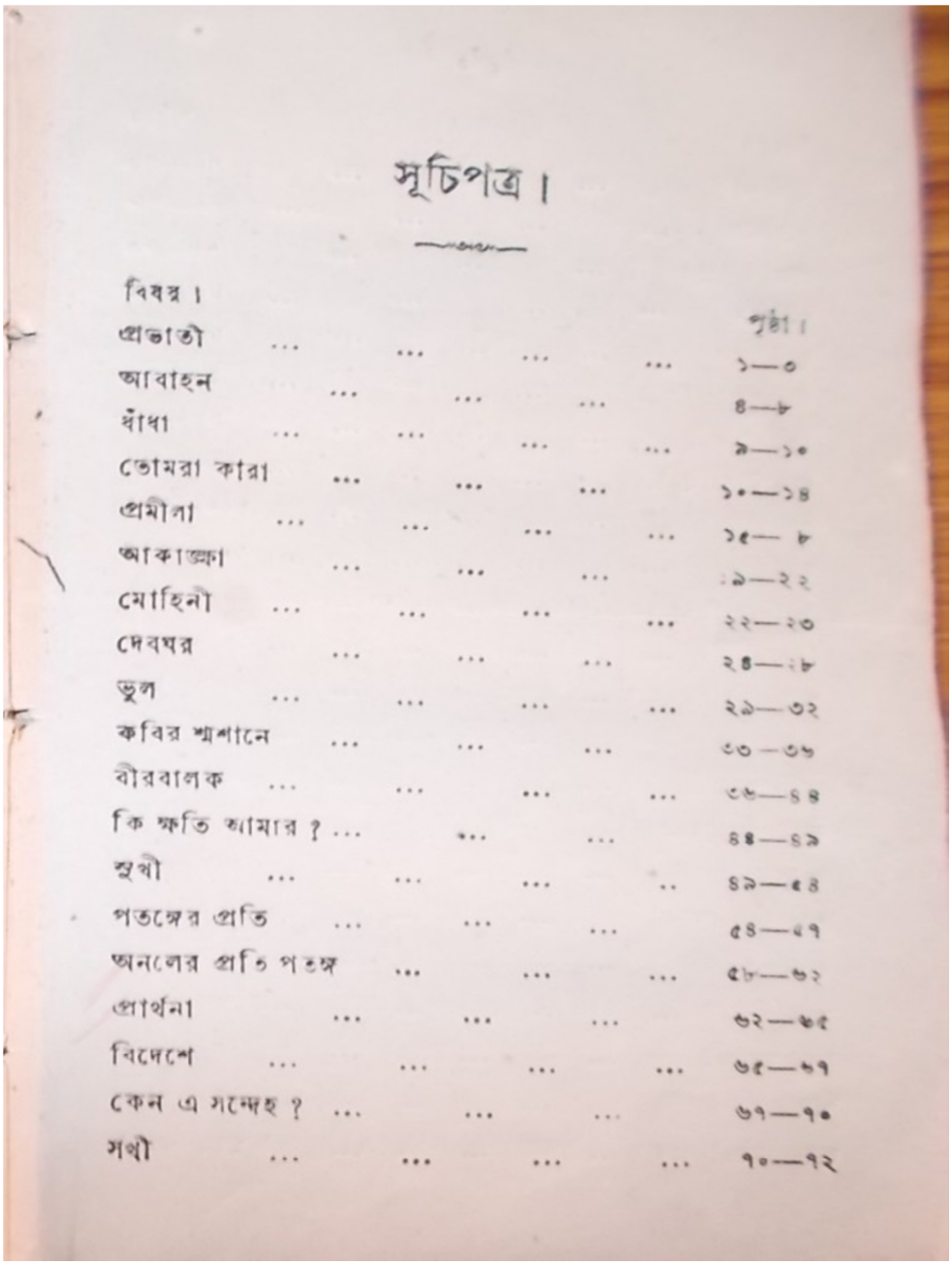
কে, পি, চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।] [ডাকমাশুল ⁄১০ আনা।

চন্দননগর লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত **১৩১১** বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কনকাঞ্জলি' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ২৭

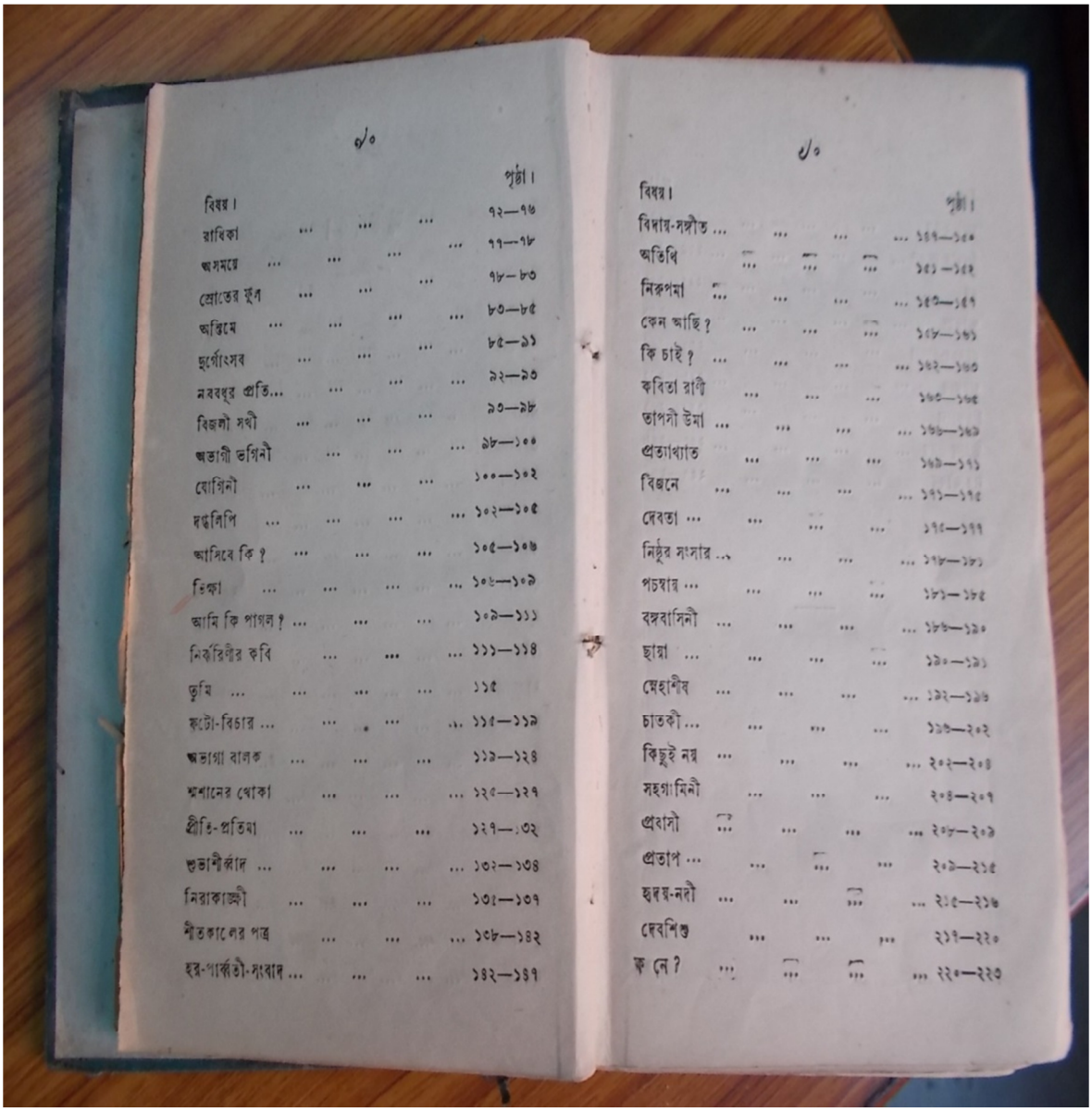


সূচিপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
প্রভাতী	১—৩
আবাহন	৪—৮
বাঁধা	৯—১০
তোমরা কারা	১০—১৪
প্রমীলা	১৫— ৮
আকাঙ্ক্ষা	১৯—২২
মোহিনী	২২—২৩
দেবঘর	২৪—২৮
ভুল	২৯—৩২
কবির শ্মশানে	৩৩—৩৬
বীরবালক	৩৬—৪৪
কি ক্ষতি আমার ?	৪৪—৪৯
সুখী	৪৯—৫৪
পতঙ্গের প্রতি	৫৪—৫৭
অনলের প্রতি পতঙ্গ	৫৮—৬২
প্রার্থনা	৬২—৬৫
বিদেশে	৬৫—৬৭
কেন এ সন্দেহ ?	৬৭—৭০
সখী	৭০—৭২

চন্দননগর লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের সূচিপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ২৮



৶৹

বিষয়। পৃষ্ঠা।

রাধিকা ... ... ৭২—৭৬
অসময়ে ... ... ৭৭—৭৮
স্রোতের ফুল ... ... ৭৮—৮৩
অন্তিমে ... ... ৮৩—৮৫
দুর্গোৎসব ... ... ৮৫—৯১
নববধূর প্রতি... ... ... ৯২—৯৩
বিজলী সখী ... ... ৯৩—৯৮
অভাগী ভগিনী ... ... ৯৮—১০০
যোগিনী ... ... ১০০—১০২
বর্ণলিপি ... ... ১০২—১০৫
আসিবে কি ? ... ... ১০৫—১০৬
ভিক্ষা ... ... ১০৬—১০৯
আমি কি পাগল ? ... ... ১০৯—১১১
নির্ঝরিণীর কবি ... ... ১১১—১১৪
তুমি ১১৫
ফটো-বিচার ... ... ১১৫—১১৯
অভাগা বালক ... ... ১১৯—১২৪
শ্মশানের খোকা ... ... ১২৫—১২৭
প্রীতি-প্রতিমা ... ... ১২৭—১৩২
শুভাশীর্ব্বাদ ... ... ১৩২—১৩৪
নিরাকাঙ্ক্ষী ... ... ১৩৫—১৩৭
শীতকালের পত্র ... ... ১৩৮—১৪২
হর-পার্ব্বতী-সংবাদ ... ... ১৪২—১৪৭

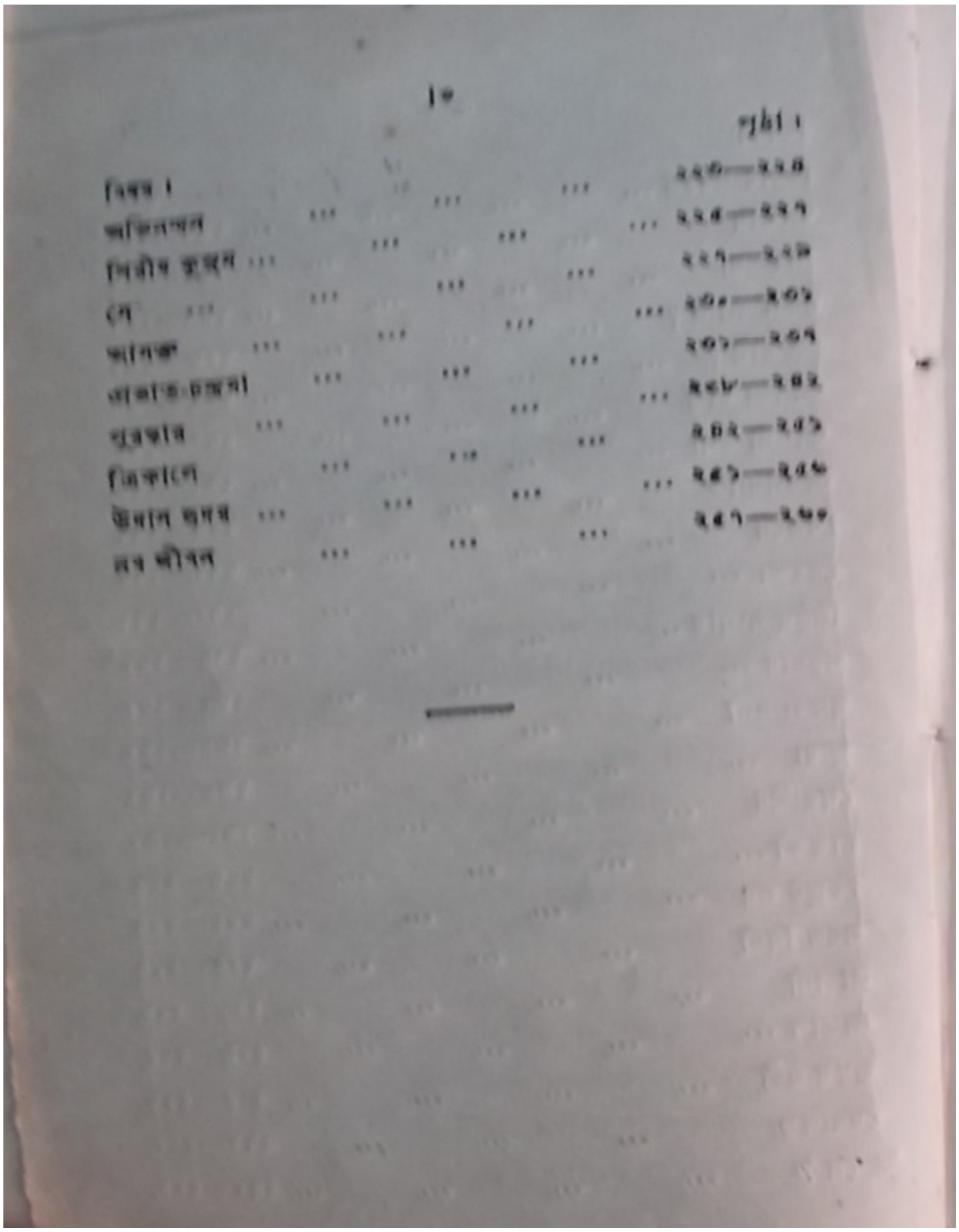
৶৹

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিদায়-সঙ্গীত ... ... ১৪৭—১৫০
অতিথি ... ... ১৫১—১৫৪
নিরুপমা ... ... ১৫৪—১৫৭
কেন আছি ? ... ... ১৫৮—১৬১
কি চাই ? ... ... ১৬২—১৬৫
কবিতা রাণী ... ... ১৬৫—১৬৮
তাপসী উমা ... ... ১৬৯—১৭৩
প্রত্যাখ্যাত ... ... ১৭৩—১৭৬
বিজনে ... ... ১৭৬—১৭৮
দেবতা ... ... ১৭৮—১৭৯
নিষ্ঠুর সংসার ... ... ১৭৮—১৮১
পচঘায় ... ... ১৮১—১৮৫
বঙ্গবাসিনী ... ... ১৮৬—১৯০
ছায়া ... ... ১৯০—১৯১
মেঘাশীষ ... ... ১৯২—১৯৬
চাতকী ... ... ১৯৬—২০২
কিছুই নয় ... ... ২০২—২০৪
সহগামিনী ... ... ২০৪—২০৭
প্রবাসী ... ... ২০৮—২০৯
প্রতাপ ... ... ২০৯—২১৫
হৃদয়-নদী ... ... ২১৫—২১৬
দেবশিশু ... ... ২১৭—২২০
ক নে ? ... ... ২২০—২২৩

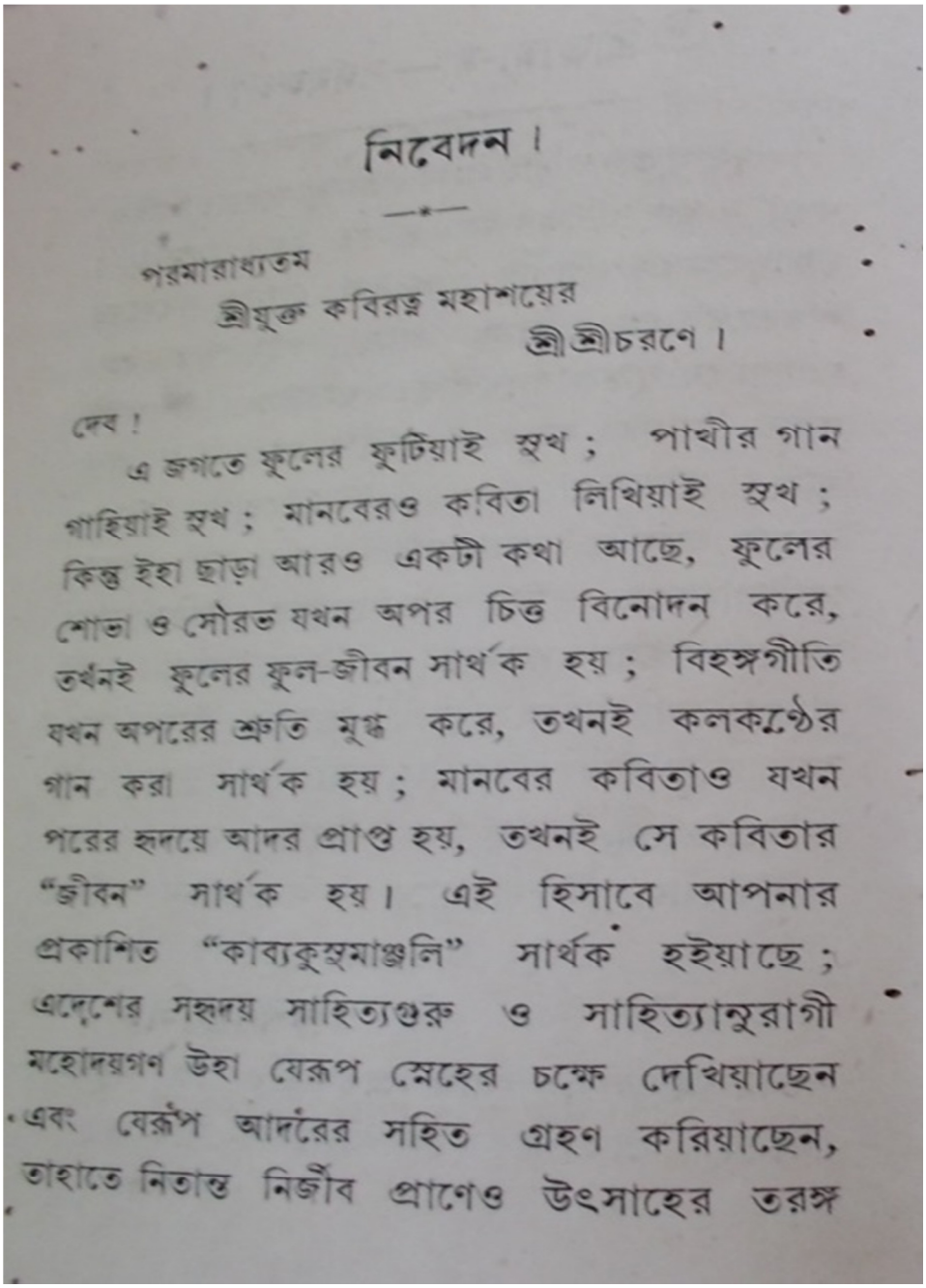
চন্দননগর লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত **১৩১১** বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের সূচিপত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ২৯



চন্দননগর লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত **১৩১১** বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের সূচিপত্রের শেষ পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩০



নিবেদন।

—•—

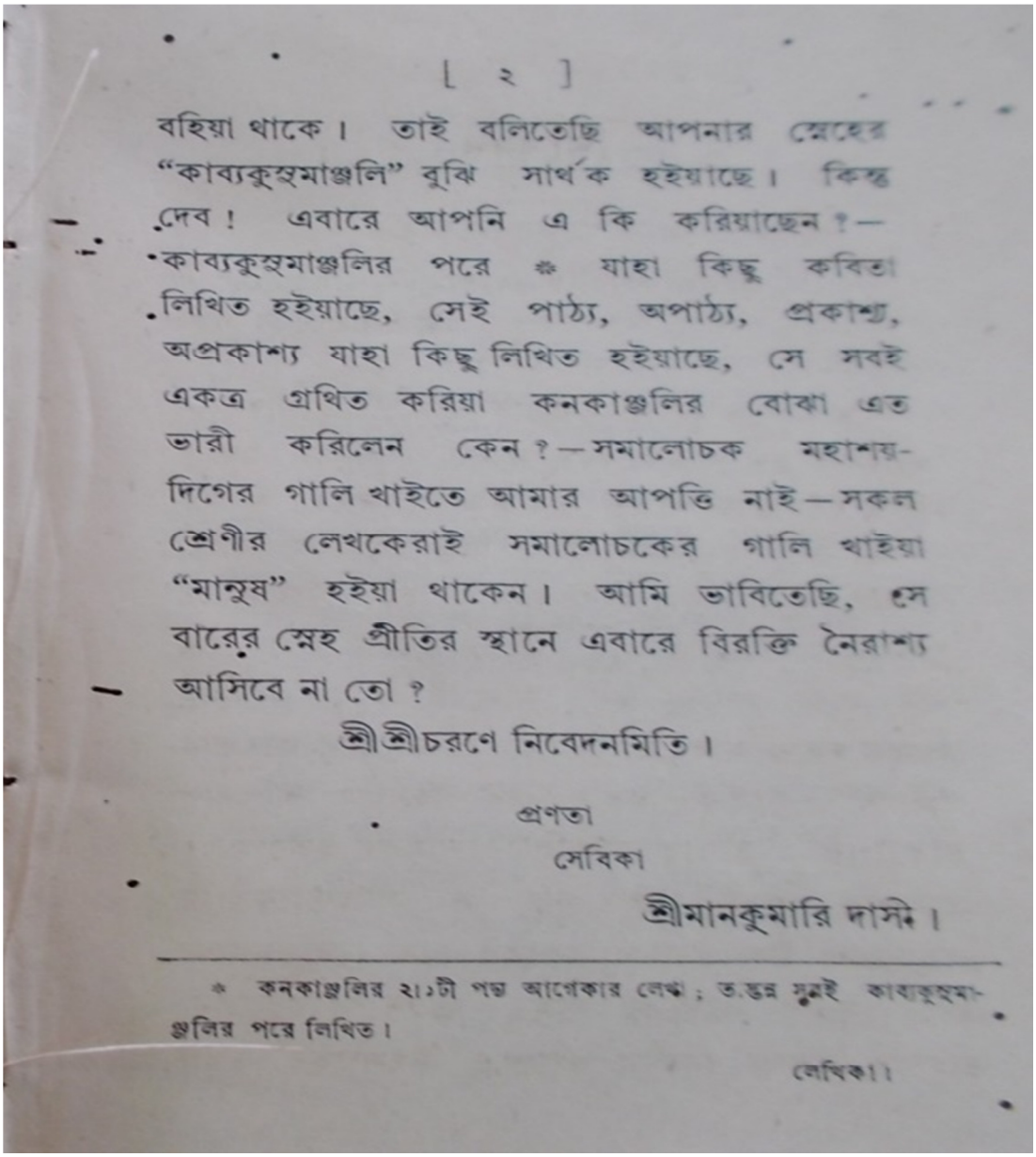
পরমারাধ্যতম
শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয়ের
শ্রীশ্রীচরণে।

দেব!

এ জগতে ফুলের ফুটিয়াই সুখ; পাখীর গান গাহিয়াই সুখ; মানবেরও কবিতা লিখিয়াই সুখ; কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটী কথা আছে, ফুলের শোভা ও সৌরভ যখন অপর চিত্ত বিনোদন করে, তখনই ফুলের ফুল-জীবন সার্থক হয়; বিহঙ্গগীতি যখন অপরের শ্রুতি মুগ্ধ করে, তখনই কলকণ্ঠের গান করা সার্থক হয়; মানবের কবিতাও যখন পরের হৃদয়ে আদর প্রাপ্ত হয়, তখনই সে কবিতার "জীবন" সার্থক হয়। এই হিসাবে আপনার প্রকাশিত "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" সার্থক হইয়াছে; এদেশের সহৃদয় সাহিত্যগুরু ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ উহা যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন এবং যেরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে নিতান্ত নির্জীব প্রাণেও উৎসাহের তরঙ্গ

'কনকাঞ্জলি' কাব্যের শুরুতে প্রকাশিত মানকুমারী বসুর রচিত 'নিবেদন অংশ'। প্রতিটি সংস্করণে এই একই 'নিবেদন অংশ' মুদ্রিত আছে। বর্তমান চিত্রটি চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের 'নিবেদন অংশ'এর প্রথম পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩১



[২]

বহিয়া থাকে। তাই বলিতেছি আপনার স্নেহের "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" বুঝি সার্থক হইয়াছে। কিন্তু দেব! এবারে আপনি এ কি করিয়াছেন?— কাব্যকুসুমাঞ্জলির পরে * যাহা কিছু কবিতা লিখিত হইয়াছে, সেই পাঠ্য, অপাঠ্য, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সে সবই একত্র গ্রথিত করিয়া কনকাঞ্জলির বোঝা এত ভারী করিলেন কেন?—সমালোচক মহাশয়-দিগের গালি খাইতে আমার আপত্তি নাই—সকল শ্রেণীর লেখকেরাই সমালোচকের গালি খাইয়া "মানুষ" হইয়া থাকেন। আমি ভাবিতেছি, সে বারের স্নেহ প্রীতির স্থানে এবারে বিরক্তি নৈরাশ্য আসিবে না তো?

শ্রীশ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

প্রণতা
সেবিকা
শ্রীমানকুমারি দাসী।

* কনকাঞ্জলির ২।১টী পদ্য আগেকার লেখা; তদ্ভিন্ন সমস্তই কাব্যকুসুমাঞ্জলির পরে লিখিত।

লেখিকা।

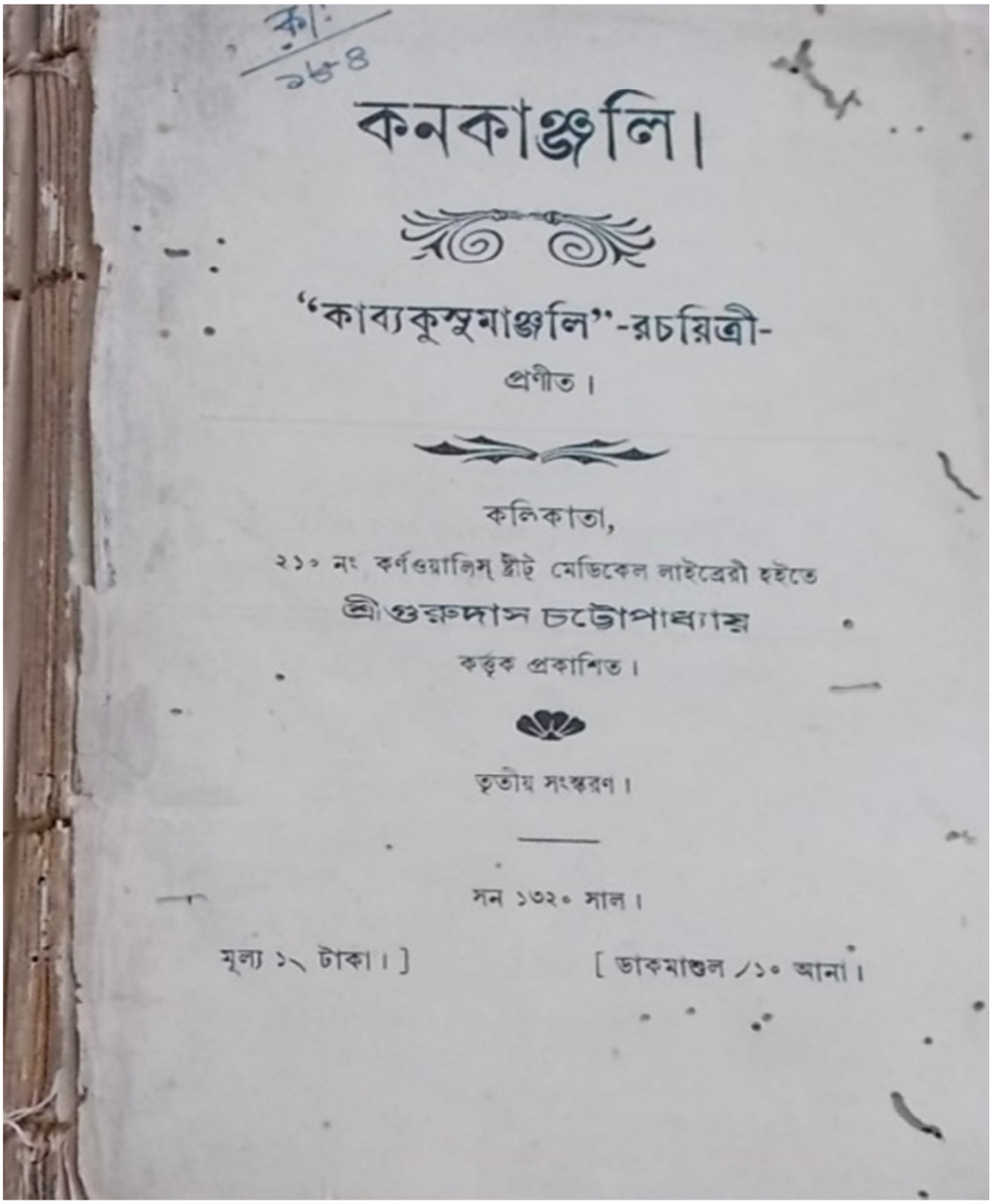
'কনকাঞ্জলি' কাব্যের শুরুতে প্রকাশিত মানকুমারী বসুর রচিত 'নিবেদন অংশ'। প্রতিটি সংস্করণে এই একই 'নিবেদন অংশ' মুদ্রিত আছে। বর্তমান চিত্রটি চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের 'নিবেদন অংশ'এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩২



বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩৩



কনকাঞ্জলি।

"কাব্যকুসুমাঞ্জলি"-রচয়িত্রী-

প্রণীত।

কলিকাতা,

২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

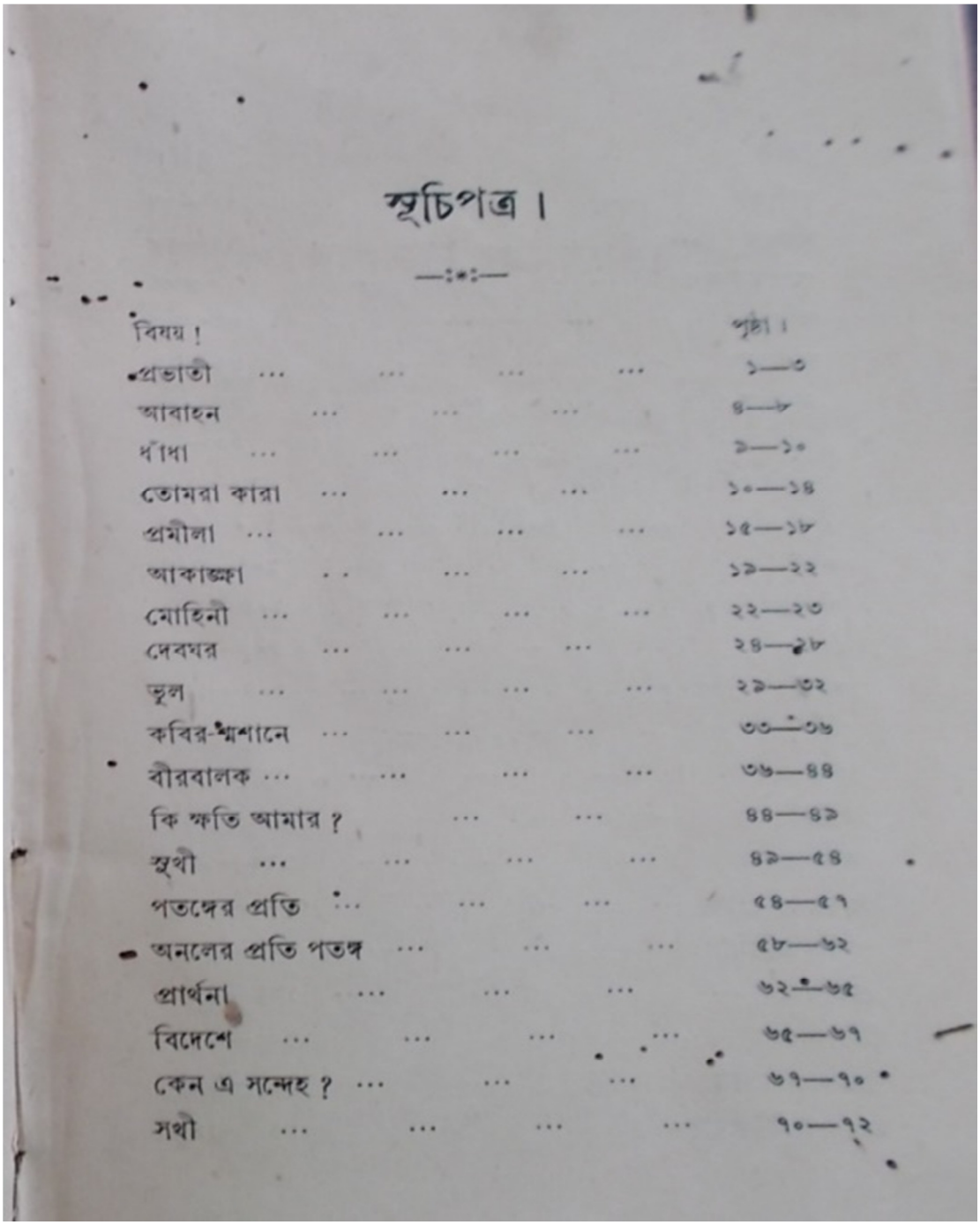
তৃতীয় সংস্করণ।

সন ১৩২০ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।] [ডাকমাশুল ⁄১০ আনা।

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের নামপত্র থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩৪



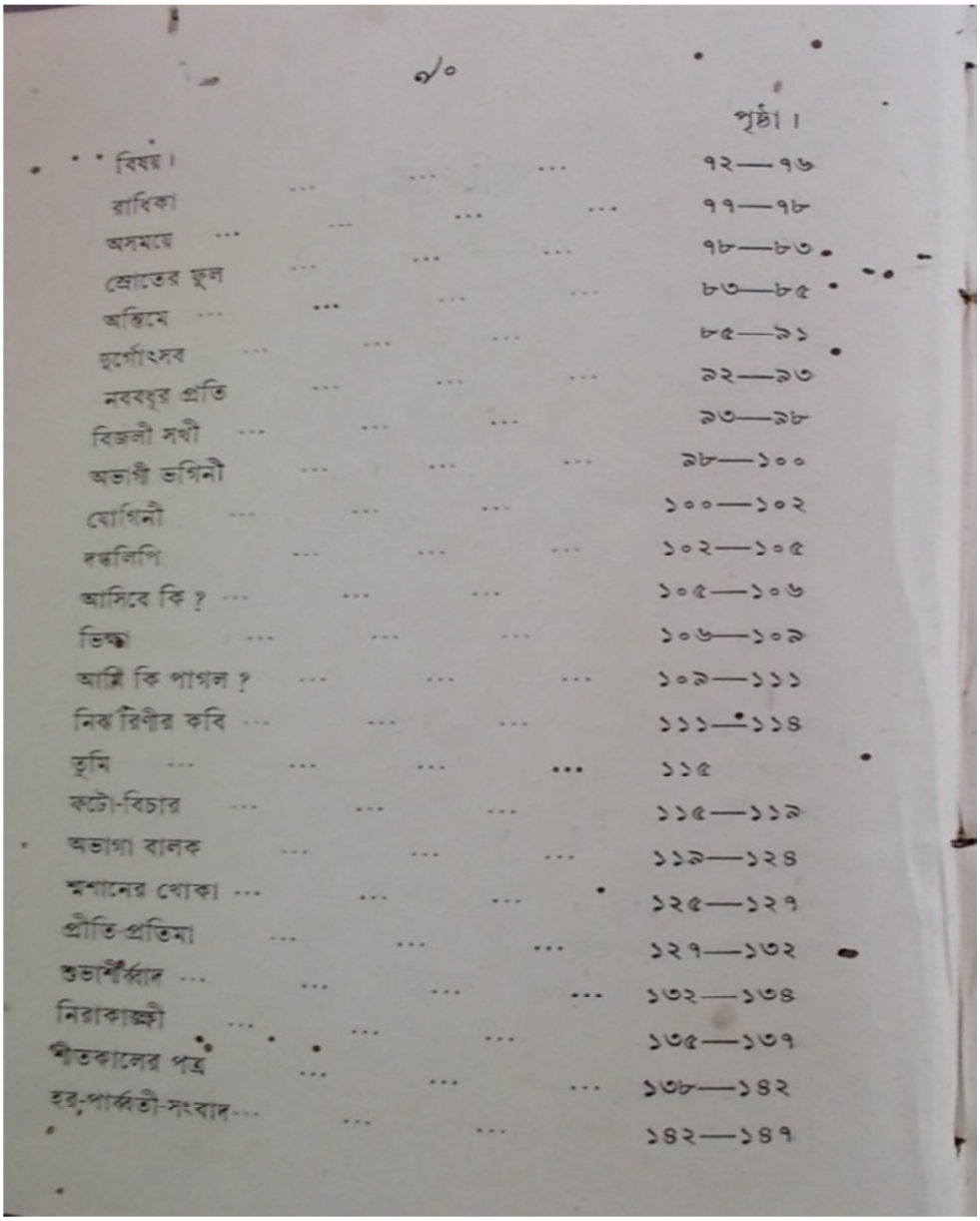
সূচিপত্র।

—:•:—

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
প্রভাতী	১—৩
আবাহন	৪—৮
বাঁধা	৯—১০
তোমরা কারা	১০—১৪
প্রমীলা	১৫—১৮
আকাঙ্ক্ষা	১৯—২২
মোহিনী	২২—২৩
দেবঘর	২৪—২৮
ভুল	২৯—৩২
কবির-শ্মশানে	৩৩—৩৬
বীরবালক	৩৬—৪৪
কি ক্ষতি আমার ?	৪৪—৪৯
সুখী	৪৯—৫৪
পতঙ্গের প্রতি	৫৪—৫৭
অনলের প্রতি পতঙ্গ	৫৮—৬২
প্রার্থনা	৬২—৬৫
বিদেশে	৬৫—৬৭
কেন এ সন্দেহ ?	৬৭—৭০
সখী	৭০—৭২

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সূচিপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩৫

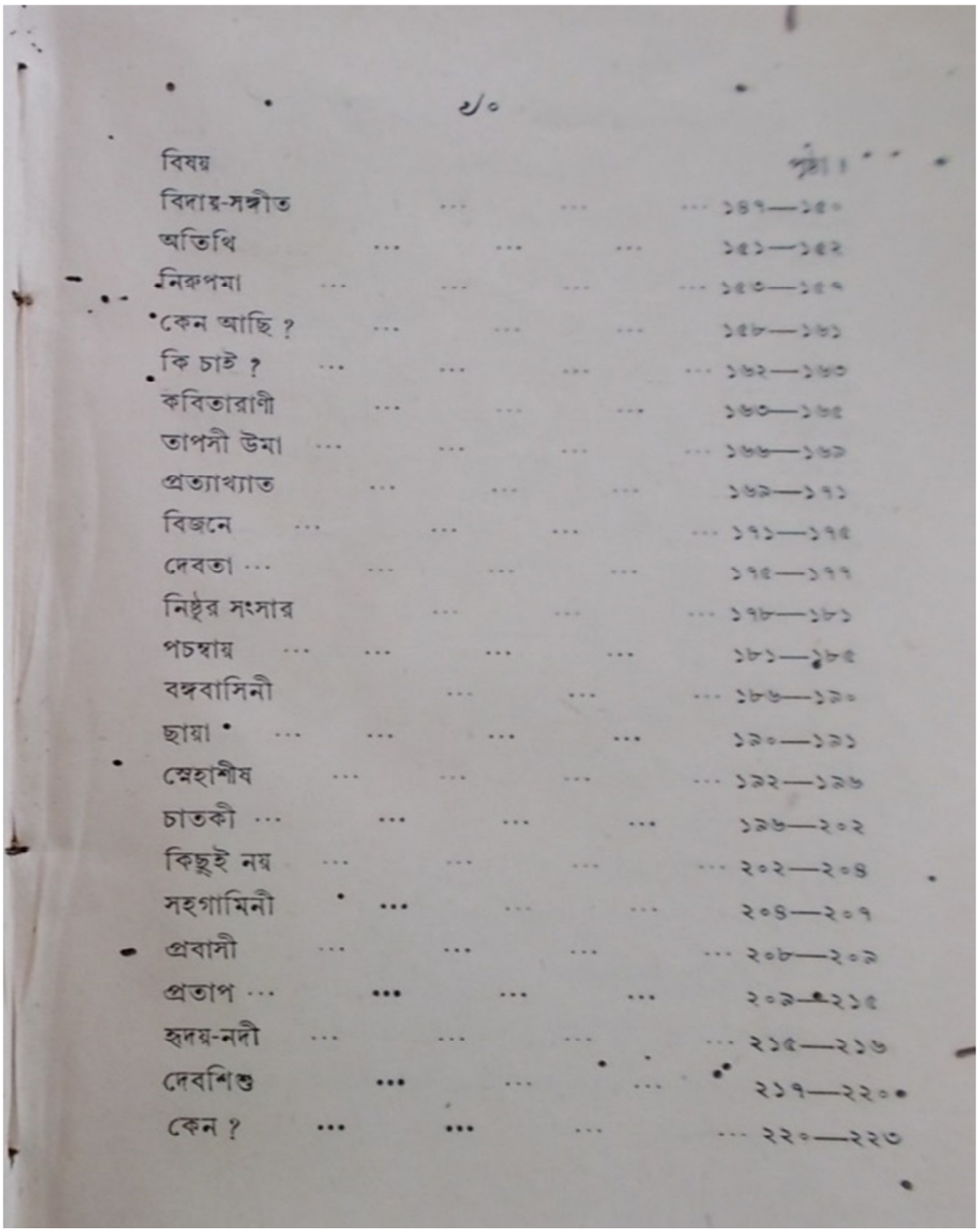


৵০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
রাধিকা	৭২—৭৬
অসময়ে	৭৭—৭৮
স্রোতের ফুল	৭৮—৮৩
অন্তিমে	৮৩—৮৫
দুর্গোৎসব	৮৫—৯১
নববধূর প্রতি	৯২—৯৩
বিজলী সখী	৯৩—৯৮
অভাগী ভগিনী	৯৮—১০০
যোগিনী	১০০—১০২
দগ্ধলিপি	১০২—১০৫
আসিবে কি ?	১০৫—১০৬
ভিক্ষা	১০৬—১০৯
আমি কি পাগল ?	১০৯—১১১
নির্ঝরিণীর কবি	১১১—১১৪
তুমি	১১৫
কটো-বিচার	১১৫—১১৯
অভাগা বালক	১১৯—১২৪
শ্মশানের খোকা	১২৫—১২৭
প্রীতি-প্রতিমা	১২৭—১৩২
শুভাশীর্ব্বাদ	১৩২—১৩৪
নিরাকাঙ্ক্ষী	১৩৫—১৩৭
শীতকালের পত্র	১৩৮—১৪২
হর-পার্ব্বতী-সংবাদ	১৪২—১৪৭

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সূচিপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩৬



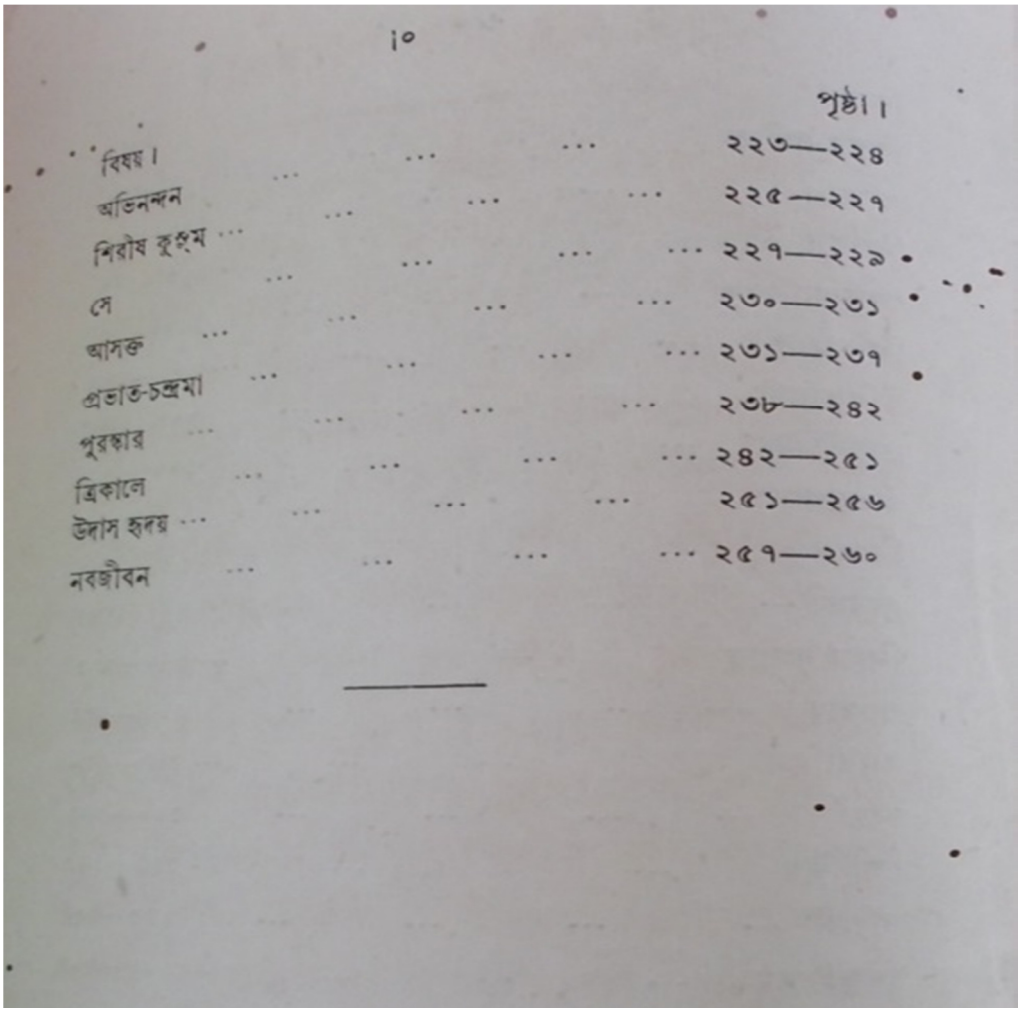
৶০

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিদায়-সঙ্গীত ... ... ১৪৭—১৫০
অতিথি ... ... ১৫১—১৫২
নিরুপমা ... ... ১৫৩—১৫৭
কেন আছি ? ... ... ১৫৮—১৬১
কি চাই ? ... ... ১৬২—১৬৩
কবিতারাণী ... ... ১৬৩—১৬৫
তাপসী উমা ... ... ১৬৬—১৬৯
প্রত্যাখ্যাত ... ... ১৬৯—১৭১
বিজনে ... ... ১৭১—১৭৫
দেবতা ... ... ১৭৫—১৭৭
নিষ্ঠুর সংসার ... ... ১৭৮—১৮১
পঞ্চস্বায় ... ... ১৮১—১৮৫
বঙ্গবাসিনী ... ... ১৮৬—১৯০
ছায়া ... ... ১৯০—১৯১
স্নেহাশীষ ... ... ১৯২—১৯৬
চাতকী ... ... ১৯৬—২০২
কিছুই নয় ... ... ২০২—২০৪
সহগামিনী ... ... ২০৪—২০৭
প্রবাসী ... ... ২০৮—২০৯
প্রতাপ ... ... ২০৯—২১৫
হৃদয়-নদী ... ... ২১৫—২১৬
দেবশিশু ... ... ২১৭—২২০
কেন ? ... ... ২২০—২২৩

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সূচিপত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩৭



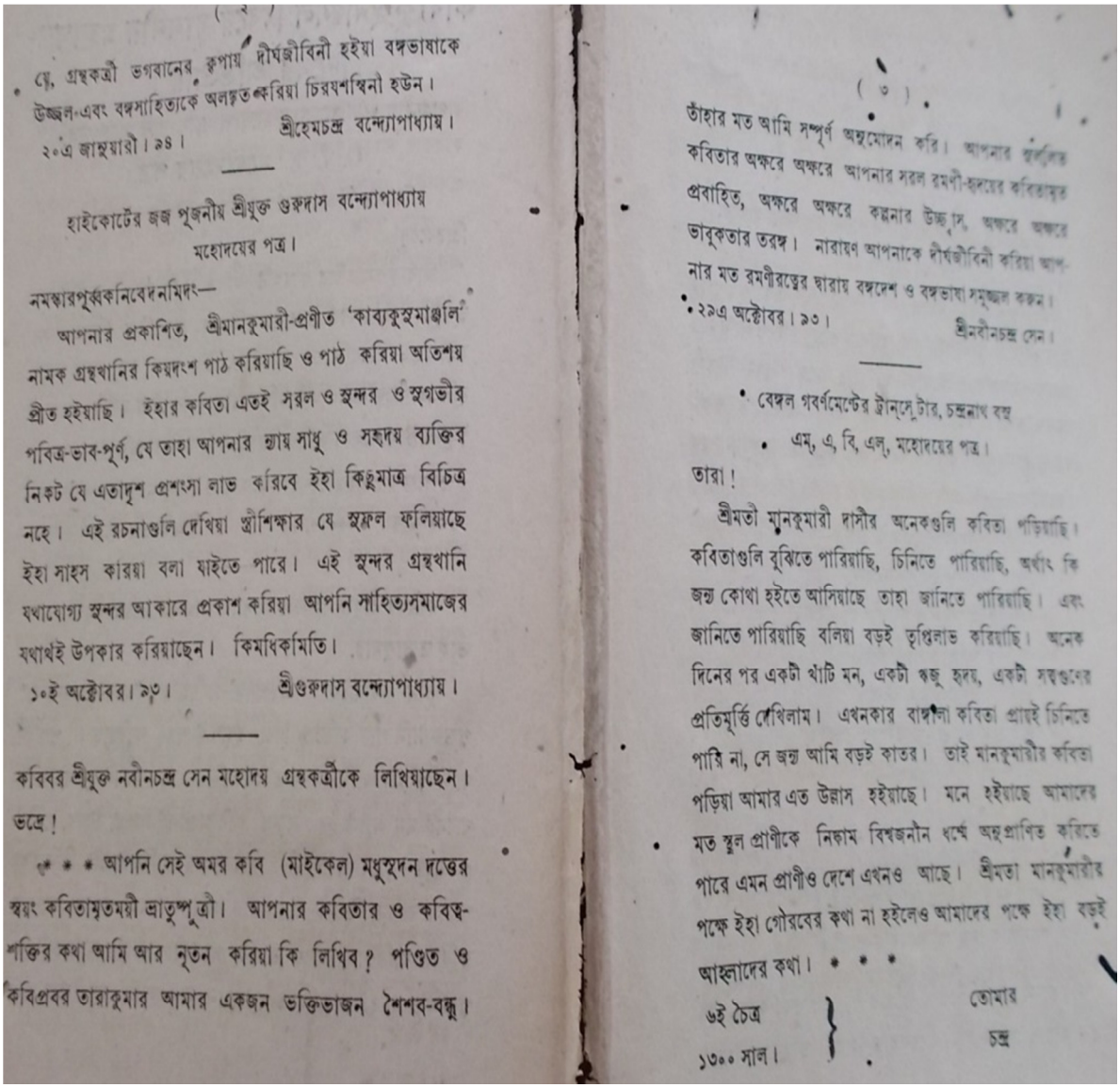
।০

পৃষ্ঠা।।

বিষয়। ... ... ২২৩—২২৪
অভিনন্দন ... ... ২২৫—২২৭
শিরীষ কুসুম ... ... ২২৭—২২৯
সে ... ... ২৩০—২৩১
আসক্ত ... ... ২৩১—২৩৭
প্রভাত-চন্দ্রমা ... ... ২৩৮—২৪২
পুরস্কার ... ... ২৪২—২৫১
ত্রিকালে ... ... ২৫১—২৫৬
উদাস হৃদয় ... ... ২৫৭—২৬০
নবজীবন ... ...

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সূচিপত্রের শেষ পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩৮



যে, গ্রন্থকর্ত্রী ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবিনী হইয়া বঙ্গভাষাকে উজ্জ্বল এবং বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া চিরযশস্বিনী হউন।

২০এ জানুয়ারী। ৯৪। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইকোর্টের জজ পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র।

নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদনমিদং—

আপনার প্রকাশিত, শ্রীমানকুমারী-প্রণীত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি ও পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ইহার কবিতা এতই সরল ও সুন্দর ও সুগভীর পবিত্র-ভাব-পূর্ণ, যে তাহা আপনার ন্যায় সাধু ও সহৃদয় ব্যক্তির নিকট যে এতাদৃশ প্রশংসা লাভ করিবে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই রচনাগুলি দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। এই সুন্দর গ্রন্থখানি যথাযোগ্য সুন্দর আকারে প্রকাশ করিয়া আপনি সাহিত্যসমাজের যথার্থই উপকার করিয়াছেন। কিমধিকমিতি।

১০ই অক্টোবর। ৯৩। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় গ্রন্থকর্ত্রীকে লিখিয়াছেন।

ভদ্রে!

* * * আপনি সেই অমর কবি (মাইকেল) মধুসূদন দত্তের স্বয়ং কবিতাময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রী। আপনার কবিতার ও কবিত্ব-শক্তির কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? পণ্ডিত ও কবিপ্রবর তারাকুমার আমার একজন ভক্তিভাজন শৈশব-বন্ধু। তাঁহার মত আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আপনার সুললিত কবিতার অক্ষরে অক্ষরে আপনার সরল রমণী-হৃদয়ের কবিত্বামৃত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কল্পনার উচ্ছ্বাস, অক্ষরে অক্ষরে ভাবুকতার তরঙ্গ। নারায়ণ আপনাকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া আপনার মত রমণীরত্নের দ্বারায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সমুজ্জ্বল করুন।

২৯এ অক্টোবর। ৯৩। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ট্রান্‌স্লেটার, চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্, মহোদয়ের পত্র।

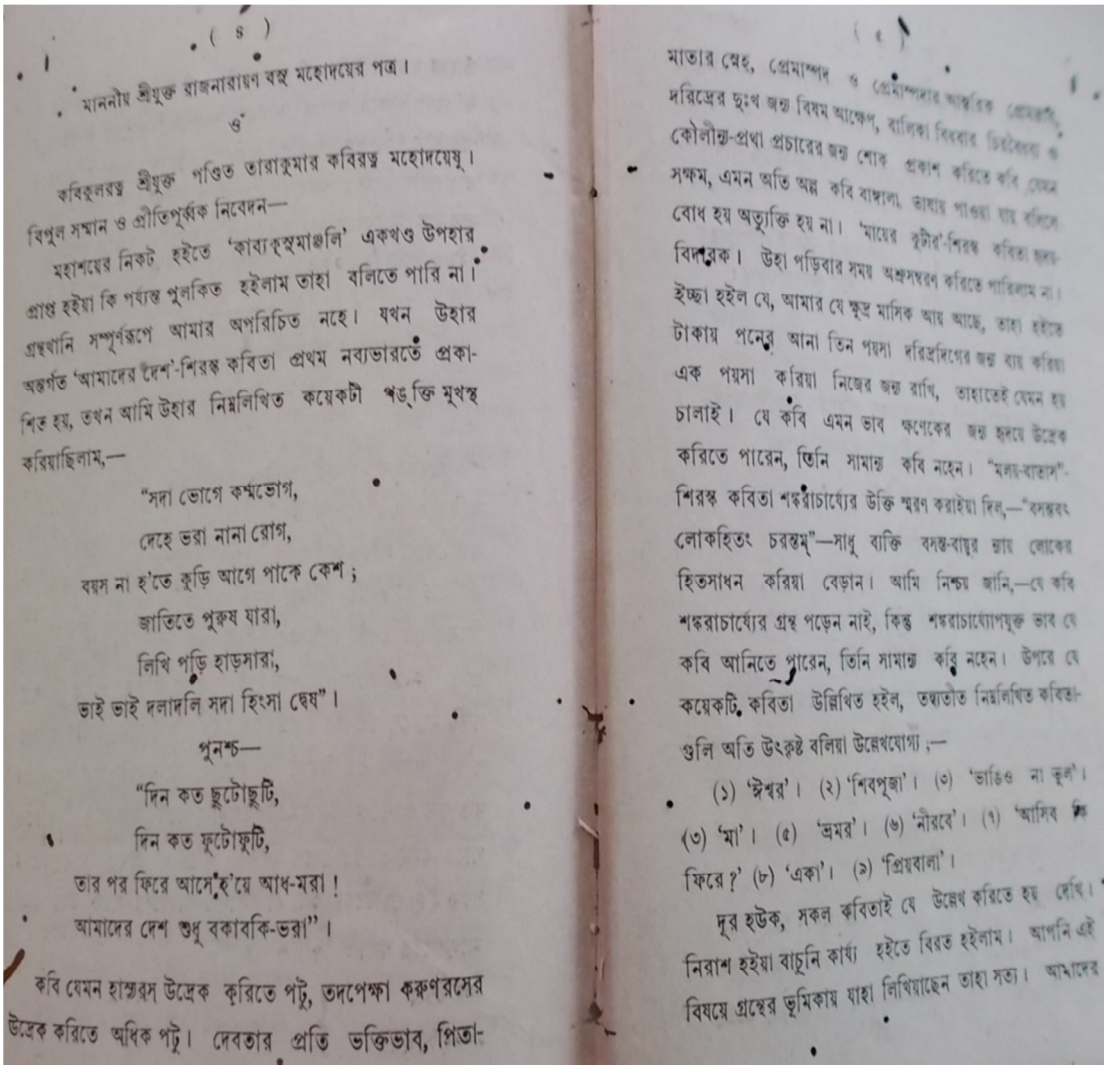
তারা!

শ্রীমতী মানকুমারী দাসীর অনেকগুলি কবিতা পড়িয়াছি। কবিতাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি, চিনিতে পারিয়াছি, অর্থাৎ কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছি। এবং জানিতে পারিয়াছি বলিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। অনেক দিনের পর একটী খাঁটি মন, একটী স্বচ্ছ হৃদয়, একটী সত্বগুণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এখনকার বাঙ্গালা কবিতা প্রায়ই চিনিতে পারি না, সে জন্য আমি বড়ই কাতর। তাই মানকুমারীর কবিতা পড়িয়া আমার এত উল্লাস হইয়াছে। মনে হইয়াছে আমাদের মত স্থূল প্রাণীকে নিষ্কাম বিশ্বজনীন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে। শ্রীমতী মানকুমারীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা না হইলেও আমাদের পক্ষে ইহা বড়ই আহ্লাদের কথা। * * *

৬ই চৈত্র ১৩০০ সাল। তোমার চন্দ্র

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত মানকুমারী বসু রচিত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের প্রকাশককে লিখিত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের প্রশংসাসূচক পত্র। 'কনকাঞ্জলি' গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত প্রশংসাসূচক বিজ্ঞাপন অংশের ২ ও ৩ নং পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৩৯



(৪)

মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের পত্র।

ও

কবিকুলরত্ন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহোদয়েষু।

বিপুল সম্মান ও প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয়ের নিকট হইতে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া কি পর্য্যন্ত পুলকিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে আমার অপরিচিত নহে। যখন উহার অন্তর্গত 'আমাদের দেশ'-শিরস্ক কবিতা প্রথম নব্যভারতে প্রকাশিত হয়, তখন আমি উহার নিম্নলিখিত কয়েকটী খণ্ড্‌ক্তি মুখস্থ করিয়াছিলাম,—

"সদা ভোগে কর্ম্মভোগ,
দেহে ভরা নানা রোগ,
বয়স না হ'তে কুড়ি আগে পাকে কেশ ;
জাতিতে পুরুষ যারা,
লিখি পড়ি হাড়সারা,
ভাই ভাই দলাদলি সদা হিংসা দ্বেষ"।

পুনশ্চ—

"দিন কত ছুটোছুটি,
দিন কত ফুটোফুটি,
তার পর ফিরে আসে হ'য়ে আধ-মরা !
আমাদের দেশ শুধু বকাবকি-ভরা"।

কবি যেমন হাস্যরস উদ্রেক করিতে পটু, তদপেক্ষা করুণরসের উদ্রেক করিতে অধিক পটু। দেবতার প্রতি ভক্তিভাব, পিতা-

(৫)

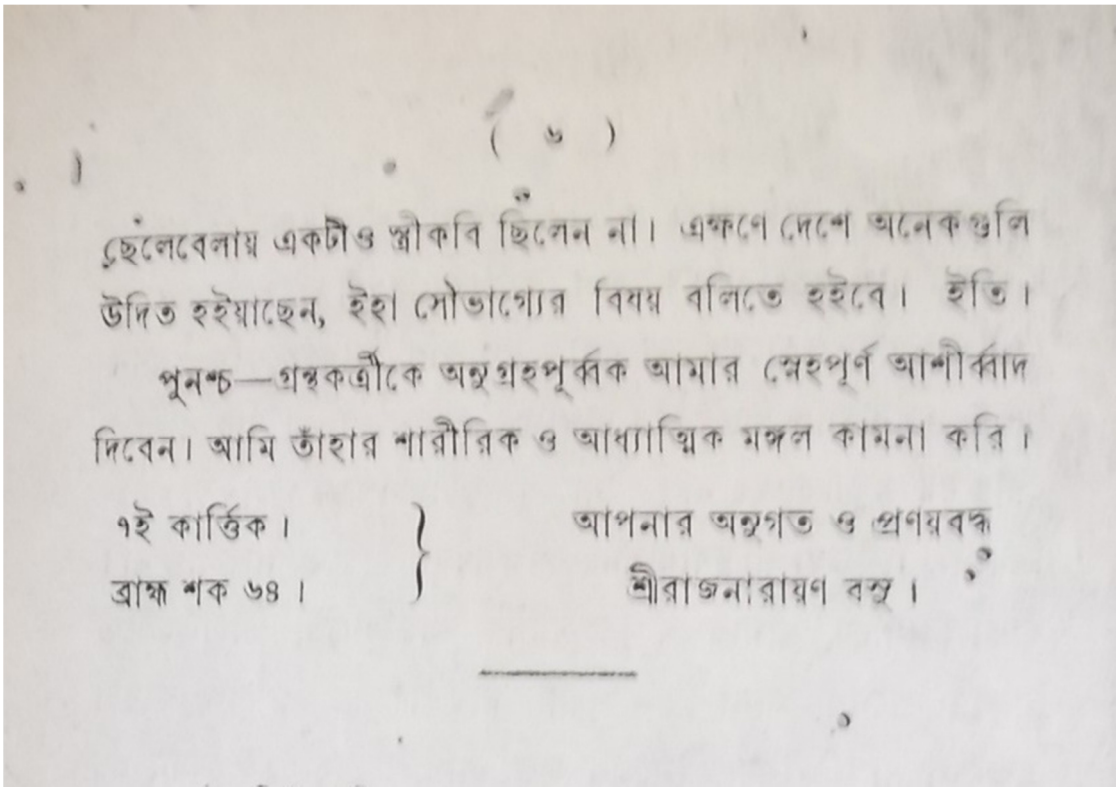
মাতার স্নেহ, প্রেমাস্পদ ও প্রেমাস্পদার আন্তরিক প্রেমের, দরিদ্রের দুঃখ জন্য বিষম আক্ষেপ, বালিকা বিধবার চিরবৈধব্য ও কৌলীন্য-প্রথা প্রচারের জন্য শোক প্রকাশ করিতে কবি যেমন সক্ষম, এমন অতি অল্প কবি বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। 'মায়ের কুটীর'-শিরস্ক কবিতা হৃদয়-বিদারক। উহা পড়িবার সময় অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইচ্ছা হইল যে, আমার যে ক্ষুদ্র মাসিক আয় আছে, তাহা হইতে টাকায় পনের আনা তিন পয়সা দরিদ্রদিগের জন্য ব্যয় করিয়া এক পয়সা করিয়া নিজের জন্য রাখি, তাহাতেই যেমন হয় চালাই। যে কবি এমন ভাব ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে উদ্রেক করিতে পারেন, তিনি সামান্য কবি নহেন। "মলয়-বাতাস"-শিরস্ক কবিতা শঙ্করাচার্য্যের উক্তি স্মরণ করাইয়া দিল,—"বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তম্"—সাধু ব্যক্তি বসন্ত-বায়ুর ন্যায় লোকের হিতসাধন করিয়া বেড়ান। আমি নিশ্চয় জানি,—যে কবি শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যোপযুক্ত ভাব যে কবি আনিতে পারেন, তিনি সামান্য কবি নহেন। উপরে যে কয়েকটি কবিতা উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কবিতা-গুলি অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখযোগ্য ;—

(১) 'ঈশ্বর'। (২) 'শিবপূজা'। (৩) 'ভাঙিও না ভুল'। (৩) 'মা'। (৫) 'ভ্রমর'। (৬) 'নীরবে'। (৭) 'আসিব কি ফিরে ?' (৮) 'একা'। (৯) 'প্রিয়বালা'।

দূর হউক, সকল কবিতাই যে উল্লেখ করিতে হয় দেখি। নিরাশ হইয়া বাছুনি কার্য্য হইতে বিরত হইলাম। আপনি এই বিষয়ে গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য। আমাদের

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত মানকুমারী বসু রচিত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের প্রকাশককে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর প্রশংসাসূচক পত্র। 'কনকাঞ্জলি' গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত প্রশংসাসূচক বিজ্ঞাপন অংশের ৪ ও ৫ নং পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৪০



(৬)

ছেলেবেলায় একটীও স্ত্রীকবি ছিলেন না। এক্ষণে দেশে অনেকগুলি উদিত হইয়াছেন, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ইতি।

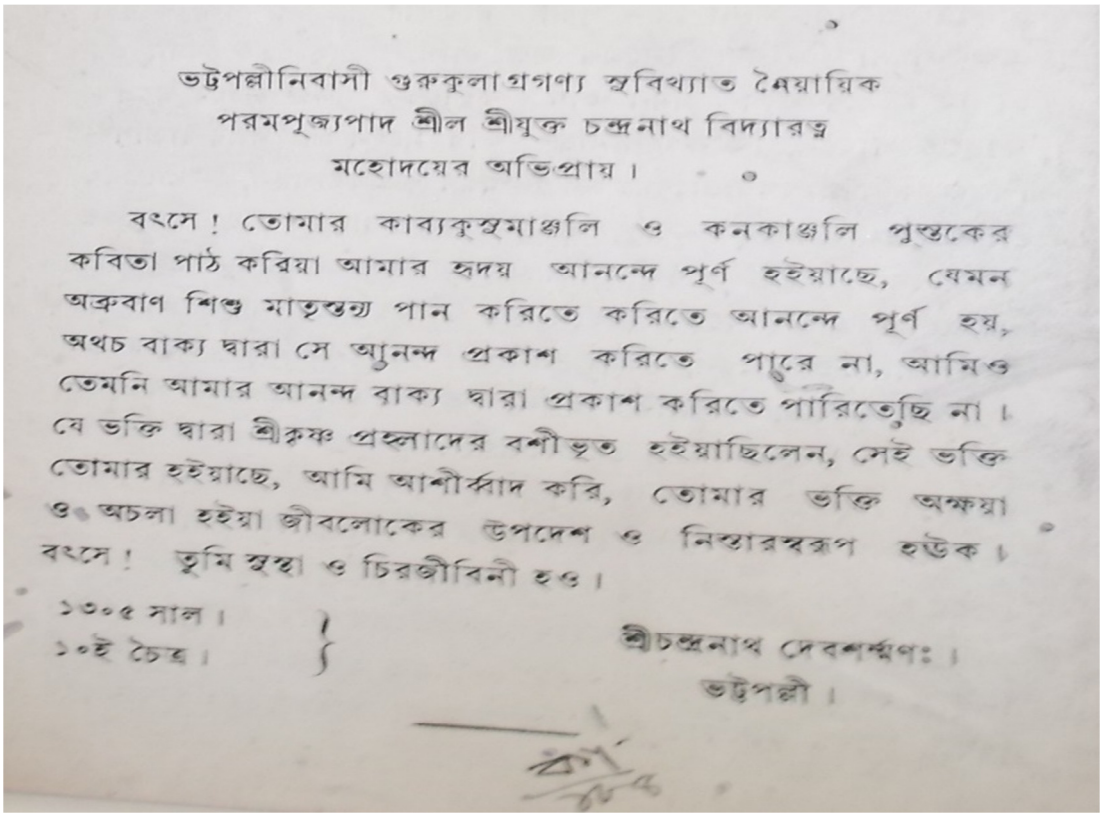
পুনশ্চ—গ্রন্থকর্ত্রীকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ দিবেন। আমি তাঁহার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল কামনা করি।

৭ই কার্ত্তিক।
ব্রাহ্ম শক ৬৪।

আপনার অনুগত ও প্রণয়বদ্ধ
শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত মানকুমারী বসু রচিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের প্রকাশককে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর প্রশংসাসূচক পত্র। ‘কনকাঞ্জলি’ গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত প্রশংসাসূচক বিজ্ঞাপন অংশের ৬ নং পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৪১



ভট্টপল্লীনিবাসী গুরুকুলাগ্রগণ্য সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক
পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন
মহোদয়ের অভিপ্রায়।

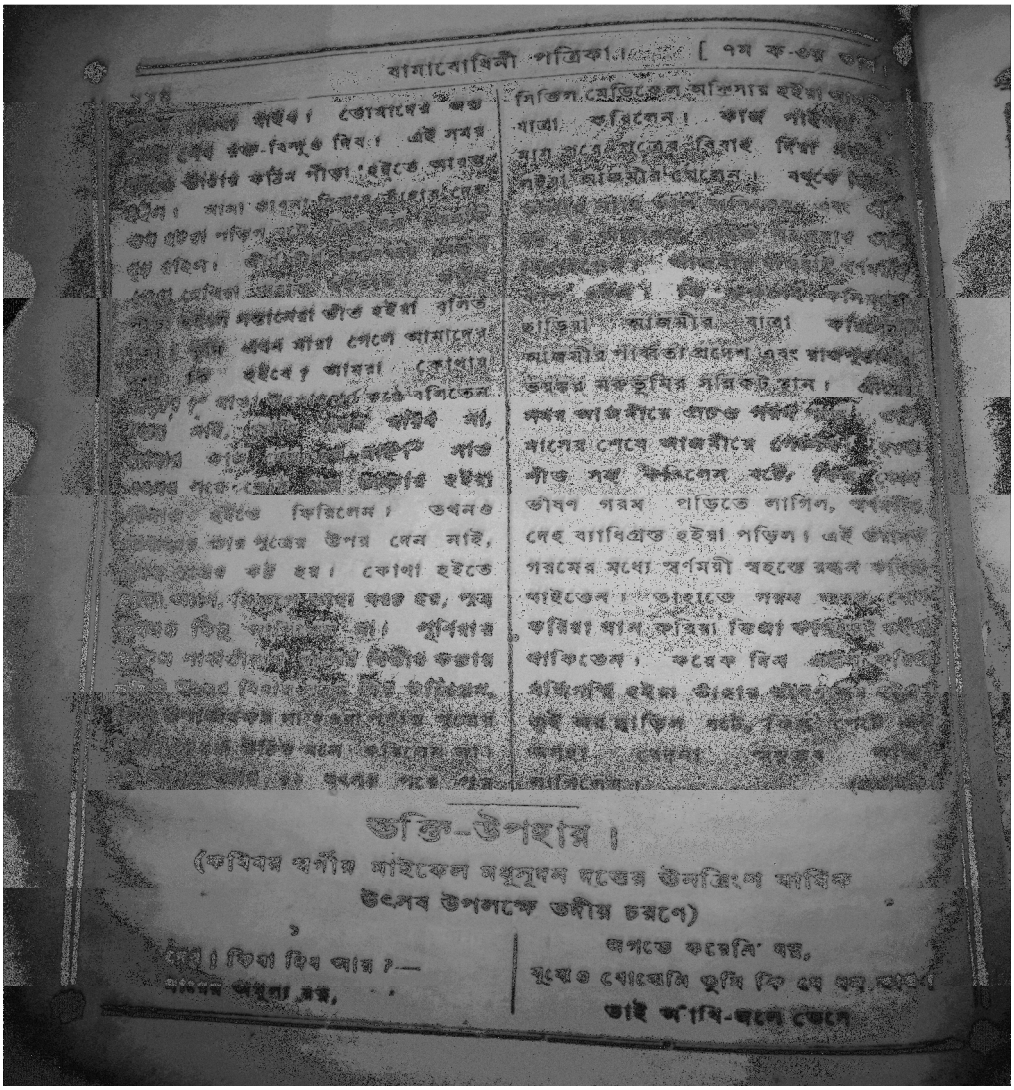
বৎসে! তোমার কাব্যকুসুমাঞ্জলি ও কনকাঞ্জলি পুস্তকের কবিতা পাঠ করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, যেমন অক্রবাণ শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে আনন্দে পূর্ণ হয়, অথচ বাক্য দ্বারা সে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না, আমিও তেমনি আমার আনন্দ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যে ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদের বশীভূত হইয়াছিলেন, সেই ভক্তি তোমার হইয়াছে, আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ভক্তি অক্ষয়া ও অচলা হইয়া জীবলোকের উপদেশ ও নিস্তারস্বরূপ হউক। বৎসে! তুমি সুস্থা ও চিরজীবিনী হও।

১৩০৫ সাল।
১০ই চৈত্র।

শ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।
ভট্টপল্লী।

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কনকাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত মানকুমারী বসু রচিত ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ গ্রন্থের প্রকাশককে লিখিত জনৈক চন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ -এর প্রশংসাসূচক পত্র। ‘কনকাঞ্জলি’ গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত প্রশংসাসূচক বিজ্ঞাপন অংশের ৬ নং পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৪২

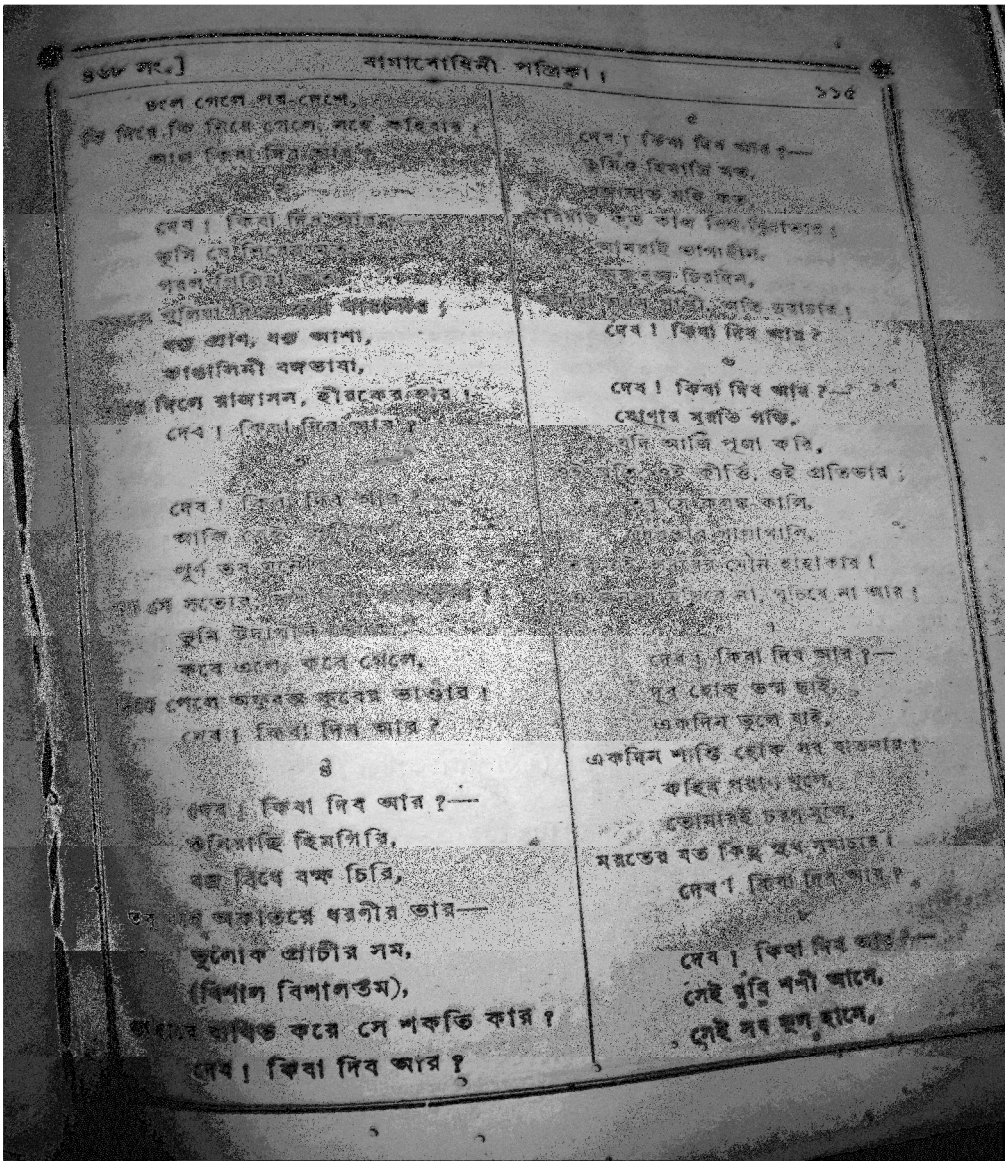

বামাবোধিনী পত্রিকা।

ভক্তি-উপহার।

(কবিবর স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঊনত্রিংশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তদীয় চরণে)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত মানকুমারী বসু রচিত 'ভক্তি-উপহার' কবিতার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। স্বর্গীয় মধুসূদন দত্তের ঊনত্রিশ বৎসর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতাটি রচনা করেছিলেন কবি।

চিত্রসংখ্যা- ৪৩

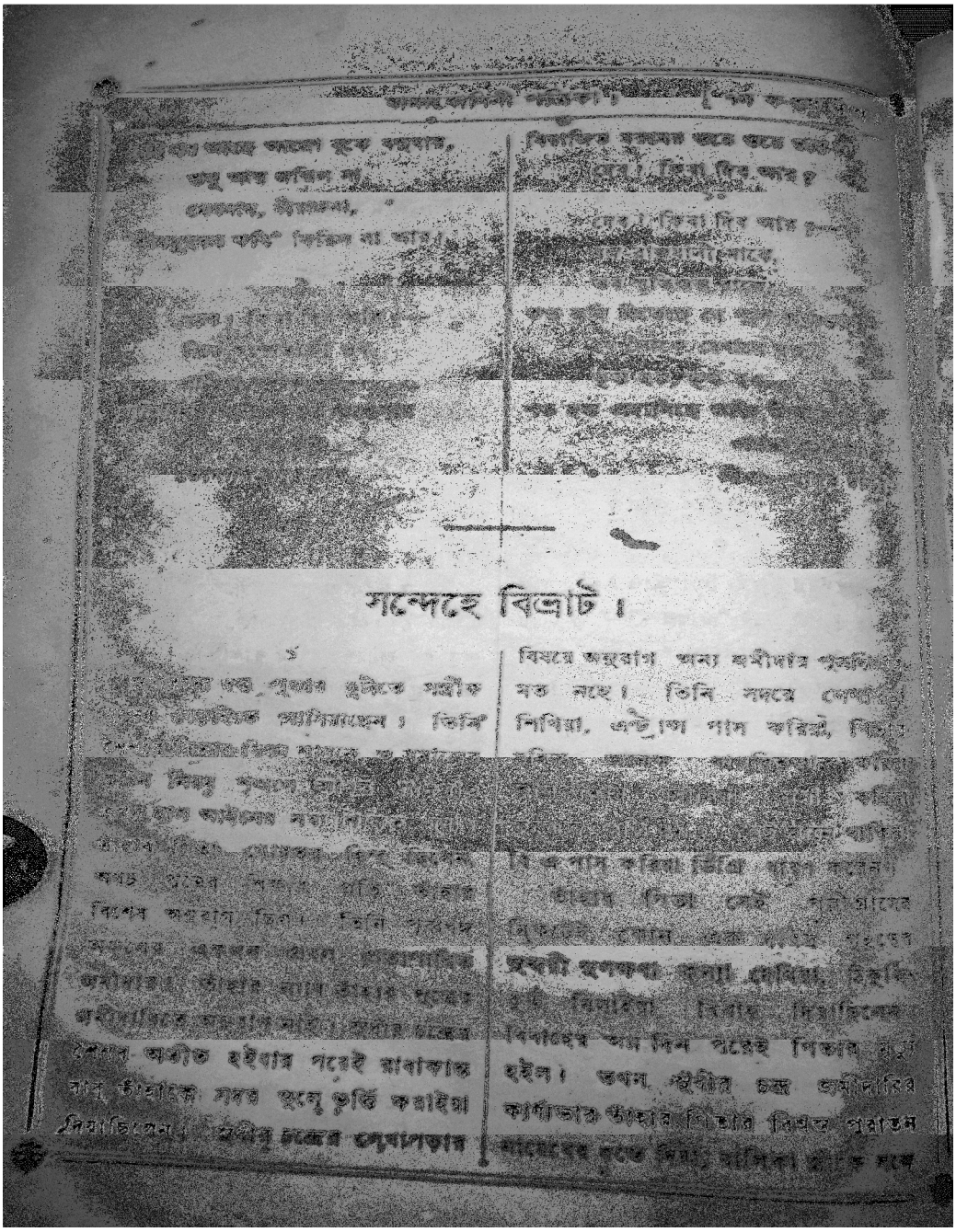

৪৬৮ সং।] বামাবোধিনী পত্রিকা। ১১৫

দেব! কিবা দিব আর?—
ভূলোক প্রাচীর সম,
(বিশাল বিশালতম),
এবার বাঁধিত করে সে শকতি কার?
দেব! কিবা দিব আর?

দেব! কিবা দিব আর?
ভূলোক প্রাচীর সম,
(বিশাল বিশালতম),
এবার বাঁধিত করে সে শকতি কার?
দেব! কিবা দিব আর?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত মানকুমারী বসুর লেখা 'ভক্তি-উপহার' কবিতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। কবিতাটি স্বর্গীয় মধুসূদন দত্তের উনত্রিশ বৎসর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতাটি রচনা করেছিলেন কবি।

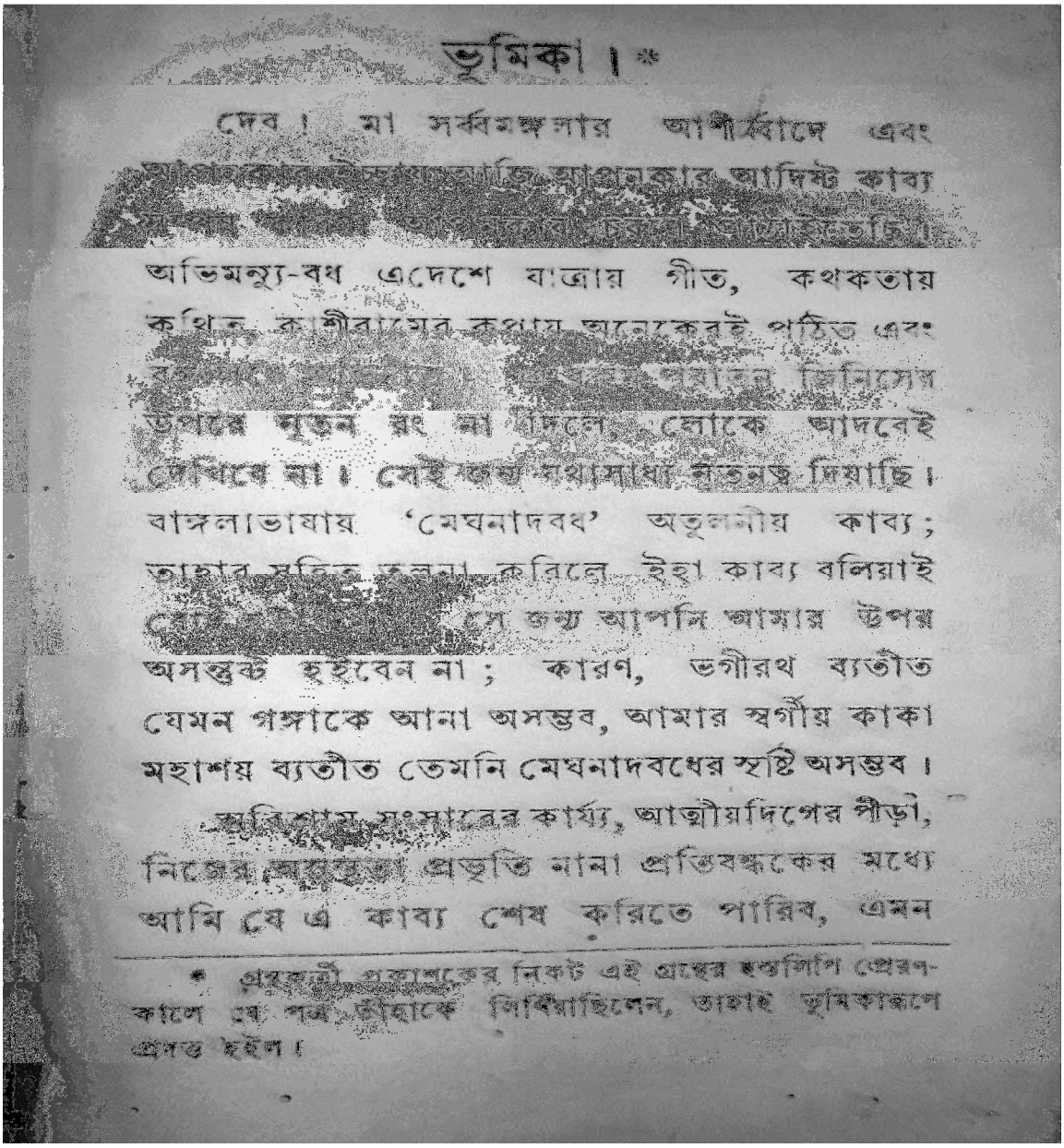
চিত্রসংখ্যা- ৪৪



সন্দেহে বিভ্রাট।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত মানকুমারী বসুর লেখা 'ভক্তি-উপহার' কবিতার শেষ পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। কবিতাটি স্বর্গীয় মধুসূদন দত্তের উনত্রিশ বৎসর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতাটি রচনা করেছিলেন কবি।

চিত্রসংখ্যা- ৪৫



ভূমিকা।*

দেব! মা সর্ব্বমঙ্গলার আশীর্ব্বাদে এবং
আপনকার উৎসাহে আজি আপনকার আদিষ্ট কাব্য
সমাপ্ত করিলাম। আপনকার চিত্র [illegible] করিতেছি।

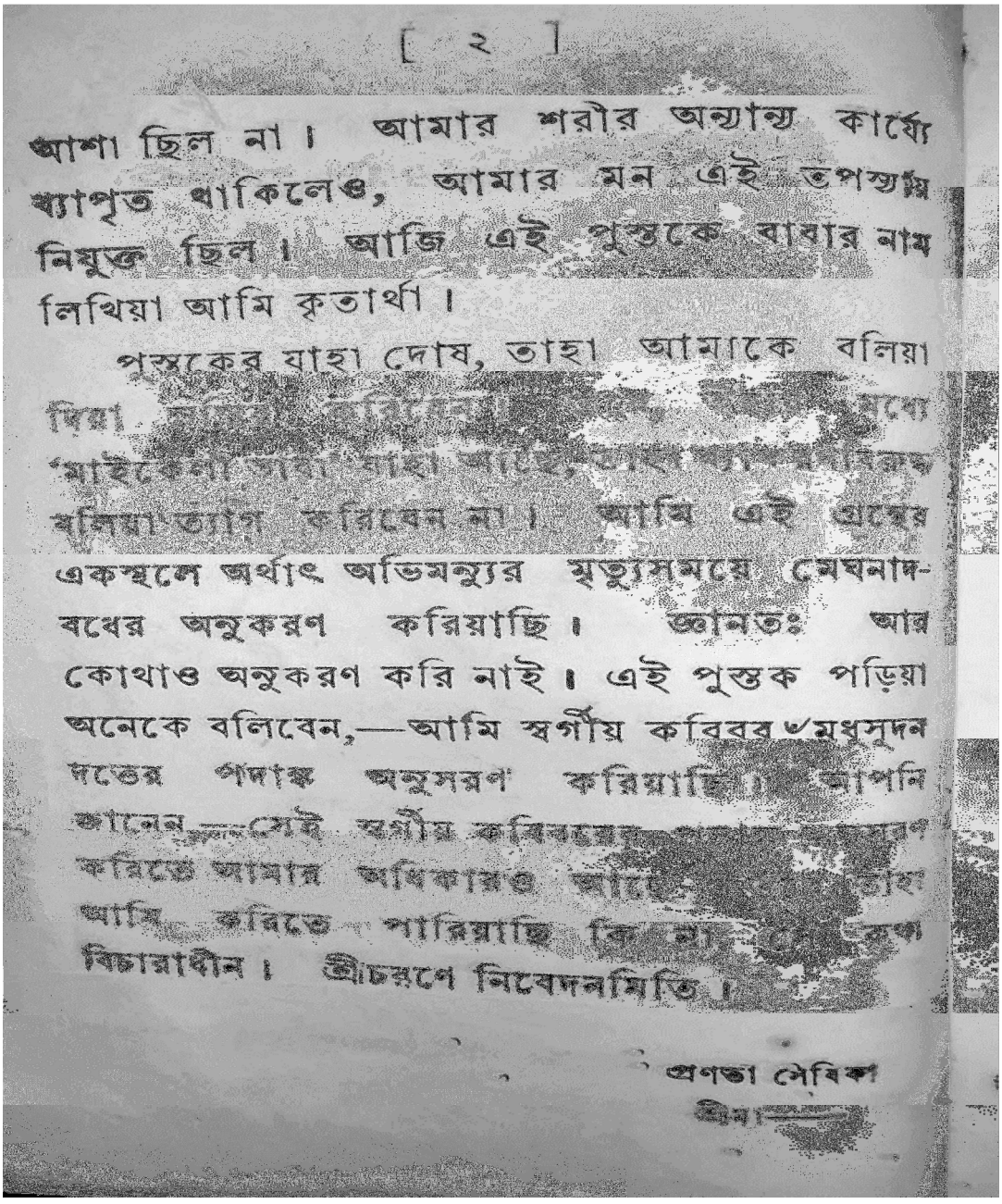
অভিমন্যু-বধ এদেশে যাত্রার গীত, কথকতায় কথিত, কাশীরামের কথায় অনেকেরই পঠিত এবং [illegible] পুরাতন জিনিসের উপরে নূতন রং না দিলে, লোকে আদরেই দেখিবে না। সেই জন্য যথাসাধ্য নূতনত্ব দিয়াছি। বাঙ্গলাভাষায় 'মেঘনাদবধ' অতুলনীয় কাব্য; তাহার সহিত তুলনা করিলে ইহা কাব্য বলিয়াই [illegible] সে জন্য আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না; কারণ, ভগীরথ ব্যতীত যেমন গঙ্গাকে আনা অসম্ভব, আমার স্বর্গীয় কাকা মহাশয় ব্যতীত তেমনি মেঘনাদবধের সৃষ্টি অসম্ভব।

[illegible] সংসারের কার্য্য, আত্মীয়দিগের পীড়া, নিজের অসুস্থতা প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধকের মধ্যে আমি যে এ কাব্য শেষ করিতে পারিব, এমন

* গ্রন্থকর্ত্রী প্রকাশকের নিকট এই গ্রন্থের হস্তলিপি প্রেরণ-কালে যে পত্র তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, তাহাই ভূমিকারূপে প্রদত্ত হইল।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত 'বীরকুমার-বধ' মহাকাব্যের ভূমিকা অংশের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগার থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৪৬



[২]

আশা ছিল না। আমার শরীর অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, আমার মন এই তপস্যায় নিযুক্ত ছিল। আজি এই পুস্তকে বাবার নাম লিখিয়া আমি কৃতার্থা।

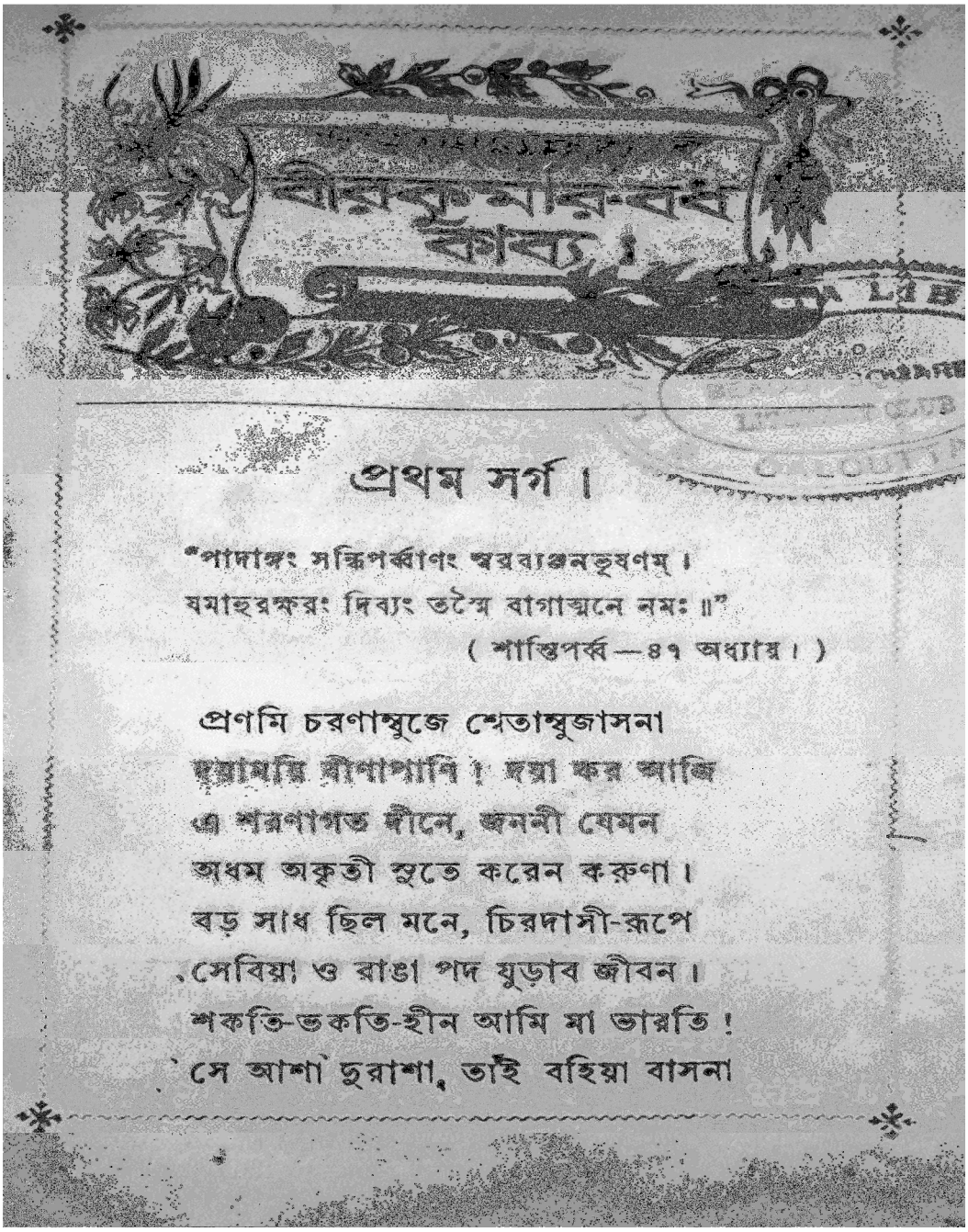
পুস্তকের যাহা দোষ, তাহা আমাকে বলিয়া দিয়া [illegible] মধ্যে 'মাইকেল সাধা' যাহা আছে, তাহা [illegible] বলিয়া ত্যাগ করিবেন না। আমি এই গ্রন্থের একস্থলে অর্থাৎ অভিমন্যুর মৃত্যুসময়ে মেঘনাদ-বধের অনুকরণ করিয়াছি। জ্ঞানতঃ আর কোথাও অনুকরণ করি নাই। এই পুস্তক পড়িয়া অনেকে বলিবেন,—আমি স্বর্গীয় কবিবর ৺মধুসূদন দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি। আপনি জানেন,—সেই স্বর্গীয় কবিবরের [illegible] করিতে আমার অধিকারও আছে। [illegible] তাহা আমি করিতে পারিয়াছি কি না [illegible] বিচারাধীন। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

প্রণতা সেবিকা

শ্রীমা—

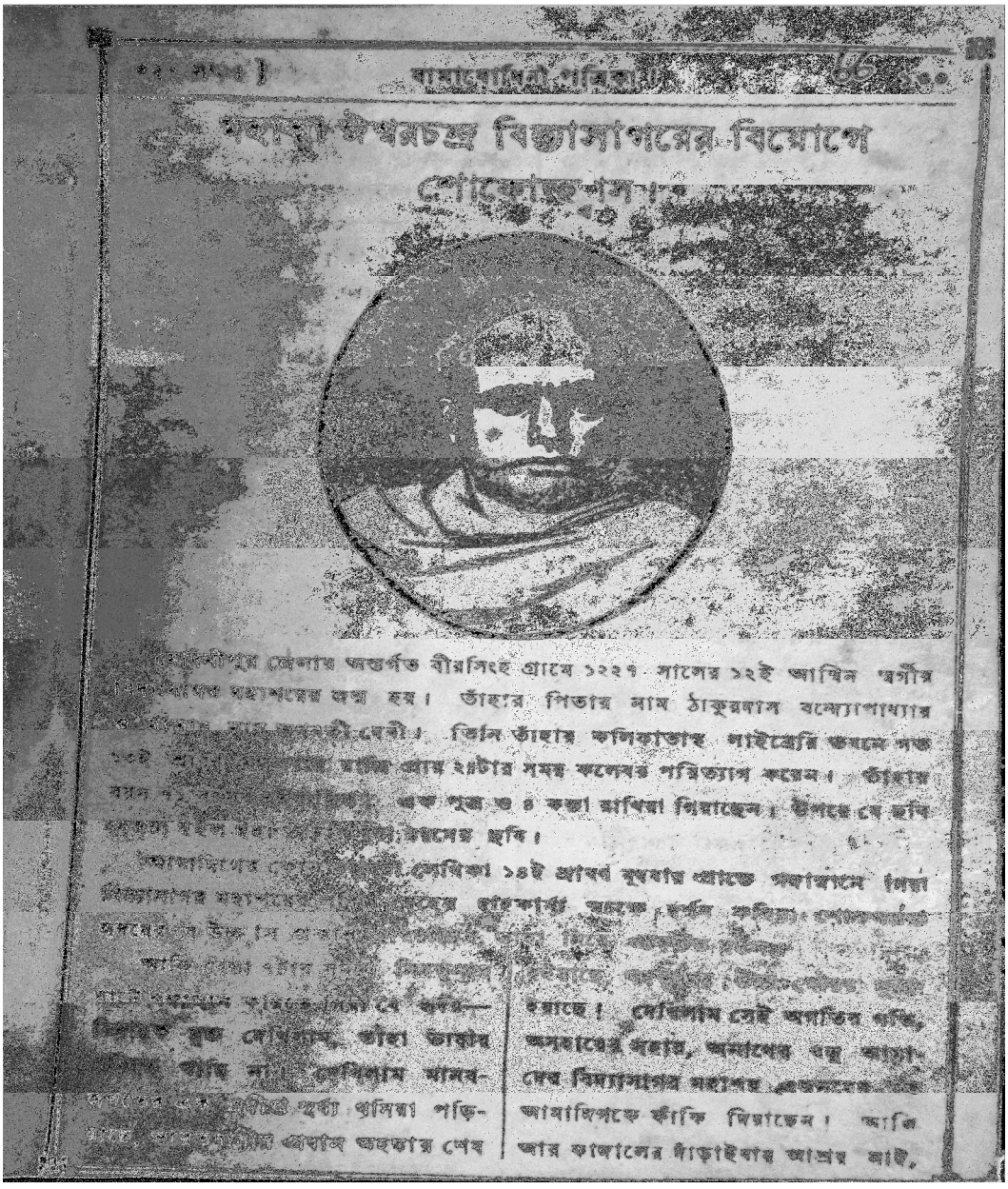
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত 'বীরকুমার-বধ' মহাকাব্যের ভূমিকা অংশের শেষ পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগার থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৪৭



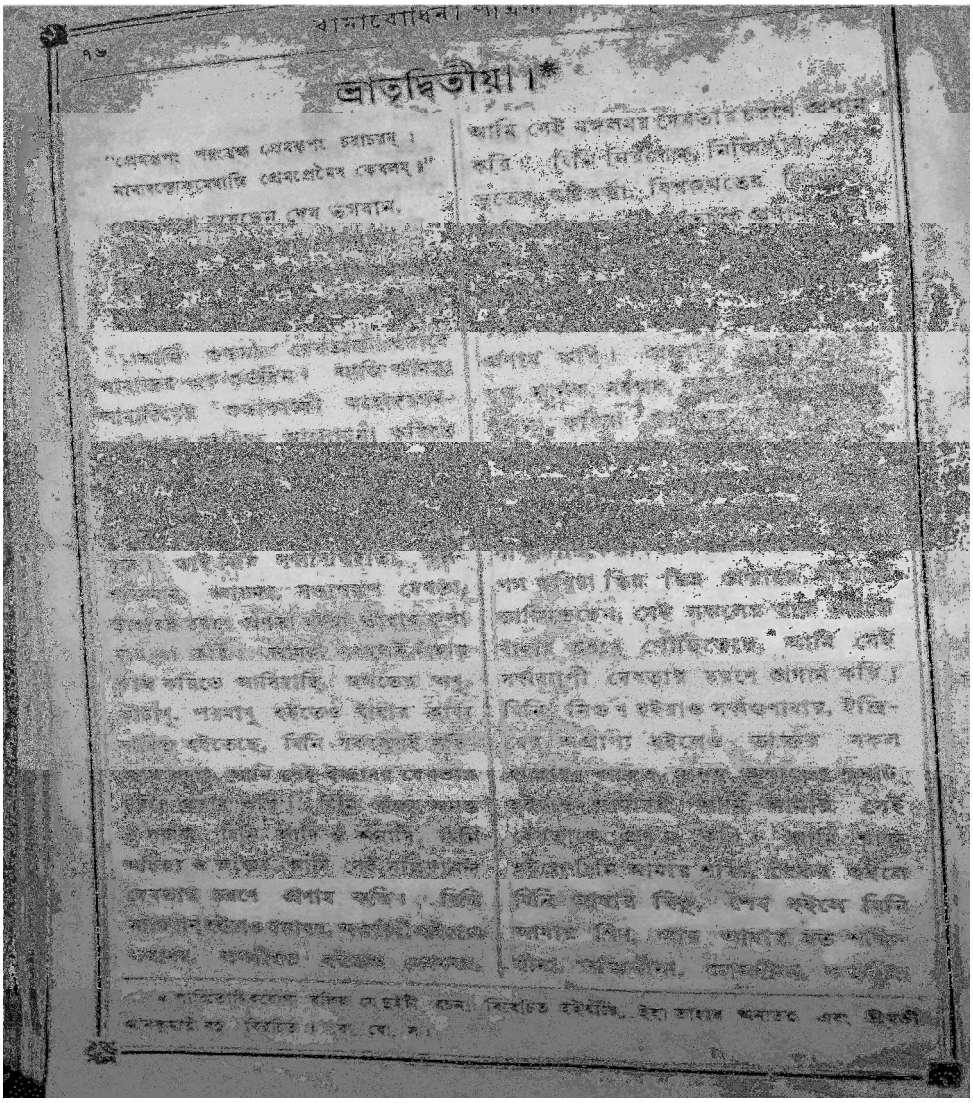
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত 'বীরকুমার-বধ' কাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগার থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৪৮



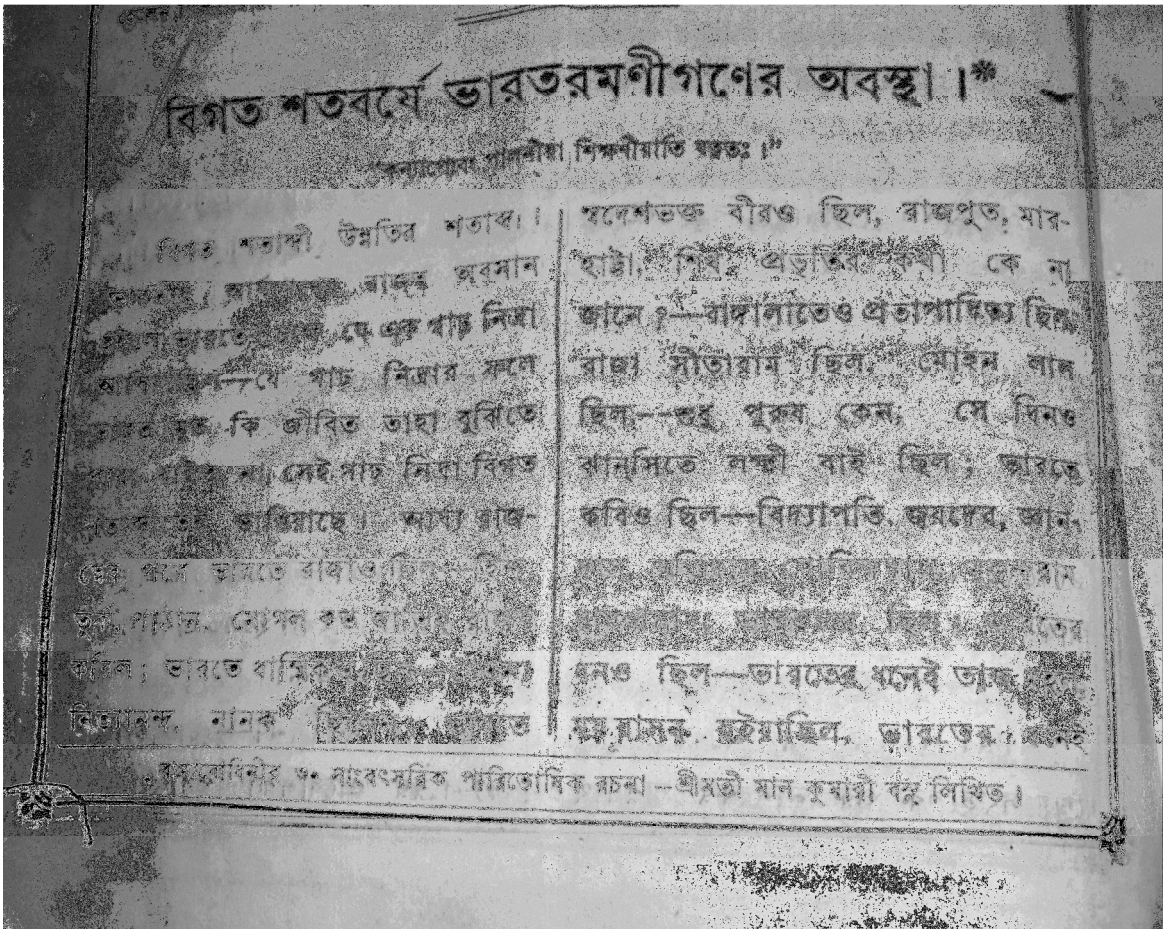
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ও মানকুমারী বসু রচিত ‘স্বর্গীয় মহাত্মা ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস’(১৮৯১) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একই শিরোনামে মুদ্রিত গদ্যরচনার প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। প্রতিলিপিটি উক্ত পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৪৯



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত ১৩০০ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত মানকুমারী বসু রচিত ‘ভ্রাতৃদ্বিতীয়া’ প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত পত্রিকা থেকে ছবিটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৫০



বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীগণের অবস্থা।*

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

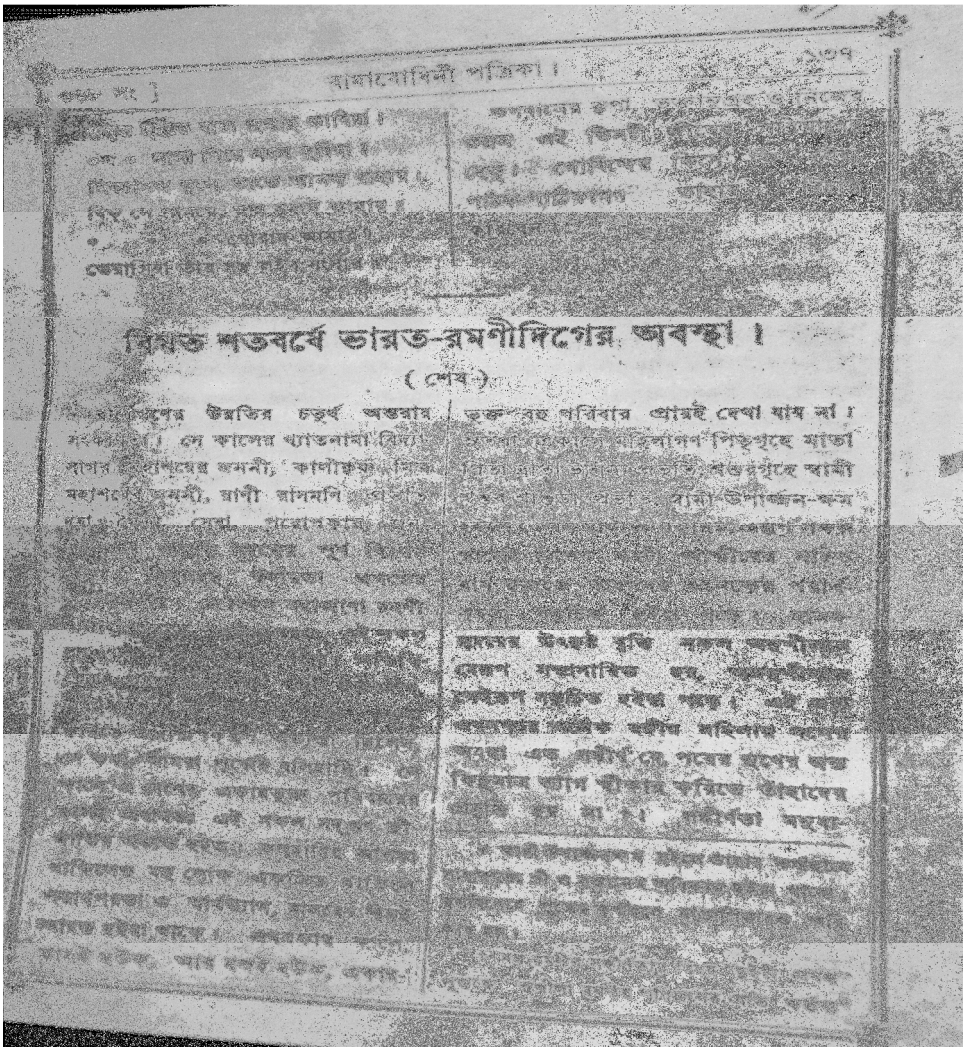
বিগত শতাব্দী উন্নতির শতাব্দী। ... অবসান ... যে এক রাত্র নিদ্রা ... যে রাত্র নিদ্রার ফলে ... কি জীবিত তাহা বুঝিতে ... সেই রাত্র নিদ্রা বিগত ... ভাঙ্গিয়াছে। আমরা রাজ- ... ভারতে রাজ্ঞী ... কেবল রাজ্ঞী ... ভারতে ধার্ম্মিক ... বিদ্যানন্দ, নানক ...

স্বদেশভক্ত বীরও ছিল, রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ প্রভৃতির কথা কে না জানে?—বাঙ্গালাতেও প্রতাপাদিত্য ছিল, রাজা সীতারাম ছিল, মোহন লাল ছিল,—শুধু পুরুষ কেন, সে দিনও ঝান্সিতে লক্ষ্মী বাই ছিল; ভারতে কবিও ছিল—বিদ্যাপতি, জয়দেব, জ্ঞান... ... ছিল ... তের ... ছিল—ভারতের ধর্ম্মের ... ছিল, ভারতের ...

* বামাবোধিনীর ৩০ বার্ষিক পারিতোষিক রচনা—শ্রীমতী মান কুমারী বসু লিখিত।

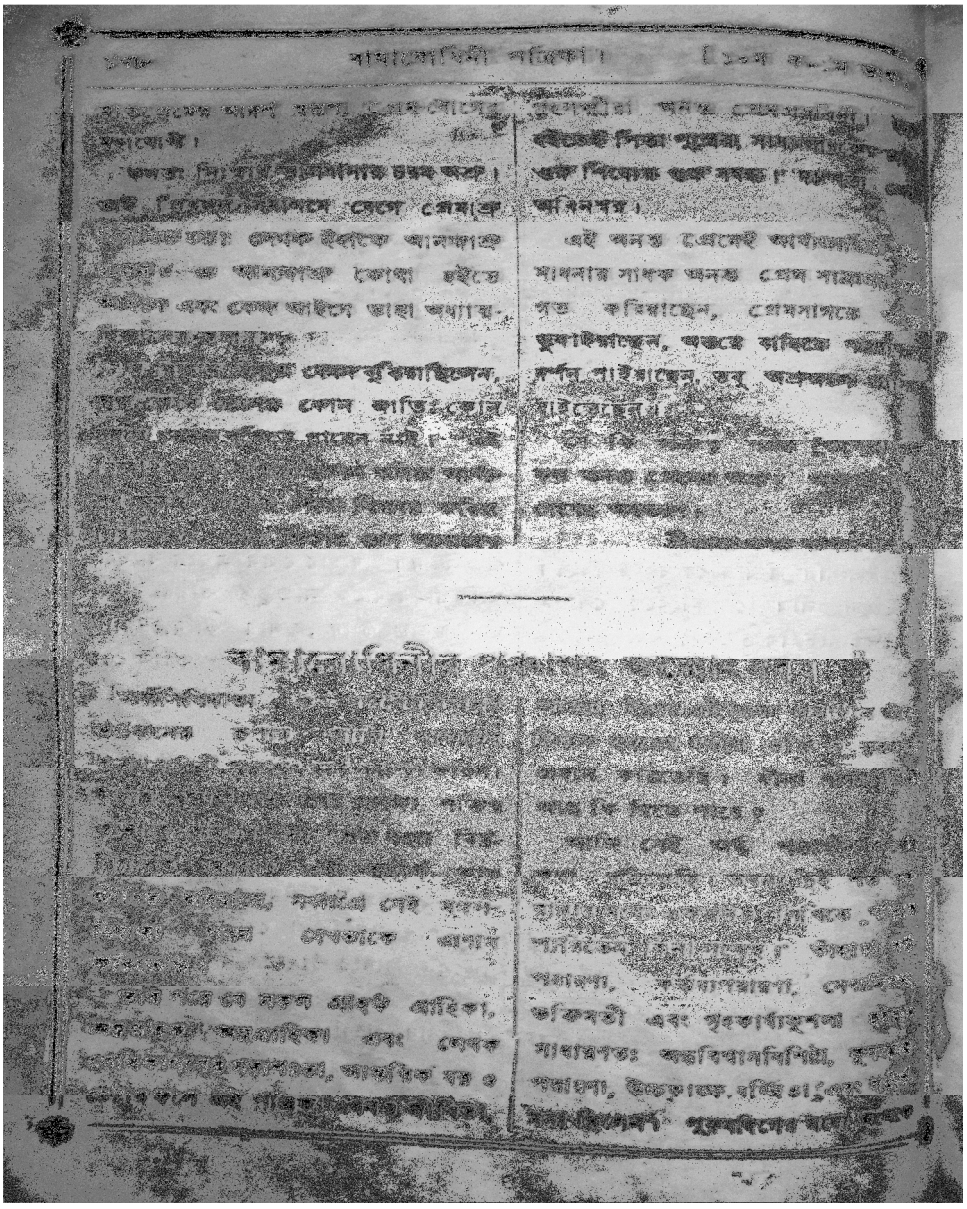
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত **১৩০১** বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত মানকুমারী বসু রচিত 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীগণের অবস্থা' প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত পত্রিকা থেকে প্রতিলিপিটি সংগৃহীত। প্রবন্ধটি বামাবোধিনী পত্রিকার ত্রিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে লিখিত এবং পুরস্কৃত।

ত্রসংখ্যা- ৫১



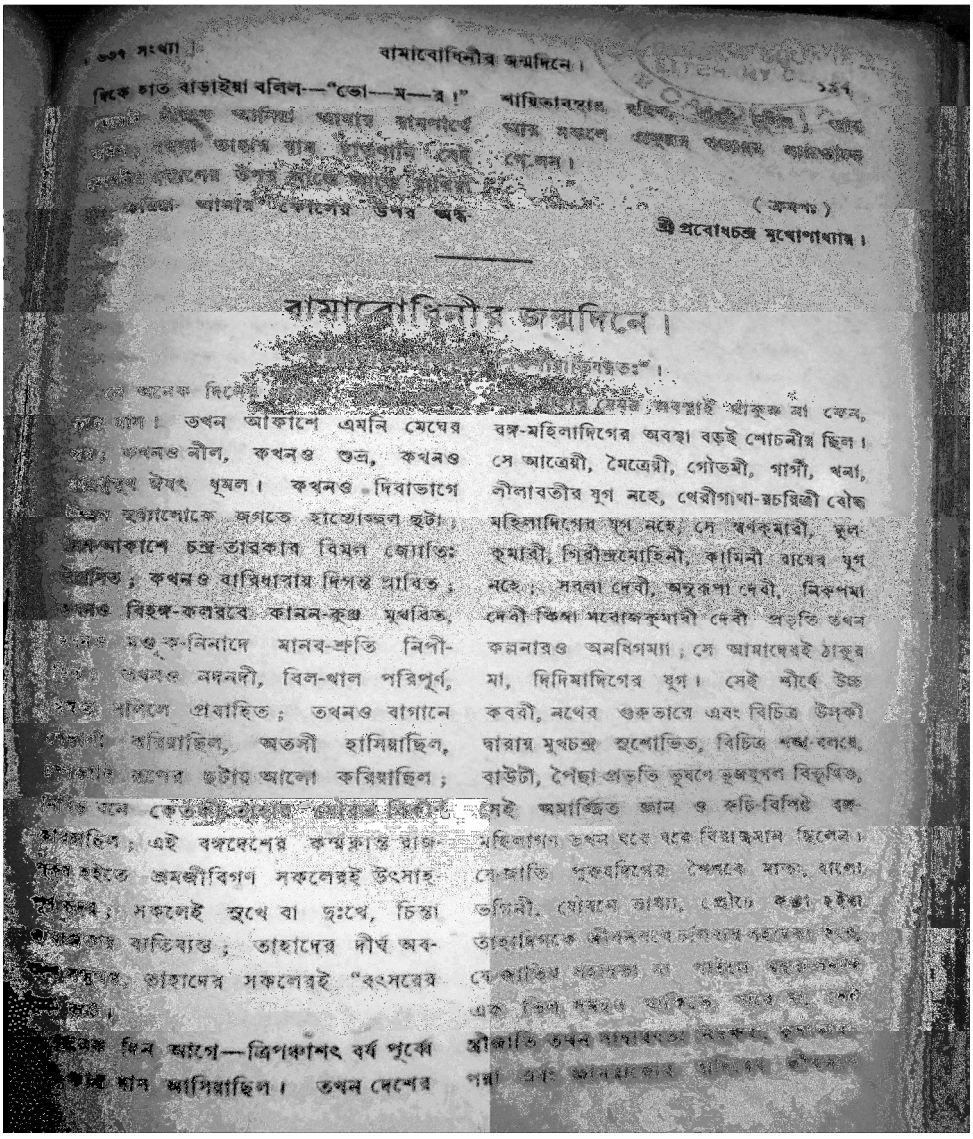
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত ১৩০১ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত মানকুমারী বসু রচিত 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীগণের অবস্থা' প্রবন্ধের শেষ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত পত্রিকা থেকে প্রতিলিপিটি সংগৃহীত। প্রবন্ধটি বামাবোধিনী পত্রিকার ত্রিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে লিখিত এবং পুরস্কৃত।

চিত্রসংখ্যা- ৫২



চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত **১৩১৯** বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় ‘বামাবোধিনীর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রবন্ধটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এই প্রবন্ধের বিষয় কোনো সাহিত্য রচনা নয়, সরাসরি বামাবোধিনী পত্রিকার গুরুত্ব বিচার।

চিত্রসংখ্যা- ৫৩



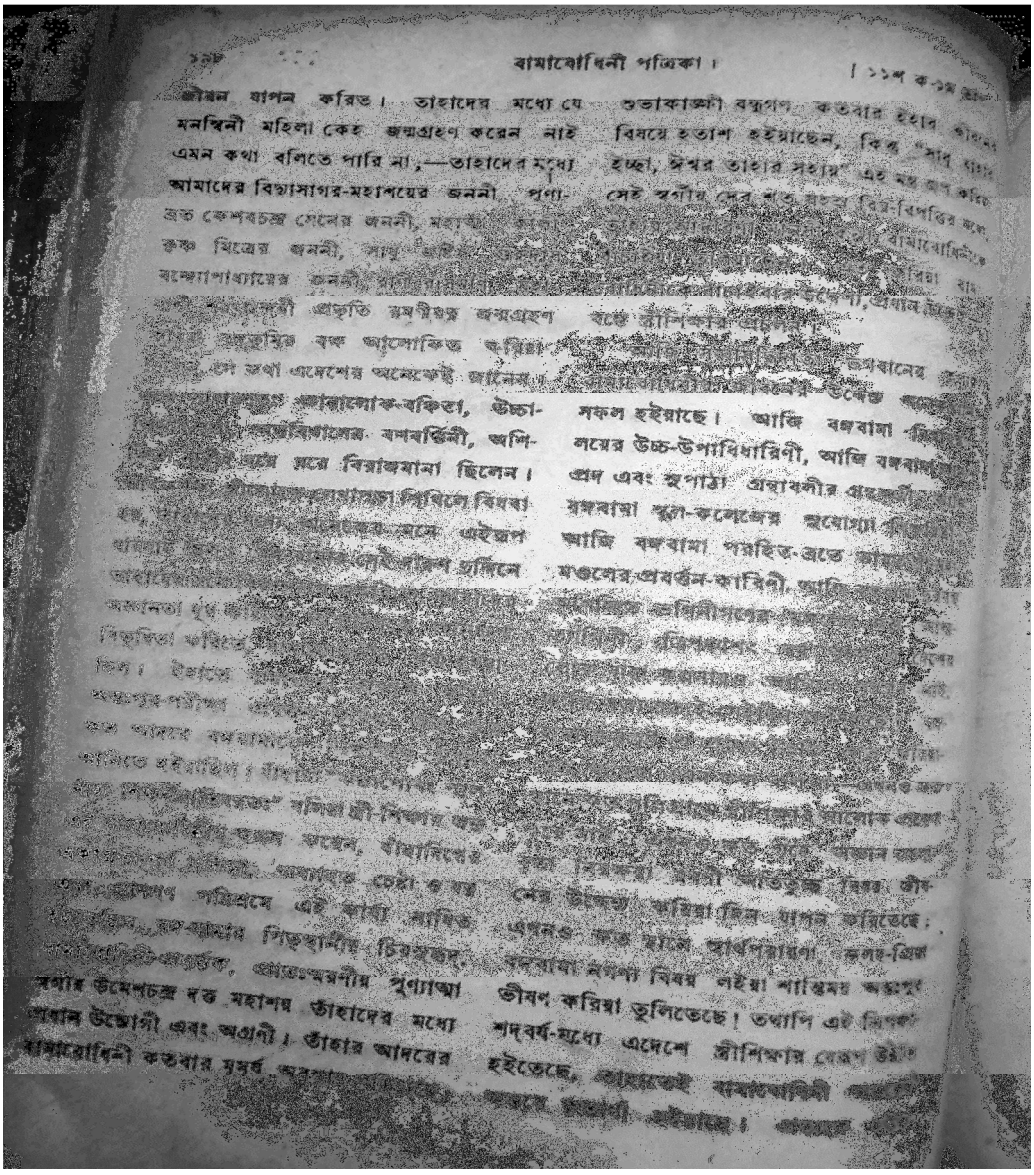
বামাবোধিনীর জন্মদিনে।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বামাবোধিনীর জন্মদিনে।

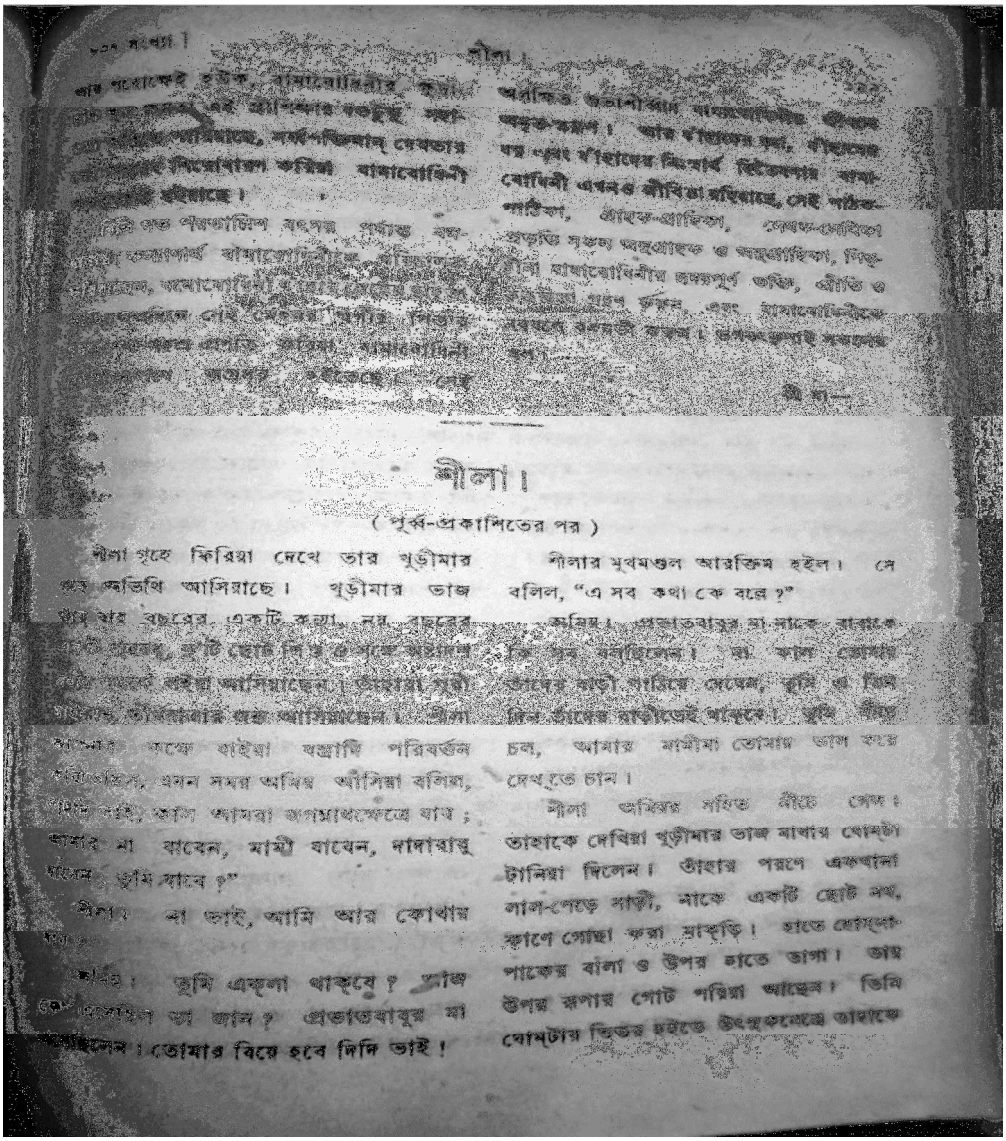
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বামাবোধিনীর জন্মদিনে' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৫৪



চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বামাবোধিনীর জন্মদিনে' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৫৫



শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শীলা গৃহে ফিরিয়া দেখে তার খুড়ীমার ... অভিথি আসিয়াছে। খুড়ীমার ভাজ ... বছরের একটি কন্যা, নয় বছরের ... দুটি ছোট দিওর ও শ্বশুর মহাশয় ... লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা খুড়ী ... আসিয়াছেন। শীলা ... বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ... এমন সময় অমিয় আসিয়া বলিল, ... ভাল আমরা জগন্নাথক্ষেত্রে যাব; ... যাবেন, মামী যাবেন, দাদাবাবু ... তুমি যাবে?"

শীলা। না ভাই, আমি আর কোথায় ...

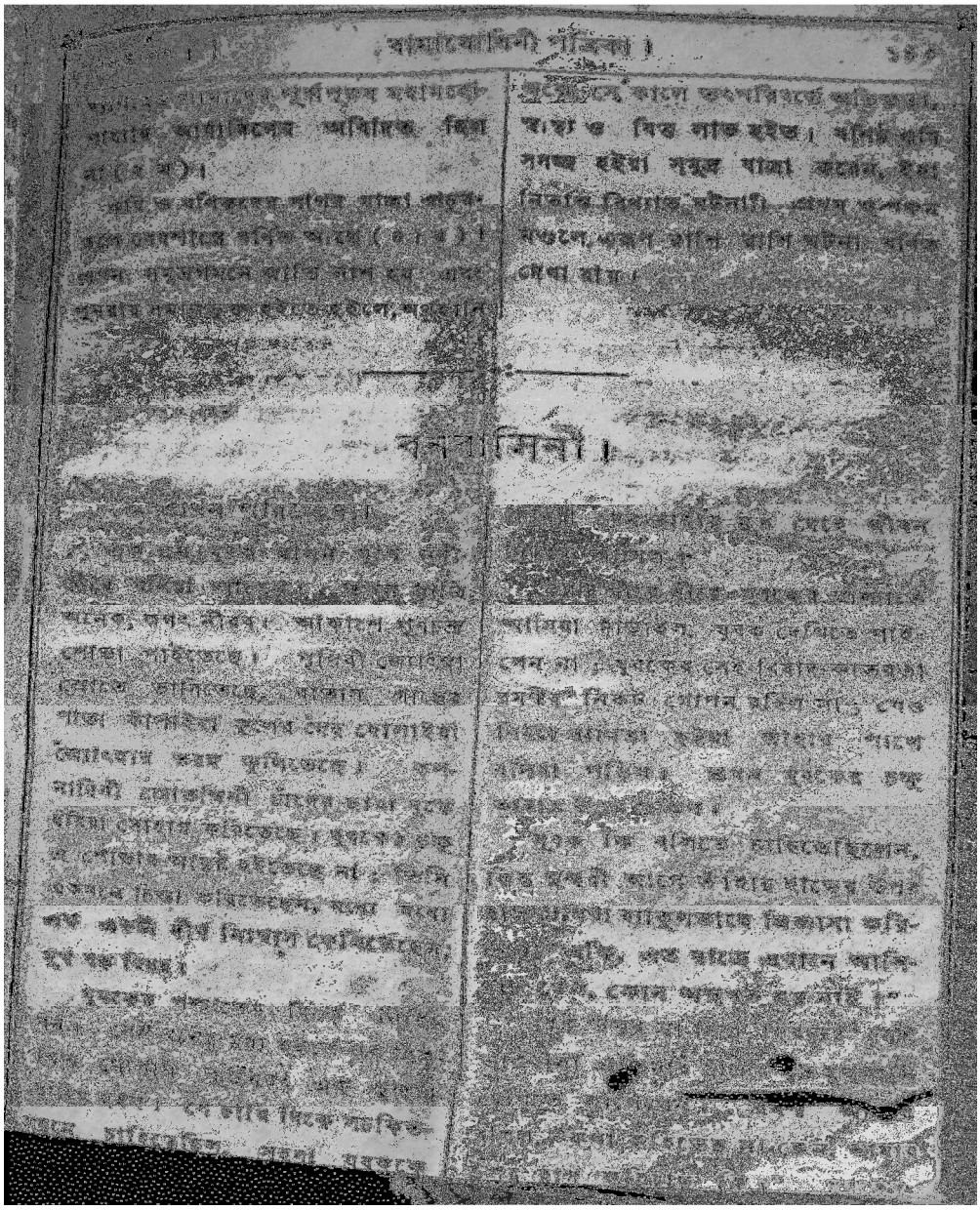
অমিয়। তুমি একলা থাকবে? আজ ... প্রভাতবাবুর মা ... তা জান? ... তোমার বিয়ে হবে দিদি ভাই!

শীলার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। সে বলিল, "এ সব কথা কে বল্লে?"

অমিয়। প্রভাতবাবুর মা মাকে বারাকে ... সব বলছিলেন। মা কাল তোমায় ... তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, তুমি ও তিন দিন তাদের বাড়ীতেই থাকবে। তুমি নীচে চল, আমার মামীমা তোমায় ভাল করে দেখ্‌তে চান।

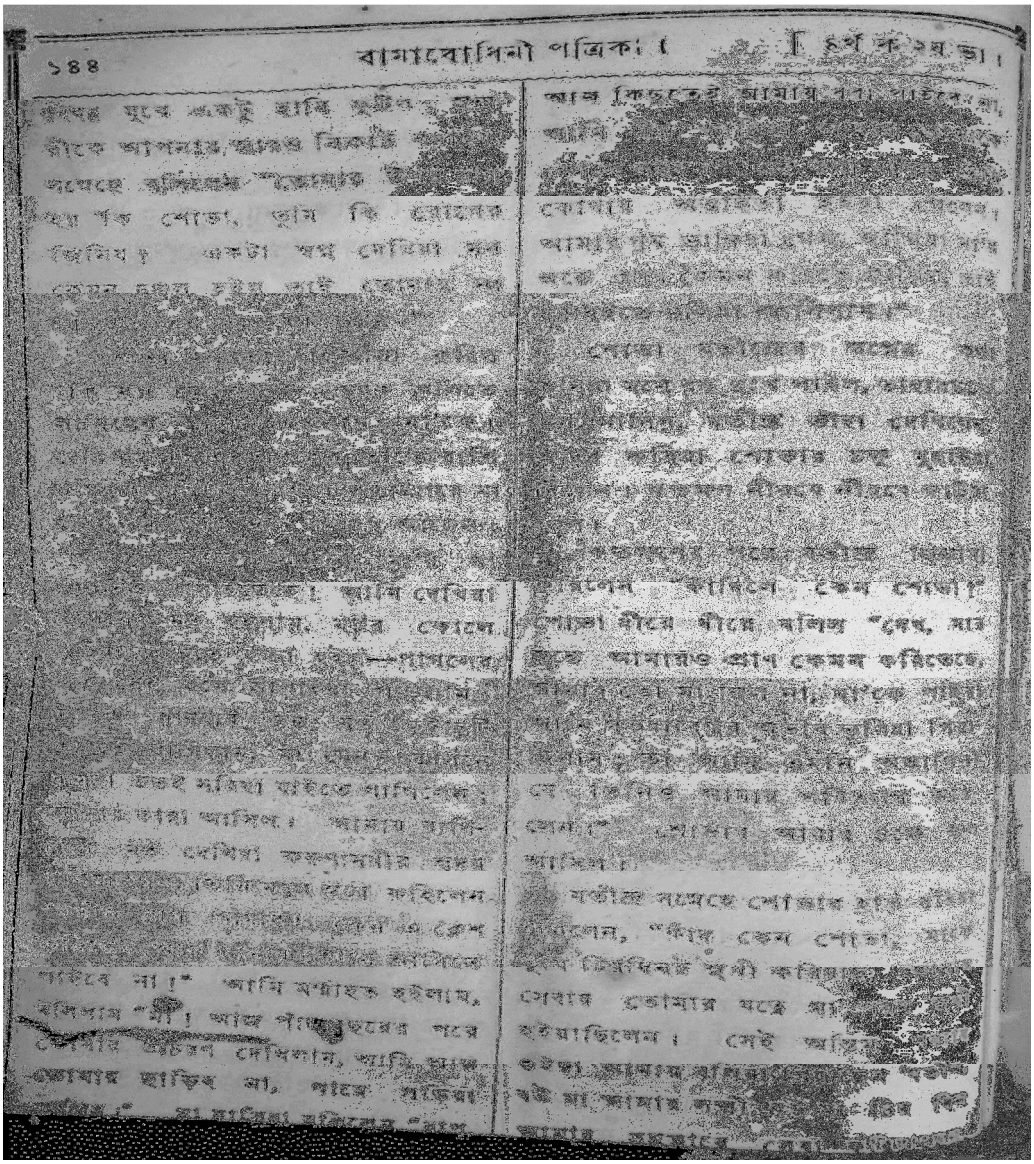
শীলা অমিয়র সহিত নীচে গেল। তাহাকে দেখিয়া খুড়ীমার ভাজ মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া দিলেন। তাঁহার পরণে একখানা লাল-পেড়ে সাড়ী, মাথে একটি ছোট নথ, কাণে গোছা করা মাকড়ি। হাতে দোণো-পাকের বালা ও উপর হাতে তাগা। তার উপর রূপার গোট পরিয়া আছেন। তিনি ঘোম্‌টার ভিতর হইতে উৎসুকনেত্রে তাহাকে

চিত্রসংখ্যা- ৫৬



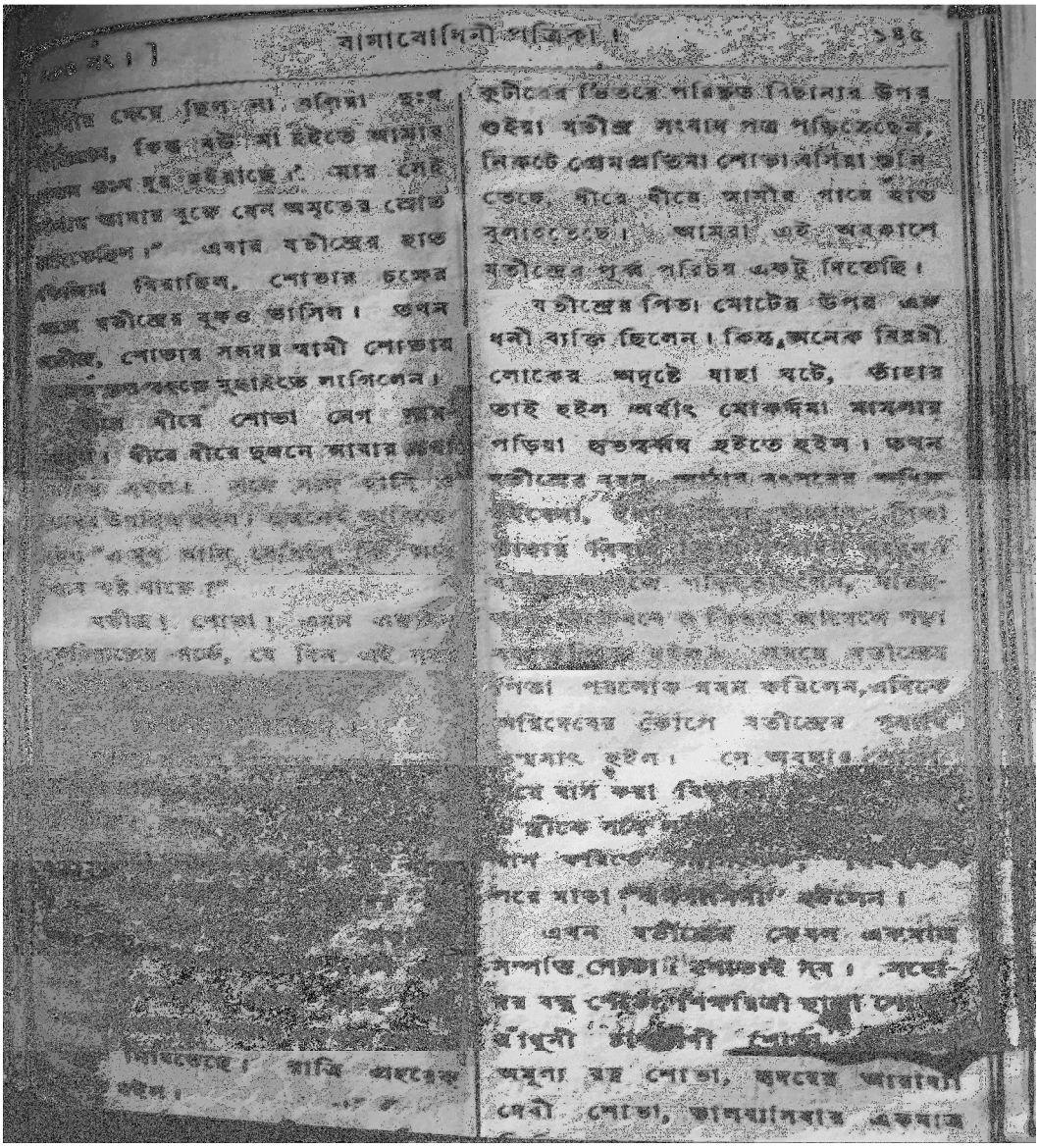
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বনবাসিনী' শিরোনামে প্রকাশিত কবির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৫৭



চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বনবাসিনী' শিরোনামে প্রকাশিত কবির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৫৮



বামাবোধিনী পত্রিকা।

কুটীরের ভিতরে পরিষ্কৃত বিছানার উপর শুইয়া যতীন্দ্র সংবাদ পত্র পড়িতেছেন, নিকটে প্রেমপ্রতিমা শোভা বসিয়া পুনি তেছে, ধীরে ধীরে আদর করে হাত বুলাইতেছে। আমরা এই অবকাশে যতীন্দ্রের পূর্ব্ব পরিচয় একটু দিতেছি।

যতীন্দ্রের পিতা মোটের উপর একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু, অনেক নিঃস্ব লোকের অদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাঁহার তাই হইল অর্থাৎ মোকদ্দমা মামলায় পড়িয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হইল। তখন যতীন্দ্রের বয়স আঠার বৎসরের অধিক হইবেনা,

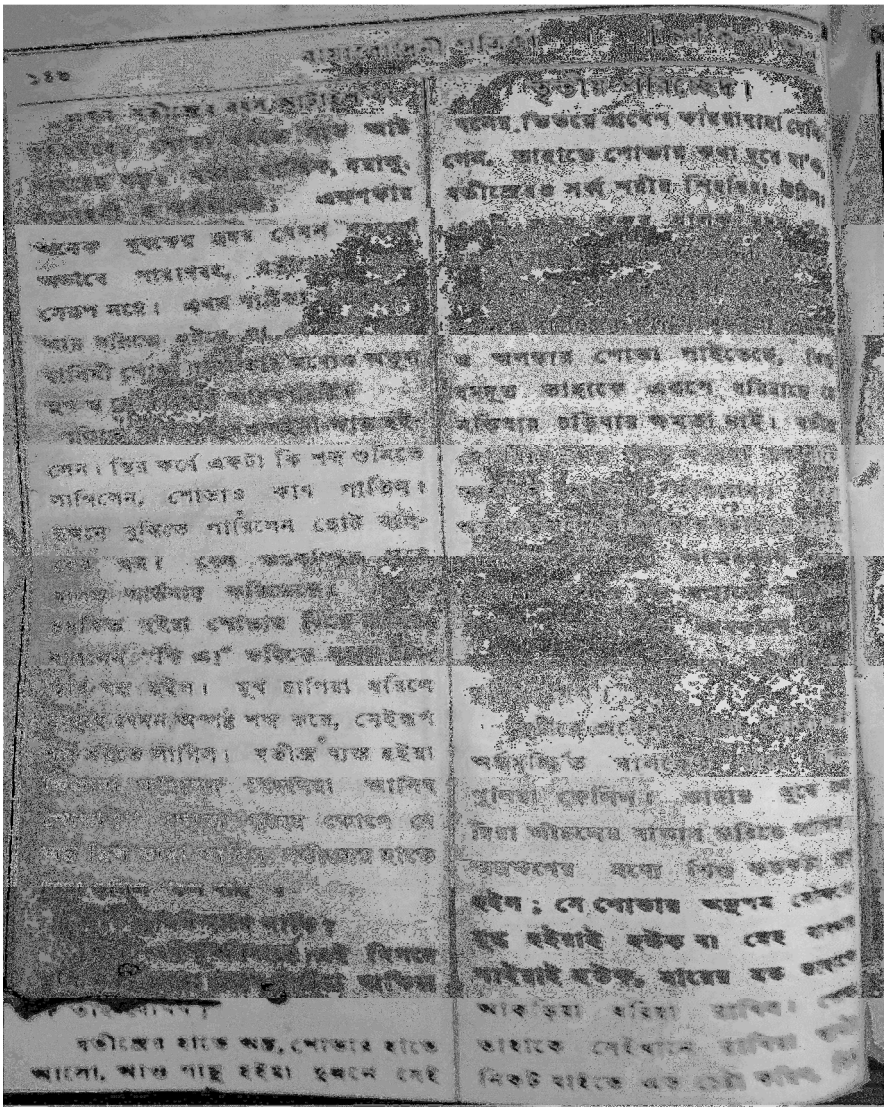
পিতা পরলোক গমন করিলেন, এদিকে অর্থাভাবে যতীন্দ্রের পড়াশুনা বন্ধ হইল। সে অবস্থায়

এখন যতীন্দ্রের কেবল এক মাত্র সম্পত্তি সেই কুটীরখানি মাত্র। সেই-

অমূল্য রত্ন শোভা, হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী শোভা, ভালবাসিবার একমাত্র

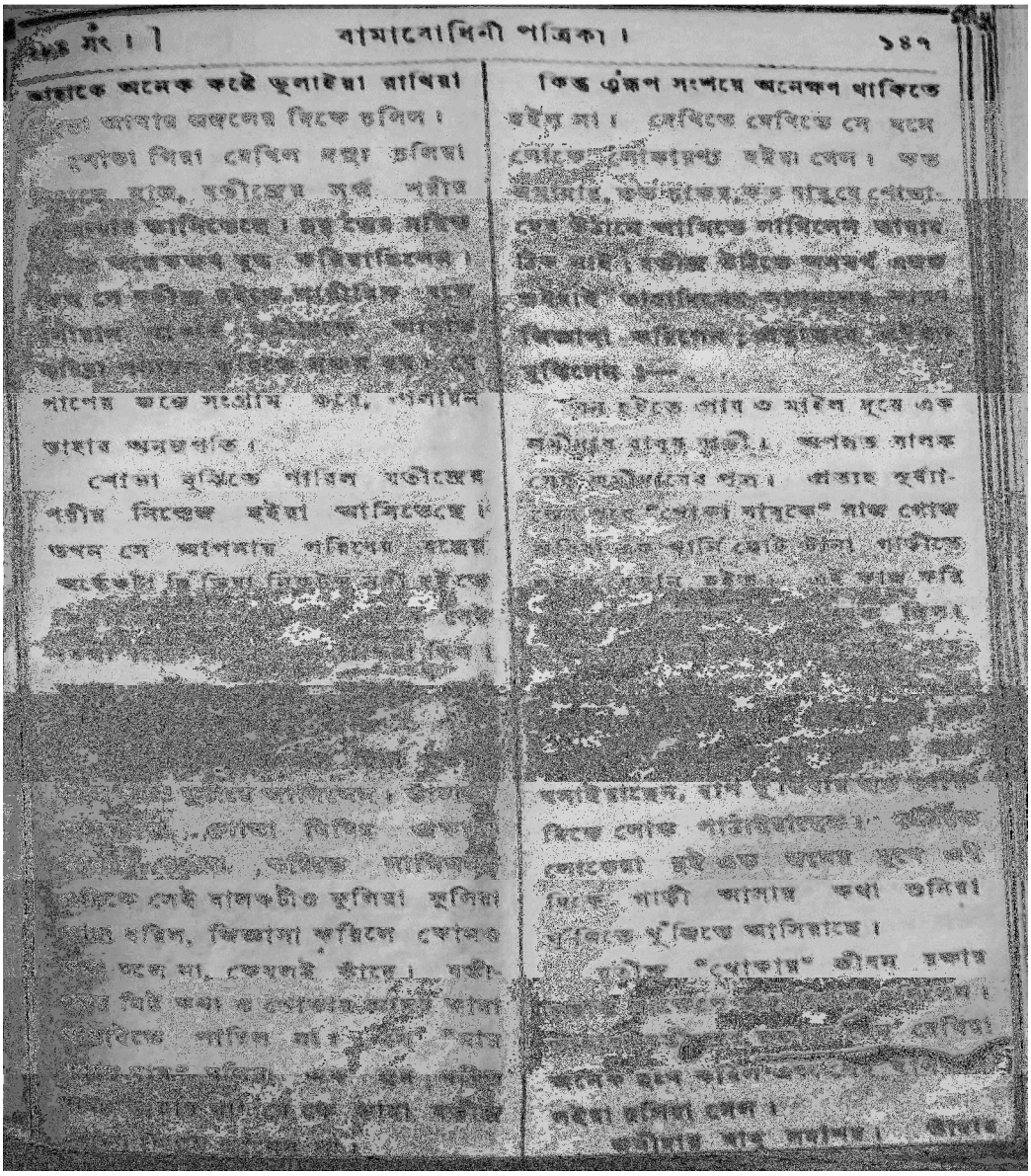
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বনবাসিনী' শিরোনামে প্রকাশিত কবির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের তৃতীয় পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৫৯



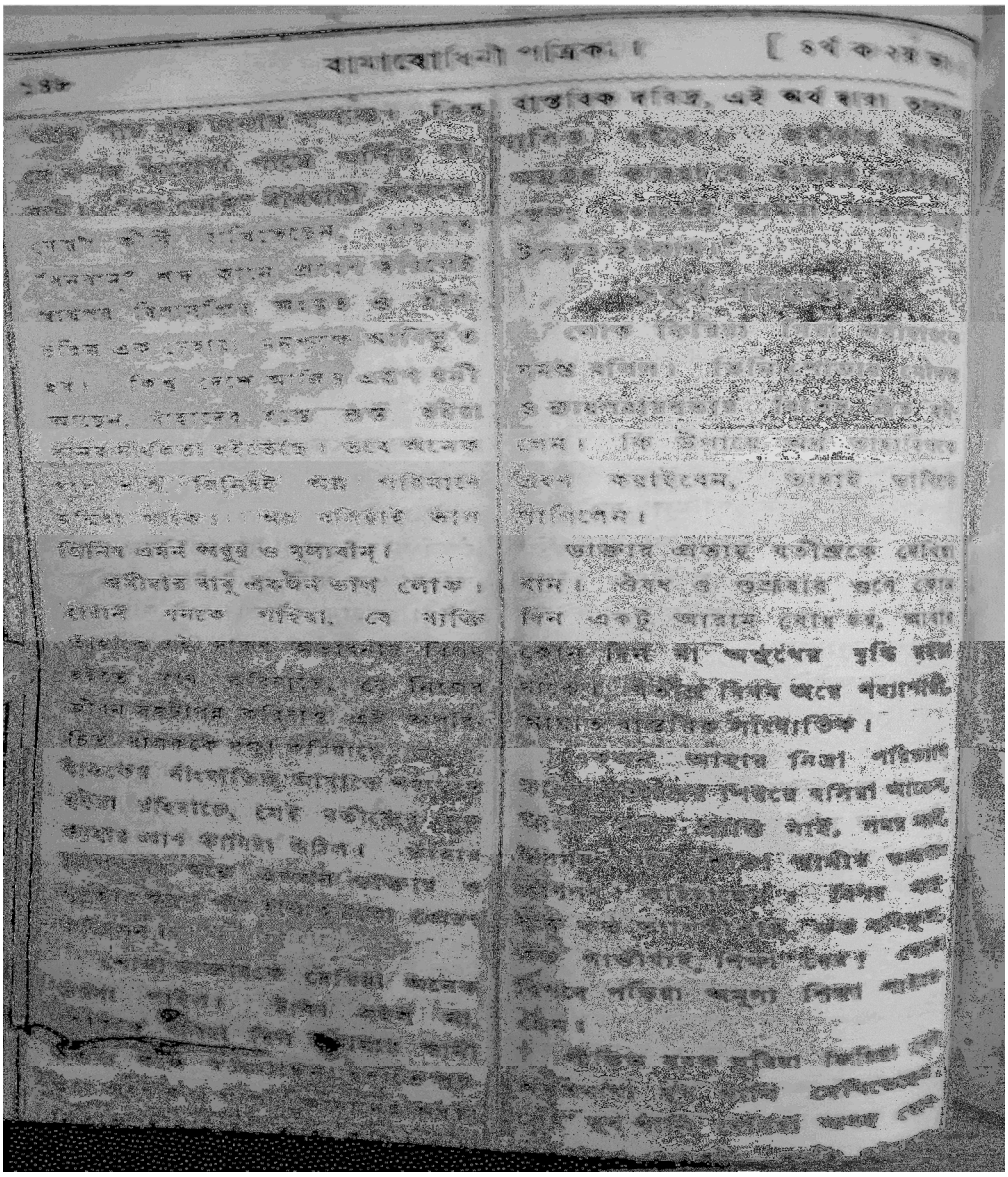
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বনবাসিনী' শিরোনামে প্রকাশিত কবির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের চতুর্থ পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৬০



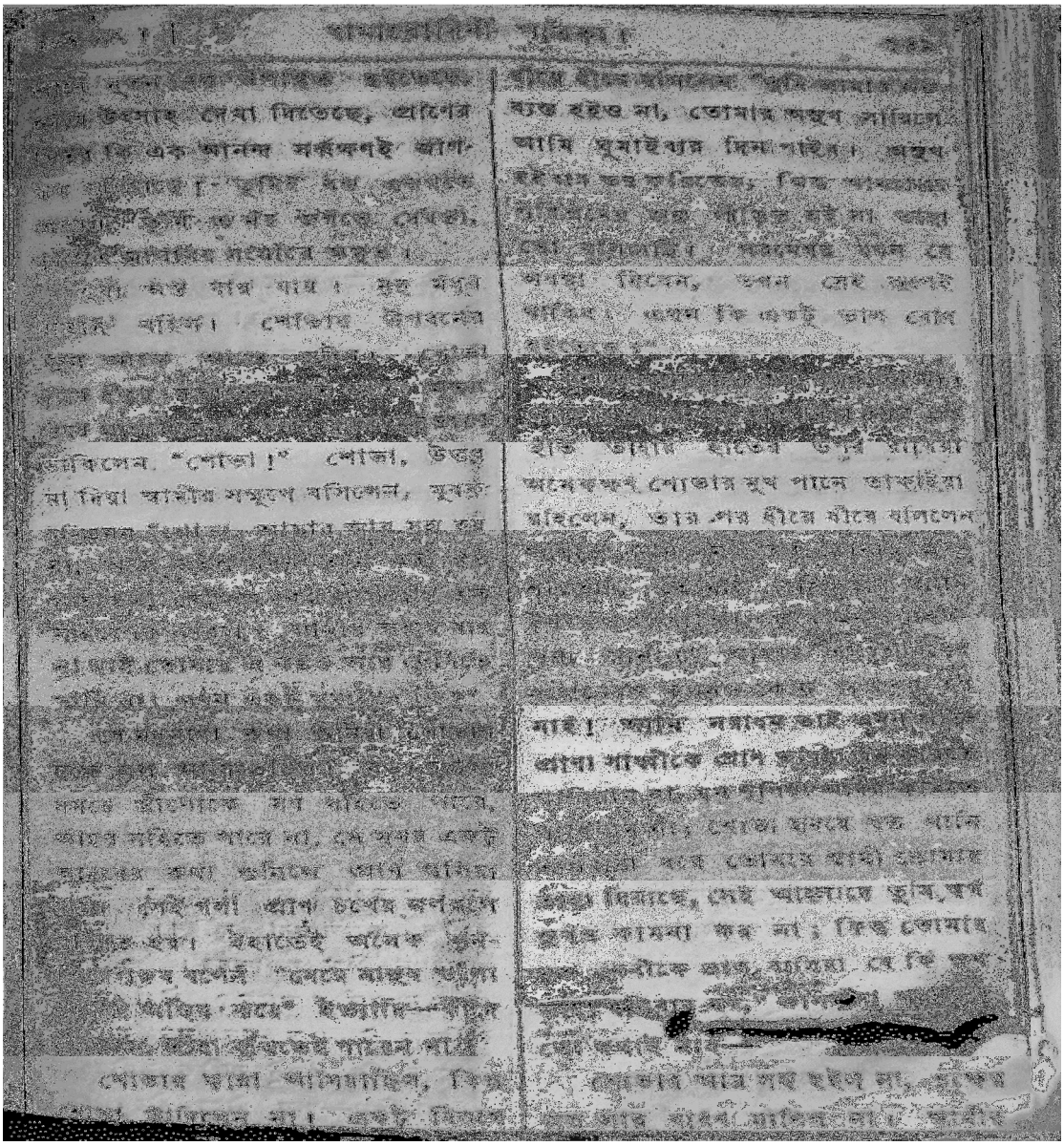
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বনবাসিনী' শিরোনামে প্রকাশিত কবির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের পঞ্চম পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৬১



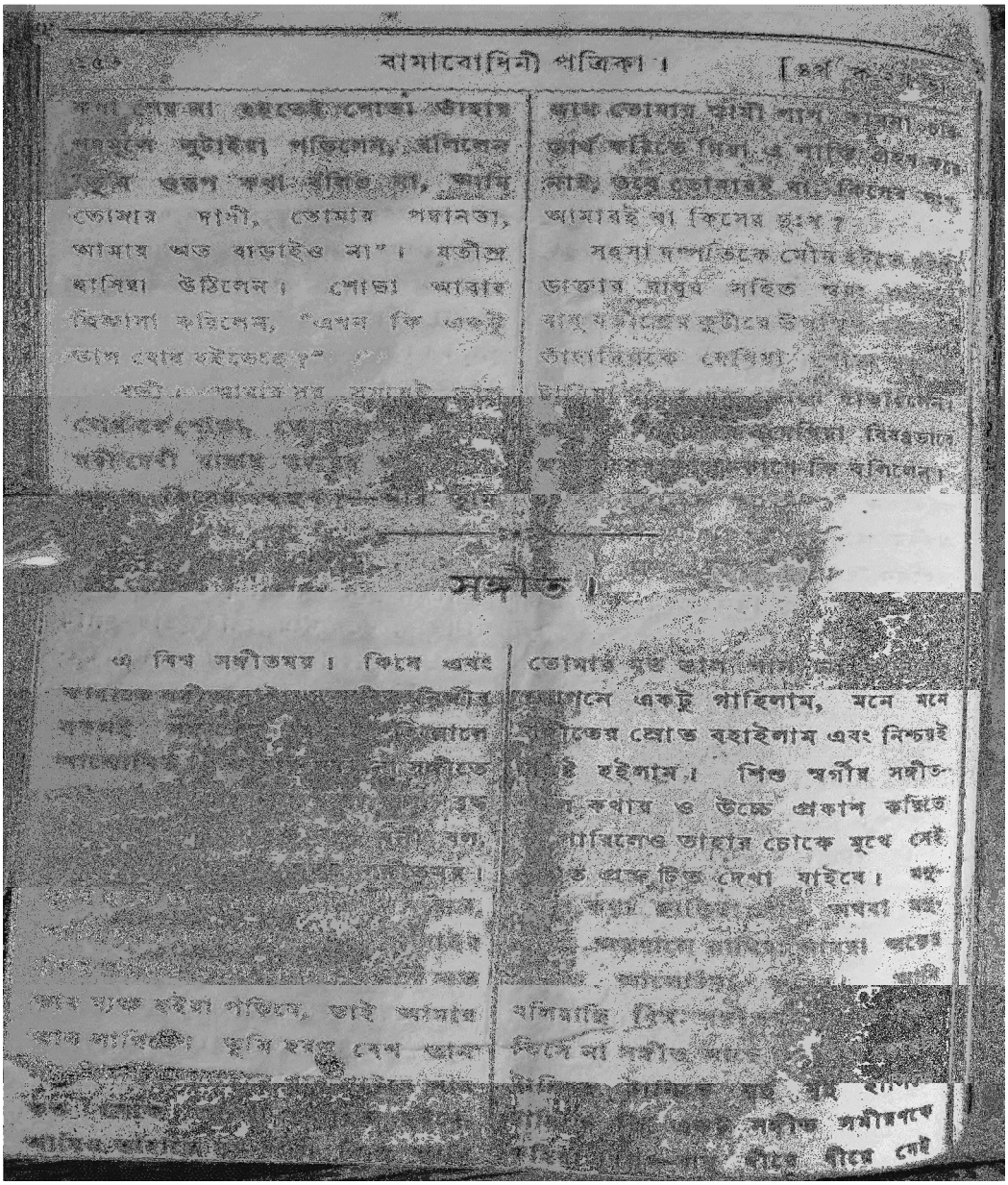
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বনবাসিনী' শিরোনামে প্রকাশিত কবির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৬২



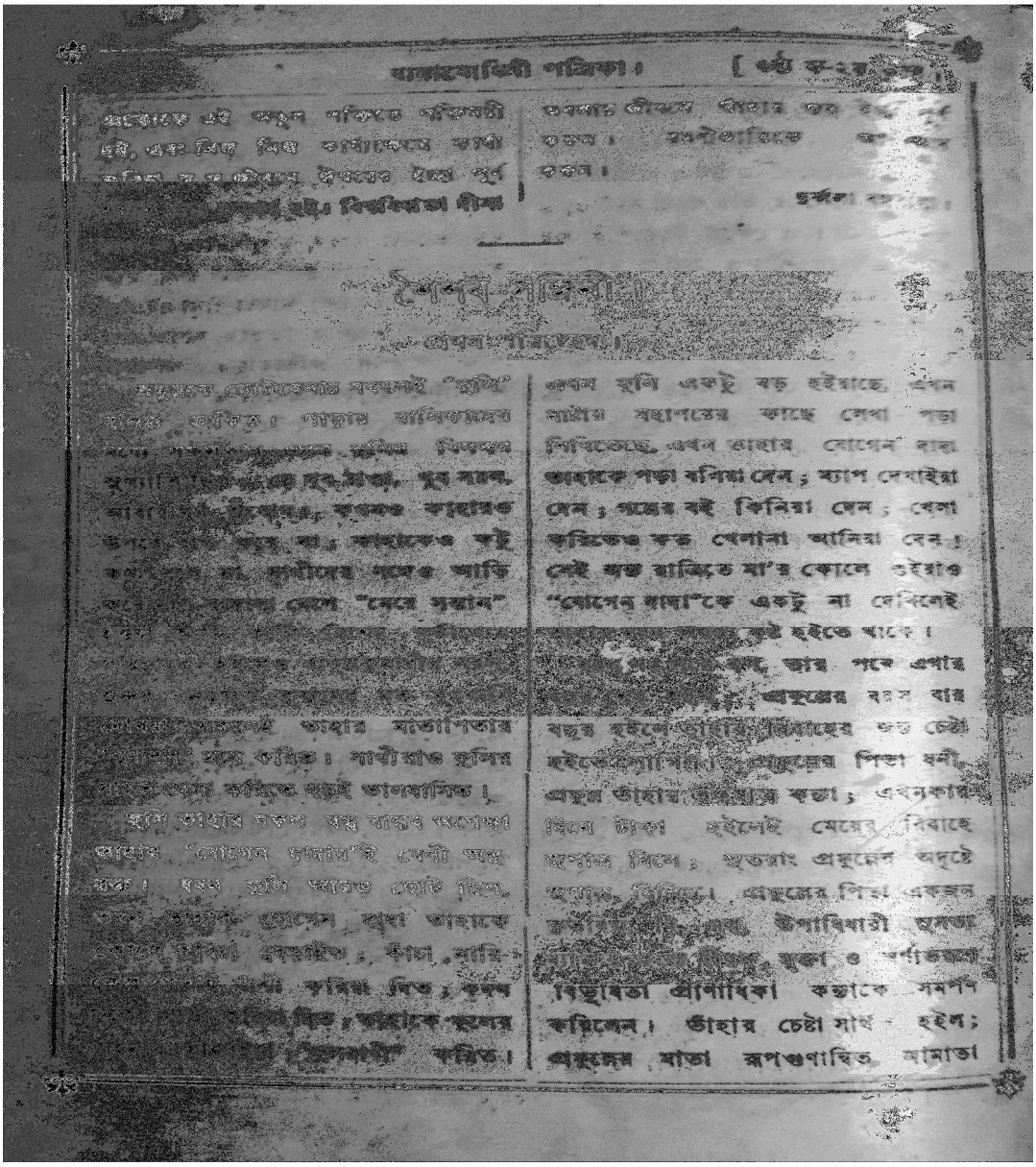
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বনবাসিনী' শিরোনামে প্রকাশিত কবির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের সপ্তম পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৬৩



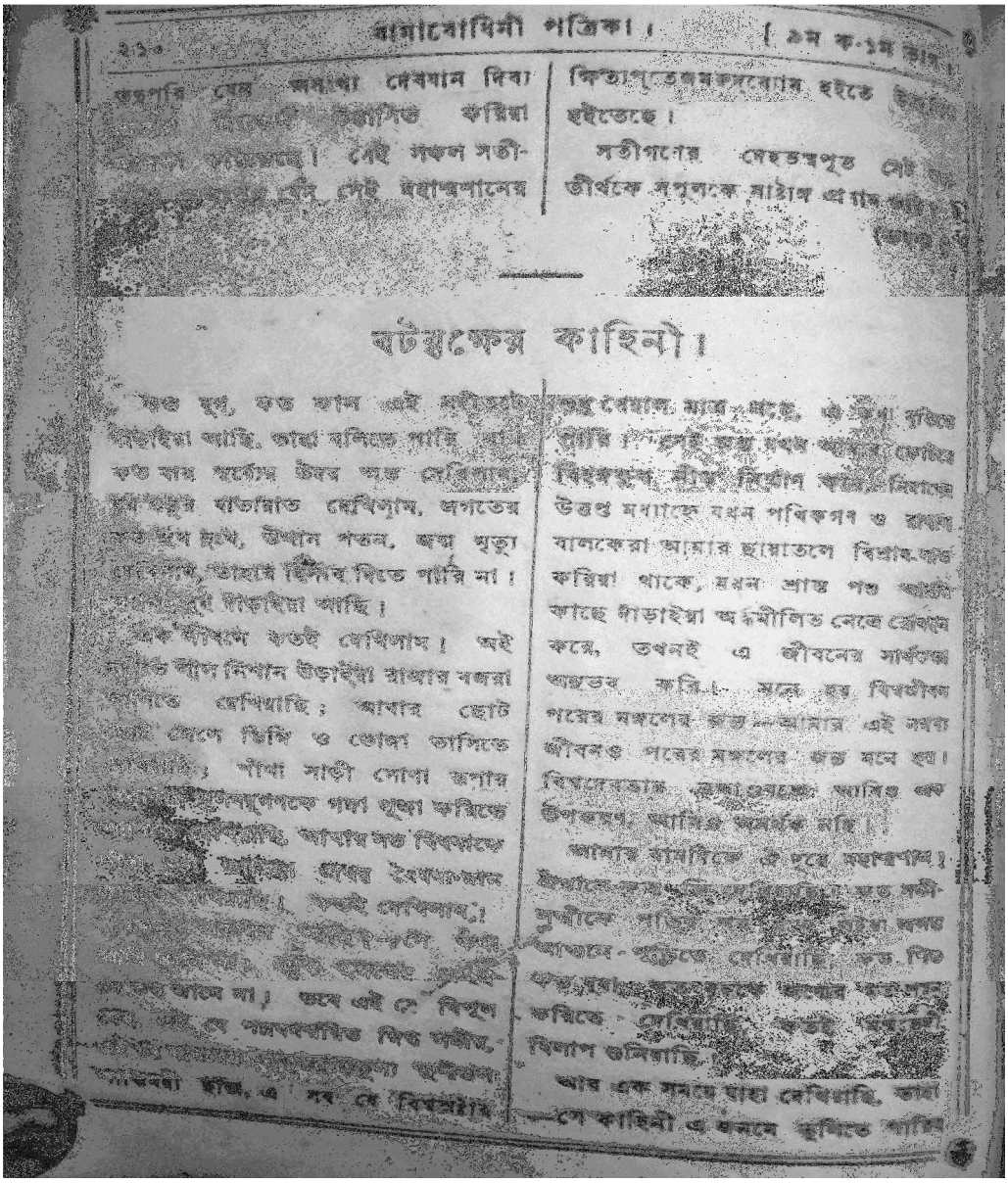
চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'বনবাসিনী' শিরোনামে প্রকাশিত কবির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠার চিত্র। ছবিটি উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৬৪



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩০৪ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'শৈশব-সঙ্গিনী' উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত পত্রিকাটি থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

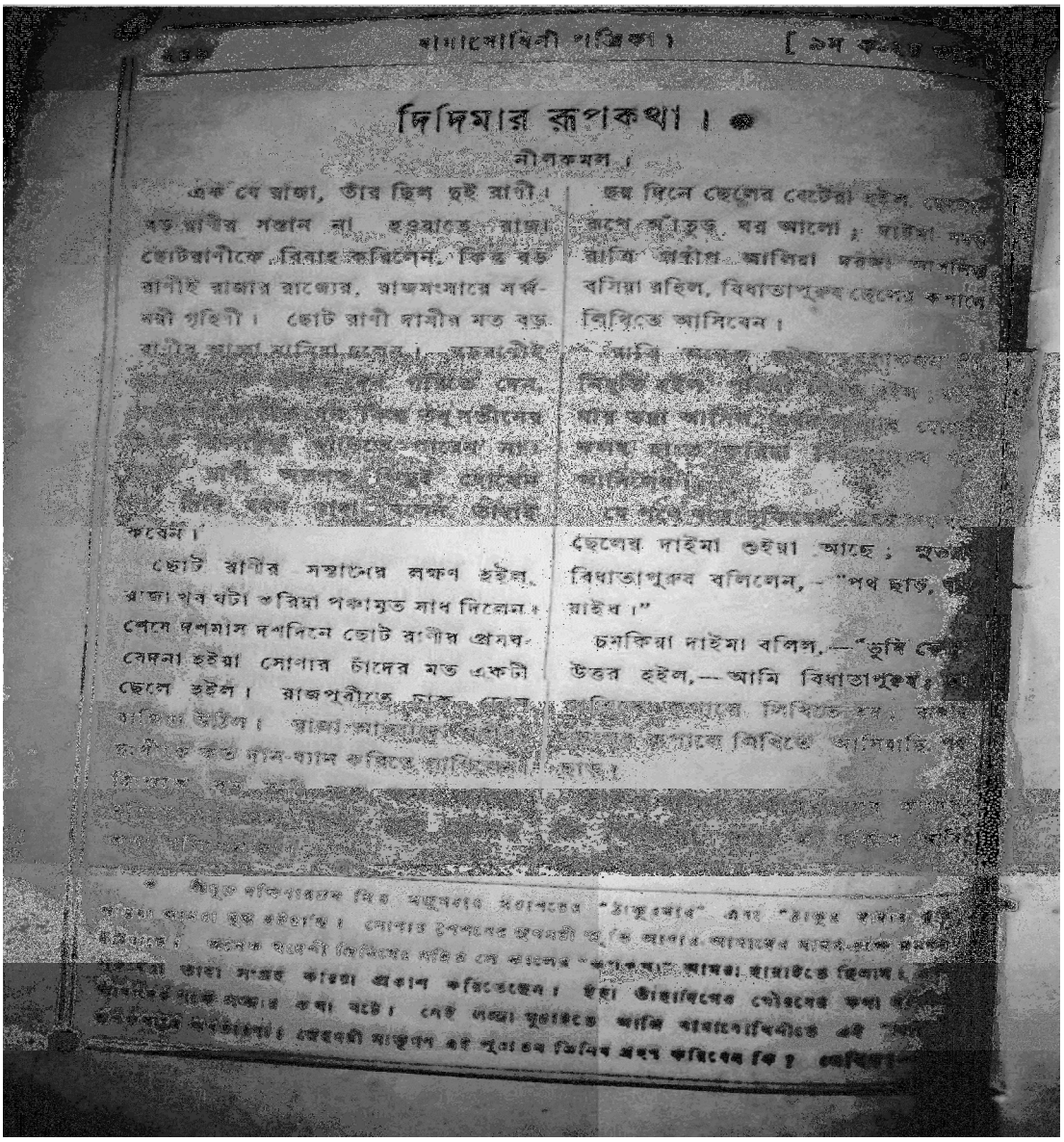
চিত্রসংখ্যা- ৬৫


বামাবোধিনী পত্রিকা।

বটবৃক্ষের কাহিনী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩১৫ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'বটবৃক্ষের কাহিনী' গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত পত্রিকাটি থেকে প্রতিলিপিটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৬৬



দিদিমার রূপকথা।

নীলকমল।

এক যে রাজা, তাঁর ছিল দুই রাণী। বড় রাণীর সন্তান না হওয়াতে রাজা ছোটরাণীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু বড় রাণীই রাজার রাজ্যের, রাজসংসারের সর্ব্বময়ী গৃহিণী। ছোট রাণী দাসীর মত বড় রাণীর সেবা করিয়া থাকেন।

ছোট রাণীর সন্তানের লক্ষণ হইল, রাজা খুব ঘটা করিয়া পঞ্চামৃত সাধ দিলেন। শেষে দশমাস দশদিনে ছোট রাণীর প্রসব-বেদনা হইয়া সোণার চাঁদের মত একটী ছেলে হইল। রাজপুরীতে

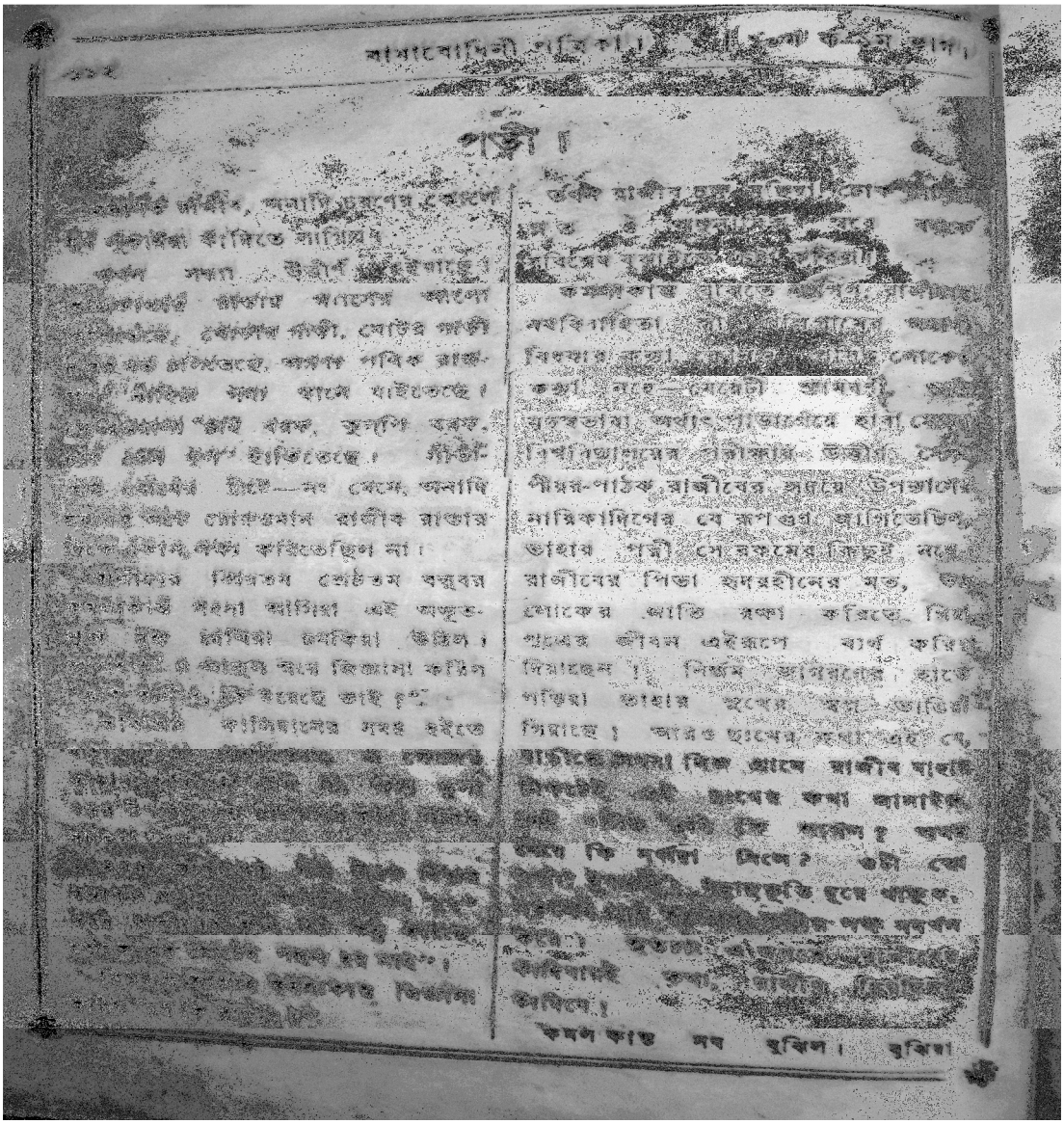
ছয় দিনে ছেলের বেটেরা হইল, ... ঘর আলো; দাইমা ... রাত্রি জাগিয়া ... বসিয়া রহিল, বিধাতাপুরুষ ছেলের কপালে লিখিতে আসিবেন।

... ছেলের দাইমা শুইয়া আছে; ... বিধাতাপুরুষ বলিলেন,—"পথ ছাড়, যাইব।"

চমকিয়া দাইমা বলিল,—"তুমি কে?" উত্তর হইল,—আমি বিধাতাপুরুষ; ... লিখিতে আসিয়াছি, পথ ছাড়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'দিদিমার রুপকথা' গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত পত্রিকাটি থেকে ছবিটি সংগৃহীত।

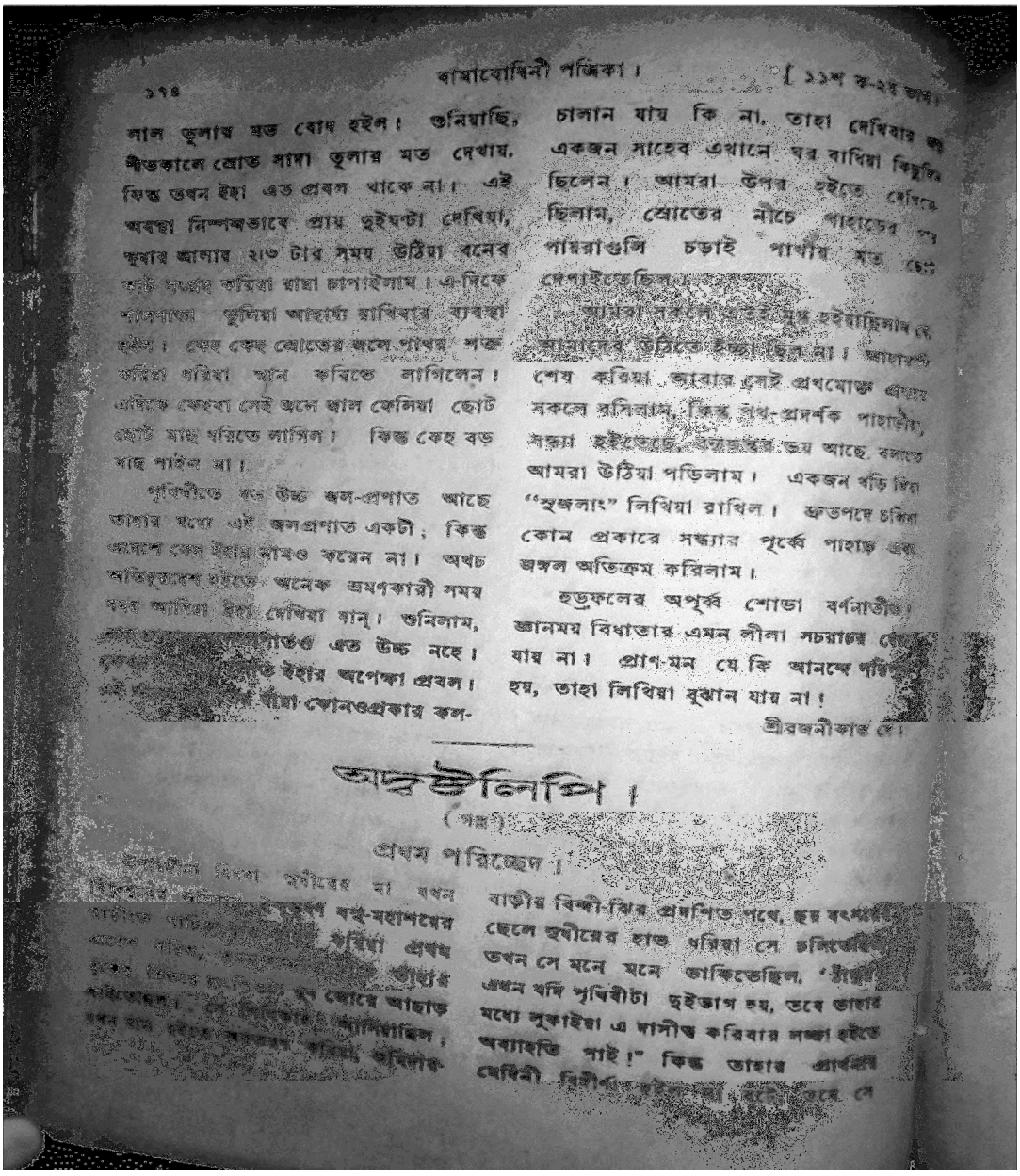
চিত্রসংখ্যা- ৬৭



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩১৯ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'পত্নী' গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত পত্রিকাটি থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

গল্পটি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজের একটি বিশেষ ভাবধারা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

চিত্রসংখ্যা- ৬৮



১৭৪ বামাবোধিনী পত্রিকা। [১১শ ক-২য় ভাগ।

লাল তুলার মত বোধ হইল। শুনিয়াছি, শীতকালে স্রোত সাদা তুলার মত দেখায়, কিন্তু তখন ইহা এত প্রবল থাকে না। এই অবস্থা নিস্পন্দভাবে প্রায় দুইঘণ্টা দেখিয়া, ক্ষুধার জ্বালায় ২।৩ টার সময় উঠিয়া বনের কতক শুকনা কাঠ যোগাড় করিয়া রান্না চাপাইলাম। এ-দিকে শুকাইতে তুলিয়া আহার্য্য রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কেহ কেহ স্রোতের জলে পাথর শক্ত করিয়া ধরিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। এদিকে কেহবা সেই জলে জাল ফেলিয়া ছোট ছোট মাছ ধরিতে লাগিল। কিন্তু কেহ বড় মাছ পাইল না।

পৃথিবীতে যত উচ্চ জল-প্রপাত আছে তাহার মধ্যে এই জলপ্রপাত একটী; কিন্তু এদেশে কেহ ইহার নামও করেন না। অথচ অতিদূরদেশ হইতে অনেক ভ্রমণকারী সময় করিয়া আসিয়া ইহা দেখিয়া যান্। শুনিলাম, [illegible] এত উচ্চ নহে। [illegible] ইহার অপেক্ষা প্রবল। [illegible] কোনওপ্রকার কল-চালান যায় কি না, তাহা দেখিবার জন্য একজন সাহেব এখানে ঘর বাধিয়া কিছুদিন ছিলেন। আমরা উপর হইতে দেখিতে ছিলাম, স্রোতের নীচে পাহাড়ের [illegible] পাথরগুলি চড়াই পাখীর মত [illegible] দেখাইতেছিল।

আমরা নরসিংহ হইতে শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের উঠিতে হইবে না। আহারাদি শেষ করিয়া আবার সেই প্রথমোক্ত প্রকারে সকলে বসিলাম, কিন্তু পথ-প্রদর্শক পাহাড়ীরা, সন্ধ্যা হইতেছে, বন্যজন্তুর ভয় আছে, বলাতে আমরা উঠিয়া পড়িলাম। একজন খড়ি দিয়া "শুভলাং" লিখিয়া রাখিল। দ্রুতপদে চলিয়া কোন প্রকারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাহাড় এবং জঙ্গল অতিক্রম করিলাম।

হড্রুফলের অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনাতীত। জ্ঞানময় বিধাতার এমন লীলা সচরাচর [illegible] যায় না। প্রাণ-মন যে কি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না।

শ্রীরজনীকান্ত দে।

অদৃষ্টলিপি।

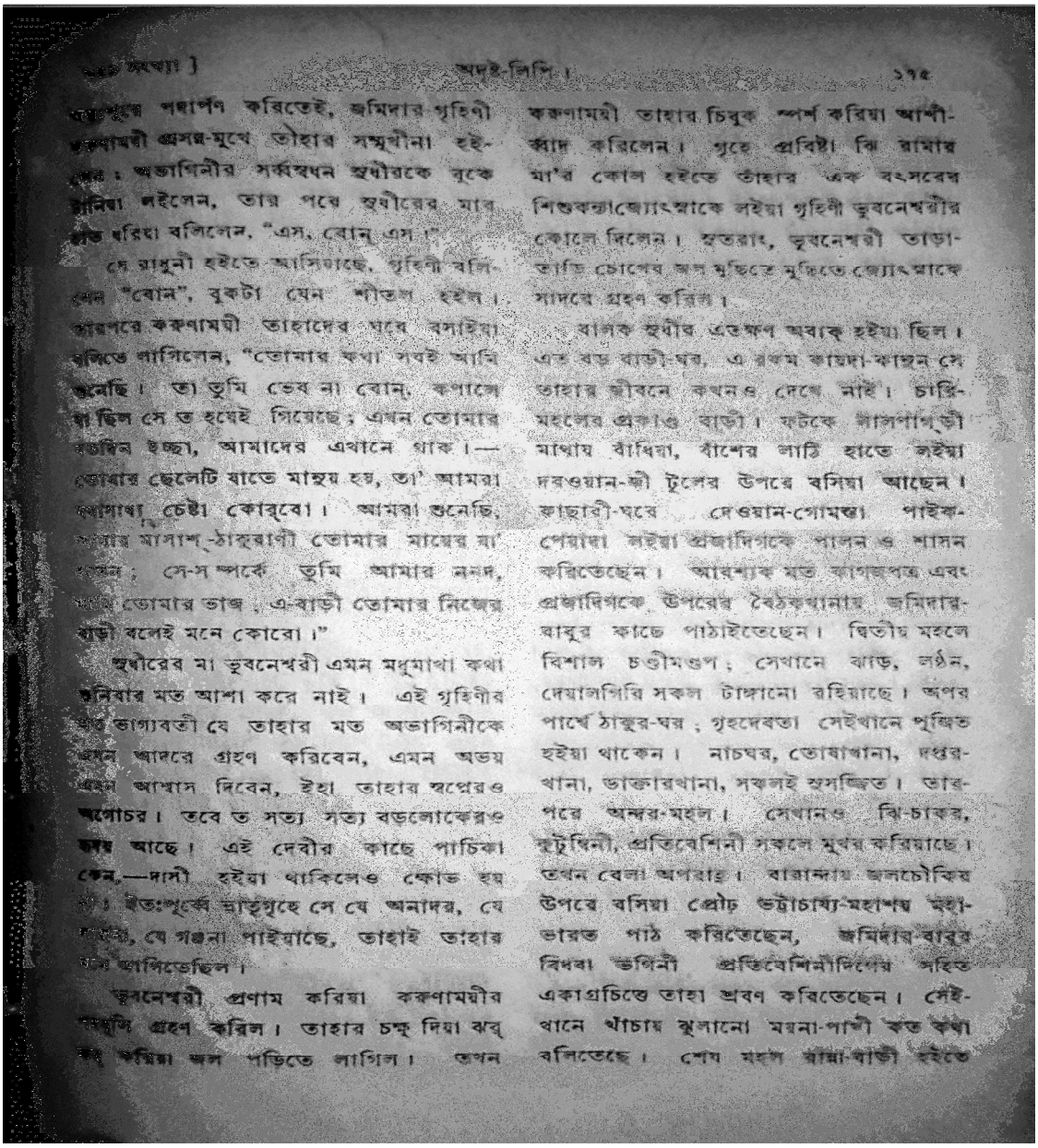
(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[illegible] বিধবা [illegible] মা যখন [illegible] বর্ষীয়ান বহু-মহাশয়ের [illegible] পড়িয়া প্রথম [illegible] তাঁহার [illegible] বড় জোরে আছাড় [illegible] খাইয়াছিল; [illegible] করিয়া, [illegible] মেদিনী [illegible] বাড়ীর বিন্দী-ঝির প্রদর্শিত পথে, ছয় বৎসরের ছেলে সুধীরের হাত ধরিয়া সে চলিতেছিল, তখন সে মনে মনে ভাবিতেছিল, 'ভগবান এখন যদি পৃথিবীটা দুইভাগ হয়, তবে তাহার মধ্যে লুকাইয়া এ দাসীত্ব করিবার লজ্জা হইতে অব্যাহতি পাই!" কিন্তু তাহার প্রার্থনায় মেদিনী [illegible] [illegible] তবে সে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'অদৃষ্টলিপি' গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত পত্রিকাটি থেকে প্রতিলিপিটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৬৯



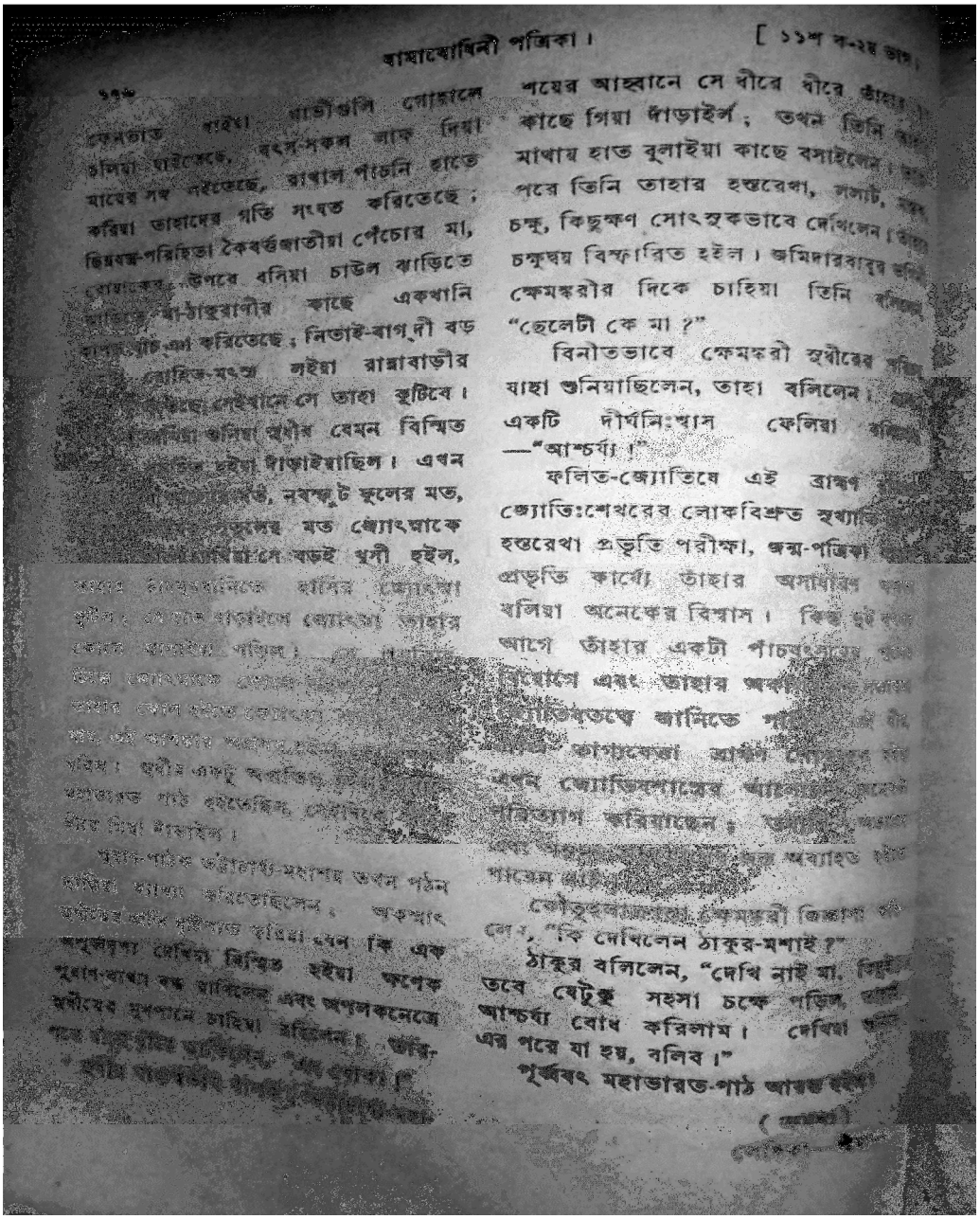
অদৃষ্ট-লিপি। ১৭৫

করুণাময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৃহে প্রবিষ্টা কি রামার মা'র কোল হইতে তাহার এক বৎসরের শিশুকন্যা জ্যোৎস্নাকে লইয়া গৃহিণী ভুবনেশ্বরীর কোলে দিলেন। সুতরাং, ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিতে মুছিতে জ্যোৎস্নাকে সাদরে গ্রহণ করিল।

বালক সুধীর এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ছিল। এত বড় বাড়ী-ঘর, এ রকম কায়দা-কানুন সে তাহার জীবনে কখনও দেখে নাই। চারিমহলের প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটকে জালপাগ্‌ড়ী মাথায় বাঁধিয়া, বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া দরওয়ান-জী টুলের উপরে বসিয়া আছেন। কাছারী-ঘরে দেওয়ান-গোমস্তা পাইক-পেয়াদা লইয়া প্রজাদিগকে পালন ও শাসন করিতেছেন। আবশ্যক মত কাগজপত্র এবং প্রজাদিগকে উপরের বৈঠকখানায় জমিদার-বাবুর কাছে পাঠাইতেছেন। দ্বিতীয় মহলে বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ; সেখানে ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি সকল টাঙ্গানো রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ঠাকুর-ঘর; গৃহদেবতা সেইখানে পূজিত হইয়া থাকেন। নাচঘর, তোষাখানা, দপ্তরখানা, ডাক্তারখানা, সকলই সুসজ্জিত। তারপরে অন্দর-মহল। সেখানেও ঝি-চাকর, ঝুটঝিনী, প্রতিবেশিনী সকলে মুখর করিয়াছে। তখন বেলা অপরাহ্ণ। বারান্দায় জলচৌকির উপরে বসিয়া প্রৌঢ় ভট্টাচার্য্য-মহাশয় মহাভারত পাঠ করিতেছেন, জমিদার-বাবুর বিধবা ভগিনী প্রতিবেশিনীদিগের সহিত একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সেইখানে খাঁচায় ঝুলানো ময়না-পাখী কত কথা বলিতেছে। শেষ মহল রান্না-বাড়ী হইতে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'অদৃষ্টলিপি' গল্পের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত পত্রিকাটি থেকে প্রতিলিপিটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৭০


বামাবোধিনী পত্রিকা। [১১শ ক-২য় ভাগ।

শয়ের আহ্বানে সে ধীরে ধীরে তাহার
কাছে গিয়া দাঁড়াইল; তখন তিনি তাহার
মাথায় হাত বুলাইয়া কাছে বসাইলেন। তাহার
পরে তিনি তাহার হস্তরেখা, ললাট,
চক্ষু, কিছুক্ষণ সোৎসুকভাবে দেখিলেন। তাহার
চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। জমিদারবাবুর
ক্ষেমঙ্করীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,
"ছেলেটী কে মা?"

বিনীতভাবে ক্ষেমঙ্করী সুধীরের
যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।
একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন
—"আশ্চর্য্য!"

ফলিত-জ্যোতিষে এই ব্রাহ্মণ
জ্যোতিঃশেখরের লোকবিশ্রুত খ্যাতি
হস্তরেখা প্রভৃতি পরীক্ষা, জন্ম-পত্রিকা
প্রভৃতি কার্য্যে তাহার অসাধারণ
বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু
আগে তাঁহার একটী পাঁচবৎসরের
বিয়োগে এবং তাহার
জ্যোতিষতত্ত্বে জানিতে
কাগজেরা
এখন জ্যোতিষশাস্ত্রের
পরিত্যাগ করিয়াছেন;

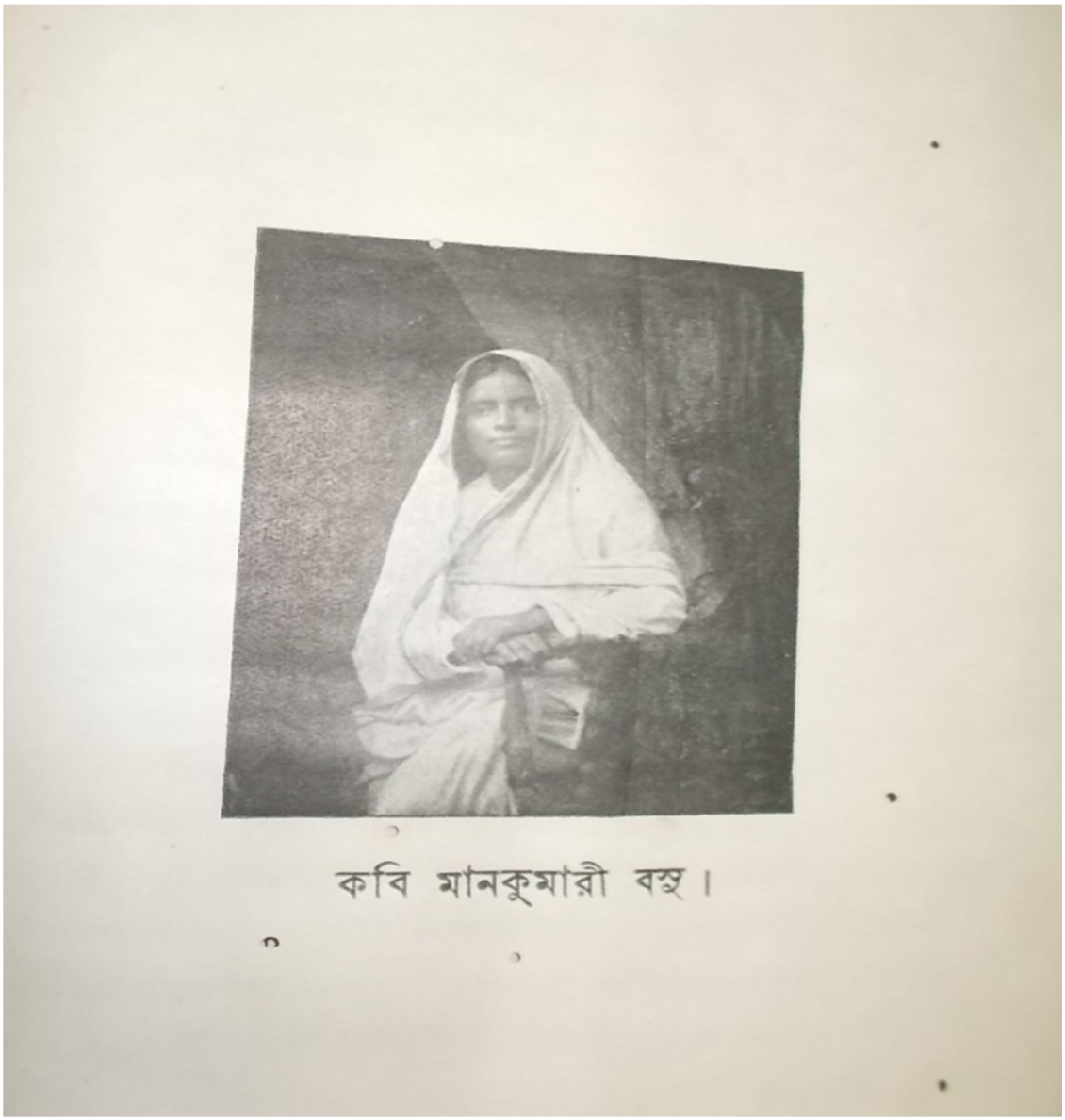
কৌতূহলাক্রান্তা ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা
করিল, "কি দেখিলেন ঠাকুর-মশাই?"

ঠাকুর বলিলেন, "দেখি নাই মা, কিন্তু
তবে যেটুকু সহসা চক্ষে পড়িল,
আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। দেখিয়া
এর পরে যা হয়, বলিব।"

পূর্ব্ববৎ মহাভারত-পাঠ আরম্ভ হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত মানকুমারী বসু রচিত ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'অদৃষ্টলিপি' গল্পের শেষ পৃষ্ঠার চিত্র। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত পত্রিকাটি থেকে প্রতিলিপিটি সংগৃহীত।

চিত্রসংখ্যা- ৭১



কবি মানকুমারী বসু।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৩২১ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যা বামাবোধিনী পত্রিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য ও এতাবৎ প্রাপ্ত মানকুমারী বসুর একমাত্র আলোকচিত্র। উক্ত পত্রিকা থেকে চিত্রটি সংগৃহীত।

-----0-----

গ্রন্থপঞ্জি

(বর্ণানুক্রমিক)

ক. **আকর গ্রন্থ (Main text)**

১. মানকুমারী বসু, 'কনকাঞ্জলি', তারাকুমার কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত, স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ১৩০৩ ।

২. মানকুমারী বসু, 'কনকাঞ্জলি', তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত,১৩০৩, চৈতন্য লাইব্রেরি।

৩. মানকুমারী বসু, 'কনকাঞ্জলি', তারাকুমার কবিরত্ন কতৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১১, চন্দননগর লাইব্রেরি।

৪. মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', ৮ম সংস্করণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ফাল্গুন ১৩২৫ স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি।

৫. মানকুমারী বসু, 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১১তম সংস্করণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, আশ্বিন ১৩৪১ স্টেট সেন্ট্রাল।

৬. মানকুমারী বসু, 'প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়', এস কে লাহিড়ী এন্ড কোং, ১৮৮৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৫২০৯, চৈতন্য লাইব্রেরি।

৭. মানকুমারী বসু, 'বিভূতি', ১৩৩০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৮. মানকুমারী বসু, 'বীরকুমার-বধ', তারাকুমার শর্মা কতৃক প্রকাশিত, ১৯০৪।

'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত মানকুমারী বসুর প্রবন্ধসমূহ : (কালানুক্রমিক)

১. বঙ্গ মহিলার পত্র, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, কার্তিক।

২. নব্যগৃহিনীদিগের নতুন অভাব ও উন্মোচন, ১২৯৫, অগ্রহায়ণ।

৩. স্ত্রী ও পুরুষ দিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার, ১২৯৫, পৌষ।

৪. বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য, ১২৯৭, আশ্বিন-কার্তিক।

৫. উদাসিনীর সংসার, ১২৯৭, অগ্রহায়ণ।

৬. গুণগ্রাহিতা শক্তি, ১২৯৭, মাঘ-ফাল্গুন।

৭. আর্যমহিলা গান্ধারী, ১২৯৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।

৮. লজ্জাশীলতা , ১২৯৮, ফাল্গুন।

৯. আর্যমহিলা পার্ব্বতী, ১২৯৮, কার্তিক।

১০. নিন্দুক , ১২৯৯, ফাল্গুন।

১১. আর্যমহিলা সুমিত্রা, ১৩০০, বৈশাখ।

১২. স্বার্থে পরার্থ, ১৩০০, জ্যৈষ্ঠ।

১৩. ভ্রাতৃদ্বিতীয়া , ১৩০০, আষাঢ়-শ্রাবণ।

১৪. পঞ্চযজ্ঞ , ১৩০০, আশ্বিন-কার্তিক।

১৫. শোকের শান্তি, ১৩০০, পৌষ-মাঘ।

১৬. শোকসন্তপ্ত হৃদয়, ১৩০১, বৈশাখ।

১৭. কবির পরিণাম , ১৩০১, শ্রাবণ

১৮. মাতৃভক্তি ও মাতৃউপাসনায় সন্তানের মুক্তি , ১৩০১, মাঘ।

১৯. স্ত্রীলোকের নির্দোষ আমোদ , ১৩০২, পৌষ-মাঘ।

২০. আর্যমহিলা: সীতা, ১৩০৭, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়।

২১. আমাদের মহারানী, ১৩০৭, মাঘ-ফাল্গুন।

২২. দয়া, ১৩০৮, আষাঢ়।

২৩. আমাদের মহর্ষি, ১৩১১, মাঘ।

২৪. শোকোচ্ছ্বাস, ১৩১৪, শ্রাবণ।

২৫. বটবৃক্ষের কাহিনী, ১৩১৫, আশ্বিন।

২৬. মৃত্যু, ১৩১৬, শ্রাবণ।

২৭. রামচন্দ্র, ১৩১৭, শ্রাবণ।

২৮. বামাবোধিনীর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব, ১৩১৯, ভাদ্র।

২৯. বর্ষশেষ, ১৩২১, চৈত্র।

৩০. বামাবোধিনীর জন্মদিনে, ১৩২৩, ভাদ্র।

'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত মানকুমারী বসুর উপন্যাসসমূহ : (কালানুক্রমিক)

১. বনবাসিনী, ১২৯৫, ভাদ্র।

২. গৃহলক্ষ্মী, ১২৯৯, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।

৩. মহামুহূর্ত্ত, ১২৯৯, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন।

৪. শৈশবসঙ্গিনী, ১৩০৪, আষাঢ়-আশ্বিন।

৫. বিমাতা ১৩০৪, মাঘ।

'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত মানকুমারী বসুর গল্পসমূহ : (কালানুক্রমিক)

১. ভিখারিণীর গীতি, ১২৯৮ পৌষ।

২. মাতৃহৃদয়, ১৩০২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।

৩. রাজলক্ষ্মী, ১৩০৩। (সংখ্যা অপ্রাপ্ত)

৪. অদৃষ্টচক্র, ১৩০৫। (সংখ্যা অপ্রাপ্ত)

৫. শোভা, ১৩০৬। (সংখ্যা অপ্রাপ্ত)

৬. দিদিমার রুপকথা, ১৩১৬, অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ।

৭. ভৈরবী, ১৩১৮, আষাঢ়-শ্রাবণ।

৮. পত্নী, ১৩১৯, শ্রাবণ।

৯. অদৃষ্টলিপি ১৩২৪, ভাদ্র-কার্তিক-অগ্রহায়ণ।

এছাড়াও মানকুমারী বসুর রচিত একাধিক অগ্রন্থিত কবিতা রয়েছে, যেগুলি 'বামাবোধিনী' 'নব্যভারত', 'ভারতবর্ষ', 'সখা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির উল্লেখ এখানে করা হলো না।

খ. সহায়ক গ্রন্থ (supporting text):- (বর্ণানুক্রমিক)

১. কালিদাস, 'কুমারসম্ভব', কালিদাস গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খন্ড, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৩২২।

২. বঙ্কিম রচনাবলী, সমগ্র বাংলা রচনা, কামিনী প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৯১।

৩. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.) কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১।

৪. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১।

৫. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.) গোবিন্দচন্দ্র দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, জুলাই ২০১৬।

৬. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.) স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, নভেম্বর ২০১৪।

৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'মেঘনাদবধ কাব্য', মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, পুনমুদ্রণ ২০১২-১৩।

৮. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', অলোক রায়(সম্পা.) দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৪।

৯. রবিশংকর বল, দশটি গল্প, পরশপাথর প্রকাশন, পৌষ ১৪১৮।

১০. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড, নবন মুদ্রণ মাঘ ১৪১৮।

গ. সহায়ক গ্রন্থ (Reference):

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য', দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

২. অলোক রায়, 'উনিশ শতকে নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান', অক্ষর প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৯।

৩. অলোকা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা কাব্য(১৮০১-১৮৭০), জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, ১৯৫৯।

৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য', বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯।

৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মর্ডাণ বুক এজেন্সী, ২০০৬।

৬. আশা দাশ, 'ভারত-ভারতবোধ-ভারত সংস্কৃতি', ফার্মা কে এল এম প্রা: লি:, ২০০১।

৭. উমা মাঝি, 'উনিশ শতকের প্রথমপাদে বঙ্গসমাজ ও সাহিত্যে ভাবসংঘর্ষ', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।

৮. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব', অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪১৯।

৯. কৃত্তিবাসী রামায়ণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, ২০০৫।

১০. ক্ষিতিমোহন সেন, 'হিন্দু ধর্ম', আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৯।

১১. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', গ্রন্থনিলয়, ১৯৯২।

১২. গোপালচন্দ্র সেন, 'দর্শনপরিচয়', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড্ সন্স্।

১৩. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬।

১৪. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'পুরাতনী', ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী-অনুলিখিত ও সম্পাদিত, আনন্দ, ২০১২।

১৫. চণ্ডীদাস পদাবলী, বসুমতী কর্পরেশন লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৬।

১৬. জীবন মুখোপাধ্যায়, 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ', নবভারতী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৩।

১৭. তারকচন্দ্র রায়, 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড্ সন্স্।

১৮. দেবেশ রায়, 'উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য: উনিশ শতকের প্রথমার্ধ নিয়ে কিছু অনুমান', প্যাপিরাস, ১৯৯৪।

১৯. নরহরি কবিরাজ, 'উনিশ শতকের বাংলা জাগরণ: তর্ক ও বিতর্ক', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৯।

২০. নেপাল মজুমদার, 'ভারতে জতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ',(ছয় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৪০১।

২১. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলার ইতিহাস সাধনা', ভবতোষ দত্ত(সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১।

২২. বঙ্কিম রচনাবলী, সমগ্র বাংলা রচনা, কামিনী প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৯১।

২৩. বিদ্যাপতী পদাবলী, বসুমতী কর্পরেশন লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৬।

২৪. বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 'কিশোর কবিতা সঞ্চয়ন', শিশুসাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫।

২৫. বুদ্ধদেব বসু, 'প্রবন্ধ সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৩৬৬।

২৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'-৫৯, 'মানকুমারী বসু', পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯।

২৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মাঘ ১৩৫৭।

২৮. ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', দ্বিতীয় পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০০৯।

২৯. মোহিনীমোহন সরদার, 'কবিকঙ্কন-চণ্ডী বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান', কোডেক্স, ২০১০।

৩০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', অলোক রায় (সম্পা.., প্রথম দে'জ সংস্করণ এপ্রিল ২০০৪।

৩১. রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪১০।

৩২. রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪১০।

৩৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪১০।

৩৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪১০।

৩৫. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, 'ঐতিহ্য ও পরম্পরা: উনিশ শতকের বাংলা', প্যাপিরাস, ১৯৯৯।

৩৬. রমেন চৌধুরী, 'বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক', বি. সেন. এণ্ড কোং, দেবীপক্ষ ১৩৬১।

৩৭. রাজনারায়ণ বসু, ‘সে কাল আর এ কাল’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ডিসেম্বর ২০১৮।

৩৮. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ‘বাঙালির নতুন আত্মপরিচয়: সমাজ সংস্কার থেকে স্বাধীনতা’, অবভাস, ২০০৫।

৩৯. রামদুলাল বসু, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌউণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ’, চলন্তিকা প্রকাশন, ১৩৮১।

৪০. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশু সাহিত্য’, কারিগর, এপ্রিল ২০১৫।

৪১. শিবনাথ শাস্ত্রী, ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি.চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৬।

৪২. শিবনারায়ণ রায়, ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’(২), আনন্দ, মার্চ ২০১৭।

৪৩. শ্রীমন্তকুমার জানা, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’, আধুনিক যুগ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০০৯।

৪৪. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, ‘অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা’, স্ত্রী, ১৯৯৮।

৪৫. সংঘমিত্রা চৌধুরী, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৪৬. সুকুমার সেন, ‘প্রবন্ধ সংকলন’(২), আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৬।

৪৭. সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা’(১৭৫১-১৮৫৫), এম. সি. সরকার. অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ১৩৬১।

৪৮. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য’, অনুষ্টুপ, ১৯৯৯।

৪৯. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ, ২০১৩।

৫০. স্বপন বসু (সম্পা).,‘উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা’ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৯।

৫১. স্বপন বসু, ‘বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস’, পুস্তক বিপণি, অগাস্ট ২০১৬।

৫২. স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা.) 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি', পুস্তক বিপণি, ২৯মে ২০১৯।

৫৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য প্রকরণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রথযাত্রা ১৪১৬।

৫৪. Gayatri Chakravorty Spivak, "Nationlism and the Imagination", Seagull Books, 2010.

৫৫. Girija K. Mookerjee, "The Indian Image of Nineteenth-Century Europe", Asia Publishing House, 1967.

৫৬. Saumyendranath Tagore, 'Rammohan Roy HIS ROLE ININDIAN RENAISSANCE', The Asiatic Society, 2015.

৫৭. Ujjal Kumar Majumdar (Ed.), 'BANKIM CHANDRA CHATTOPADHYAY HIS CONTRIBUTION TO INDIAN LIFE AND CULTURE' A collection of Seminar papers, The Asiatic Society, 2000.

ঘ. পত্রপত্রিকা (Periodicals): (বর্ণানুক্রমিক)

১. কথাসাহিত্য পত্রিকা, 'কবি মানকুমারী বসু', শ্রাবণ, ১৩৭০।

২. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, 'কবি কামিনী রায়' সংখ্যা, ২০০৭।

৩. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা ২০১৭।

৪. তথ্যসূত্র পত্রিকা, কবি মানকুমারী বসু সংখ্যা ১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪১৯।

৫. বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৫, ১২৯৭, ১২৯৮, ১২৯৯, ১৩০০, ১৩০১, ১৩০২, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৬, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১১, ১৩১৪, ১৩১৫, ১৩১৬, ১৩১৭, ১৩১৮, ১৩১৯, ১৩২০, ১৩২১, ১৩২২, ১৩২৩, এবং ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

ঙ. অভিধান(Dictionary): (বর্ণানুক্রমিক)

১. ' আকাদেমি বানান অভিধান', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৮।

২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', প্রথম খণ্ড, অ-ন, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬।

২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', দ্বিতীয় খণ্ড, প-হ, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬।-----0-----